সম্পাদক শ্রীসুশীল রায় বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪

IISCO

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪ · ১৮৮৯ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১ · শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৪ · ১৮৮৯ শক

চিঠিপত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

Post Mark
BOLPUR
11 April 1910

কল্যাণীয়েষু

রথী, অজিত কলকাতায় থাকাকালে তাকে একখানি রেজেষ্ট্রি ও একখানা সাধারণ চিঠি লিখেছিলুম— দুটোই শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয়ের কেয়ারে ২১০।৩।৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ঠিকানায় পাঠিয়ে ছিলুম। কিন্তু সেখানে যায় নাই— সুতরাং সে দুটো চিঠি পায়নি। সেই চিঠি দুইখানি তুই যদি আনিয়ে নিস্ ত ভাল হয়। কারণ সে চিঠি কোথাও পড়ে থাকে বা আর কারো হাতে যায় এ আমার ইচ্ছা নয়। বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী নামক একজন ব্রাহ্ম দেবালয় আপিসে কাজ করেন— তিনি মদনবাবুর গলিতে অবনের জামাই নির্ম্মলদের বাড়িতে থাকেন— তাঁকে পর পৃষ্ঠায় লিখে দিলুম— পাঠিয়ে দিস্ তিনি চিঠি দুটো উদ্ধার করে তোকে দেবেন।

নববর্ষের উপাসনা ভোরে আরম্ভ হবে। তোরা তার আগের দিন যদি এখানে দুপুর রাত্রে এসে পৌঁছস তাহলে পরের দিন কষ্ট হবে— এবং তোদের সঙ্গে যে সব ফল প্রভৃতি আস্‌বে তারও সুব্যবস্থা হতে পারবে না। উপাসনার পর ছেলেরা খাবে— অতএব সন্ধ্যার সময়েই সমস্ত ঠিক করে রেখে দিতে হবে— অতএব মেল ট্রেনেই তোদের আসা ভাল। যদি লাবণ্য এবং প্রমোদ আসে তাহলে গাড়ি রিজার্ভ করে আসাই ভাল— গাড়িতে কিছু বরফ তুলে নিস্—পথে অত্যন্ত গরম।

[চৈত্র ১৩১৬]

২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বৌমার পড়ার জন্যে এক কপি বিচিত্রপ্রবন্ধ নিয়ে আসিস্।

শাস্ত্রীমশায় তাঁর পালি ব্যাকরণের যে ভূমিকা লিখ্‌চেন তার জন্যে তাঁর কর্পূরমঞ্জরী নামক একখানা

প্রাকৃত বইয়ের প্রয়োজন হয়েছে— Harvard Oriental Series-এ সেই বইখানি প্রকাশিত হয়েছে— সেটা গগনদের Libraryতে আছে— নিয়ে আসিস্, শাস্ত্রীমশায় একবার দেখেই ফিরিয়ে দেবেন।

ছেলেরা প্রায়শ্চিত্ত অভিনয় করবে— তাদের জন্যে মুখ রং করার তিনটে stick ও ভুরু প্রভৃতি আঁকার পেন্সিল একটা আনিয়ে নিস্।

মানিকগঞ্জওয়ালাদের একটা চিঠি লেখা হয়েছিল মনে হচ্চে কি লেখা হয়েছিল ঠিক মনে পড়চে না। ইতি ২রা শ্রাবণ ১৩১৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিঁড়ির কাজটাতে এখনি হাত দিয়ে কাজ নেই— কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখা যাক— কি বলিস্ ?

৩

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

বেলা তোদের পুরীতে নিয়ে যেতে চাচ্চে। তাহলে বৌমার পড়াশুনা সমস্ত উলটপালট হয়ে গিয়ে ওর খুব ক্ষতি হবে। এখন কিছুদিন যাতে ওর কোনো প্রকার disturbance না হয় সেজন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

Steamerএর কি হল।

সেই লোকটি (নিবেদিতার) নিশ্চয় তোর সঙ্গে দেখা করেছে— তার একটা ব্যবস্থা না করে দিলে নিবেদিতা আমাকে সহজে ছাড়বেন না।

আশ্বিন মাস থেকে ঠিক মাসের ৩রা তারিখের মধ্যে সুজিতের কলেজের খরচ প্রভৃতির জন্যে তাকে ৩৫ টাকা করে পাঠাতে হবে। এই পঁয়ত্রিশ টাকাটা যাতে সুজিত ঠিক নিয়মমত পায় সেই রকম বন্দোবস্ত করে দিস্। তার ঠিকানা হচ্চে :— ৩২-৬ বীডন্ ষ্ট্রীট।

বসন্ত কবিরাজ তার জামাইয়ের চাকরীর জন্যে চিঠির উপর চিঠি লিখচে। আমি আজ তাকে লিখে দিয়েছি যে, যদি ১৫।১৬ টাকা মাইনেতে কাজে প্রবেশ করতে তার আপত্তি না থাকে তাহলে তোকে জানাতে। ইতি ২৫শে ভাদ্র ১৩১৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

ভূপেশকে একটু উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখে দিস্— নইলে অনিষ্ট হবে।

ভীমবাবুরা যে এষ্টিমেট্ দিয়েছিলেন সেটা ৫০০র কাছাকাছি। সেটা আমার লেখবার ঘরের টেবিলের উপরকার letter rack খুঁজলে প্ল্যানসুদ্ধ পাবি। আশুর প্ল্যান ও এষ্টিমেটের সঙ্গে তুলনা করে দেখে

তারপরে কর্তব্য স্থির করা যাবে। বিশুবাবুর দ্বারা চল্‌বে না— তিনি ভয়ানক বেশি দাবী করেন বলে বোধ হয়।

কাল থেকে আমার জ্বরের মত হয়েছে— এখন কতকটা ভাল আছি।

বেলা কেমন আছে?

ষ্টীমারের কি হল?

ইতি ২৯শে ভাদ্র ১৩১৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

ওঁ

[শিলাইদহ
২২ মাঘ ১৩২১]

কল্যাণীয়েষু

রথী, এণ্ড্রুজ কাল হঠাৎ বৈশাখী ঝড়ের মত এসে পড়ে আজ ঝড়ের মত চলে যাচ্চেন।

ডাক্তার মৈত্র আমার ছুটির মেয়াদ থেকে আরো দুদিন কেটে নিলেন। তিনি ঠিক করেচেন শনিবারে সভা করবেন— তাহলে আমাকে শুক্রবারে ছাড়তে হবে। আজ শুক্রবার। আমার কেবল ছ'টা দিন হাতে রইল।

মনে হচ্চে পর্শু রবিবারে অলকের বৌভাত। তাই এদের বলে দিয়েছি কিছু মাছের জোগাড় করতে। কাল হয়ত সন্ধ্যার মধ্যে মাছ পাঠাতে পারব। অবনকে দিস্।

এবারে কয়দিন মেঘ করে রয়েছে। রোদ পেলে আরো মনের সুখে থাক্‌তুম। পদ্মা এখান থেকে বহুদূরে চলে গেছে— যাকে তার একটিন রেখে গেছে সে নিতান্ত আনাড়ি, যাই হোক কলকাতার চিৎপুর রোডের চেয়ে ভালো।

৬

ওঁ

[শিলাইদহ
মাঘ ১৩২২]

কল্যাণীয়েষু

রথী,···র একটা চিঠি তোকে দেখ্‌তে পাঠাই। এ চিঠি নিয়ে কোনো আন্দোলন করিস নে— কেননা এটা প্রাইভেট চিঠি। এর মধ্যে কতটা সত্য আছে তাও জানি না— তবে কিনা এক এক সময় হঠাৎ এক-একটা সর্বনাশের ঢেউ কোথা থেকে এসে পড়ে— সাম্‌লে ওঠবার পূর্ব্বেই কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়— সেইজন্যেই যদি কোথাও বিপদের সূত্রপাত হয়ে থাকে তবে প্রথম থেকেই সাবধান হতে বলি। মোটের উপর জোড়াসাঁকোয় আমি মনের মধ্যে বড়ই একটা অস্বাস্থ্য অনুভব করি— সেখানকার

হাওয়া আমাকে কিছুকাল থেকে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়— গৃহস্থের ঘরের মর্ম্মের মধ্যে যে জিনিসটি অমৃতের মত, তার বড় অভাব আমাকে আঘাত করে। সেটা যে কি তা আমি নিজেই বেশ সুনির্দ্দিষ্ট করে বুঝতে পারিনে বলে অনেক সময় ভাবি এ সমস্ত হয়ত আমার ক্লান্ত মনেরই ক্লিষ্ট কল্পনা। কিন্তু আমার মন অত্যন্ত Sensitive আমি বাতাসের একটু মাত্র বিকৃতি কিম্বা বিক্ষোভ না বুঝেও যেন বুঝতে পারি— সেইজন্য কেবলি ভয় হতে থাকে যে আমাদের কল্যাণের মূলে হয়ত কোথাও ভাঙন ধরেচে।

যাই হোক আমার এখন নেপথ্যে যাবার সময়— সংসারের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করা আর চল্‌বে না তবু যদি কোথাও কিছু ছিদ্র দেখা দিয়ে থাকে আমি ত একেবারে উদাসীন থাকতে পারি নে।

একবার তোরা এখানে এলে ভাল করতিস্। কলকাতার মধ্যে নিয়ত ডুব মেরে থাকা ত স্বাস্থ্যকর নয়। বৌমার শরীর যদি অসুস্থ হয়ে থাকে এখানে আসবামাত্র সেরে যাবে কোনো সন্দেহ নেই। মীরা ত বোলপুরে যাবে— নাও যদি যায় তাকেও আন্‌তে পারিস যথেষ্ট জায়গা আছে। চরে এবার যে জায়গায় আছি ভারি চমৎকার— দুদিকে নদী— মাঝখানে প্রশস্তচর।

তিনজন artist খুবই আনন্দে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোরা অল্পদিনের জন্যও একবার আসবার চেষ্টা করিস্। অনেক আলোচনার বিষয় এখানে আছে। বৌমার পক্ষেও এই Change উপকারী হবে কোনো সন্দেহ নেই।…

Cousinsকে আমাদের অভিনয়ের রিপোর্ট কি পাঠানো হয়েচে?

পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অজিত। অজিতকুমার চক্রবর্তী

লাবণ্য। অজিতকুমারের স্ত্রী

নির্মল। নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শাস্ত্রীমহাশয়। বিধুশেখর শাস্ত্রী

গগন। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বেলা। মাধুরীলতা : কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা

সুজিত। সুজিতকুমার চক্রবর্তী

ডাক্তার মৈত্র। দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

অলক। অবনীন্দ্রনাথের পুত্র অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিবাহ-তারিখ ২২ মাঘ ১৩২১

তিন জন আর্টিস্ট। নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর ও মুকুলচন্দ্র দে

সতীশচন্দ্র রায় ১৮৬৬ - ১৯৩১

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গভাষার জন্মকাল হইতেই এই ভাষা ও ইহার সাহিত্য বাঙ্গালী পণ্ডিতের কাছে একেবারে উপেক্ষিত হয় নাই, যদিও পণ্ডিত লোকেরা অর্থাৎ সংস্কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী বেশীর ভাগ সংস্কৃতেই লিখিতেন, বিষয়বস্তুর অভাবের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা সম্বন্ধে তাঁহাদের ততটা আগ্রহ ছিল না। অবশ্য তাঁহারা সংস্কৃত হইতে অনুবাদের মাধ্যমে এবং পদ ও কাব্য রচনার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার সাধনে যথাশক্তি চেষ্টিত হইতেন, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া, রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের কথাবস্তু মৌখিক কথকতার সহায়তায় ও মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে জনসাধারণের আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টি সাধনে যত্নবান্ হইতেন; এতদ্ভিন্ন ভালো রচনা বাঙ্গালায় পাইলে, তাহা উপেক্ষা করিতেন না, বরং তাহার চর্চায় মনোনিবেশ করিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধ সহজিয়া চর্যা-গানগুলির সংস্কৃত টীকা খুব সম্ভব বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতেরাই লিখিয়া গিয়াছেন, এবং রাধামোহন ঠাকুর ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদের সংস্কৃত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, বাঙ্গালা সাহিত্যে বড়ো বই, ভালো বই, নামকরা বইয়ের অভাব নিতান্তই পীড়াদায়ক। বাঙ্গালা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ, যাহা মধ্যযুগে লিখিত হইয়াছিল, তাহা হইতেছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'। নিষ্ঠার সহিত বাঙ্গালী বৈষ্ণব পণ্ডিত ও জনসাধারণ ইহা পাঠ করিয়া আসিয়াছেন, এবং সম্প্রতি ইহার হিন্দী ইংরেজি ও সংস্কৃত অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে আগত ইউরোপীয়দের হাতেই বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চর্চা রীতিমত ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। ইউরোপীয় খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকেরা মুখ্যত: খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া ভারতীয় ভাষা পঠন-পাঠন আরম্ভ করেন, এবং খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের কাজে লাগিয়া যান। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ভারতীয় ভাষার স্বকীয় সাহিত্যের সম্বন্ধে প্রথমটায় কোনও আগ্রহ ছিল না, এবং পুরাতন সাহিত্যের চর্চা তাঁহাদের গণ্ডীর এবং ক্ষমতার বাহিরেই ছিল। বাঙ্গালার প্রথম ব্যাকরণ ও প্রথম গদ্য-গ্রন্থ ('কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ') লিস্‌বন্ হইতে ১৭৪৩ সালে রোমান হরফে পোর্তুগীস্ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তখন পোর্তুগীস্ পাদ্রীদের মধ্যে বাঙ্গালার নিজস্ব সাহিত্য পড়িবার কোনও গরজ ছিল না। ইংরেজ সরকারী কর্মচারী নাথানিএল ব্রাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ সালে হুগলী হইতে তাঁহার Grammar of the Bengal Language প্রকাশিত করেন—এই পুস্তকের ছাপায় সর্বপ্রথম বাঙ্গালা হরফ ব্যবহৃত হয়। পোর্তুগীস্ পাদ্রী মানুএল দা আস্‌সুম্পসাঁও-র ব্যাকরণ অপেক্ষা ইংরেজিতে লেখা হ্যালহেডের ব্যাকরণ আরও উচ্চ পর্যায়ের বই ছিল; এবং হ্যালহেড তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণে বাঙ্গালা পাঠের নিদর্শন স্বরূপ কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে কিয়দংশ ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। বিদেশীর হাতে এইরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চার সূত্রপাত দেখি। ইহার পরে রুষ বাদক নাট্য-প্রযোজক এবং লেখক হেরাসিম লেবেডেফ কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গালা নাটক রচনায় ও প্রযোজনায় পথিকৃৎ হইলেন, কলিকাতার দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ লিখিবার প্রয়াস করিলেন, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উচ্চ কোটির পুস্তক অধ্যয়নেও মনোনিবেশ

করিলেন— ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তিনি রুষ অক্ষরে নিজের উচ্চারণের সুবিধার জন্য লিখিয়া লইলেন, এবং প্রত্যেক শব্দের আক্ষরিক অনুবাদও দিলেন। হাতে-লেখা বাঙ্গালা বইয়ের প্রত্যেকটি ছত্র ধরিয়া এইভাবে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে বাঙ্গালা ভাষার চর্চায় তিনি অবহিত হইলেন; ইঁহার নিজের লেখা রুষ প্রতিবর্ণ- ও অনুবাদ-ময় এই বই মস্কো নগরে রক্ষিত আছে, এবং ইহার দুই-একটি পৃষ্ঠাও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদিত, লেবেডেফের কৃতি বাঙ্গালা নাটকের সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহার পরে আমরা পাই শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট পাদ্রী উইলিয়ম কেরিকে, ইনি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অপরিসীম সেবা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙ্গালার প্রথম যুগের এক বড়ো কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণের মুদ্রণ ও প্রকাশন, এবং ইঁহার দ্বারা প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা— এই সব কারণে ইনি চিরকাল ধরিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন।

প্রায় ঐ সময়েই ভারতে ও ভারতের বাহিরে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে সংস্কৃতের চর্চা আরম্ভ হইয়া যায়। কয়েক দশক ধরিয়া ভারতের আধুনিক ভাষার সাহিত্যের প্রতি ইউরোপীয় মনীষার একটু অবহেলা দেখা যায়। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, কারণ তাঁহাদের নিজেদের দেশে নিজেদের মাতৃভাষার সাহিত্যের গভীর আলোচনা তখনও আরম্ভ হয় নাই। সকলেই তখনও ইউরোপের প্রাচীন ভাষা লাতীন ও গ্রীক লইয়াই মশগুল হইয়া থাকিতেন। গ্রীক ও লাতীনের পাশে ইহাদের সহোদরা সংস্কৃত ভাষাও স্থান করিয়া লইল। ১৮৬০ সালের পর হইতে এদেশের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইউরোপের কোনও-কোনও ব্যক্তি আকৃষ্ট হইলেন। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পোর্তুগীস পাদ্রীদের হাতে, কোঙ্কণী মারাঠী ও তমিল, এই তিনটি ভাষা বিশেষভাবে আলোচিত হইত, কিন্তু উত্তর-ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির প্রতি কাহারও তেমন দৃষ্টি পড়ে নাই। ফরাসী পণ্ডিত গার্স্যাঁ দ্যু-তাসি হিন্দী ও উর্দু ভাষার সাহিত্যের চর্চা করিতে লাগিলেন, এবং সে সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষার আলোচনার আদি প্রবর্তক ইংরেজ সিবিলীয়ন জন বীম্স্ ১৮৬৫ সালের দিকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

বঙ্গভাষী জনসাধারণ পুরানো সাহিত্য বলিতে খুব বেশী করিয়া বিবিধ কবির কৃতি রামায়ণ মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ করিতেন; কবিকঙ্কণ-চণ্ডী এবং বিশেষ করিয়া ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল লোকপ্রিয় কাব্য ছিল, এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের নিকট বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিত্য মহাজন-পদাবলী ও জীবনী-সাহিত্য প্রভৃতি সমাদৃত ছিল। ১৮৭০ সালের পরে ক্ষীণ ধারায় মাতৃভাষার পুরানো সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালীর কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা দেখা দিল। এই বিষয়ে অগ্রণী হইলেন রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়; তাঁহার নামের ইংরেজি বানানের তিনটি আদ্য অক্ষর R. C. D.-কে বদলাইয়া Arcy Dae এই ছদ্ম নামে ইংরেজিতে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক প্রকাশ করিলেন ১৮৭২ সালে। তারপরে পথ যেন খুলিয়া গেল। বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য মন্থন করিয়া ১৮৮৩ সালে জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' সংকলন করিলেন, এবং প্রায় ঐ সময়েই (১৮৭৪) সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলী, বাঙ্গালা পদসাহিত্য হইতে সংকলন করিয়া, পৃথক্ প্রকাশ করিলেন। সারদাচরণ মিত্র ও শোভাবাজারের বরদাকান্ত মিত্রের সহযোগিতায় সাহিত্য-সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' নাম দিয়া

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ প্রমুখ পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত করেন (১৮৭৪-৭৭)। ইতিমধ্যে কলিকাতার বটতলা ছাপাখানা হইতে ১৮৪০ সালের পূর্বেই কিছু-কিছু বৈষ্ণব পদ পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়, এবং ১৮১৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন কতকগুলি সংস্করণও প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলার সাধারণ পাঠাগারে বৈষ্ণব পদকর্তাদের সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজকে তাহার ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের এই দিকটির প্রতি আকৃষ্ট করেন। রমণীমোহন মল্লিক চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতির সম্পূর্ণ পদসংগ্রহ প্রকাশিত করেন। ইতিমধ্যে ১৮৯২ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী তাহার প্রাচীন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক রিকৃথ সম্বন্ধে সচেতনভাবে অনুসন্ধানের জন্য পথ বাহির করিল।

১৮৭২ সালে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তখনকার কালের বিখ্যাত পুস্তক 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত করেন। ওদিকে কুমিল্লায় ও ঢাকায় থাকিয়া দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত করেন। পরে ১৯১২ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালার আধারে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক *History of the Bengali Language and Literature* প্রকাশিত করিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পুঁথি সংগ্রহ এবং অপ্রকাশিত পুঁথির মুদ্রণ তখন পূরা দমে চলিয়াছে।

এইভাবে বাঙ্গালীর কাছে তাঁহার মাতৃভাষার সাহিত্যের গভীর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের সূত্রপাত হইল। এবং এই পথে যাঁহারা নূতন-নূতন আবিষ্কার ও গবেষণার দ্বারা, নূতন তথ্য ও তত্ত্ব আনয়ন করিয়া বঙ্গ-সরস্বতীর মুখ উজ্জ্বল করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক মনস্বী ও কৃতী পুরুষ ছিলেন ঢাকার সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়।

বাঙ্গালী তাহার সাহিত্য-সাধনায় রাজশেখরের নির্দিষ্ট দুই প্রকার মনীষার বা প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন—(১) কারয়িত্রী প্রতিভা, ও (২) ভাবয়িত্রী প্রতিভা। কারয়িত্রী প্রতিভা, ইংরেজিতে যাহাকে Creative genius বলে— তাহা হইতেছে অভিনব সাহিত্য সর্জনা, নূতন-নূতন রসসৃষ্টি, এবং সৎ বা সাধু সাহিত্যের প্রসার। ভাবয়িত্রী প্রতিভা, অর্থাৎ reflective genius, মুখ্যতঃ আলোচনাত্মক— যে সাহিত্য আমাদের উপলব্ধ হইয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা ও বিচার। বাঙ্গালা ভাষার মতো উন্নতিশীল ভাষায় এই উভয়বিধ প্রতিভার লক্ষণীয় বিকাশ দেখা যায়। কবিতা ও কাব্য, গল্প ও উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্য-সর্জনা বাঙ্গালা ভাষায় এখন অব্যাহত রূপেই চলিতেছে। আধুনিক কালে যে-সমস্ত নূতন-নূতন সাহিত্যের ধারা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষা নিত্যই নব-নব রচনার দ্বারা পুষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ কোটির সাহিত্য-স্রষ্টার অভাব কখনও হয় নাই ; এযুগে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেম, নবীন, বিহারীলাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, পরে রবীন্দ্রনাথ— ইঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, এমন বহু জীবিত কবি এখনও বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বর্ধন করিতেছেন। গল্প ও উপন্যাসে আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণ বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র শরৎচন্দ্র

প্রমুখ পথিকৃৎদের অনুসরণে ভারতের তথা বিশ্বের সাহিত্যে অতি উচ্চ মর্যাদার স্থান অধিকার করিয়াছেন।

এদিকে বাঙ্গালা বাঙ্ময়ের অধ্যয়ন ও আলোচনায় বাঙ্গালীর ভাবয়িত্রী প্রতিভা তাহার কারয়িত্রী প্রতিভার সঙ্গে তাল রাখিয়া যেন চলিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় বাঙ্গালী মনীষী পণ্ডিত কখনও অবহেলা করেন নাই, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা কতকগুলি অদ্ভুৎ শক্তিশালী লেখককে পাইয়াছি, এবং এই কাজে তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরও অভাব হয় নাই। আধুনিক সাহিত্য ভিন্ন বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্যের আলোচনাও চলিতেছে, এবং এই আলোচনার ইতিহাস বা ধারা সংক্ষেপে উপরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে যাঁহারা একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম সকল দিক হইতেই শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতে হয়। মৃত ও জীবিত আলোচকদের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালীর প্রাচীন সাহিত্য গভীরভাবে চর্চা করিয়া সেই আলোচনার পথকে সুগম করিয়া দিয়াছেন এবং এই বিষয়ে একটি discipline বা পরিপাটি অথবা পদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তাঁহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায়ের অপেক্ষা যোগ্যতর পণ্ডিত আর কেহ-ই দেখা দেন নাই। সতীশচন্দ্র রায় বাঙ্গালা ১২৭৩ সালের ১লা কার্তিক ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার ধামগড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৩৩৮ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ ঐ স্থানেই আপন গৃহে পরলোক গমন করেন (ইংরেজি ১৮৬৬ হইতে ১৯৩১ সাল)। তাঁহার জীবন ছিল সম্পূর্ণ রূপে বিদ্যাচর্চায় উৎসর্গীকৃত। কোনও চটকদার ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। একনিষ্ঠভাবে সারস্বত-সাধনার এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হইতেছে পাঁচ খণ্ডে বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ 'পদকল্পতরু'র সটীক সংস্করণ, ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ১৩২২ বঙ্গাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত কয় বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হয়। এই বিরাট পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে ২৫৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী তাঁহার লিখিত অতীব মূল্যবান্ ভূমিকা ও ১১৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী শব্দসূচী সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পঞ্চম খণ্ড তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র, অধুনা পরলোকগত ভবানীচরণ রায়ের লিখিত তাঁহার পিতার একটি ক্ষুদ্র জীবনকথা-মুদ্রিত হইয়াছে। এই জীবনকথা হইতে সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার বহুমুখী জ্ঞান ও অভিনিবেশ এবং সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দী ও অন্যান্য ভাষার, উপরন্তু ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ অধ্যয়ন ও বিচার-শক্তি লইয়া অতি অল্প সাহিত্য-সমালোচকই আমাদের দেশে প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইনি একজন অধিকারী পণ্ডিত ছিলেন। বি. এ. পরীক্ষাতে সংস্কৃতে অনার্স লইয়া প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন— তাঁহার সহিত প্রথম হন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এবং কর্মবীর অম্বিকাচরণ উকিল মহাশয়। সতীশচন্দ্র সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

সারা জীবন ধরিয়া তিনি বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিবার কালে হিন্দী ভাষার চর্চা আরম্ভ করেন; এবং ঐ ভাষাতে এতদূর প্রাধান্য অর্জন করেন যে, ইহাতে কতকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধ রচনা করেন, এবং হিন্দীর পণ্ডিত-সমাজে বিশেষভাবে সুপরিচিত হন। হিন্দী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ছাড়া,

উত্তর-ভারতের তাবং আর্য-ভাষার সহিত তাঁহার অল্প-বিস্তর পরিচয় ঘটে। ইহা ভিন্ন ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকগণের পুস্তক অধ্যয়ন করা তিনি তাঁহার সাহিত্য-সাধনার অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং ইংরেজি ফরাসী ইতালীয়ান জর্‌মান রুষ গ্রীক ও লাতীন ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির সহিত তিনি পরিচয় লাভ করেন। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আনুষঙ্গিক অন্যান্য মানবিকী শাস্ত্রের সম্বন্ধে তাঁহার যেমন আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা ছিল, তেমনই ছিল অতন্দ্র পরিশ্রমের সহিত সেই সমস্ত বিষয়ের চর্চা। ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ দর্শনে অতি আধুনিক বিকাশও তাঁহার আলোচ্য ছিল। ভারতীয় অলংকার ও রস -শাস্ত্রেও তেমনই ছিল তাঁহার গভীর প্রবেশ। প্রাচীন বাঙ্গালা, বিশেষতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা তুলনামূলক পদ্ধতির এক অপরিহার্য অঙ্গ, এবং সেইজন্য তিনি হিন্দীর শ্রেষ্ঠ classics বা প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থগুলির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ছন্দঃশাস্ত্রে— কেবল সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দী মৈথিলীর নহে, অধিকন্তু ইংরেজি ছন্দ সম্বন্ধেও তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহা ব্যতীত তিনি সংগীতেও পারদর্শী ছিলেন— কেবল সংগীতের সম্বন্ধে উপর-উপর জ্ঞান নহে; তিনি কার্যকরভাবে একজন গায়ক ও উচ্চদরের বাদ্যশিল্পী ছিলেন, এবং এই বিষয়ে তাঁহার বহুবর্ষ-ব্যাপী অধ্যবসায় ও সাধনাও ছিল। পাখোয়াজ ও তবলায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এবং কলিকাতার বিখ্যাত পাখোয়াজী মুরারিবাবুর শিষ্য ছিলেন। ফলিত জ্যোতিষেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশীয় astrology বা ফলিত জ্যোতিষ লইয়া তিনি গবেষণা করিতেন। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি মৌলিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার সংকল্প করেন, কিন্তু কার্যতঃ তাহা হইয়া উঠে নাই। এতদ্ভিন্ন তিনি চিত্রবিদ্যার একজন গুণী সমঝদার ছিলেন, এবং বিশেষ করিয়া ইউরোপের আধুনিক কালের শিল্পকলা তাঁহার সানুরাগ আলোচনার বস্তু ছিল। এককালে তিনি ছোটো গল্প ও উপন্যাস লিখিবার সংকল্প করেন, কিন্তু তাহার উপযোগী 'কারয়িত্রী প্রতিভা'র পরিবর্তে অন্য প্রকারের প্রতিভাই তাঁহার জীবনে সম্যকভাবে প্রকাশিত হয়। তবে তিনি কালিদাসের 'মেঘদূত', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত বইয়ের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে সতীশচন্দ্র অত্যন্ত নিরভিমান মাধুর্যপূর্ণ সর্বজনপ্রিয় মানুষ ছিলেন। কাহারও সম্পর্কে তিনি কখনও দ্বেষ পোষণ করেন নাই, এবং সকলেই তাঁহাকে তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় ও সৌজন্যের জন্য আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। সতীশচন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎপরিচয়ের সৌভাগ্য কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদে, এবং যতদূর মনে হয়, ঢাকায় তাঁহার বাসাবাড়িতে হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাতে, এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আমার অধ্যাপনার মুখ্য উপজীব্য হওয়াতে, আমি তাঁহার প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং তদ্দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি। তাঁহার 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী', ভবানন্দের 'হরিবংশ', এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু'— এগুলি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় আমার নিত্য সঙ্গী ছিল। দুই একটি বিষয়ে আমার বিচার তাঁহার মনঃপূত হওয়াতে, তিনি বিশেষ স্নেহের সহিত তাহার উল্লেখ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করেন; ব্যক্তিগত ব্যবহারেও তাঁহার সেই প্রীতির পরিচয় পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

অবস্থাগতিকে ভাষাতত্ত্বের পথ ধরিয়া আমাকে বিদ্যাপতি প্রমুখ প্রাচীন মহাজনগণের পদের

আলোচনা করিতে হইয়াছিল, এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের সহিত মিলিয়া চণ্ডীদাসের পদের সংগ্রহ ও সম্পাদনের কাজে হাত দিয়াছিলাম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আমাদের উভয়ের সম্পাদনায় 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদনার কালে আরও গভীরভাবে সতীশচন্দ্রের 'পদকল্পতরু' ও 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' আলোচনা করিবার আবশ্যকতা হইয়াছিল। তিন হাজার এক শ এক সংখ্যক পদের এক সম্পুট এই মহাগ্রন্থকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদসাহিত্যের ঋগ্বেদ বলিতে পারা যায়। এবং ঋগ্বেদ-সংহিতার মতো এই 'বৈষ্ণব-পদ-সংহিতা' গ্রন্থের টীকাকার অভিনব সায়ণাচার্য রূপে আবির্ভূত হন সতীশচন্দ্র রায়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে এই পদকল্পতরু গ্রন্থের সংকলন-কর্তা বৈষ্ণবদাসকে এই বৈষ্ণব-পদ-সংহিতার ব্যাস ঋষি বলা যায়। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য এবং সঙ্গে-সঙ্গে অলংকার ও রস -শাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্যিক ও পৌরাণিক উল্লেখাদি, আবশ্যক ক্ষেত্রে অনুবাদ এবং পদসমূহের কাব্যসৌন্দর্যের বিশ্লেষণ— এই সমস্ত লইয়া সতীশচন্দ্রের পদকল্পতরুর টীকা এক অপূর্ব ও অমূল্য বস্তু হইয়া বিদ্যমান। নানা পুথি মিলাইয়া পদগুলির পাঠ নির্ণয় করিবার চেষ্টা সতীশচন্দ্রের সংস্করণে প্রতি পদে দেখা যায়, এবং কাব্য-সাহিত্যের সম্পাদনায় এই বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। এইরূপ সুশিক্ষিত সুসংস্কৃত সহজ সরল ও আড়ম্বরবিহীন পাণ্ডিত্য আমাদের দেশে অত্যন্ত বিরল। ইঁহার আবশ্যক বিষয়ের জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা এবং সঙ্গে-সঙ্গে ইঁহার বিনয়-নম্রতা ও আত্মাবলুপ্তি, এই-সব দেখিয়া ইঁহাকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচক সুপণ্ডিতগণের মধ্যে নেতা বলিতে কিছুমাত্র সংকোচ হয় না।

সতীশচন্দ্রের সম্পাদিত গ্রন্থাবলী এবং সংস্কৃত হইতে তাহার অনুবাদের সংখ্যা সব মিলিয়া দশখানিরও অধিক নহে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পুত্রের লিখিত প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত তাঁহার সাতাশটি এবং হিন্দীতে রচিত সাতটি বিভিন্ন আলোচনার সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার রচনা-সম্ভার পরিমাণে বিরাট নহে, কিন্তু "একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি, ন চ তারাগণৈরপি"— তাঁহার সম্পাদিত মাত্র পদকল্পতরুর দ্বারাই তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিশালত্ব এবং উপযোগিতা বুঝিতে পারা যাইবে। এই গ্রন্থ বাঙ্গালা তথা ভারতীয় সাহিত্যে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে, এবং আশা করিতে পারা যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিত্যের, পাঠক তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিবে এবং অনুপ্রেরণা পাইবে। তথ্য ও তত্ত্ব, উভয় দিক হইতেই তিনি বাঙ্গালা দেশের মধ্যযুগের বৈষ্ণব কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের পরেই যেন একটি মর্যাদার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গভাষী আমরা আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য লইয়া গর্ব অনুভব করি, এবং কখনও-কখনও সেই গর্ব প্রকাশও করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা সেই সাহিত্যকে স্বরূপে বুঝিবার জন্য উপযুক্ত পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হই। সতীশচন্দ্র আমাদের প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনার পথ বিশেষভাবে সহজ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই বৎসর গৌড়বঙ্গে তাবৎ সুধীগণ তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী পালন করিবেন, এবং তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কথঞ্চিৎ ঋষি-তর্পণের দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ করিবেন। তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সশ্রদ্ধ প্রণাম আমরা নিবেদন করিতেছি; কিন্তু তাঁহার স্মৃতি জীবিত রাখিবার জন্য তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির পুনঃপ্রকাশ বিষয়ে আমরা কি অবহিত হইব না?

আষাঢ় ১৩৭৪। জুন ১৯৬৭

সতীশচন্দ্র রায় ও শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শৈশব হইতেই পদাবলী কীর্তন শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

কীর্তন শুনি, অথচ মানে বুঝিতে পারি না। গান জানি না, গাহিবারও গলা নাই, তথাপি কীর্তন ভাল লাগে। আর কীর্তন ভাল লাগে বলিয়াই কবিগান ভাল লাগে; ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, রামায়ণ-গান; নীলকণ্ঠের যাত্রা ভাল লাগে। বিশেষ রসিক দাস, গণেশ দাস, প্রেমাদাস, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন এবং নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনিতে দূরান্তরেও ছুটিয়া যাই। কীর্তন গানে এবং নীলকণ্ঠের যাত্রায় জয়দেবের নাম শুনি, গানও শুনি। জয়দেবের মধ্যস্থতাতেই সতীশচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয়।

আমাদের গ্রাম হইতে জয়দেব কেন্দুলী বেশি দূর নয়। বাল্যকাল হইতেই জয়দেবের মেলায় যাইতাম— পৌষ-সংক্রান্তির মেলা। মেলায় একখানি শ্রীগীতগোবিন্দ কিনিলাম। কি বিপদ— একটানা সমাসবদ্ধ সংস্কৃত পদ, শ্লোকগুলি কটমট। গানের ঝঙ্কারে প্রাণ টানে, শ্লোক কিন্তু একেবারেই দুর্বোধ্য। বটতলার ছাপা গ্রন্থ, পদ এবং শ্লোকের নীচে বঙ্গানুবাদ আছে। মনে হইল জয়দেবকে ভাষান্তরিত করা যায় না।

বীরভূম হেতমপুরের মহারাজকুমার শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী বীরভূম জেলার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন। সে কালের 'গৃহস্থ' মাসিক পত্রে তিনি 'সুপুর' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন —সুপুর গ্রামের কথা। লেখায় ভুল ছিল, আমি প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। সেই সূত্রে মহারাজকুমারের সঙ্গে পরিচয়। তাঁহার আহ্বানে হেতমপুর যাই। সেই সময়ে 'বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি' প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক আলোচনা হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারের পত্র পাইয়া হেতমপুর যাইতে হইল। তথা হইতে কলিকাতা। কলিকাতায় সেজবৌ-রানীর অসুখ সারিতেছিল না, এই জন্য কলিকাতা হইতে দেওঘর। সেখানে তাঁহাদের নিজের বাড়ি ছিল। কলিকাতাতেই শ্রীগীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদের কথা শুনিয়াছিলাম। একখানি সংগ্রহ করিলাম। অনুবাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম. এ.। এক পৃষ্ঠায় লাল কালিতে ছাপা পদ ও শ্লোক, অন্য পৃষ্ঠায় কালো কালিতে ছাপা সতীশচন্দ্রের কৃত পদ্যানুবাদ। রানা কুম্ভের নামে প্রচলিত টীকা 'রসিক প্রিয়া' এবং সতীশচন্দ্রের লিখিত বিস্তৃত ভূমিকা এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য। ভূমিকায় রায়মহাশয় জয়দেবের গানের কিম্বা শ্লোকের ছন্দের ত্রুটি ধরিয়াছিলেন, স্মরণ হইতেছে না। এই গ্রন্থেই আমি জয়দেব সম্বন্ধে আলোচনার একটা সূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম। জয়দেবকে লইয়াই রায়মহাশয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত। সতীশচন্দ্র সে সময়ে পাবনা জেলার সাহাজাদপুরে জমিদারবাড়িতে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

হেতমপুরে 'বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইবে। উপদেষ্টা হইবেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ। সভাপতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু। সম্পাদক মহিমানিরঞ্জন, এবং আমি হইব সহ-সম্পাদক। এইসমস্ত কথাবার্তা যখন মহিমানিরঞ্জনের সঙ্গে স্থির হইয়া গেল, তখন বীরভূম-বিবরণে জয়দেবের কেন্দুলীর কথা লিখিতে হইবে বলিয়া আমি দেওঘর হইতেই সতীশচন্দ্রের সঙ্গে পত্র ব্যবহার আরম্ভ

করিলাম। পত্রেই তাঁহার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সে আজ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কালের— সন ১৩২১ সালের ভাদ্র মাসের কথা। পত্রে জয়দেব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতাম, তিনি উত্তর দিতেন। এই পত্রগুলি হারাইয়া গিয়াছে। সতীশচন্দ্রের শ্রীগীতগোবিন্দ বাহির হইয়াছিল— সন ১৩১৯ সালে।

আমাদের সংকলনের নাম ছিল 'বীরভূম-বিবরণ'। 'বীরভূম-বিবরণ' ছাপা হইত বিশ্বকোষ প্রেসে। আমি তখন থাকিতাম হেতমপুররাজের ৮৭।১ রিপন স্ট্রীটের বাড়িতে; অবশ্য বই ছাপাইবার প্রয়োজনে কলিকাতায় গিয়াছিলাম। স্বাভাবিক ভাবেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ কার্যালয়ে যাতায়াত করিতাম। সেখানে পরিচিত হই— পরিষদ-অন্ত-প্রাণ রামকমল সিংহের সঙ্গে। এমন কর্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী, সদালাপী, অক্লান্ত কর্মী আমি খুব কমই দেখিয়াছি। অল্পদিনেই তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া উঠিলেন।

পরিষদ তখন পদাবলী সাহিত্যের রত্নমঞ্জুষা শ্রীশ্রীপদকল্পতরু এক-একখানি করিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন। সম্পাদন করিতেছিলেন তদানীন্তন বঙ্গে পদাবলী সাহিত্যের একপত্রী রত্নাকর সতীশচন্দ্র। পদকল্পতরু বোধহয় সতীশচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ ছিল। সন ১৩০৪ সালে তিনি একবার পদকল্পতরু সম্পাদন করিয়াছিলেন। সে গ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। তাহাতে কোনো পাঠান্তর, ব্যাখ্যা বা টীকাটিপ্পনী ছিল না। ভারতীয়-গ্রন্থপ্রচার-সমিতি এই পদকল্পতরু প্রকাশ করেন। পরিষদ হইতে সন ১৩২২ সালে পদকল্পতরুর প্রথম স্তবক প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি আমি পূর্বেই দেখিয়াছিলাম। পদাবলী কেমন করিয়া সম্পাদন করিতে হয়, সেই প্রথম দেখিলাম। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসজ্ঞতার এমন রাসায়নিক সংমিশ্রণও তখন আমার চক্ষে নূতন। আমি মনে মনে তাঁহাকে পদাবলী-পরিক্রমায় গুরুপদে বরণ করিয়া লইলাম। পদকল্পতরু সম্পাদন ব্যাপদেশে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পরিষদে আসিলেন, রামকমল তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণে ধন্য হইলাম। তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহাকে কত যে চিঠি লিখিয়াছি, কত বাদপ্রতিবাদ করিয়াছি, তিনি স্নেহভরে প্রতিটি চিঠিরই উত্তর দিয়াছেন। কখনো কখনো সাত-আট পাতার চিঠিও লিখিতেন। হাতের লেখা খুব ভাল ছিল না, পড়িতে সামান্য অসুবিধা হইত।

পদাবলী-আলোচনার এই পথিকৃৎ বাঙ্গালা সংস্কৃত হিন্দী ও ইংরাজি ভাষায় সমান অভিজ্ঞ ছিলেন। ভাষাতত্ত্বেও অধিকার তাঁহার কম ছিল না। ছন্দ এবং অলঙ্কারেও তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। পদাবলী আলোচনা করিতে হইবে বলিয়া তিনি পাখোয়াজ এবং খোল শিখিয়াছিলেন। গানও শিখিয়াছিলেন, তবে কণ্ঠে সুর ছিল না বলিয়া তিনি বেহালাতেই হাত পাকাইয়াছিলেন। বেহালায় কীর্তনের সুর তুলিতেন। পদাবলী সাহিত্যে এমন পাণ্ডিত্য, এমন রসজ্ঞতা, এমন শ্রদ্ধা, এমন নিষ্ঠা, এমন বিচার-বিশ্লেষণে নিপুণতা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সতীশচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় ধামগড় গ্রামে। জন্ম সন ১২৭৩ সাল, তারিখ ১লা কার্তিক। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে এন্ট্রান্স ও কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এবং কলিকাতায় জেনারেল এসেম্ব্রী ইন্‌স্টিটিউট হইতে সংস্কৃতে অনার্স লইয়া বি. এ. পরীক্ষায় প্রথমশ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার

করেন। স্বনামধন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেবার প্রথম হইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজ হইতে এম. এ. পাস করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন।

কিছুদিন অধ্যাপনার পর সতীশচন্দ্র সাহাজাদপুরের জমিদারবাড়িতে চাকুরী লইয়া চলিয়া যান। সাহাজাদপুরে থাকিবার কালেই তিনি পদাবলীর হস্তলিখিত অনেক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'র ভূমিকা হইতে এ বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য উদ্ধৃত করিতেছি। 'পদ রস সার' পুঁথিখানির বিষয়ে লিখিতেছেন—'পাবনা জেলার পাতিয়া বেড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীমাধবীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে।' —ভূমিকা।/০। 'আর একখানি উল্লেখযোগ্য পুঁথিকে আমরা দৌলতপুর পুঁথি নামে অভিহিত করিয়াছি। এই পুঁথিখানি আমরা পাবনা জেলার রায় দৌলতপুর গ্রাম নিবাসী সুকণ্ঠ কীর্তন গায়ক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল অধিকারীর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি।' —ভূমিকা।/০। 'এই পদসংগ্রহের প্রধান প্রবর্তক বলিয়া আমাদিগের সর্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞতার পাত্র বাঁকুড়া জেলার শ্রীপাট পুরুলিয়া নিবাসী নিত্যানন্দ বংশাবতংস কীর্তন পারদর্শী শ্রীযুক্ত বনবিহারী গোস্বামী মহোদয়। তিনি আমাদের কার্যস্থল সাহাজাদপুরে শিষ্যালয়ে অবস্থান কালে আমাদিগকে নানা সময়ে নানা স্থান হইতে বৈষ্ণব-পদাবলীর নানা পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া ও আমাদিগের সহিত একান্ত অন্তরঙ্গভাবে বৈষ্ণব-পদাবলী ও রসগ্রন্থের আলোচনা করিয়া আমাদিগকে যেরূপ অনুগৃহীত ও উপকৃত করিয়াছেন, তাহা বলা দুঃসাধ্য। আমরা চিরকাল এজন্যে ঋণী থাকিব।' —ভূমিকা ॥/০। পদরত্নাবলী প্রকাশিত হয় সন ১৩২৭ সালে। পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় সাহাজাদপুর হইতে, প্রকাশকের নাম শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম. এ.। সন ১৩২৭ সালের ৭ই চৈত্র আমি পুস্তকখানি উপহার প্রাপ্ত হই। তিনি নাম স্বাক্ষরপূর্বক নিজ হাতে আমাকে পুস্তকখানি দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

সতীশচন্দ্রের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি পরিষদ-প্রকাশিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু সম্পাদন। পদের পাঠ নির্বাচনে, ব্যাখ্যায়, রসবিশ্লেষণে, তুলনামূলক আলোচনায়, পাদটীকা সংযোজনে, গ্রন্থ সম্পাদনে তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দক্ষতার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পদকল্পতরু দ্বিতীয় স্তবক প্রকাশিত হয় সন ১৩২৫ সালে। তৃতীয় স্তবক সন ১৩৩০ সালে, চতুর্থ স্তবক সন ১৩৩৪ সালে। ভূমিকা, পদসূচী ও পদাবলীতে ব্যবহৃত শব্দের তালিকা ও তাহার অর্থসহ পঞ্চম স্তবক সন ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। মাঝখানে সন ১৩৩৭ সালে তিনি নায়িকা-রত্নমালা ও ১৩৩৮ সালে ভবানন্দের হরিবংশ সম্পাদন করেন। নায়িকা-রত্নমালা হুগলী আলাটী হইতে এবং হরিবংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এবং বাঙ্গালার নানা পত্রপত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দী মাসিক পত্রে তিনি সাত আটটি হিন্দী প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্রের লিখিত পদকল্পতরুর ভূমিকা এবং পদাবলী সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী আলোচনায় আমাদিগকে একটি কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে সতীশচন্দ্রের পক্ষে নানাস্থান ভ্রমণপূর্বক তথ্যসংগ্রহের সুযোগ ছিল না। সে সময়ে পদাবলী আলোচনার এত উপকরণও পাওয়া যায় নাই। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের পরে ডক্টর শ্রীমান্ সুকুমার সেন এবং ডক্টর শ্রীমান্ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আপন আপন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে সেই তথ্যাবলীর যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণে ও যথাস্থানে সন্নিবেশে বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং সতীশচন্দ্রের লেখায়, কিম্বা পদের পাঠ ও

ব্যাখ্যায় ভুল অনুসন্ধান না করিয়া নতমস্তকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই শোভন ও সঙ্গত। পদাবলীর রচয়িতৃ পরিচয়ে ভণিতার জটিলতার বিচারে তিনি যে দু-একটি সূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আজিও তাহা সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া রহিয়াছে। প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের কবিগণের রচনায় সখা-সখীর নাম কিম্বা সখীভাবের সেবার প্রসঙ্গ থাকিবে না, এ কথা তিনিই প্রথম বলিয়াছিলেন। এই সূত্রের সার্থক প্রয়োগে তিনি কবিশেখর নামক বাঙ্গালী কবিকে মিথিলার বিদ্যাপতি হইতে পৃথক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির প্রথম সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কবল হইতে এইভাবে তিনি বহু কবিকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। অবশ্য রামগোপাল দাসের রসকল্পবল্লী গ্রন্থাদি দেখেন নাই বলিয়া তিনি কবিরঞ্জনকে একজন স্বতন্ত্র পদকর্তা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিম্বা 'থির বিজুরি বরণ গোরি পেখলুঁ ঘাটের কূলে' পদটি গোপাল দাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। আমার মতে এইসমস্ত ছোটখাট বিষয় ধর্তব্যের মধ্যে নহে।

সতীশচন্দ্রের স্মৃতি ছিল অম্লান। বৈষ্ণব-পদাবলীর আলোচনা করিতে গিয়া তাই তুলনামূলক অজস্র সংস্কৃত শ্লোকের উদ্‌ধৃতি তাঁহার পক্ষে অনায়াসসাধ্য হইয়াছে। দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় যে 'অমরুশতক' হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীপাদরূপ গোস্বামী-সঙ্কলিত পদ্যাবলী পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁহার অবাধ বিচরণ। এবং উদ্‌ধৃতির মধ্যে কোথাও কোনো অসামঞ্জস্য নাই। প্রভূত কবিত্বশক্তির অধিকার জন্মিলে, রসাস্বাদনে উত্তরোত্তর ব্যগ্রতা বৃদ্ধি পাইলে, সৌন্দর্যদৃষ্টি প্রভাতে সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নে নিশীথে নব নব দিগন্তে প্রসারিত হইলে তবেই-না এমন পর্যালোচনা সাবলীল হইতে পারে।

বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। অলঙ্কারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া গোবিন্দ দাসের অলঙ্কারবহুল পদাবলী তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। কবিবল্লভের 'সই কি পুছসি অনুভব মোয়' পদ অপেক্ষা তিনি গোবিন্দ কবিরাজের 'আধ কি আধ আধ দিঠি অঞ্চলে সব ধরি পেখলুঁ কান' পদের উচ্চ-প্রশংসা করিয়াছেন। আমি একটি সামান্য উদাহরণ দিয়া তাঁহার বিশ্লেষণের ভঙ্গী বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

'কাব্যের রস একটি চমৎকার জিনিস; উহাকে প্রকাশ করিতে হইলে স্ব-বাচক শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না; উহার বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারি-ভাব বর্ণিত করিয়া সেই-সকল ভাবের সঙ্কেত অর্থাৎ ব্যঞ্জনা দ্বারাই উহাকে পরিস্ফুট করিতে হয়। মনে করুন, দম্পতির প্রেম বা আদিরসকে রচনায় পরিস্ফুট করিতে হইবে। এখানে "আহা কি দাম্পত্য প্রেম! আহা কি দাম্পত্য প্রেম!" বাক্যটির শতসহস্রবার আবৃত্তি করিলেও উহা দ্বারা আদিরসের বিন্দুমাত্রও আস্বাদন পাওয়া যাইবে না। কিন্তু যদি প্রেম শব্দটির ঘুণাক্ষরে উল্লেখ না করিয়াও বৈষ্ণব-কবির ভাষায় বলা যায়—

রাই যব হেরল হরি-মুখ ওর।
তৈখনে ছলছল লোচন-জোড়॥
যব পঁহু কহলহি লহু-লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধনী অবনত মাথ॥
যব হরি ধয়লহি অঞ্চল-পাশ।
তৈখনে ঢরঢর তনু পরকাশ॥

যব পহুঁ পরশল কঞ্চুক-সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পূরল সব অঙ্গ।

তাহা হইলেই অশ্রু পুলক ও গদগদ বাক্য প্রভৃতি মানান্ত-মিলনের অনুভাবগুলির ব্যঞ্জনার সাহায্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমচিত্রটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সকল রসই এইরূপ একমাত্র ব্যঞ্জনাগম্য বলিয়া প্রাচীন ও আধুনিক সকল শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিকই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকে কাব্যের প্রাণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

—শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ভূমিকা পৃ. ২৫০

পদটি কবিশেখরের। রায়মহাশয় কবিশেখর বিদ্যাপতির অন্যতম উপাধি বলিয়া মনে করিতেন। পদকল্পতরুর ভূমিকায়, এবং অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ভূমিকায় তাঁহার এইরূপ রসাস্বাদনের উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যাইবে। পদকল্পতরুর ভূমিকায় তিনি ছন্দ সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরু ও অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর পরিশিষ্টে পদাবলীতে ব্যবহৃত বহু অপ্রচলিত শব্দের অর্থ দেওয়া আছে। একমাত্র স্বর্গগত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ ভিন্ন গ্রন্থসম্পাদনে রায়মহাশয়ের সঙ্গে তুলনা হয়, এমন ব্যক্তি সেকালে বিরল ছিলেন।

জানি না কেন তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। দুই-একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। বোধহয় সন ১৩৩৪ সালের কথা— তিনি ভরতপুর যাইবেন। ভরতপুরের হিন্দী-সাহিত্য সম্মেলন তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। সম্মেলনে পাঠ করিবার জন্য তিনি বিদ্যাপতির উপর লিখিত একটি হিন্দী প্রবন্ধ লইয়া যাইতেছেন। কলিকাতায় আসিয়া রায়মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আমার খোঁজ করিলেন। আমি তখন নাট্যকার বন্ধুবর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসায় ছিলাম। বাসাটা ছিল হেদোর পূর্ব দিকে একটা গলির মধ্যে। কিন্তু নম্বরটা ছিল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের। ভর্তি দুপুর বেলা তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিদ্যাপতি-বিষয়ক হিন্দী প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত শুনাইলেন। অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ে উভয়েই আনন্দিত হইয়াছিলেন। পরদিন আমি গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম।

আর-একটা ঘটনার কথা বলি, আচার্য শ্রীসুনীতিকুমারের সঙ্গে আমি তখন চণ্ডিদাস-পদাবলী-সম্পাদনকার্যে নিযুক্ত ছিলাম। পদসংগ্রহের জন্য মাঝে মাঝে ঢাকায় যাইতাম। ঢাকায় গিয়া থাকিতাম স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ঢাকা যাদুঘরের অধ্যক্ষ বন্ধুবর ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালীর বাসায়। সেবার ঢাকায় গিয়াছি, নলিনীকান্ত বলিলেন— আপনি রায়মহাশয়কে প্রণাম করিতে যাইবেন না? তিনি আর সাহাজাদপুরে থাকেন না। এখন ধামগড়েই আছেন। আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই যাইব, তবে পথ তো চিনি না। নলিনীকান্ত বলিলেন, চলুন আপনাকে পৌছাইয়া দিয়া আসি। অনুমান সন ১৩৩৬ সালের কথা। আমি এবং ভট্টশালীমহাশয় একদিন সন্ধ্যায় ধামগড় পৌছিয়া সতীশচন্দ্রের চরণ বন্দনা করিলাম। পূর্বে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে আমাদের দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত নানাবিধ সাহিত্যালোচনা চলিল। পরদিন ভট্টশালী ঢাকা চলিয়া গেলেন। আমি থাকিয়া গেলাম।

চারি দিন ধামগড়ে ছিলাম। প্রতিদিন নিত্য নূতন বিষয়ের আলোচনা। কোনোদিন কবি গোবর্ধনের আর্যা সপ্তশতী, কোনোদিন বা অমরুশতক, আবার কোনোদিন পদাবলী সাহিত্য। আলোচনা

করিতে গিয়া তিনি মাতিয়া উঠিতেন। সময়ের জ্ঞান থাকিত না, আহার-নিদ্রার কথাও ভুলিয়া যাইতেন। যতদূর স্মরণ হয় তাঁহার পুত্র ভবানী বোধ হয় এম. এ. পাস করিয়াছে, এবং সে সময়ে ধামগড়েই ছিল। একটা বিষয় বড় নূতন ঠেকিল, আমাদের আলোচনায় ভবানী যোগ দিত না। কোনো কথা বলিত না। এমনকি অসুস্থ শরীরে অধিক রাত্রি জাগরণের জন্য পিতাকেও কিছু বলিতে সাহস করিত না। মাঝে মাঝে খুব আস্তে আমাকে বলিত, আপনার কষ্ট হচ্ছে, না? ঠিক এমনটি দেখিয়াছিলাম বাঁকুড়ায় পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির গৃহে। আমি এবং ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ায় গিয়া প্রথম দিন এক অধ্যাপকের গৃহে উঠিয়াছিলাম। দ্বিতীয় দিনে আমন্ত্রিত হইয়া বিদ্যানিধি-মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। রাত্রে আহার হইয়াছে অত্যন্ত গুরুতর, রাত্রি বারোটা বাজিয়াছে। তখনো বিদ্যানিধি-মহাশয় আমাদিগকে আকাশে কালপুরুষ দেখাইতেছেন। অগণিত নক্ষত্র-পুঞ্জের মধ্যে কে বৃহস্পতি, কে শুক্র, আর কে-ই বা কালপুরুষ! একদিনেই চিনিব সাধ্য কি, এ দিকে চোখে ঘুম আসে-আসে। তাঁহার একটি এম. এ. পাস পুত্র পাশে দাঁড়াইয়া, কিন্তু অসুস্থ পিতাকে কিছু বলিবার সাহস নাই। বলিতেছে চুপে চুপে আমাদিগকে, আপনাদের কষ্ট হচ্ছে, না? অন্যত্র দেখিয়াছি— শিক্ষিত পুত্র পিতার সঙ্গে আলোচনায় আমাদের সঙ্গে সমানে যোগ দিয়াছে। কিন্তু যেমন বাঁকুড়ায়, তেমনই ধামগড়ে পুত্র নীরব শ্রোতা। আমি একা একবার বাঁকুড়ায় গিয়াছিলাম। আমি এবং বিদ্যানিধি আলোচনা করিতেছি। পুত্র দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। বিদ্যানিধি-মহাশয় তামাক খাইতেন একটু বেশি মাত্রায়। সে সময়ে তামাক আমিও খাইতাম। বিদ্যানিধি-মহাশয়ের তামাকের প্রশংসা করায় আমার জন্য তখনই একটি থেলো হুঁকা আসিল। নূতন করিয়া তামাক সাজা হইল। তামাকে মজিয়া আলোচনায় মশগুল হইয়া আছি। কে কখন ধূমপানে ছেদ টানিব, পুত্র সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে। একবার আমার হাত হইতে হুঁকা লইয়া নামাইয়া রাখিয়া কলিকাটি বাপের হুঁকার মাথায় বসাইয়া তাঁহার হাতে ধরাইয়া দিতেছে। পুনরায় সেইরূপভাবে আমার হাতে। কিন্তু একবারের জন্য তাঁহাকে বৈঠকখানার ভিতরে আসিয়া বসিতে দেখিলাম না। যতক্ষণ আমরা আলাপ করিলাম— ছেলেটি দুয়ারের বাহিরে ছবির মতো ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল নির্বাক।

ধামগড় হইতে ঢাকায় ফিরিব, নৌকায় নারায়ণগঞ্জ যাইতে হইবে। নৌকা ঠিক হইয়াছে। রায়মহাশয়ের বাড়ি হইতে খানিক দূর গিয়া নৌকায় উঠিব। আহারাদি সারিয়া বাহির হইলাম, মাথায় রুমাল বাঁধিয়া (মাথায় টাক ছিল) রায়মহাশয় আমাকে নৌকায় তুলিয়া দিতে সঙ্গে আসিতেছেন। আলোচনা চলিতেছে 'ধামার' সম্বন্ধে। বলা বাহুল্য, আমি তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিতেছি না। নদীর কিনারে আসিয়া রায়মহাশয়ের পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিয়া নৌকায় উঠিব— এক পা নৌকায় তুলিয়াছি, আর একটি পা ডাঙায় আছে রায়মহাশয় তখনো হাতে তালি দিয়া আমাকে ধামারের তাল বুঝাইতেছেন— 'রাম আধ্ দুই তিন, চার আধ্ পাঁচ ছয়!' ছবিটি আমি চোখের সামনে এখনো দেখিতেছি। ওদিকে নৌকার পূর্ববঙ্গীয় মাঝি আপন মাতৃভাষায় অনর্গল আমাকে ধমক দিতেছে, যথাসময়ে নারায়ণগঞ্জে উপস্থিতি বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিতেছে। আমি মনে মনে 'নারায়ণ' স্মরণ করিতেছি।

পদকল্পতরুর পঞ্চম স্তবক লেখা এবং ছাপা প্রায় শেষ হইয়াছে। জীবনের আরব্ধ ব্রত সমাপনপূর্বক সন ১৩৩৮ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ এই সুরসিক বিনয়ান্বিত বিদ্বান সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়াইয়া জীবনের পরপারস্থিত সেই মরণজয়ী সাহিত্যসাধকের পদপ্রান্তে আমি পুনরায় প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

সতীশচন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ॥ ভারতীয়-গ্রন্থপ্রচার-সমিতি, কলিকাতা। ১৩০৪ বঙ্গাব্দ

মেঘদূত ॥ পদ্যানুবাদ

শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ ॥ সচিত্র। সংস্কৃত মূল, পূজারী গোস্বামীর টীকা, পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা -সংবলিত। ১৩১৯ বঙ্গাব্দ

রসমঞ্জরী ॥ পদ্যানুবাদ, ব্যাখ্যা -সংবলিত। ১৩২০ বঙ্গাব্দ

সূর্যশতক ॥ পদ্যানুবাদ, সংস্কৃত মূল, টীকা ও ব্যাখ্যা -সংবলিত। অসম্পূর্ণ

অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী ॥ বিষয়সূচী পদসূচী রসসূচী, দুরূহ স্থলে পাদটীকা ও অর্থ প্রয়োগ -সংবলিত শব্দসূচী-সহ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ পদকর্তার ও ২৮ জন অজ্ঞাতপূর্ব পদকর্তার ছয় শতের অধিক অপ্রকাশিত ও নবাবিষ্কৃত পদাবলীর সংগ্রহ। ১৩২৭ বঙ্গাব্দ

বিদ্যাপতি-বিচার ॥ "শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'সোনার গৌরাঙ্গ' নামক মাসিক পত্রিকাতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার পিতার মৃত্যুর ফলে তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।·· [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের] 'সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেবের উৎসাহের ফলে এক সঙ্গে প্রকাশিত।"—ভবানীচরণ রায়। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদিত

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ॥ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ -কর্তৃক প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড, ১৩২২ ; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩২৫ ; ৩য় খণ্ড, ১৩৩০ ; চতুর্থ খণ্ড, ১৩৩৪ ; পঞ্চম খণ্ড, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

ভবানন্দের হরিবংশ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় -কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

নায়িকারত্নমালা ॥ মধুসূদন অধিকারী -কর্তৃক প্রকাশিত, আলাটী, হুগলী। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড থেকে গৃহীত। সতীশচন্দ্রের পুত্র ভবানীচরণ রায় -কর্তৃক সংকলিত

পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৭ - ১৯৫৯

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিদ্যালয়ের কাজে এসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এমন কথা কেউ বলবে না। দু-একজন অবশ্যই অসাধারণ ছিলেন, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় এ কথা নির্বিবাদে বলা যেতে পারে যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে তাঁদের সমকক্ষ ব্যক্তির অভাব দেশে তখনও ছিল না, এখনও নেই। অথচ নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরাও অনেকেই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা স্বেচ্ছায় এমন-সব কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন, আজকের সাংসারিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা যাকে হঠকারিতা বলে মনে করবেন। মনে হবে আপন সাধ্যসীমা ভুলে গিয়ে তাঁরা সাধ্যাতীতের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল অবিশ্বাসীর অবিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আপন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁরা যে ভাবে কাজ করেছেন তাকে একমাত্র সাধনা নামেই অভিহিত করা যায়, মাস-মাহিনার চাকুরে দ্বারা এ জাতীয় কাজ কখনোই সম্ভব নয়। যে কাজে বহুজনের মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন কখনো কখনো সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কর্তা অকিঞ্চন, কীর্তি সুমহান। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে কর্তার তুলনায় কীর্তি বহুগুণে বৃহৎ। বস্তুত: তা নয়, কীর্তি কখনো কর্তাকে ছাড়িয়ে যায় না। বাহ্যত: যা দৃষ্টিগোচর ছিল না সেই শক্তি তাঁদের চরিত্রের মধ্যে নিহিত ছিল। সুবৃহৎ কার্যে সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন নিষ্ঠা এবং অভিনিবেশ। বিদ্যাবুদ্ধি তো ছিলই, তদুপরি উক্ত দুই গুণসন্নিপাতে সাধারণ মানুষের দ্বারাও অসাধারণ কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়েছিল।

এর কৃতিত্ব অনেকাংশে শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য, কারণ এরূপ মানুষ শান্তিনিকেতন নিজ হাতে তৈরি করেছে। আমাদের দেশে স্থানমাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে ; সেটা কেবলমাত্র স্থান-বিশেষের মাটি-জল-হাওয়ার গুণ নয়। সে স্থানই মহৎ যে স্থান মানুষের কাছ থেকে বড় কিছু দাবি করতে জানে। দাবি করবার অধিকার সব স্থানের থাকে না। সে অধিকার অর্জন করতে হয়— অর্জন করতে হয় নিজের দান-শক্তির দ্বারা। যে দিতে জানে সেই দাবি করতে জানে। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের দান অপরিসীম। শান্তিনিকেতনই দেশকে প্রথম শিখিয়েছে যে বিদ্যালয় কেবলমাত্র বিদ্যাদানের স্থান নয়, বিদ্যাচর্চার স্থান ; শুধু বিদ্যাচর্চা নয়, বিদ্যা-বিকিরণের স্থান। বিদ্যার্জনের পথ সুগম করে দেওয়া বিদ্যাকেন্দ্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। যে সময়ে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহও এসব কথা ভাবে নি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তার শৈশবেই সেসব কথা ভেবেছে এবং সেজন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। শান্তিনিকেতনের স্থানমাহাত্ম্য বলতে এই অর্থেই বলেছি। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন শান্তিনিকেতনের সেবায়। সেই জোরে তিনি যাঁদের আহ্বান করেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে নিঃসংকোচে সর্বশক্তি নিয়োগের দাবি করতে পেরেছিলেন।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় যখন রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। বয়সে নবীন, অভিজ্ঞতায় অপ্রবীণ,

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপটুকু পর্যন্ত নেই, প্রামাণিক কোনো গ্রন্থ রচনা করে পাণ্ডিত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি। এরূপ সুবৃহৎ কাজের জন্যে তাঁর প্রস্তুতি কতখানি সে বিষয়ে সাধারণের মনে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না; থাকলে এমন নিশ্চিন্ত মনে এই বিশাল কার্যভার তাঁর উপরে ন্যস্ত করতে পারতেন না। এই সম্পর্কে একটি কথা অনেক সময়ে আমার মনে হয়েছে। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক-নির্বাচন অনেকটা যেন শেক্সপীয়ারের প্লট-নির্বাচনের মতো। হাতের কাছে যেমন-তেমন একটা গল্প পেলেই হল, শেক্সপীয়ার চোখ বুজে তাকেই গ্রহণ করেছেন। প্রতিভাবানের হাতে ছাই ধরলেও সোনা হয়ে যায়। অত্যন্ত শীর্ণ বিবর্ণ কাহিনীও রক্তমাংস-অস্থিমজ্জার সংযোগে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে, রঙে রসে পূর্ণতা লাভ করেছে, নিষ্প্রাণ কাহিনী প্রাণের স্পন্দনে অপূর্ব বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। পণ্ডিত সমালোচকদের মতে মূল কাহিনীতে শেক্সপীরীয় ঐশ্বর্যের আভাসমাত্র ছিল না। অবশ্য এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে একমাত্র শেক্সপীয়ারের কবিদৃষ্টিতেই সেইসব শীর্ণ কাহিনীর অনুচ্চারিত সম্ভাবনাটুকু ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। আপাতদৃষ্টিতে যে মানুষ সাধারণ তাঁরও প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সর্বদর্শী দৃষ্টিকে এড়াতে পারে নি। জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীকে অধ্যাপনার কাজে ডেকে এনে একজনকে দিয়ে লিখিয়েছেন ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান-গ্রন্থমালা, আরেকজনকে দিয়ে বাংলা ভাষার বৃহত্তম অভিধান। বিধুশেখর শাস্ত্রী ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ টোলের পণ্ডিত, সেই মানুষ কালক্রমে বহুভাষাবিদ পণ্ডিতে পরিণত হলেন—ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে সর্বাগ্রগণ্যদের অন্যতম। ক্ষিতিমোহন সেনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁরও জিজ্ঞাসা নতুন পথে প্রবাহিত হল—মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের বাণী সংগ্রহ করে ভারতীয় জীবনসাধনার বিস্মৃত-প্রায় এক অধ্যায়কে পুনরুজ্জীবিত করলেন। এ সমস্তই সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। তিনি দাবি করেছেন, এঁরা প্রাণপণে সেই দাবি পূরণ করেছেন। দাবি পূরণ করতে গিয়ে এঁদের শক্তি দিনে দিনে বিকাশ লাভ করেছে। ক্ষিতিমোহনবাবু বলতেন, জান, আমরা ছিলাম সব মাটির তাল, গুরুদেব নিজ হাতে আমাদের গড়ে নিয়েছেন, নইলে যে বিদ্যা শিখে এসেছিলাম তাও ঠিক মতো ব্যবহার করা আমাদের সাধ্যে কুলোতো না।

রবীন্দ্রনাথ যে চোখ বুজে এঁদের গ্রহণ করেছিলেন এমন নয়, চোখ মেলেই করেছিলেন। মানুষ যাচাই করবার বিশেষ একটি রীতি তাঁর ছিল। প্রথমেই দেখে নিতেন দৈনন্দিনের দাবি মিটিয়ে মানুষটির মধ্যে উদ্বৃত্ত কিছু আছে কি না। রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের সাধনা উদ্বৃত্তের সাধনা। সংসারের পনেরো-আনা মানুষই আটপৌরে, তাদের দিয়ে নিত্য দিনের গৃহস্থালির কাজটুকু শুধু চলে, বাড়তি কিছু দেবার মতো সম্বল এদের নেই। জমিদারি মহল্লা পরিদর্শন করতে গিয়ে আমিনের সেরেস্তায় নিযুক্ত হরিচরণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, দিনে সেরেস্তায় কাজ কর, রাত্রিতে কি কর? হরিচরণ বলেছিলেন, সন্ধ্যাবেলায় তিনি একটু সংস্কৃতের চর্চা করেন, একখানা বইএর পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত আছে। পাণ্ডুলিপিটি চেয়ে নিয়ে দেখে নিলেন। মানুষ কিভাবে অবসর যাপন করে তাই দিয়ে তার প্রকৃত পরিচয়। যার মধ্যে উদ্বৃত্ত কিছু নেই তার অবসর কাটে না। ঐ সামান্য বাক্যালাপ থেকেই হরিচরণবাবুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটি কবি দেখতে পেয়েছিলেন। এই কারণেই অত্যল্পকাল মধ্যে ম্যানেজারের নিকট নির্দেশ এল, তোমার

সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীটিকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দাও। কবি তখন বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে 'সংস্কৃতপ্রবেশ' নামে একটি পুস্তক রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার সহজ প্রণালী উদ্ভাবনই ঐ পুস্তকের উদ্দেশ্য ছিল। হরিচরণবাবু আসবার পরে কবি তাঁর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি হরিচরণবাবুর হস্তে অর্পণ করেন। অধ্যাপনা-কার্যের অবসরে তিনি কবির নির্দেশ মত ঐ পুস্তকরচনা সমাপ্ত করেন।

১৩০৯ সালে অর্থাৎ বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার বৎসরকাল মধ্যেই হরিচরণবাবু শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কর্মনিষ্ঠার দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, নতুবা কাজে যোগ দেবার পর দু বৎসর অতিক্রান্ত হতে না হতেই ৩৭।৩৮ বৎসরের এক যুবককে ঐ সুবৃহৎ অভিধান রচনার কার্যে আহ্বান করতেন না। অপরপক্ষে শান্তিনিকেতনে বসবাসের শুরু থেকেই বিদ্যাচর্চায় যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা তিনি বোধ করেছেন সে কথা আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে হরিচরণবাবু নিজ মুখেই ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব তাঁর কাছে দেবতার আশীর্বাদের মতো মনে হয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নম্রহৃদয়ে নতমস্তকে কবির আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন। ১৩১২ সালে অভিধান রচনার সূচনা, রচনাকার্য সমাপ্ত হল ১৩৩০ সালে। মাঝে আর্থিক অনটনের দরুণ শান্তিনিকেতনের কর্ম ত্যাগ করে তাঁকে কিছু কালের জন্য কলকাতায় যেতে হয় এবং অভিধান-সংকলনের কাজ বন্ধ থাকে। এটি তাঁর নিজের পক্ষে যেমন রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তেমনি ক্লেশের কারণ হয়েছিল। তাঁকে অবিলম্বে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কবি নিজেই উদ্যোগী হলেন। রবীন্দ্রনাথের আবেদনক্রমে বিদ্যোৎসাহী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অভিধান-রচনাকার্যে সহায়তার উদ্দেশ্যে হরিচরণবাবুর জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকার একটি বৃত্তি ধার্য করেন। ১৩১৮ সাল থেকে অভিধান-সংকলনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত তেরো বৎসর কাল তিনি এই বৃত্তি ভোগ করেছেন। বাংলা দেশের গৌরবের কথা যে, ইংরেজি ভাষার প্রথম অভিধান-রচয়িতা ডক্টর জনসন যে সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন হরিচরণবাবুর বেলায় তা ঘটে নি। মহারাজের মহানুভবতার কথা শেষ পর্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন; আর রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর জন্যেই উপযাচক হয়ে মহারাজের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন সে কথাও মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হন নি। মুদ্রণকার্য শুরু হবার পূর্বেই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়। যাঁর সহায়তায় অভিধান রচনা সম্ভব হল তাঁকে স্বহস্তে একখণ্ড অভিধান কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করতে পারেন নি, এই দুঃখ শেষ পর্যন্ত তাঁর ছিল। ১০৫ খণ্ডে সমাপ্ত অভিধান-মুদ্রণ শেষ হবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথও বিদায় নিলেন। হরিচরণবাবুর করুণ উক্তি— যিনি প্রেরণাদাতা, যাঁর অভীষ্ট এই গ্রন্থ তিনি স্বর্গত, তাঁর হাতে এর শেষ খণ্ড অর্পণ করতে পারি নি। কিন্তু হরিচরণবাবু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি। বলেছিলেন, মহারাজের বৃত্তিলাভ বিধাতার অভিপ্রেত, অভিধান সমাপ্ত হবার পূর্বে তোমার জীবনান্ত হবার আশঙ্কা নাই। কবিবাক্য মিথ্যা হয় না, এ ক্ষেত্রেও হয় নি।

পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ হয় ১৩৩০ সনে। তার পরেও প্রায় দশ বৎসর কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে— অর্থাভাবে মুদ্রণকার্যে হাত দেওয়া সম্ভব হয় নি। এরূপ বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের সামর্থ্য বিশ্বভারতীর ছিল না। অবশ্য মাঝে এই কয়েক বৎসরও তিনি অভিধানের নানা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অবশেষে ১৩৩৯ সালে মুদ্রণকার্য শুরু হয়। তিনি নিজেই তাঁর যৎকিঞ্চিৎ সম্বল নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ক্রমশঃ প্রকাশের আয়োজন করেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
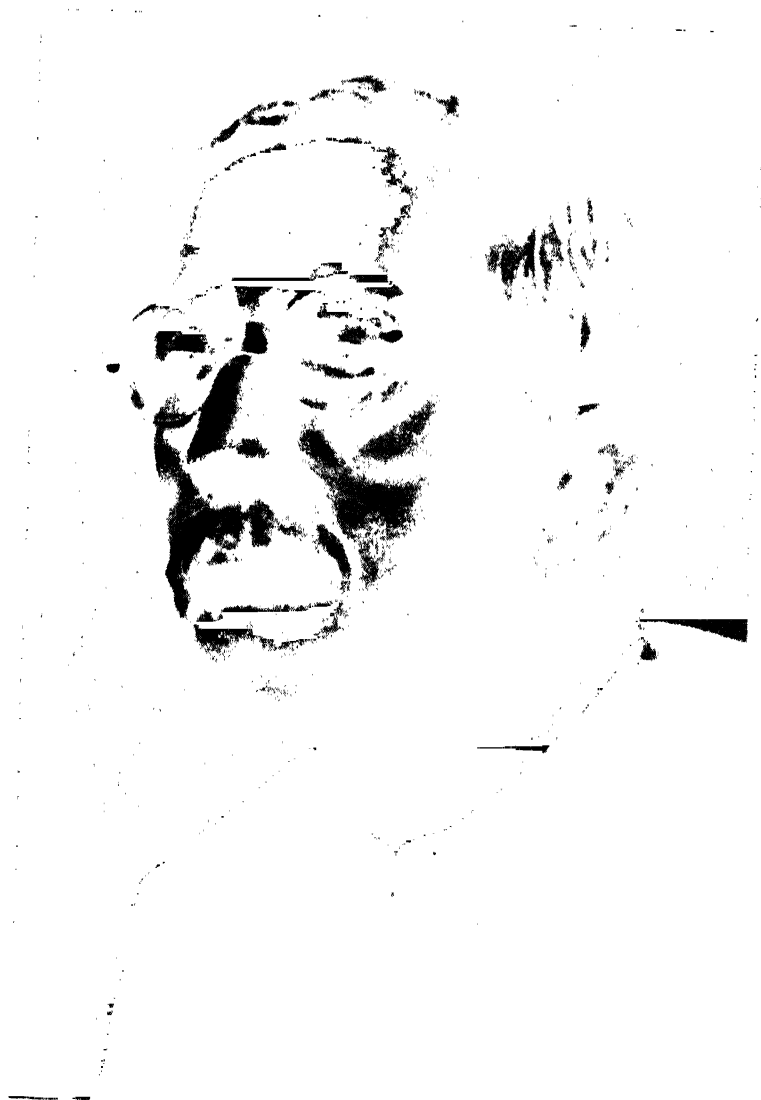
১৮৬৭ - ১৯৫৯

মুদ্রণ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্ররা এবং শান্তিনিকেতনের অনুরাগী কিছুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি নিয়মিত গ্রাহক হয়ে এই ব্যাপারে যথেষ্ট আনুকূল্য করেন।

১৩১২ সালে রচনার সূচনা, ১৩৫২ সালে মুদ্রণকার্য সমাপ্ত। জীবনের চল্লিশটি বছর এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক কাজ নিয়ে কাটিয়েছেন। এ এক মহাযোগীর জীবন। বাঙালি চরিত্রে অনেক গুণ আছে, কিন্তু নিষ্ঠার অভাব। এ দিক থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি জাতির সম্মুখে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। নিষ্ঠার যথার্থ পুরস্কার অভীষ্ট কার্যের সফল সমাপ্তি। এর অধিক কোনো প্রত্যাশা তাঁর ছিল না। সুখের বিষয়, লৌকিক পুরস্কারও কিছু তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে ষোড়শোপচারে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। সর্বশেষে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' (ডি. লিট) উপাধিদানে সম্মানিত করেন।

অভিধান-জাতীয় গ্রন্থের গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা আমার নাই। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাই মতামত দেবার অধিকারী। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি অভিধানে কিছু কিছু ঘাটতি আছে। এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে— বিশেষ করে একক চেষ্টায়— কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। সাহিত্য আকাদেমির উদ্যোগে অভিধানের পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে ; পুনর্মুদ্রণের পূর্বে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একবার পুনর্মার্জনার ব্যবস্থা করে নিলে বোধ করি ভালোই হত। অন্যান্য দেশে এরূপ কার্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো বিদ্বৎ পরিষৎ অর্থাৎ পণ্ডিত গোষ্ঠীর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, একক চেষ্টায় এরূপ বিরাট কাজের দৃষ্টান্ত বিরল। এই অভিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য— বাংলা এবং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রত্যেক শব্দের বহুবিধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ। এই কার্যে যে শ্রম এবং জ্ঞানের প্রয়োজন হয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমরা যারা বিশেষজ্ঞ নই তাদের কাছে অভিধানের এই অঙ্গটি মহামূল্য, ব্যক্তিগত ভাবে আমি এর কাছে অশেষ ঋণে ঋণী।

আমি যখন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিই তখনও অভিধানের মুদ্রণকার্য শেষ হয় নি। লাইব্রেরি-গৃহের একটি অনতিপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে তাঁকে নিবিষ্ট মনে কাজ করতে দেখেছি।

প্রথম যুগের কর্মীদের সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি করে চৌপদী লিখে দিয়েছিলেন। একান্ত মনে কাজে মগ্ন হরিচরণবাবুকে দেখে তাঁর সম্পর্কিত শ্লোকটি আমার মনে পড়ে যেত—

> কোথা গো ডুব মেরে রয়েছ তলে
> হরিচরণ! কোন্ গরতে?
> বুঝেছি! শব্‌দ-অব্‌ধি-জলে
> মুঠাচ্ছ খুব অরথে!

কোথায় কোন্ গর্তে বসে হরিচরণ শব্দবারিধি থেকে মুঠো মুঠো 'অর্থ' কুড়োচ্ছেন— বর্ণনার সঙ্গে নিবিষ্টচিত্ত অভিধানিকের মূর্তিটি দিব্যি মিলে যেত।

বলা বাহুল্য, তখন তিনি বিশ্বভারতীর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, বয়স পচাত্তর উত্তীর্ণ। তখনকার দিনে কে কবে অবসর গ্রহণ করতেন জানবার কোনো উপায় ছিল না, কারণ অবসর গ্রহণের পরেও

তাঁরা পূর্ববৎ নিজ আসনে নিজ কাজে অভিনিবিষ্ট থাকতেন। কাজের সঙ্গে মাস-মাহিনার কোনো সম্পর্ক ছিল না।

অভিধান-মুদ্রণ শেষ হবার পরেও তাঁকে নিত্য দেখেছি। প্রাতঃভ্রমণ এবং সান্ধ্যভ্রমণ নিত্যকর্ম ছিল। ক্ষীণদৃষ্টিবশতঃ পথে দেখা হলে সব সময় লোকজন চিনতে পারতেন না। কখনো চিনতে পারলে সস্নেহে কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করতেন। বিরানব্বুই বৎসর বয়সে (১৯৫৯ সালে) তিনি দেহরক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের শক্তি অটুট ছিল। শেষবয়সে তাঁকে দেখলে একটি কথা প্রায়ই মনে হত। ইংরেজ ঐতিহাসিক তথা সাহিত্যিক গিবন তাঁর *Decline and Fall of the Roman Empire* নামক গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করে বলেছিলেন, হঠাৎ মনে হল জীবনের সব কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে, কিছুই আর করবার নেই। মনে খুব একটা অবসাদের ভাব এসেছিল। গিবন উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে দীর্ঘ বারো বৎসর কাল একান্ত মনে নিযুক্ত ছিলেন, আর হরিচরণবাবু জীবনের চল্লিশ বৎসর কাল অনন্যমনা হয়ে এক কাজে মগ্ন ছিলেন। কর্মাবসানে তাঁর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল জানতে কৌতূহল হত। গ্রন্থ সমাপ্তির পরেও চৌদ্দ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। যখনই দেখেছি তাঁকে প্রসন্নচিত্ত বলেই মনে হত। এরূপ সাধক মানুষের মনে কোথাও একটি প্রশান্তি বিরাজ করে। এজন্য সুখে-দুঃখে কখনো তাঁরা বিচলিত হন না।

রচিত গ্রন্থাবলী

বঙ্গীয় শব্দকোষ
রবীন্দ্রনাথের কথা
সংস্কৃত-প্রবেশ। তিন খণ্ড
ব্যাকরণ-কৌমুদী। চার ভাগ
Hints on Sanskrit Composition & Translation
পালিপ্রবেশ। শব্দানুশাসন
কবির কথা

ঐতিহাসিক উপন্যাস

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

১

সাহিত্যের শাখাপ্রশাখাগুলির মধ্যে উপন্যাসই সব থেকে বাস্তব-অনুগামী। উপন্যাস বাস্তবের মর্মসত্যকে প্রকাশ করেই তৃপ্ত নয়, বাস্তবের বাইরের রূপটাকেও সে যথাসাধ্য অবিকৃতভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু যত বাস্তবানুগই হোক-না কেন, উপন্যাসের জগৎ যে খাঁটি বাস্তবজগৎ নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে যে জগৎ আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয় সে জগৎ কল্পনার জগৎ। বলতে পারি, মায়াজগৎ। বিভিন্ন উপন্যাস বিভিন্ন মায়াজগৎ আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরছে। কোনোটা 'বিষবৃক্ষে'র জগৎ, কোনোটা 'শ্রীকান্তে'র জগৎ, কোনোটা বা 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র। কোনোটাতে মায়া-ভ্রমর, মায়া-রোহিণী, কোনোটাতে বা মায়া-কুন্দনন্দিনী আর তার মায়া-বিষপান।

কল্পনা, কিন্তু যদৃচ্ছ কল্পনা নয়। মায়া, কিন্তু মিথ্যা নয়। উপন্যাস খাঁটি বাস্তব নয়, কিন্তু সে খাঁটি বাস্তবেরই প্রতিনিধি। মায়া এই জন্যে যে কল্পনার বাইরে সে-জগৎ নেই। সত্য এই জন্যে যে তার মধ্যে দিয়ে জীবনের সত্য উজ্জ্বলতর ভাবে প্রকাশিত। উপন্যাস পরিচিত জগতের বাস্তব সত্যটাকেই মূর্ত করে তোলে। উপন্যাসের মায়া উপন্যাসের সত্যকে লঙ্ঘন করে না, উপন্যাসের সত্য উপন্যাসের মায়াকে বিনষ্ট করে না।

এমন উপন্যাস হতে পারে না, যার কিছুই বানানো নয়। আবার এমন উপন্যাসও হতে পারে না, যার সবটাই বানানো। যার কিছুই বানানো নয়, তাকে উপন্যাস বলব না। বলব জীবনী, বলব ইতিহাস। যার আগাগোড়া এমন ভাবে বানানো যে তার ষোল-আনাই মিথ্যা, যা জীবনসত্যের প্রতীকী রূপায়ণে অক্ষম, তাকে আর যা-ই বলি, সাহিত্য বলব না।

সত্য আর মায়ার দোটানা আর সেই দোটানায় সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করা, শুধু সাহিত্যে নয়, আর্টের সর্বত্রই এটা দেখতে পাওয়া যাবে। শিল্পের অজস্র রূপবৈচিত্র্যের মূলে অনেকখানি এরই ক্রিয়া। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এই ভারসাম্যের বিভিন্ন রূপ।

উপন্যাস জিনিসটাকে বুঝতে হলে তার ভারসাম্য রক্ষার বিশেষত্বকে একটু লক্ষ করে দেখতে হবে। উপন্যাসকে এই দিক থেকে রোমান্সের সঙ্গে তুলনা করে দেখলেই আমাদের বক্তব্য অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। উপন্যাস এবং রোমান্স দু'য়েরই এক কোটিতে কল্পনার মায়া, বিপরীত কোটিতে সত্যের আকর্ষণ। ব্যাপক ভাবে ধরলে উপন্যাস ও রোমান্স দু'য়ের মধ্যে জাতিগত ঐক্যও অবশ্য আছে। কিন্তু এদের পার্থক্যটাও কম গভীর নয়। এই পার্থক্যকে সত্য ও মায়ার আপেক্ষিক গুরুত্বের পার্থক্য বলে বর্ণনা করলে খুব বেশি ভুল হয় না।

উপন্যাসে সত্যের যেমন সুস্পষ্ট একটা দেশকালগত নির্দিষ্টতা আছে, যাকে বলি তার বাস্তবতা, সেই ঋজু সুনির্দিষ্ট কঠিন বাস্তবতা রোমান্সে নেই। রোমান্সে পরিচিত সত্যের পরিচিত আইন-কানুনের অধিকার

চূড়ান্ত নয়, বাস্তবতার দাবি সেখানে শিথিল। এই শিথিলতার রন্ধ্রপথে অনেক সময় সেখানে ইচ্ছাপূরণের অধিকারই সুপ্রতিষ্ঠিত। উপন্যাসের জগৎ ইচ্ছাপূরণের জগৎ নয়। উপন্যাসের বাস্তব মায়া-বাস্তব হলেও তার মধ্যে দিয়ে উপন্যাস আসল-বাস্তবকেই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। একটা নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট বাস্তবকে কল্পনার সাহায্যে মূর্ত করে তোলা এই হল উপন্যাসের লক্ষ্য। এই রকম বাস্তবতা— বিশিষ্ট ধরণের বাস্তবতা, এর প্রতি রোমান্সের কোনো আকর্ষণ নেই।

তা বলে রোমান্সে সত্য নেই, অথবা রোমান্সের সত্যের সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই এ কথা ঠিক নয়। রোমান্সে যা ঘটে, তা হল বাস্তবের তির্যক রূপায়ণ। রোমান্সের বাস্তব ছদ্মবেশী বাস্তব। উপন্যাস ও রোমান্স, এদের ঝোঁকটা বিপরীত দিকে। উপন্যাসের ঝোঁক বাস্তবের দিকে— ঋজুভাবে কঠিন ও নির্দিষ্ট বাস্তবের রূপায়ণ। রোমান্সের ঝোঁক কল্পনার ইন্দ্রজালের মধ্যে দিয়ে ইচ্ছাপূরণের দিকে— তির্যকতম বাস্তবের দিকে, এমন বাস্তব যাকে অবাস্তব বলতে আটকায় না। বাস্তবমুখী ঝোঁকের টানে ভারসাম্য নষ্ট হলে কল্পনার ভরাডুবি হয়, তখন উপন্যাস হয়ে পড়ে ইতিহাস। অথবা হয় জীবনী। অন্য দিকে, রোমান্সের ক্ষেত্রে— ইচ্ছাপূরণের দাবি অপ্রতিহত হয়ে উঠলে, রোমান্স হয়ে ওঠে আদিম পুরাণ-কল্পনার সগোত্র, যাকে বলে 'মিথ্'। অর্থাৎ অসাহিত্য।

উপন্যাসের এক দিকের সীমানায় ইতিহাস, অপর দিকের সীমানায় রোমান্স। যেমন- রোমান্সের এক-দিকের সীমানায় উপন্যাস, অপরদিকের সীমানায় 'মিথ্'।

উপন্যাস জিনিসটা কাল্পনিক, ইতিহাসের সঙ্গে তার ভেদ সুস্পষ্ট। কিন্তু মিলও একটা আছে, মর্মগত মিল। সে মিল সত্যের মিল। উপন্যাসে সত্যের যেহেতু একটি নির্দিষ্ট দেশকালগত চেহারা আছে, একটি বিশেষ ভৌগোলিক সংস্থানে বিশেষ সমাজপরিবেশে বিশেষ ইতিহাস-পর্বের মধ্যে যেহেতু তার কাহিনীর জন্ম, প্রতিষ্ঠা এবং পরিণাম, সেই হেতু উপন্যাসের সত্যতা তার ঐতিহাসিকতার থেকে অচ্ছেদ্য, প্রায় অভিন্ন। সেই দিক থেকে দেখলে, সমস্ত উপন্যাসই ঐতিহাসিক উপন্যাস। কেননা, কম হোক আর বেশি হোক, উপন্যাসের সত্য গূঢ় অর্থে সব সময়ই ঐতিহাসিক সত্য।

২

উপন্যাসের প্রসঙ্গে সত্য কথাটার দুটো আলাদা মানে আছে। অন্যভাবে বললে বলা যায়, উপন্যাসের সত্য দু'জাতের সত্য। এক, যাকে বলা যেতে পারে, জীবনের মর্মগত সত্য, অথবা কেউ হয়তো বলবেন, ভাবসত্য। এটা উপন্যাসের একচেটে ব্যাপার নয়, এ সত্য সাহিত্য মাত্রেই বিদ্যমান। খুব সম্ভব আর্ট মাত্রেই বিদ্যমান। এই-যে গূঢ় অনির্দিষ্ট অচিহ্নিত অথচ গভীর এবং মূল্যবান সত্য, একে বর্ণনা করা যায় না। সম্ভবত আর্ট-প্রতীকের মধ্যে দিয়ে ছাড়া অন্যভাবে কোথাও একে পাই না।

উপন্যাসের আর-এক রকম সত্যতা হচ্ছে তার বাস্তবতা— তার দেশকালচিহ্নিত, সুনির্দিষ্ট সমাজ-পরিবেশে-বিধৃত, কার্যকারণপরম্পরায় সুগ্রথিত প্রত্যক্ষ ও বিশিষ্ট সত্যতা। সেই বাস্তব-সত্য, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় উপন্যাস যার বিশ্বস্ততম অনুগামী।

ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক সত্যের সূত্রে। এখানে প্রশ্ন উঠবে, এই দুই জাতীয় সত্যের মধ্যে কোন্‌টির সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক নিকটতর? এদের কোন্‌টিকে বলব উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা?

বলা বাহুল্য, প্রথমটিকে নয়। ইতিহাসমাত্রেই সত্য হতে পারে, কিন্তু সত্যমাত্রেই ইতিহাস নয়। অন্তত সাধারণ উপলব্ধিতে সত্য আর ইতিহাস সব সময় এ রকম অভিন্ন নয়। মানব-উপলব্ধিতে সত্যের নানান্ জাত, নানান্ চেহারা। ঐতিহাসিক সত্য তারই মধ্যে বিশেষ একটা জাত মাত্র। আর্টের সত্য ঠিক এই জাতের চিহ্নিত সত্য নয়। যে সত্যে দেশকালের ছাপ পাকা নয়, যার সঙ্গে প্রমাণের যোগ স্পষ্ট নয়, যার সঙ্গে তথ্যের সম্পর্ক সুনির্ণীত নয়, তাকে আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলে মানি না। ইতিহাসের সত্য ইতিহাসের তথ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

তা ছাড়া যে সত্য সমস্ত আর্টেরই সত্য, তাকেই ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিলে, সব আর্টকেই সমান ভাবে ঐতিহাসিক বলতে হয়। তেমন বললে লোক-ব্যবহারের ব্যত্যয় ঘটে। আমরা ঐতিহাসিক নাটক বলি, ঐতিহাসিক উপন্যাস বলি, কিন্তু সংগীত ভাস্কর্য চিত্রকলা বা নৃত্যের সম্পর্কে এই বিশেষণের ব্যবহার করি না।

সুতরাং ঐতিহাসিক সত্য আর আর্টের ভাবসত্য এক নয়। ঐতিহাসিকতা এমন একটা নির্দিষ্ট গুণ যা সব আর্টে বা সব সাহিত্যশাখাতে নেই— অন্তত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নেই, কিন্তু উপন্যাসে আছে। নাটকেও আছে— সব নাটকে থাক আর না-ই থাক কোনো কোনো নাটকে আছে। নাটকের কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, উপন্যাসের কথাতেই ফিরে আসি। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, উপন্যাসমাত্রেই বাস্তবতাধর্মী। এই দেশকালচিহ্নিত বাস্তবতার সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একেই কি উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা বলে গ্রহণ করব? করলে, তত্ত্বের দিক থেকে হয়তো খুব বেশি বাধা হবে না। এবং যেহেতু এই জাতীয় ঐতিহাসিকতা— যা কিনা বাস্তবতারই নামান্তর— উপন্যাসমাত্রেই অল্প-বিস্তর থাকতে বাধ্য, সেই হেতু সমস্ত উপন্যাসকেই যে অল্প-বিস্তর ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে দাবি করা যায়, এ কথা বোধ করি অস্বীকার করবার কোনো হেতু নেই।

বলা বাহুল্য, ইতিহাসের সত্যও কেবল তথ্যগত সত্য নয়। তারও একটা মর্মের দিক আছে। যাকে বলতে পারি ইতিহাসের অর্থ। সুতরাং উপন্যাসের বাস্তবতার মধ্যে বাস্তবের তথ্য এবং উক্ত তথ্যের গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্য, এই দুই দিকটাই থাকতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবতা আর ঐতিহাসিকতা যদি অভিন্ন হয়, তা হলে সমস্ত উপন্যাসই যে ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে যে স্বতন্ত্র কোনো শ্রেণী নেই, এ কথা না মেনে উপায় নেই।

৩

এ কথা আমরা পূর্বেই মেনে নিয়েছি। অন্তত তত্ত্বে। কিন্তু পুরোপুরি নয় এবং ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে। তার কারণ, কথাটা যে অর্থে সত্য, সে অর্থটা প্রচলিত নয়। অথচ উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'ঐতিহাসিক' কথাটার একটা প্রচলিত অর্থও আছে। তার প্রচলনকেও আজ খুশিমতো বন্ধ করা যাবে না, তার ব্যঞ্জনাকে আজ পছন্দমতো বদলে নেওয়া যাবে না। অপ্রচলিত নতুন অর্থ শুধু বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করবে।

লোক-ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যে অর্থটা পাকা হয়ে বসেছে তার দিকে একটু দৃষ্টি রাখা দরকার। ঠিক যেমন সমস্ত আর্ট বা সমস্ত সাহিত্যশাখাকেই আমরা সমান ভাবে ঐতিহাসিক আখ্যা দিই না, বিশেষ-ভাবে নাটক-উপন্যাসের ক্ষেত্রেই কথাটার প্রয়োগ করি, উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তেমনি সমস্ত উপন্যাসকেই

আমরা ঐতিহাসিক বলি না, বিশেষ কতকগুলিকেই মাত্র বলি। কোন্‌গুলিকে বলি এবং কেন বলি? বলা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ সে প্রশ্ন তুলব না। কেননা ভাষায় যা একবার প্রয়োগসিদ্ধ হয়ে যায়, যুক্তি দিয়ে আর তার আসন টলানো যায় না। আমাদের বর্তমান আলোচনা 'ঐতিহাসিক' শব্দটাকে নিয়ে নয়, বরং তার প্রয়োগের তাৎপর্যকে নিয়ে— প্রয়োগের লজিক নিয়ে নয়, তার সাইকলজিকে নিয়ে। সেই কারণে প্রচলিত অর্থকে আমরা বিশ্লেষণ করব, কিন্তু লঙ্ঘন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করব না।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কথাটি আজকাল একটি প্রায়-সর্বজনগৃহীত কথা। এই বিশেষ শ্রেণীর উপন্যাসের সীমানা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক অনেক আছে, কিন্তু এর অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় নেই। সুতরাং ঐতিহাসিকতা বলে একটা সুস্পষ্ট গুণ নিশ্চয়ই আছে যা শুধু সেই শ্রেণীর উপন্যাসেরই আছে অপর কারো নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ গুণ দেখলে উপন্যাসকে আমরা ঐতিহাসিক বলে চিহ্নিত করি? বাস্তবতা কি? লোক-প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ কথা মোটেই বলা চলবে না। ঐতিহাসিক উপন্যাসের কী কেন ইত্যাদি নিয়ে যতই মত-বিরোধ থাকুক না কেন, বাস্তবতা আর ঐতিহাসিকতা যে পৃথক্ এ বিষয়ে সাধারণত কোনো মত-বিরোধ দেখা যায় না। সাধারণত আমরা ঐতিহাসিকতা বলতে মাত্র বাস্তবতা বুঝি না, আরো-কিছু বুঝি। হয়তো তার সঙ্গে বাস্তবতার ভাবটিও সংযুক্ত আছে, কিন্তু সেই আরো-কিছুটিকেও মোটেই অগ্রাহ্য করা যাবে না।

প্রশ্নটা সোজা। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিকতাটা কোথায়? কোন্ গুণে ঐতিহাসিক উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে চিনতে পারি? সাদা কথায়, অন্য উপন্যাসের সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের তফাতটা কোথায়?

৪

এই সিধে প্রশ্নটার সিধে জবাব কি সম্ভব নয়? এ কথা কি সোজাসুজি বলতে পারি না যে, অন্য উপন্যাসের সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আসল তফাত ইতিহাসের অস্তিত্বে, ইতিহাসের উপস্থিতিতে?

বলতে অবশ্যই পারি, কেননা কথাটা ভুল নয়। ভুল নয় বলেই যে এ কথা মূল্যবান তা নয়। আলোচনার ক্ষেত্রে এ কথার খুব বেশি দাম নেই। তার কারণ কথাটা অস্পষ্ট। উপন্যাসের প্রসঙ্গে 'ইতিহাসের অস্তিত্ব', 'ইতিহাসের উপস্থিতি'— এসব কোনো কথারই অর্থ খুব পরিচ্ছন্ন নয়। এমনকি, 'ইতিহাস' কথাটাও এই বিশেষ প্রসঙ্গে একটু ঝাপ্‌সা ধরণের কথা। বিষয়টার বোধ করি একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

গয়লার দুধে যখন জলের 'উপস্থিতি' ঘটে তখন তাকে বলি জলীয় দুধ। জলীয় দুধটা দুধের কোনো আলাদা শ্রেণী নয়। জল আর দুধ আলাদা জাতের জিনিস, তাদের মিশ্রণটা বাইরের মিশ্রণ। আগন্তুক জলটাকে বাদ দিলে দুধ দুধই থাকে। উপন্যাস আর ইতিহাস— এরা আলাদা জাতের জিনিস। অথচ ঐতিহাসিক উপন্যাস উপন্যাসেরই একটা বিশিষ্ট শ্রেণী। এ ইতিহাসটা উপন্যাসে বাইরের থেকে আসে নি। কারণ তাকে বাদ দিলে উপন্যাস আর উপন্যাসই থাকে না। তা হলে কি ঐতিহাসিক উপন্যাসের 'ইতিহাস'-টা আসল ইতিহাস নয়? এ এমন বস্তু যার সঙ্গে উপন্যাসের সাজাত্য আছে? সন্দেহটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কথাটা একটু বুঝে দেখতে হবে। উপন্যাসখানা ছিলই, ইতিহাসের বই থেকে গুটি গুটি নেমে এসে ইতিহাস শুট্ করে সেই উপন্যাসখানার মধ্যে ঢুকে পড়ল, এমন কখনোই ঘটে না। ঐতিহাসিক উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়েই জন্মায়। ঔপন্যাসিক কখনোই ইতিহাস আর উপন্যাস এই দুই বিরুদ্ধ উপাদানকে জোড়া দিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস গড়ে তোলেন না। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদি মধ্য অন্ত সমস্তই ষোলো-আনা উপন্যাস।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস ও উপন্যাসের মিলন ঘটে না। তার কারণ মিলনের পূর্বে উপন্যাসটার অস্তিত্বই ছিল না। অন্য দিকে যে-ইতিহাস মিলিত হবে তাও যথার্থ ইতিহাস নয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে সত্যিই যদি কোনো-কিছুর মিলন ঘটে থাকে তো সে কল্পনার সঙ্গে এমন এক আশ্চর্য বস্তুর, যা ইতিহাস হয়েও ইতিহাস নয়, আবার ইতিহাস না-হয়েও ইতিহাস। এমন বস্তু যা কল্পনার সঙ্গে অনায়াসে মিলতে পারে, আবার অলক্ষ্যে সংগোপনে নিজের মধ্যে ইতিহাসের একটা বড়ো ধর্মকে রক্ষা করতে পারে। তাকে বলতে পারি কল্পনাত্মক ইতিহাস, বিকল্প-ইতিহাস। সত্যি ইতিহাস নয়, সম্ভবপর ইতিহাস।

উপন্যাস-মধ্যগত ইতিহাস যখন নিতান্তই কাল্পনিক বস্তু, তখন ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রসঙ্গে 'ইতিহাসের উপস্থিতি' 'ইতিহাসের অস্তিত্ব' ইত্যাদি বর্ণনার প্রয়োগ করলে ঐতিহাসিক উপন্যাসের শিল্প-স্বরূপটাই চাপা পড়ে যায়।

'ইতিহাস থেকে ধার নেওয়া হয়' এই বর্ণনার মধ্যেও একই ত্রুটি। ব্যাপারটা মূলত মিথ্যা নয়, কিন্তু বর্ণনাটা ঝাপ্‌সা। জিজ্ঞাসা করি, ঔপন্যাসিক ইতিহাস থেকে ধার নেন, না ইতিহাসকেই ধার নেন? স্বয়ং ইতিহাসকেই ধার নেওয়া, সে বড়ো কঠিন কথা। ইতিহাসকে ইতিহাস রেখেই ধার নেওয়া— তা হলে উপন্যাসের ঠাঁই হবে কোথায়? ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে "ছোট সে তরী"! সুতরাং বলতে হবে, ইতিহাসকে নয়, ঔপন্যাসিক ইতিহাসের কাছ থেকে ধার নেন। বোধ হয় বলা ভালো, ইতিহাসের বই থেকে, অথবা ঐতিহাসিকের কাছ থেকে। কিন্তু কী ধার নেন? নিশ্চয়ই বলতে হবে, ইতিহাসের ভগ্নাংশকে, উপাদান-উপকরণকে।

কিন্তু দুটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে। প্রথমত, আগেই বলা হয়েছে, উপন্যাস-মধ্যগত ইতিহাসের উপাদানকে যথার্থভাবে ঐতিহাসিক উপাদান বলা যায় না। তা উপন্যাসেরই উপাদান, কেননা তা কল্পনাত্মক। ঔপন্যাসিক ধার যে বস্তুকেই চেয়ে থাকুন না কেন, ধার হিসেবে যা নিয়েছেন, তা ঠিক ঐতিহাসিক বস্তু নয়। দ্বিতীয়ত— এবং এটাও নিতান্ত কম গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়— ইতিহাসের উপাদান নিজে ইতিহাস নয়।

ইতিহাসের পাত্র-পাত্রী, সন-তারিখ, নগর-বন্দর, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিচ্ছিন্ন ঘটনাখণ্ড— আলাদা করে এদের কোনোটাই ইতিহাস নয়। এমনকি ইতিহাসেরও নয়। বিশুদ্ধ উপাদান হিসাবে অর্থহীন এবং অ-চরিত্র। একই উপাদান ইতিহাসে স্থান পেতে পারে, প্রবাদ-কিংবদন্তীতেও স্থান পেতে পারে, রোমান্সে স্থান পেতে পারে, আবার উপন্যাসেও স্থান পেতে পারে। তাকে কী ভাবে কোন্ তাৎপর্যে নেওয়া হচ্ছে, সমগ্রের মধ্যে তার ভূমিকা কী, এইটেই আসল কথা।

যে সাক্ষ্যপ্রমাণের গুণে ইতিহাসের উপাদান ইতিহাস হয়ে ওঠে, সেই সাক্ষ্যপ্রমাণের বৈগুণ্যেই ঐতিহাসিক উপন্যাস অনেক সময় উপন্যাস-ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়। যে কার্যকারণপরম্পরার মধ্যে সংস্থাপিত

হয়ে ইতিহাসের ভগ্নাংশ ইতিহাস-ধর্ম অর্জন করে, সেই ঐতিহাসিক কার্যকারণের গুরুভারই কোনো কোনো সময় ঐতিহাসিক উপন্যাসের শ্বাসরোধ করে ফেলে।

উপাদান ইতিহাসের বই থেকে এলেও, ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র আবার তা নিরপেক্ষ নিরুপাধিক উপাদান। একবার উপন্যাস-সংসর্গের পরে আর তার ইতিহাসে ফিরে যাবার পথ নেই। কাঁচা-মালটা যেখান থেকেই এসে থাকুক, সৃষ্টির প্রচণ্ড ফার্নেস থেকে যে পাকা-বস্তুটি তৈরি হয়ে বেরুলো, তার গোত্রনিরূপণ অত্যন্ত কঠিন কাজ। উপন্যাস-মধ্যগত ইতিহাস যেখানে সত্যিই ইতিহাস হয়ে ওঠে, সেখানে উপন্যাসের মৃত্যু অবধারিত। ঠিক তেমনি, ঐতিহাসিক উপন্যাস যেখানে সত্যিকারের উপন্যাস হয়ে ওঠে, সেখানে তার মধ্যেকার ইতিহাসেরও আত্ম-বিগলন— গলে' একেবারে একাকার হয়ে সম্পূর্ণভাবে উপন্যাস হয়ে যাওয়া— অনিবার্য।

অথচ তখনো তার অঙ্গে একটা ইতিহাসের ছদ্মবেশ লগ্ন থাকে। এ কি একেবারেই ছদ্মবেশ? পরিপূর্ণ ছলনা? এইখানেই রহস্য। সে ইতিহাস নয়, কিন্তু দেখতে ইতিহাসের মতো। সে ইতিহাস নয়, অথচ সূক্ষ্মভাবে ইতিহাসই তার মধ্যে দিয়ে কথা বলে।

৫

উপন্যাস-মধ্যগত কল্পিত-ইতিহাস এক দিকে যেমন ইতিহাসের ছদ্মবেশধারী, অন্য দিকে তেমনি ইতিহাসের প্রতিনিধি। উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চে সে যেন ইতিহাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সে ইতিহাসের প্রতীক, এমন প্রতীক যার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের মর্মসত্য মূর্ত হয়ে ওঠে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতীকের করণীয়টা সে ঠিক ভাবে করতে পারছে, ততক্ষণ সে যে প্রকৃত ইতিহাস নয় এই সত্যটাকে আমরা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ভুলে থাকতে পারি। আসলে, সে যে ইতিহাস নয়, এটা তখন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর কথা। আমাদের উপলব্ধির বিশেষ একটা স্তরে তার ঐতিহাসিকতার সম্পর্কে এক ধরণের গ্রহণের মনোভাব তখন জাগ্রত। ইতিহাসের ছদ্মবেশ এই মনোভাবটাকে সাহায্য করে, প্রতীককে প্রতীক হিসেবে ঘনীভূত করে তোলে। অনেকটা, রঙ্গমঞ্চে রূপসজ্জা যে কাজ করে। প্রতীক হিসেবে যখন সে সার্থক হয়, তখন বুঝতে হবে, আমাদের উপলব্ধি তার ঐতিহাসিকতাকে গ্রহণ করেছে। অন্য দিকে তেমনি, আমাদের উপলব্ধি যখন তার ঐতিহাসিকতায় সন্দিহান, বুঝতে হবে, তার প্রতীকরূপে কাজ করবার যোগ্যতা আমাদের কাছে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রতীকের সত্যতা তার প্রতীকযোগ্যতায়। সে যোগ্যতা আক্ষরিক যথাযথতায় নয়। সে যোগ্যতা, এক দিকে অবিশ্বাসকে প্রত্যাহার করাবার ক্ষমতায়, অন্য দিকে সত্যের প্রকাশক্ষমতায়— যথার্থ প্রতিনিধিত্বে। কল্পিত-ইতিহাসের পক্ষে সেই কারণে তথ্যগত যথাযথতার প্রয়োজন সীমাবদ্ধ। ঐতিহাসিক তথ্যের ভুলভ্রান্তি খানিকটা দূর পর্যন্ত সে অনায়াসে সহ্য করতে পারে। এই জন্যেই, ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা-অসার্থকতা সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস-গবেষণার অগ্রগতির উপর নির্ভর করে না। ইতিহাসের জ্ঞান সতত-পরিবর্তনশীল। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা ঠিক তা নয়। অন্তত তার পরিবর্তনশীলতা অতখানি দ্রুতগামী নয়।

ইতিহাসের সত্যতা পাঠক-নিরপেক্ষ। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা অনেকখানি পরিমাণে

পাঠকের উপলব্ধি-সাপেক্ষ। পাঠকের জ্ঞান বোধ সংবেদনশীলতা এবং কল্পনাশক্তির দ্বারা তার সীমানা নির্ধারিত। ক্ষেত্রবিশেষে তথ্যের অনেকখানি ভুলভ্রান্তি সে সহ্য করতে পারে। বলা বাহুল্য, তারও সীমা আছে। মাপটা সমস্ত পাঠকের পক্ষে এক নয়। এ ক্ষেত্রে মোটামুটি 'পাঠক-সাধারণের উপলব্ধি' নামক একটি অনির্দিষ্ট ধারণার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। যাই হোক, এটা ধরে নিতে পারি যে, ইতিহাস-বিজ্ঞানীর ইতিহাস-জ্ঞানের মতো তা দ্রুত-ধাবমান বস্তু নয়। তা যদি হত, তা হলে আর্ট আর আর্ট থাকতে পারত না। বিভিন্ন আর্টের সঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞানের নানা রকমের যোগাযোগ আছে। কিন্তু আর্টের একটা আপেক্ষিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাও আছে। সেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও থাকতে হবে। কিন্তু কথাটাকে বোধ করি একটু দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা দরকার।

একদিন পদ্মিনী-ভীমসিংহ-আলাউদ্দীন কাহিনী, বা মেহেরুন্নিসা-সেলিম কাহিনী, অথবা মেবারযুদ্ধে আওরঙ্গজেবের চূড়ান্ত দুর্দশার কাহিনী ষোলো-আনা ইতিহাস বলেই গণ্য হত। এইসব কাহিনীকে অবলম্বন করে একদিন যেসব নাটক-উপন্যাস রচিত হয়েছিল, ধরা যাক, সেদিন সেগুলি সার্থকভাবে ঐতিহাসিক বলেই গৃহীত হয়েছিল। আরো ধরা যাক যে, আজ এগুলো সবই মিথ্যা বলে প্রমাণিত। সঙ্গে সঙ্গেই কি কালকের দিনের সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস আজ অনৈতিহাসিক বলে গণ্য হবে? না, এই কথা বলব যে, কালও তারা অনৈতিহাসিকই ছিল? কিন্তু আগামী কালের গবেষণায় কাহিনীগুলোর কোনোটা যদি আবার সত্য বলে প্রমাণিত হয়? এবং আগামী কালেরও আগামী কাল আছে— আবার যদি ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত পাল্‌টে যায়? ইতিহাস-গবেষণার হেরফেরের সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ট সে কি বার বার তার শিল্পধর্ম বদলাতে থাকবে? তা নিশ্চয়ই করবে না। কিন্তু তা হলে শেষ সত্যটাই বা কে বলে দেবে? আর, শেষ সত্যকে যখন জানতেই পারছি না, তখন 'ঐতিহাসিক' বিশেষণের প্রয়োগ কি অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত রাখাই সঙ্গত হবে? ইতিহাসের জ্ঞান অন্তহীন। অতএব তার ভ্রান্তিও অন্তহীন। প্রতিদিন নতুন ভ্রান্তির আবিষ্কারে ইতিহাসের আনন্দ। ইতিহাসের প্রতিদিনের আনন্দই কি ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতিদিনের বিপদ?

শুধু ভবিষ্যৎ-গবেষণার কথা কেন, কোনো ইতিহাসই তো কখনোই পূর্ণ নয়। এক হিসেবে, ইতিহাসের সমস্ত সত্যই সংশয়াক্রান্ত সত্য। এ সংশয় নিত্যসংশয়। ইতিহাসের সত্যের ধর্মই তাই। এইখানেই আর্টের স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা আসে। হতে পারে সে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আপেক্ষিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। কিন্তু স্বাদের দিক থেকে তার মধ্যে কোনো সংশয়, কোনো আপেক্ষিকতা নেই। ইতিহাসের স্বভাবের মধ্যেই অনিশ্চয়তা, তার সর্বাঙ্গে 'আনুমানিক' ছাপ মারা। ঐতিহাসিক উপন্যাস কার্যত যতই আপেক্ষিক সত্য নিয়ে কারবার করুক-না কেন, যখন সে আর্ট তখন সে অনপেক্ষ। সে পুরোই কল্পনা, তাই তার কিছুই আনুমানিক নয়। সমস্তই অবিসংবাদিত।

৬

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঙ্গে অন্য উপন্যাসের তফাত তা হলে ইতিহাসের বা ঐতিহাসিক উপাদানের 'উপস্থিতি' দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। যে 'আরো-কিছু'র কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তা মাত্র বাস্তবতাও নয়, আবার কেতাবী ইতিহাসের তথ্যপুঞ্জও নয়। তা হলে সেটা কী?

বলতে পারতাম, ওদের আসল তফাত স্বাদের তফাত। বললে, খুব যে ভুল বলা হত তাও নয়। সত্যিই তো, 'বিষবৃক্ষ' আর 'বেণের মেয়ে'র, 'রজনী' আর 'রাজসিংহে'র কিংবা 'স্বর্ণলতা' এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'র আসল তফাত যে স্বাদেরই তফাত তাতে আর সন্দেহ কী?

কিন্তু মুশকিল এই যে স্বাদ জিনিসটা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত। বাইরে তার প্রমাণ নেই। তাকে নিয়ে তর্ক চলে না। যার স্বাদবোধ নেই, তার নেই-ই। নেই যে, তা সে নিজেও জানে না। এ রকম একটা প্রাইভেট জিনিসকে পাবলিক আলোচনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। বোধের ক্ষেত্রে স্বাদকে অবশ্যই স্বীকার করব, কিন্তু আলোচনা বা বিচারের ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে আরো তথ্য-ভিত্তিক কিছু প্রমাণ দেওয়া দরকার। অন্তত দেখানো দরকার, কোথায় সেই স্বাদের বিশেষত্ব, কী তার উপাদান-উপকরণ।

কেউ হয়তো স্বাদ না বলে, বলতে পারেন— আসল তফাত হল রসের তফাত। স্বাদ বললে যেমন ভুল হবে না, রস বললেও তেমনি ঠিক কথাই বলা হবে। কিন্তু অসম্পূর্ণতাটা থেকেই যাবে। কারণ স্বাদ আর রস একই জিনিস। সুতরাং রসের বিশেষত্বটাকে দেখিয়ে দিতে হবে। কী কী যোগাযোগের ফলে ওই বিশেষ রসটা জমে ওঠে তার হদিশ দিতে চেষ্টা করতে হবে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'ঐতিহাসিক রসে'র কথা বলেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি উক্ত রসের উপাদান-কারণেরও কিছু কিছু ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেছেন। আমাদের সেই উপাদান-কারণের পথ ধরেই অগ্রসর হতে হবে।

যে যোগাযোগের ফলে রসের সঞ্চার, সন্ধানের দিক থেকে তারই গুরুত্ব বেশি। স্বাদের তফাত বিনা কারণে ঘটে না। উপাদান-উপকরণ, বিন্যাস-কৌশল, ভাব-বস্তু, প্রকাশ— অনেক-কিছুর সমবেত ক্রিয়াই পাঠকের চিত্তে উপলব্ধির ভিন্নতা, অর্থাৎ আস্বাদের ভিন্নতা ঘটিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে হলে পাঠকচিত্তের সংস্কার অভ্যাস অভিজ্ঞতা উপলব্ধি— এই দিকটাতে দৃষ্টি দেওয়ার বিশেষ একটা সার্থকতা আছে বলে মনে হয়।

একটা জিনিস অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন। ইতিহাস তো শুধু দূর-অতীতই নয়, সূক্ষ্মভাবে দেখলে ইতিহাস ত্রিকালে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু সাধারণত আমরা ইতিহাসকে মোটেই সেভাবে দেখতে অভ্যস্ত নই। ইতিহাস বলতে সাধারণত আমরা কেবল অতীতকালের ঘটনাকেই বুঝে থাকি। সদ্য-অতীত সম্পর্কেও কোথায় যেন আপত্তি আছে। অতীত যদি যথেষ্ট দূরের অতীত না হয়, তা যদি আমাদের জীবৎকালেরই ঘটনা হয়, তা হলে তাতেও আমাদের মন সায় দেয় না। দূরে না গেলে তা যেন আমাদের কাছে ঠিক ঠিক ইতিহাস হয়ে ওঠে না।

খানিকটা বোধ করি এই কারণেই, রাজা-বাদশা আমাদের কাছে যে পরিমাণে ইতিহাস, সাধারণ লোক তা নয়। যুদ্ধ-বিগ্রহটা যেরকম যোলো-আনা ইতিহাস, দৈনন্দিন জীবন তা নয়। রাজনৈতিক ব্যাপার যেরকম নিঃসংশয়ে ইতিহাস, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যাপার তা নয়। একটা ব্যর্থ ষড়যন্ত্র আমাদের কাছে যতখানি ইতিহাস, একটা সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি তা নয়। রাজপ্রাসাদের ভোগ-বিলাসের বিবরণ যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস, হাটবাজারের কেনাবেচা তা নয়। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, এ তালিকার প্রত্যেক জোড়ার প্রথমটি আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত এবং দূর-স্থিত।

এই মনোভাব কতটা যুক্তিযুক্ত সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আধুনিক ইতিহাস-বিজ্ঞানী নিশ্চয়ই

ইতিহাসকে খণ্ড করেও দেখেন না, দূরত্বের রঙিন চশমা দিয়েও দেখেন না। কিন্তু এখানে প্রশ্নটা ইতিহাস-বিজ্ঞানীকে নিয়ে নয়, প্রশ্নটা লোকচিত্তের ধারণাকে নিয়ে। বহুকালের অভ্যস্ত ভাবনার ফলে লোকচিত্তে ইতিহাসের যে কল্পমূর্তিটি গড়ে উঠেছে, সে কল্পমূর্তি অতীত দিয়ে গড়া, দূরত্ব তার প্রধান একটা বিশেষত্ব।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যেকার যে ইতিহাস, তার সঙ্গে লোকচিত্তগত এই কল্পমূর্তির একটা গভীর যোগ আছে। এ ইতিহাসও খানিকটা ভাবধর্মী ইতিহাস। ততটা যুক্তিভিত্তিক নয় যতটা অনুভবভিত্তিক— উপলব্ধিভিত্তিক। এখানেও, উপলব্ধির প্রধান অবলম্বন অতীতের অনুভব, দূরত্বের অনুভব।

ভাবধর্মী বলেই এর রূপের মধ্যে একটা স্থিরত্ব আছে, একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে। যদিও সেটা আপেক্ষিক, চূড়ান্ত নয়, তবু তার রূপের মধ্যে— তার স্বাদের মধ্যে সে আপেক্ষিকতার ছাপ নেই। যদিও ইতিহাস-জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে অলক্ষ্যে নানা পরিবর্তন আসতে বাধ্য, তবু সেই পরিবর্তনের ছন্দটা স্বতন্ত্র। তার কারণ তাকে লোকচিত্তের চলনের সঙ্গেও খানিকটা তাল রেখে চলতে হয়।

সেই সঙ্গে আবার এও মনে রাখতে হবে যে, উপন্যাস-মধ্যগত এই ভাবধর্মী ইতিহাস কখনোই লোকচিত্তের সম্পূর্ণ অধীন নয়। অনেক সময় বরং লোকচিত্তগত কল্পমূর্তিকে সে-ই ভেঙে চুরে নতুন করে গড়ে তোলে।

উপন্যাস-মধ্যগত এই ভাবধর্মী ইতিহাসের দুই দিকে দুই বিপরীত শক্তির টান। এক দিকে যেমন লোকচিত্তগত কল্পমূর্তির টান, অন্য দিকে তেমনি ইতিহাস-বিজ্ঞানের অগ্রগতির টান। অতীত বা দূরত্ব ছাড়া তার মধ্যে যে আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিদ্যমান, সেখানে ওই ইতিহাস-বিজ্ঞানেরই অধিকার। এই দিকটিই তার বাস্তবতার দিক।

এইখানেই আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্রগত দ্বৈততার হদিশ পেতে পারি। একই সঙ্গে তার মধ্যে অতীতকালের স্বাদগত দূরত্ব এবং সুচিহ্নিত সুপরিচিত বাস্তবের ভাবগত নৈকট্য। বাস্তবের উপর অতিরিক্ত জোর পড়লে— বাস্তবটা আক্ষরিক অর্থে বাস্তব হয়ে উঠলে, ঐতিহাসিক উপন্যাস আর উপন্যাস থাকে না, ইতিহাস হয়ে পড়ে। দূরত্বের উপর অতিরিক্ত জোর পড়লে, বাস্তবের শক্তি একেবারে ঝিমিয়ে পড়লে, তখনো ঐতিহাসিক উপন্যাস আর উপন্যাস থাকে না। তখন সে হয় রোমান্স।

রোমান্সে দূরত্ব আছে, দূরত্বই আসল, কিন্তু সে যে অতীতেরই দূরত্ব তা নয়। সে অতীত অচিহ্নিত, অনির্দিষ্ট অতীত, তার কোনো কালগত রূপ নেই। অনেক সময় অবশ্য কালগত রূপের ভান থাকে। তখন তাকে বলি ঐতিহাসিক রোমান্স। অর্থাৎ যে রোমান্সে ইতিহাসের তথ্য থাকে কিন্তু সত্য থাকে না, এমন তথ্য থাকে যা সত্যকে প্রকাশ করে না— বরং আবৃতই করে, যার মধ্যে ইতিহাসে ছদ্মবেশ থাকে, কিন্তু প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা একবিন্দু নেই, তারই নাম ঐতিহাসিক রোমান্স।

যা বাস্তব নয় অথবা যার বাস্তবতা নগণ্য, যা বাস্তবতার ভান অথবা যার বাস্তবতা এমনই তির্যক যে তা আসলে অবাস্তবতারই সঞ্চার করে, তাকে 'ঐতিহাসিক' বিশেষণ দেওয়া অযৌক্তিক। আমরা

আগেই দেখেছি, একটু উদার অর্থে ধরলে উপন্যাসমাত্রকেই ঐতিহাসিক বলা যায়। ঠিক তেমনি, অনমনীয় অর্থে ধরলে, রোমান্সমাত্রকেই অনৈতিহাসিক বলে আখ্যা দেওয়া যায়। তাকে বলতে পারি, অতীতাশ্রয়ী রোমান্স, কি পুরা-ঘটিত রোমান্স। ঐতিহাসিক রোমান্স নামটা স্ববিরোধী।

ঐতিহাসিক উপন্যাসকে যদি 'পুরা-ঘটিত উপন্যাস' নাম দেওয়া যায়, তা হলে খুব বেশি ভুল হয় না। বলা বাহুল্য, পুরা-ঘটিত অনেক রকমের গল্প-কাহিনীই সম্ভব। তার সবই বাস্তব নয়। বাস্তব না হলে— কেবল অতীত হলে— তাকে ঐতিহাসিক বলা যায় না। কিন্তু উপন্যাস হলে তা বাস্তব হতে বাধ্য, হোক সে কাল্পনিক-বাস্তব। পুরা-ঘটিত উপন্যাস বললে অতীত এবং বাস্তব দুইই বলা হল।

একটা কথা এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। প্রকাশরীতির দিক থেকে কিন্তু উপন্যাস-মাত্রেই পুরা-ঘটিত। অর্থাৎ উপন্যাসের কাল প্রায় সব সময়ই অতীতকাল। কাহিনীকে যে ভাবেই বিবৃত করা হোক-না কেন, প্রথম-পুরুষেই হোক আর উত্তম-পুরুষেই হোক, বিবৃতিতে প্রায় সব সময়ই অতীতের কাল-রূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই আঙ্গিকগত অতীতের সঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাসের উপজীব্যগত অতীতের কোনো সম্পর্ক নেই। 'বিষবৃক্ষে'র অতীতকাল মুখ্যত বিবৃতির অতীতকাল, 'বেণের মেয়ে'র অতীতকাল বিবৃতিরও যেমন, বক্তব্যেরও তেমনি।

নাটক যেমন নিত্য-বর্তমান, উপন্যাস তেমনি নিত্য-অতীত। নাটক বিবৃতিমূলক নয়, নিত্য-প্রত্যক্ষ। তাই তার আঙ্গিক বর্তমানের আঙ্গিক। উপন্যাস সব সময়ই বিবৃতিমূলক, সব সময়ই অল্পবিস্তর পরোক্ষ। এই পরোক্ষতা বা বিবৃতি-মূলকতা তাকে আঙ্গিকের দিক থেকে নিত্য-অতীত করে দিয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের অতীত চরিত্রগত। এ হল স্বাদগত অতীত। এ অতীত গৃহীত বিষয়বস্তু, বিবৃতির ব্যাকরণমাত্র নয়।

সব উপন্যাসই মোটামুটি সুস্পষ্ট কাল-চিহ্নই বহন করে। তার কারণ সব উপন্যাসই অল্পবিস্তর বাস্তবতাধর্মী। কিন্তু সেই কাল-চিহ্ন সব রকম উপন্যাসেই যে বক্তব্য হিসেবে সমান গুরুত্ব পাবে এমন কোনো কথা নেই। যেখানে কাল-চিহ্ন গুরুত্ব পায়, সেখানেও সে যে কেবল অতীত কালেরই হবে এমন কোনো কথা নেই। কোনো উপন্যাসে সাম্প্রতিকের স্বাদ ফুটে উঠতে পারে, কোনো উপন্যাসে সদ্য-অতীতের। কোথাও ভবিষ্যতের স্বাদ ফুটে ওঠাও বিচিত্র নয়। কালের আস্বাদযুক্ত হলে তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আত্মীয় বলে গণ্য করা যেতে পারে। বিশিষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট অতীতের আস্বাদযুক্ত হলে তবেই তাকে খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলব।

বিশিষ্টতা এবং নির্দিষ্টতা বাস্তবতারই অপরিহার্য শর্ত। বাস্তবতার প্রতীতি উৎপাদন করার জন্যেই ঐতিহাসিক উপন্যাসকে এমন কতকগুলি চিহ্ন ধারণ করতে হয়, ইতিহাস হিসেবে যা আমাদের সুপরিচিত। ইতিহাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে বলেই সে ইতিহাসের তথ্য দিয়ে, ইতিহাসের নাম-রূপ দিয়ে নিজেকে মণ্ডিত করে রাখে। এ হল তার পরিচয়পত্র। এই পরিচয়পত্র না থাকলে তাকে সনাক্ত করবার উপায় থাকে না। সনাক্তীকৃত এবং স্বীকৃত না হলে সে ইতিহাসের প্রতীক

হতে পারে না। এবং সেই কারণে, ইতিহাসের মর্মসত্যকে প্রকাশ করবার যে নিঃসপত্ন অধিকার তার উপর ন্যস্ত ছিল, সেই অধিকার তখন তার নষ্ট হয়ে যায়।

ইতিহাসের সন-তারিখ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজা-উজীর—উপন্যাসের মধ্যে সকলেরই দ্বৈত ভূমিকা। এক, তারা কল্পনা। বলতে পারি, মায়া। মায়া হয়েও কিন্তু সত্য। আর্টমাত্রেই যে অর্থে সত্য। অন্য দিকে, তারা ইতিহাসের তথ্য। আসলে ইতিহাসের চিহ্ন, ইতিহাসের নাম-রূপ। প্রতীতি-উৎপাদনের অবলম্বন। বলতে পারি, বাস্তবকে ঘনিয়ে তোলার মন্ত্র। এই মন্ত্রেই সে প্রতীক হয়ে ওঠে এবং ইতিহাসের মর্মসত্যকে প্রকাশ করে।

ইতিহাসের আওরঙ্গজেব, সে ইতিহাসেরই আওরঙ্গজেব। মাত্র নাম-রূপ নয়, সে ষোলো-আনা সত্য। কারো প্রতীক নয়, সে একেবারে আক্ষরিকভাবে বাস্তব। অপর পক্ষে, উপন্যাসের নগেন্দ্রনাথ উপন্যাসেরই নগেন্দ্রনাথ। সে ষোলো-আনাই কল্পনা। বলতে পারি, কল্পনার সত্য। কল্পনার জগতে সে বাস্তবেরই প্রতিনিধি। সে প্রতীক, কিন্তু কোনো চিহ্নিত বাস্তবের নয়। সে দূর-অতীতের নয়, তার কোনো চিহ্নের প্রয়োজন নেই। বিনা পরিচয়পত্রেই সে প্রতীকরূপে গৃহীত।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের আওরঙ্গজেবকে কী বলবো? সে ইতিহাসের আওরঙ্গজেবের মতো আক্ষরিক সত্য নয়, সে উপন্যাসের নগেন্দ্রনাথের মতোই কল্পনার সত্য। নগেন্দ্রনাথের মতো সেও কল্পনার জগতে বাস্তবের প্রতিনিধি। যে-বাস্তবের সে প্রতিনিধিত্ব করছে সে-বাস্তব নিকটের নয়, দূর-অতীতের। সে-বাস্তবকে চিহ্নিত করে দেওয়া দরকার। সেইজন্যেই সে জনৈক নগেন্দ্রনাথ কি জনৈক গোবিন্দলাল নয়। সে ইতিহাসের বিশিষ্ট একটি চিহ্নিত পুরুষ। দূরের অতীত নিয়ে কারবার বলেই ঐতিহাসিক উপন্যাসে নাম-রূপের নৈকট্য এত অত্যাবশ্যক।

৮

ইতিহাসের তথ্যগুলিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে ভুল হবে। এরা অত্যাবশ্যক, কিন্তু লক্ষ্য হিসেবে নয়। লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপায় হিসেবে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষ্য ইতিহাসের তথ্য নয়, ইতিহাসের সত্য। আরো স্পষ্ট বললে বলতে হয়, ইতিহাসের অর্থ। ইতিহাসের সেই অর্থ, মানুষের অন্তরঙ্গ-জীবনের মধ্যে দিয়ে যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত। কথাটিকে অন্য দিক থেকে অন্য রকম করেও বলতে পারি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষ্য মানবজীবনের সত্য। অথবা বলতে পারি, মানবজীবনের অর্থ। সেই অর্থ, ইতিহাসের ঘনঘটার মধ্যে দিয়ে যার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাজ হল, ইতিহাসের সত্য আর মানব-জীবনের অন্তরঙ্গ সত্য, এই দুই আপাত-বিপরীতকে সমন্বিত করে দেখানো।

এই কাজে তথ্য অত্যাবশ্যক, কিন্তু মাত্র তথ্য হিসেবে নয়। অর্থের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে। অর্থটারই আসল গুরুত্ব। তথ্য তার বাহন, তার অবলম্বন। তথ্য নইলে অর্থের আলো জ্বলবে না। কিন্তু আলো না জ্বললে সমস্ত তথ্য মিথ্যা। এইজন্যেই দেখতে পাই, কখনো কখনো পর্যাপ্ত তথ্য থাকা সত্ত্বেও—ইতিহাসের নাম-রূপগুলি নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও—কাহিনীবিশেষ আদৌ ঐতিহাসিক বলে গৃহীত হতে পারল না। যেমন ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। আবার কখনো কখনো দেখতে

পাই, প্রচুর সন্দেহজনক তথ্য থাকা সত্ত্বেও— প্রধান নাম-রূপগুলিকে নিয়ে সংশয় ঘটা সত্ত্বেও— কাহিনীবিশেষ শেষ পর্যন্ত পাঠক-সাধারণের কাছে ঐতিহাসিক বলেই বিবেচিত হয়ে গেল। দৃষ্টান্ত— 'বেণের মেয়ে'। কথাটা একটু বোধ করি খুলে বলা দরকার।

'বেণের মেয়ে'র অনেক তথ্যই আজ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। বাকি অনেক-কিছুর সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। পাত্র-পাত্রীও অনিশ্চিত। তবু, 'বেণের মেয়ে'তে সেই 'হিন্দু-বৌদ্ধ' যুগের বাংলাদেশ ও বাঙালি সমাজের— তখনকার বাঙালির জাতীয়জীবনের যে ছবিটি ফুটে উঠেছে, সে ছবিকে— অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও— মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক বলে অনেকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। আক্ষরিক যথাযথতা নয়, মর্মগত সত্যই এখানে বেশি মূল্য পেয়েছে।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র আরঙ্গেব, রোসিনারা, শিবজী, জয়সিংহ, 'বেণের মেয়ে'র পাত্র-পাত্রীদের তুলনায় অনেক বেশি সুনিশ্চিত, অনেক বেশি ঐতিহাসিক। দু-একটি মুখ্য ঘটনা তো সর্বজনবিদিত ইতিহাস। তবু সামগ্রিক তাৎপর্যের অভাবে— অথবা বলা উচিত, ভাবগত অনৈতিহাসিকতার জন্যে, সামগ্রিক অনৈতিহাসিকতার জন্যে, 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' রোমান্স বলেই পরিচিত, উপন্যাসরূপে গণ্য নয়।

বিচ্ছিন্ন তথ্য নয়, লেখকের প্রধান উপজীব্য কী সেইটেই এখানে আসল কথা। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' আর 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', এ দু'য়ের মধ্যে তথ্যাদিতে মিল প্রচুর, ঘটনাবিন্যাসেও মিল নিতান্ত কম নয়। কিন্তু লক্ষ করে দেখলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র জগৎ রোমান্সের জগৎ। শিবজী রোমান্টিক নায়ক, নিত্য-প্রণয়লোকের অধিবাসী। রোসিনারাও সেই জগতেরই, আয়েষার পূর্বগামিনী। রামদাসস্বামী বঙ্কিমচন্দ্রের রামানন্দস্বামীদেরই পূর্বপুরুষ। সাজাহান প্রথাসিদ্ধ পিতামহ— প্রায় এ কালের ইংরেজিশিক্ষিত পিতামহ। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' একটি বিষণ্ণ-মধুর প্রেমকাহিনী। এবং তৎসহ, হিন্দুমুসলমান প্রশ্নে, হিন্দু লেখকের দিক থেকে মৃদু ইচ্ছাপূরণ। অনেক দিক থেকে অনেকখানি পরিমাণে 'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্বপুরুষ।

'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাতে'ও প্রেম আছে। গল্পে তা নিতান্ত গৌণ নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত'কে সমগ্রভাবে নিছক প্রেমের গল্প বলে গণ্য করা যাবে না। সুচিহ্নিত অতীতের বিশেষ আস্বাদটি তার মধ্যে বেশ সচেতনভাবেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ইচ্ছাপূরণকল্পনা কোথাও আত্মপ্রকাশের অবকাশ পায় নি। সামগ্রিক তাৎপর্যের ইঙ্গিত 'জীবনপ্রভাত' নামটার মধ্যেই কিছু পরিমাণে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র সঙ্গে তার তথ্যগত যেটুকু ঐক্য, তা এই ভাবগত অনৈক্যে একদম চাপা পড়ে গিয়েছে। অল্পস্বল্প রোমান্সের রঙ থাকলেও, 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে মানতে অনেকেই দ্বিধা করবেন না।

৯

ঐতিহাসিকতা যে মাত্র তথ্যের উপর নির্ভর করে না, রচনার সামগ্রিক চরিত্রের উপর নির্ভর করে, তার উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত হল 'চন্দ্রশেখর'। দৃষ্টান্ত অবশ্য এ ক্ষেত্রে নেতিবাচক।

'চন্দ্রশেখরে' ইতিহাসের পাত্রপাত্রী, ইতিহাসের ঘটনাবলী পর্যাপ্ত পরিমাণেই আছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দু-একটি ঘটনার বিবরণে, দু-একটি ঐতিহাসিক চরিত্রের আচরণ-বর্ণনে কিছু কিছু তথ্যগত ত্রুটি

অবশ্যই ঘটেছে। কিন্তু ইতিহাসের কোনো বড়ো সত্যকে বিকৃত করা হয় নি। ইতিহাসের আসল তকি খাঁ বীর এবং বিশ্বাসী হতে পারেন, ইতিহাসের আসল গুরগিন খাঁ বিশ্বাসঘাতক নাও হতে পারেন, তাতে কিছু এসে যায় না। সে সময়কার নবাবদরবারে বিশ্বস্ততার ভয়াবহ অভাবটা তো সম্পূর্ণই ঐতিহাসিক সত্য। সেই সর্বাত্মক বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষাপটে, কাহিনীর মূল তাৎপর্যের দিক থেকে অপ্রধান কোনো চরিত্রকে যদি ভুল করেও বিশ্বাসঘাতকরূপে চিত্রিত করা হয়ে থাকে তাতে ইতিহাসের ভাবসত্যের কোনো হানি ঘটে নি। যুগসত্যের প্রকাশ তাতে একটুও অযথার্থ হয় নি। সুতরাং সে দিক থেকে 'চন্দ্রশেখর'কে অনৈতিহাসিক বলা সঙ্গত হবে না।

অন্য দিকে 'চন্দ্রশেখরে'র স্থানে স্থানে কাল পরিবেশ চিত্রণে যে আশ্চর্য ঐতিহাসিক কল্পনার স্ফুরণ ঘটেছে, অনেক সমালোচকের কাছে তা যে-কোনো তথ্যের থেকে বেশি মূল্যবান। এতখানি ঐতিহাসিক তথ্যাদি ঐতিহাসিক পরিবেশ— এসব থাকা সত্ত্বেও 'চন্দ্রশেখর'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে দ্বিধা হয়। এ দ্বিধা নিতান্ত অকারণ নয়।

আগেই বলেছি, তথ্যের ভুল এর কারণ নয়। এর যেটুকু তথ্যগত ভুলভ্রান্তি, তা অনায়াসেই অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। 'চন্দ্রশেখরে' কিঞ্চিৎ রোমান্স আছে বটে, কিন্তু ঐটুকু রোমান্সের অস্তিত্বও এর যথেষ্ট কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে না। মনে রাখতে হবে, বাংলা উপন্যাসে সর্বত্রই রোমান্সের জন্যে কিছু আসন সংরক্ষিত থাকে। ওটা প্রধান হয়ে না উঠলেই হল। রোমান্স 'চন্দ্রশেখরে' কখনোই তেমন প্রধান হয়ে উঠতে পারে নি। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত রোমান্স যেমন আছে, তেমনি রোমান্সঘাতী বাস্তবও ওর মধ্যে বড়ো কম নেই। তবু যে 'চন্দ্রশেখর' ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, তার কারণটা অন্যত্র।

এইবারে সেই কারণের কথা বলি। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের বাংলাদেশ, সে সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক পরিবেশ, ঘটনাবলীর আড়ালের গূঢ় কার্যকারণপরম্পরা, এবং এসবের সামগ্রিক অর্থ, যাকে বলতে পারি সেদিনের বাঙালির ইতিহাসের মর্মসত্য— 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে এসবের গুরুত্ব কতখানি? গুরুত্ব কিছু আছে ঠিকই, কিন্তু খুব বেশি নয়। যাকে বলে প্রাথমিক গুরুত্ব, তা নয়।

নায়কনায়িকার সুখদুঃখের মধ্যে দিয়ে সে দিনের ঐতিহাসিক সত্যটিকে মূর্ত করে তোলা, অথবা— এরই সঙ্গে সঙ্গত এর বিপরীত দিকটি— সেদিনের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সত্যের চাবিতে নায়কনায়িকার সুখদুঃখের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা, 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের এইটেই কি কেন্দ্রস্থ ভাববস্তু? লক্ষ করলে দেখা যাবে, ঠিক তা নয়।

'চন্দ্রশেখরে' যুগপরিবেশ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে আনুষঙ্গিকভাবে। এ কথা বলা চলবে না যে, প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের মধ্যে দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর হৃৎস্পন্দন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ইতিহাসের ঘটনাবলী প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের ভাগ্যকে স্পর্শ করেছে, কিন্তু চরিত্রকে স্পর্শ করতে পারে নি। 'চন্দ্রশেখরে' তথ্যগত ঐতিহাসিকতার গুরুত্ব খুব বেশি নয়। এর প্রাথমিক গুরুত্ব অন্যত্র।

'চন্দ্রশেখর' গার্হস্থ্য উপন্যাস। পটভূমিকা ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু কাহিনীর কেন্দ্রে যে গার্হস্থ্যসমস্যা, ইতিহাস তাকে বাইরের থেকে স্পর্শ করেছে, তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে নি। অতীতের আস্বাদ এখানে গৌণ। ইতিহাসের নাম-রূপ এখানে ইতিহাসের পরিচয়পত্র নয়, মাত্র অঙ্গসজ্জা, লেখকের বিন্যাসকলাকুশলতার আশ্চর্য নিদর্শন। কিন্তু তার বেশি নয়। 'চন্দ্রশেখর' এত একান্তভাবে প্রণয়ঘটিত

যে, যথার্থভাবে পুরা-ঘটিত হয়ে উঠবার অবকাশই তার ঘটে নি। 'বিষবৃক্ষে'র দাম্পত্য প্রশ্নের সঙ্গে 'চন্দ্রশেখরে'র যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। লেখকের ধ্যান-দৃষ্টি নারীজীবনের এমন এক সংকটের দিকে নিবদ্ধ, যে সংকট বিশেষভাবে উনবিংশ শতকের যুগধর্মের দ্বারাই সেদিনে শিল্পীদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল। এমন সংকট, শিল্পী-বঙ্কিমচন্দ্র সারাজীবনে যার সমাধান খুঁজে পেলেন না।

১০

ইতিহাসের তথ্য হোক সত্য হোক যা-ই হোক, সে কেবল ঐতিহাসিকতারই দায়িত্ব নিতে পারে, শিল্পসার্থকতার নয়। তার জন্যে চাই শিল্পীর হাতের ছোঁওয়া। তার অভাবে সবই ব্যর্থ।

কথাটা যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পক্ষেও সমানভাবেই প্রযোজ্য, প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' তার একটি নিঃসংশয় প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে। আজকের ইতিহাস-জ্ঞানের আলোকে যা-ই মনে হোক-না কেন, খুব কম বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসেই এতখানি তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় মিলবে। দেশকালগত পরিবেশের প্রতিও লেখকের দৃষ্টি কম তীক্ষ্ণ নয়। তবু, 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' যে যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি, এ কথা বোধ করি অনেকেই স্বীকার করবেন। পারে নি তার শিল্পগত ত্রুটির জন্যে। যেখানে উপন্যাস বলেই মানতে বাধা সেখানে ঐতিহাসিকতা কথা উঠবারই অবকাশ পায় না।

ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়েছে কি না, প্রথম প্রশ্ন এটা নয়। উপন্যাস হয়ে উঠেছে কি না, এইটেই প্রথম প্রশ্ন। 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' কিংবা 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' ঐতিহাসিকতার দিক থেকে বহু-প্রশংসিত। অনেক সময় এইটেকেই আমরা যথেষ্ট বলে বিবেচনা করি। এবং এই বিবেচনার উপর ভিত্তি করে 'রাজসিংহে'র সঙ্গে এদের তুলনা করি। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে যে 'রাজসিংহে'র তুলনায় এরা সার্থকতর এমন রায়ও দিয়ে থাকি। গ্রন্থ দুটি উপন্যাস হিসেবে কতখানি সার্থক সে প্রশ্ন উত্থাপন করতেই ভুলে যাই। কিন্তু সে প্রশ্ন যে একেবারেই উঠতে পারে না তা নয়। বিশেষত যখন তুলনাটা 'রাজসিংহে'র সঙ্গে ঘটে।

অবশ্য 'রাজসিংহ' সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ অন্য প্রশ্ন। 'রাজসিংহে'র শিল্পসার্থকতা অবিসংবাদিত। সেখানে কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই।

'রাজসিংহ' সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠতে পারে তা তার ঐতিহাসিকতাকে নিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির সমর্থন করে আমরাও কি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস? 'চন্দ্রশেখরে' ঐতিহাসিকতার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই—এই যুক্তিতে ইতিপূর্বে 'চন্দ্রশেখরে'র ঐতিহাসিকতার দাবিকে আমরা নাকচ করে দিয়েছি। 'রাজসিংহ' সম্পর্কেও কি ওই একই যুক্তি খাটতে পারে না?

'চন্দ্রশেখর' সম্পর্কে আমাদের অভিমতটা ছিল এই যে, 'চন্দ্রশেখরে' ঐতিহাসিকতা অবশ্যই আছে। কিন্তু, কী পরিমাণে, কী গুরুত্বে, কোনো দিক থেকেই তা স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য নয়। 'রাজসিংহে' ঐতিহাসিকতার পরিমাণ বেশি, গুরুত্বও বেশি। 'রাজসিংহ' এমন একটা সীমান্তবর্তী ক্ষেত্র যেখানে কেবল মাত্রার বিচারে এ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। এ ক্ষেত্রে 'রাজসিংহে'র ঐতিহাসিকতার

চরিত্রকে একটু ভাল করে অনুধাবন করা দরকার। তা হলেই আমরা 'চন্দ্রশেখরে'র সঙ্গে এর চরিত্রগত সাজাত্য ঠাহর করতে পারব।

'রাজসিংহে'ও 'চন্দ্রশেখরে'র মতোই যুগ্মকাহিনীর সমাবেশ। 'চন্দ্রশেখরে' মূল কাহিনী প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর-কথা। এখানে ইতিহাস গৌণ। উপকাহিনী দলনী-মীরকাসেম-কথা। এইখানেই ইতিহাস-সংসর্গ। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, 'রাজসিংহে'ও ইতিহাস-সংসর্গ উপকাহিনীতেই প্রবলতর কিন্তু ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত জটিল। কারণ, প্রথমেই খট্‌কা লাগবে, মূল কোনটা? 'রাজসিংহে' ঘটনার দিক থেকে হয়তো রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারী-আওরঙ্গজেব-কথাই মুখ্য। এই দিকটাতেই কাহিনীর বিস্তার। কিন্তু ভাবের দিক থেকে দেখলে, জেবউন্নিসা-মবারক-দরিয়া, এই দিকটাই মুখ্য। এইখানেই কাহিনী গভীরতা পেয়েছে। আর ইতিহাস-সংসর্গ? সে তো দুটিতেই পাওয়া যাবে। তবে প্রথমটিতে বেশি, দ্বিতীয়টিতে কম।

এ ভাবে দেখে সমাধান হবে না। দেখতে হবে সব মিলিয়ে। যুগল কাহিনীকে এক করে নিয়ে। সব মিলিয়ে দেখলে, 'চন্দ্রশেখরে' ইতিহাসের অধিকার যে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, গার্হস্থ্য-সমস্যার দাবিই যে প্রবলতর, এটা বুঝতে খুব কষ্ট হয় না। কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলেও, 'রাজসিংহে' ইতিহাসের দাবি কোথাও বিশেষ ক্ষীণ বলে অনুভব করা যায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকতার পরিমাণ নিরূপণ করলেই আমাদের প্রশ্নের নিঃসংশয় উত্তর মিলবে না। সমগ্রভাবেই দেখতে হবে বটে, কিন্তু ঐতিহাসিকতার মাত্রা নয়, ঐতিহাসিকতার চরিত্রই এখানে বড়ো কথা। শুধু এখানে নয়, সর্বত্রই। দেখতে হবে, যাকে ইতিহাস মনে করছি, তার ঐতিহাসিকতাটা কী জাতের, কতদূর গভীর। এবং—বলা বাহুল্য—কাহিনীতে তার ভূমিকা কী।

'রাজসিংহে'র কাহিনী-পরিণামে সত্যিই কি ঐতিহাসিকতার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ? যে কথা 'চন্দ্রশেখর' সম্বন্ধে অনায়াসে প্রয়োগ করা গিয়েছে, সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যাবে যে, প্রায় সেই কথাই, অনুরূপ কারণেই, 'রাজসিংহ' উপন্যাস সম্পর্কেও প্রযোজ্য। 'রাজসিংহে'ও শেষ পর্যন্ত প্রেমের দাবিই বড়ো হয়ে উঠেছে। 'রাজসিংহে'র ঐতিহাসিকতার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাঁর নিজের বিশ্বাসমতে এটিই তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, 'চন্দ্রশেখরে'র সঙ্গে এর পার্থক্য পরিমাণগত, গুণগত নয়। আখ্যানবস্তুর বিস্ময়কর গতি ও বিস্তার সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এটি এমন একটি নিভৃত প্রেমকাহিনী, ইতিহাস যাকে আলগোছে ছুঁয়ে আছে, ভিতরে প্রবেশ করে নি। শিল্পীর ধ্যানদৃষ্টিতে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। সে দৃষ্টি মানবহৃদয়ের যে বেদনার দিকে স্থির-নিবদ্ধ, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের অধিকারকে একটুও স্বীকৃতি দেন নি।

কাহিনীতে ঐতিহাসিকতার ভূমিকা, এটা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু যার গুরুত্ব আরো বেশি সে হল ঐতিহাসিকতার চরিত্র। 'রাজসিংহ' সম্পর্কে এইখানেই খট্‌কা।

এক দিকে ব্যক্তিজীবনে ইতিহাসের অধিকার, অন্য দিকে ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণে—ইতিহাসকে চালিত করায় ব্যক্তির ভূমিকা, মানুষের অস্তিত্বকে ঘিরে নিয়ত এই দুই বিপরীত শক্তির দ্বৈতলীলা। মানুষের জীবনে নিয়মের অমোঘতাও যেমন সত্য, মুক্তির রহস্যও তেমনি সত্য। নিয়ম আর মুক্তির এই যে দ্বৈততা,

এই ডায়লেক্‌টিক্‌সেই ঐতিহাসিক উপন্যাসের আসল সৌন্দর্য। 'রাজসিংহে' অন্য সৌন্দর্য অনেক আছে। কিন্তু ঠিক এই সৌন্দর্যটি নেই।

ঐতিহাসিক উপন্যাস কী অথবা কী নয়, সেই রহস্যের আসল চাবিকাঠি বোধ করি এইখানেই।

আমরা জানি, একদিন এপিকের মধ্যে দিয়ে জীবনের বিস্তারের দিকটা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হতে পেরেছিল। জীবনের সেই সরল ব্যাপ্তির দিন আজ আর নেই। জীবনের যেটা গভীরের দিক, তীক্ষ্ণতা আর তীব্রতার দিক, অথবা অন্ধকারের পথে তলিয়ে যাবার দিক, একলা-মানুষের নিঃসঙ্গতার দিক— জীবনের এই দিকটার প্রকাশ ঘটে কখনো কবিতায় নাটকে, কখনো উপন্যাসে ছোটগল্পে। যেখানে ব্যাপ্তি এবং গভীরতা মিলে যায়, যেখানে এক এবং অনেক, সঙ্গ এবং নিঃসঙ্গতা একটি অখণ্ড তাৎপর্যে বিধৃত হয়, ঐতিহাসিক উপন্যাস জীবনের সেই দিকটার সন্ধানী।

ভারতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত যে চিঠিতে রামমোহন রায় পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার সপক্ষে যুক্তি দেন তাতে কোথাও উল্লেখ নেই যে, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই সেই শিক্ষা দিতে হবে। অবশ্য সেই কথা স্পষ্ট করে বলার হয়তো দরকার বোধ করেন নি, কারণ আমাদের মাতৃভাষার তৎকালীন অবস্থায় তাকে আধুনিক জ্ঞান আহরণের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার প্রশ্ন হয়তো তখনো কারো মনে জাগে নি। তবে, এর থেকে একটা জিনিস প্রতিভাত হয় যে, যিনি আরবী ফারসী ইংরেজি সংস্কৃত গ্রীক্ ইত্যাদি নানা ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের জ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, তাঁর প্রধান দৃষ্টি ছিল জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপর, ভাষার উপর নয়। কিন্তু ইংরেজ শাসকের পক্ষে তখন দরকার ছিল একটি বিরাট বহুভাষাভাষী দেশকে সহজে সংহত করা, আর আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর পক্ষে দরকার ছিল শক্তিশালী শাসকের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারে যে-কোনো ভাবে প্রবেশ করে আধুনিক হওয়া এবং উপার্জনক্ষম হওয়া। কাজেই খুব সহজে আমরা ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মেনে নিয়েছি এবং এমনভাবে মেনে নিয়েছি যে, এখনো পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে (regional languages) উচ্চশিক্ষা-মাধ্যমের স্থান দিতে আমাদের দ্বিধা ও বাগ্‌বিতণ্ডার অন্ত নেই, আর যদিও বা আঞ্চলিক ভাষাকে সেই স্থান দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করি, সেই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে গিয়ে মনে হয়, এখনো সময় হয় নি— ইংরেজির মতো উৎকৃষ্ট ভাষাকে স্থানচ্যুত করার মতো পর্যায়ে কোনো ভারতীয় ভাষা এখনো পৌঁছয় নি। আগে উচ্চস্তরের পরিভাষা (terminology) তৈরি হোক্, তবে আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষা দান শুরু করব। এখনই তা শুরু করতে গেলে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে, শিক্ষার মান নেমে যাবে। এমন মতামতও শোনা যায় যে, উচ্চশিক্ষায় ইংরেজি ছাড়া চলবে না, অর্থাৎ স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষায় এবং 'popular' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের জন্য মাতৃভাষা, কিন্তু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি। এক সময় ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরাও ভাবতেন যে ইংরেজি যথার্থ উচ্চশিক্ষাদানের ভাষা নয়; ১৬২০ সালে ফ্রান্সিস্ বেকন্ তাঁর লাতিন্ ভাষায় লিখিত *Novum Organum* বইয়ে লেখেন যে, সবাই যখন আরো শিক্ষিত হবে তখন ইংরেজি ভাষা লুপ্ত হবে, অর্থাৎ তখন ভাববিনিময়ের ভাষা হবে লাতিন; অথচ সেই সময়েই ইংরেজের মার্কিনী উপনিবেশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষার বিস্তার শুরু হয় এবং আঠারো শতকের মধ্যে ইংরেজি একটি ইউরোপীয় ভাষা হিসাবে স্থান করে নেয়। অবশ্য 'আন্তর্জাতিক ভাষা'র ভূত যেতেও সময় লাগে; যেমন, দেখা যায় ১৭৯১ সালেও ইতালীয় বিজ্ঞানী Galvani তাঁর বৈদ্যুতিক আবিষ্কার বিষয়ে এবং ১৮২০ সালেও দিনেমার বিজ্ঞানী Oersted তাঁর তড়িৎ-চৌম্বক আবিষ্কার বিষয়ে লিখছেন লাতিন ভাষায়।

তবে আর যাই হোক্, ইংরেজি ভাষা তথা অন্য কোনো ইউরোপীয় ভাষা বা জাপানী ভাষা— পরিভাষা তৈরির অপেক্ষায় বসে থাকে নি। ষোলো শতকের মাঝামাঝি থেকে জাপানে যখন একে একে পোর্তুগীজ স্পেন্‌বাসী ও ওলন্দাজদের আগমন শুরু হয়, প্রায় তখন থেকেই পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষে

মুগ্ধ হয়ে জাপানী বুদ্ধিজীবীরা নিষ্ঠার সঙ্গে বিদেশীদের বই মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করেন; তাঁরা সরকারের মুখাপেক্ষী তো ছিলেনই না, বরং যখনই সরকার বিদেশীদের ভয়ে পাশ্চাত্যের বইপত্র আসা বন্ধ করেছেন, তখন সেই জ্ঞানপিপাসুদের দাবি ও সমালোচনার ফলে ঐ বাধা দূর হয়েছে। জ্যোতিষ, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, শরীরবিদ্যা, সব রকম বিষয়ের তথ্যপূর্ণ বিদেশী বই অনুবাদের মধ্য দিয়ে এবং মাতৃভাষায় মৌলিক লেখার মধ্য দিয়ে আধুনিক জাপানী ভাষার সৃষ্টি, যা বিশ্বের যে-কোনো গভীর ও জটিল বৈজ্ঞানিক আলোচনা করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। পরিভাষা উদ্ভাবিত হয়েছে স্বাভাবিকভাবে, বক্তব্যবিষয়কে বোধগম্য করার প্রয়োজনে।

অবশ্য এই কথার মানে এই নয় যে, সুপরিকল্পিত সর্বজনগ্রাহ্য (standard) পরিভাষা সৃষ্টির কোনো দরকার নেই। প্রথমতঃ একটি বিদেশী শব্দের জন্য বিভিন্ন লেখকের উদ্ভাবিত বিভিন্ন দেশী শব্দ থেকে একটিকে standard শব্দ হিসাবে বেছে দেওয়া দরকার আছে; দ্বিতীয়তঃ বিদ্বান লেখকেরা অনেক ক্ষেত্রেই শব্দ উদ্ভাবন করতে বিফল হবেন। কাজেই শব্দ নির্বাচন ও উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানী ও ভাষাতাত্ত্বিকের মধ্যে সংগঠিত সহযোগিতার দরকার। কিন্তু শব্দ বা term সৃষ্টির জন্য অত্যধিক চিন্তা ও সূক্ষ্মবিচার যে কি আকার ধারণ করতে পারে, তার একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চীন দেশে ১০৯২ সালে সুসুং নামক জনৈক ব্যক্তি একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, তিনি সেইটিকে তদানীন্তন সম্রাটকে উৎসর্গ করে বলেন— তিন রকম যন্ত্রের সংযোগে এই অপূর্ব যন্ত্র তৈরি, অতএব আপনি অনুগ্রহ করে এইটির এমন একটি নাম দিন যাতে তিনটি যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈশিষ্ট্য ঐ নামের দ্বারা সূচিত হতে পারে। তার নাম আর দেওয়া হয় নি, পরের যুগের লোকে তার অস্তিত্বও ভুলে গেল, কিন্তু যন্ত্রটি ছিল একটি স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি। অথচ সতেরো শতকে যখন নবাগত জেসুইটরা তাদের সঙ্গে আধুনিক ঘড়ি আনল, তখন চীনে ভাষায় তার নাম হল 'ৎসু-মিং-চুং' বা স্বতঃশব্দায়মান ঘণ্টা (clock বা তৎজাতীয় ইউরোপীয় শব্দের আদি অর্থ ঘণ্টা)— যেন দেশে একটা সম্পূর্ণ নূতন যন্ত্র এল! বর্তমান যুগের একটি জটিল ক্রিয়াশীল যন্ত্রের অতি সহজ নামের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে ইলেকট্রনিক্‌সে— যথা tube বা valve; এই বিষয়ে পরে আলোচনা করেছি।

পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষণীয় বিষয়কে শিক্ষার্থীর অন্তরে সহজে প্রবেশ করানো, অর্থাৎ মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচিন্তার পথ সুগম করা। কিন্তু তার আগে একটা ধাপ আছে। যখন জাতীয় শিক্ষার মূল ও আশু প্রয়োজন হচ্ছে সফলভাবে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি শেখানো, তখন একটি সম্পূর্ণ পারিভাষিক শব্দকোষ তৈরি হবার অপেক্ষা না করেও তা শুরু করা যায়।

উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু আমাদের এম. এস-সি. ক্লাসে আপেক্ষিকতা বা relativity পড়িয়েছিলেন বাংলায়, কিন্তু তাই বলে তিনি interference, charge, charged প্রভৃতি সব বিদেশী বিশেষ্য বিশেষণকে বাংলা করে বলার চেষ্টা করেন নি, যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকলিত পরিভাষায় এই অনূদিত শব্দগুলি তালিকাভুক্ত হয়েছে আগেই। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই কঠিন বিষয়টিকে বাঙালি ছাত্রের কাছে সহজে বোধগম্য করা। বস্তুত যে-ছাত্ররা অমিশ্র ইংরেজি বক্তৃতায় কখনো কখনো অসুবিধা বোধ করত, তারা বিদেশী শব্দমিশ্রিত বাংলা বক্তৃতা সহজে বুঝেছিল। পরে কলেজে পদার্থবিদ্যা পড়ানোর সময় আমারও এই ধরণের অভিজ্ঞতা হয়। ইংরেজি বক্তৃতার মধ্যে মধ্যে ছাত্ররা ব্যাখ্যা চাইত বাংলা বাক্যে (sentence), বাংলা পারিভাষিক শব্দে (terms) নয়, বরং

অনূদিত পারিভাষিক শব্দগুলি উটকোভাবে ব্যবহার করলে তাদের অসুবিধাই হত। এর থেকে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা ইংরেজি জানি বলে প্রকাশ্যে বা মনে মনে যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করি না কেন, আমরা কখনো ইংরেজিতে চিন্তা করি না, আমরা চিন্তা করি মাতৃভাষাতেই, কিন্তু মাঝে মাঝে নির্ভর করি ইংরেজি শব্দ বা শব্দপুঞ্জের খুঁটির উপর। বিষয়বস্তুকে হৃদয়ঙ্গম করাটাই যখন মূল উদ্দেশ্য, তখন ইংরেজি থেকে পুরো মাতৃভাষায় আসার আগে এই মধ্যবর্তী ধাপটাকে মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তরে অথবা বৈজ্ঞানিক অনুবাদে বাংলা বাক্যের মধ্যে বিদেশী শব্দ বা শব্দপুঞ্জের মিশ্রণ সাময়িক ভাবে মেনে নেওয়া যায়— এখানে কোনো গোঁড়ামির স্থান নেই। Philosophy of Physical Science থেকে একটি উদ্‌ধৃতাংশ পড়লে ধারণা করা যাবে যে, পারিভাষিক শব্দ বা technical termsই একমাত্র সমস্যা নয়— "The concept of identical structural units is implicit in the relativity outlook.· · It is the habit of thought which regards variety always as a challenge to further analysis, so that the *ultimate* end-product of analysis can only be sameness. We keep on modifying our system of analysis until it is such as to yield the sameness which we insist on.··· The sameness of the ultimate entities of the physical universe is a foreseeable consequence of forcing our knowledge into the form of thought."

এখানে কোনোরকম technical শব্দ না থাকা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুটি ছাত্রের কাছে দুর্বোধ্য হতে পারে ইংরেজি ভাষার জন্যেই, এবং আপাতভাবে খুব সাধারণ শব্দবিন্যাসকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করতে গিয়েও বেগ পেতে হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে, বলা বাহুল্য, অনুবাদের বদলে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা দরকার। কাজেই বিদেশী বই অনুবাদ করার সময় অনুবাদকের কাছে সেই বিচারবোধ আশা করা হবে নিশ্চয়, কারণ অনুবাদক হবেন অনূদিত বিষয়বস্তুতে বিদগ্ধ কোনো ব্যক্তি।

যাঁরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে আগামী এক দশকের মধ্যে বিজ্ঞানী ও এন্‌জিনীয়ার হতে যাচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ভাষাসমস্যা কি ধরণের হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেছি উপরের অনুচ্ছেদে। এর পরই প্রশ্ন ওঠে পারিভাষিক শব্দ উদ্ভাবনের প্রয়োজন ও পদ্ধতি বিষয়ে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে অনেক দিন থেকেই এবং দেশী পরিভাষার সপক্ষে[১] বেশির ভাগ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে স্কুল শিক্ষাকেই কেন্দ্র করে, কারণ সুপরিকল্পিত পরিভাষা সৃষ্টি হলে যে মাধ্যমে স্কুলের ছাত্রদের বিজ্ঞানচর্চার প্রথম বুনিয়াদ তৈরি হবে, সেই মাধ্যমেই তারা উচ্চশিক্ষা পাবে এবং সেই মাধ্যম দেশী বিদেশী শব্দ ও শব্দপুঞ্জের যথেচ্ছ মিশ্রণ নয়— তা হবে যথার্থ বিজ্ঞানচর্চার যোগ্য একটি সুষ্ঠু ভাষা। অবশ্য যতদিন না দেশের বিজ্ঞানীরা উন্নত ভাষাগুলি থেকে গভীর তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ বই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুবাদ শুরু করবেন এবং সাহসের সঙ্গে গভীর ও জটিল বিষয়বস্তুর উপর মাতৃভাষায় মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হবেন, ততদিন

---

১ দ্র°: University Education Commisionএর রিপোর্ট (১৯৪৮-৪৯) এবং Conspectus of Principles Underlying the Preparation of Scientific Terminology (Ministry of Education, Govt. of India, 1959.) এবং সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী Dr. D. S. Kothariর *The Problems of Scientific and Technical Terminology in Indian Languages*.

আমাদের বিজ্ঞানচর্চার ভাষা স্কুলশিক্ষা ও তথাকথিত 'popular' রচনার স্তরেই থেকে যাবে। অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়নের ভিতর দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের সহযোগিতায় সচেতন ভাবে একটি সর্বজনগ্রাহ্য ও বিজ্ঞানসাধনার উপযোগী পরিভাষা তৈরি হবে।

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, সব আঞ্চলিক ভাষাই বিভিন্ন অঞ্চলগুলির স্ব স্ব মাতৃভাষা, কাজেই ভারতের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের Central Hindi Directorate ১৯৬২তে যে ইংরেজি-হিন্দি 'পারিভাষিক শব্দ-সংগ্রহ' প্রকাশ করেছেন, তাতে ভারতের ভিন্ন ভাষাভাষী বিজ্ঞানী ও ভাষাতাত্ত্বিকরা সহযোগিতা করেছেন একটি যথাসম্ভব নিখিলভারতীয় পরিভাষা উদ্ভাবন করার জন্য। কিন্তু একটা নিখিলভারতীয় পরিভাষা সৃষ্টি এবং ভিন্নভাষাভাষী অঞ্চলে স্ব স্ব আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের ভিতর কোনো বিরোধ আছে বলে মনে হয় না।

দেশী পরিভাষা তৈরির প্রয়োজন ও পদ্ধতি আলোচনার্থে উদাহরণের আশ্রয় নিতে হবে। পরিভাষা উদ্ভাবনে যেমন নির্বিচারে সব বিদেশী শব্দকেই অননূদিত রাখা অর্থহীন, তেমনি সব বিদেশী শব্দকেই মাতৃভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টাও সমান অর্থহীন। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে 'আন্তর্জাতিক শব্দে'র। ভারত-শিক্ষামন্ত্রণালয়ের পরিভাষা-পরিষদের সংজ্ঞা অনুযায়ী যে শব্দটির রূপ তিনটি ইউরোপীয় ভাষায় প্রায় একইরকম, সেই শব্দটি আন্তর্জাতিক। যেমন ইংরেজি শব্দ calorimetryর প্রতিশব্দ ফরাসীতে calorimetrie, ইতালীয়তে calorimetria, জার্মানে Kalorimetrie, রুশে kalorimetriya ইত্যাদি। এই প্রকার শব্দ আমাদের ভাষায় সহজেই নেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের লিপিতে লেখার সময় 'কালোরিমেট্রি' লেখা উচিত, ইংরেজি উচ্চারণ 'ক্যালোরিমেট্রি' নকল করার দরকার নেই, কারণ ইংরেজি ছাড়া আর যে-কোনো ভাষায় এর উচ্চারণ 'কালোরিমেট্রি', অবশ্য আমরা রোমান্ লিপি গ্রহণ করলে লিখব kalorimetri, যেমন করেছে তুর্কী বা ইন্দোনেশিয়া। উচ্চারণ ও লিপ্যন্তর (trans-literation) বিষয়ে পরে আলোচনা করেছি। যখন আমরা calorimeter ও thermometer শব্দ নিচ্ছি, তখন আমরা সচেতন নই যে, লাতিন্ শব্দ calor এবং গ্রীক্ শব্দ thermeর অর্থ 'তাপ' (heat)। পুরো শব্দগুলির বর্তমান বৈজ্ঞানিক অর্থের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। কিন্তু যে বাস্তব সত্তা-গুলিকে মাপার জন্য ঐ যন্ত্রগুলি তৈরি, সেই সত্তাগুলির নাম দেবার জন্য আন্তর্জাতিক বা ইংরেজি শব্দের আশ্রয় নেবার প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের সাহিত্যের ভাষাতেও 'তাপ' ও 'উষ্মা'র পার্থক্য সুবিদিত; প্রথমটি heat, দ্বিতীয়টি hotness অর্থাৎ প্রথমটি কারণ (cause) দ্বিতীয়টি ফল (effect)। উষ্মাই (বা উষ্ণতা) হচ্ছে temperature বা hotnessএর সংখ্যামূলক পরিমাপ। 'তাপ' না থাকলে 'উষ্মা'র প্রশ্ন ওঠে না। এমনকি 'উষ্মা'র যে আর-এক অর্থ 'ক্রোধ', তা উদ্রিক্ত হবার জন্যও একটা কারণ দরকার, অর্থাৎ একটা ক্রোধ-উদ্রেককারী ঘটনার দরকার। আমাদের সাধারণ ভাষাজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে উষ্মা ও তাপের কার্যকারণ সম্পর্ক এত স্পষ্ট যে, এই ধরণের পারিভাষিক শব্দগুলি শিখতে বিশেষ কোনো চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু হিন্দি পারিভাষিক শব্দসংগ্রহে কেন যে heatকে 'উষ্মা', এবং temperatureকে 'তাপ' অনুবাদ করে কার্যকারণ সম্পর্ক উল্টে দেওয়া হয়েছে, তার যৌক্তিকতা বোঝা যায় না।

শব্দ-উদ্ভাবনের সময়ে একটা বিশেষ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা দরকার; ভাষাতাত্ত্বিক দিক দিয়ে

পারিভাষিক শব্দ হয়তো ত্রুটিহীন ও সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু আরো বেশি প্রয়োজন হল এমন শব্দ উদ্ভাবন করা, যাতে সেইগুলি আমাদের সহজবোধগম্য হয়, অর্থাৎ সেইগুলি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য যাতে অতিরিক্ত ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োজন না হয়। উদাহরণ দেওয়া যাক্— centrifugal ও centripetal শব্দ তৈরি হয়েছে লাতিন শব্দ থেকে— centrum— কেন্দ্র, fugere— পলায়ন করা, petere— অন্বেষণ করা; অনুবাদ করা হয়েছে যথাক্রমে 'অপকেন্দ্রী' ও 'অভিকেন্দ্রী'; অর্থাৎ শব্দগুলিকে পরিপাক করতে হলে সবসময় সচেতন থাকা দরকার, কোন্ কোন্ উপসর্গ কোন্ কোন্ অর্থসূচক; কিন্তু তার পরিবর্তে যদি বলি 'কেন্দ্রবিমুখ' ও 'কেন্দ্রোন্মুখ', তবে আমরা অবিলম্বে অর্থ বুঝতে পারব, কারণ মোটামুটি শিক্ষিত মনের কাছে 'বিমুখ' ও 'উন্মুখ' শব্দগুলিই যথেষ্ট অর্থপূর্ণ। তেমনি perihelion ও aphelionকে 'অনুসূর' ও 'অপসূর' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংকলিত পরিভাষায়) না করে 'রবিসন্নিধি' (বা 'রবিনৈকট্য') ও 'রবিদূরতা' করলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রতি হয়তো একটু অন্যায় হতে পারে, কিন্তু ছাত্রের সহজবোধশক্তির প্রতি ন্যায় করা হবে; বস্তুতঃ এইগুলির জার্মান প্রতিশব্দ যথাক্রমে Sonnennaehe ও Sonnenferne; Sonne মানে সূর্য, Naehe মানে সন্নিধি, Ferne— দূরতা। যে জার্মান ছেলের সাধারণ ভাষাজ্ঞান হয়েছে, সে সহজেই শব্দগুলির মানে বুঝবে। অবশ্য ইংলণ্ডে জার্মানীতে বা জাপানে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা স্বাভাবিকভাবে উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং পরিভাষা সৃষ্টি বিষয়ে কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু আমাদের পরিভাষা যখন কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সুপরিকল্পিতভাবেই তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, তখন সব দেশের পারিভাষিক সমস্যা ও সুবিধা-অসুবিধাগুলিকে তুলনামূলকভাবে বিচার করে সহজবোধ্য শব্দ উদ্ভাবন করাই বাঞ্ছনীয়। পারিভাষিক শব্দ সহজবোধ্য হওয়ার প্রয়োজনটাই মুখ্য, সব সময়ে তা ব্যাকরণ-অনুমোদিত বা শ্রুতিমধুর নাও হতে পারে। তবে, শব্দ যদি সহজবোধ্য হয়, মানের দিক থেকে ত্রুটিহীন হয় এবং একই সঙ্গে শ্রুতিমধুরও হয়, তা হলে তা আদর্শ উদ্ভাবন।

সংস্কৃতমূলক পারিভাষিক শব্দ তৈরি বিষয়ে কিছু মন্তব্যের প্রয়োজন। বর্তমান যুগেও ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় নূতন বৈজ্ঞানিক শব্দ তৈরি করতে গেলে প্রায়ই লাতিন ও গ্রীক ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়, শব্দসৃষ্টির ভাষাগত সুবিধার জন্য; যেমন "representing the earth as centre" এবং "originating in the lever" বিশেষণগুলির জন্য geocentric ও hepatogenous শব্দগুলিকে সহজে ব্যবহার করা যায়। তেমনি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক শব্দ তৈরি করতে গেলে আমরা সংস্কৃতের আশ্রয় নিই সেই সুবিধার জন্য, যথা— 'ভূকেন্দ্রী' (geocentric) বললে অনেকখানি কথা সংক্ষেপে বলা হয়ে যায়। সংস্কৃত যে অপরিহার্য তা বোঝা যাবে Monier-Williamsএর কয়েকটি মন্তব্য থেকে। প্রথমতঃ ইউরোপের বর্তমান ভাষাগুলির উপর গ্রীক ও লাতিনের যে প্রভাব, তার চাইতে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার উপর "সংস্কৃতের প্রভাব অনেক বেশি"। দ্বিতীয়তঃ "· · no vernacular tongue (অর্থাৎ, আঞ্চলিক ভাষা) is adequate to express the ideas of · · science without borrowing its terms from the Sanskrit"। তৃতীয়তঃ যেসব ক্ষেত্রে বিদেশী শব্দের কোনোরকম দেশী প্রতিশব্দ নেই, সেসব ক্ষেত্রেও নূতন শব্দসৃষ্টি করা যায় সংস্কৃত ভাষার একটি গুণের জন্য, তা হল তার "· · pliancy · · and its amazing power of

expressing exotic ideas by the employment of an infinite variety of compound words."

কিন্তু একই সঙ্গে বলা দরকার যে, সংস্কৃতের উপর অতিনির্ভরশীল হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ এর ফলে আরবী ফারসী শব্দ গ্রহণ করা বিষয়ে একটা উন্নাসিক মনোবৃত্তি দেখা দেয়। যেমন brain ও digestionএর প্রতিশব্দ 'মস্তিষ্ক' ও 'পরিপাক' (বা 'পাচন') না হলেই চলবে না— আমরা 'মগজ' ও 'হজম' হরদম ব্যবহার করতে রাজী আছি, কিন্তু গুরুগম্ভীর বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ব্যবহার করতে নারাজ। অথচ আরবী ফারসী পোর্তুগীজ ইংরেজি শব্দকে আত্মীকরণ করে এবং চলিত ভাষাকে লিখিত ভাষার স্থান দিয়ে বাংলাভাষা তথা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা সচল ও জীবন্ত হয়েছে, এবং সেই সজীবতা বজায় রাখতে হলে সংস্কৃত-ঘেঁষা নাক-উঁচু ভাব ত্যাগ করতে হবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। Eddington তাঁর *The Expanding Universe* বইএ এক জায়গায় বলেছেন : বিশ্বটা ঠিক নিটোল গোল নয়, কারণ যেখানে যেখানে নক্ষত্রনীড় বা galaxies রয়েছে, অর্থাৎ বস্তুর সমাবেশ বেশি হয়েছে, সেখানে সেখানে "curvature of space" বেশি, কাজেই সেসব জায়গাগুলো যেন ফুলে ফুলে গিয়ে ফুস্‌কুড়ির (pimples) মতো হয়ে গেছে, অতএব বিশ্বটা যেন একটা "pimply sphere"। এখানে তিনি কোনো গালভরা গ্রীক বা লাতিন ভাষাজ শব্দ দেবার চেষ্টা করেন নি। আমরা যদি বাংলা অনুবাদে 'ফুসকুড়িভর্তি গোলক' লিখি, তবে গম্ভীর শুচিতাবাদীদের (purist) রুচিতে বাধবে, 'ব্রণখচিত বর্তুল' বললে তাঁরা হয়তো খুশি হবেন। আমরা যদি মনে করি, বক্তব্যবিষয় জটিল ও গভীর হলে তাকে প্রকাশের ভাষাও অতিমার্জিত এবং সম্পূর্ণ সংস্কৃতনির্ভরশীল হতে হবে, তবে সেই ভাষা কখনো একটা সজীব বৈজ্ঞানিক ভাষা হয়ে উঠবে না। এসব ক্ষেত্রে প্রত্যেক আঞ্চলিক ভাষার ব্যাখ্যাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য (genius) প্রকাশ পাওয়া বাঞ্ছনীয়।

যাঁদের আবার ইংরেজি শব্দের দেশী প্রতিশব্দ বিষয়ে নাক-সিঁটকানো ভাব, তাঁদেরও মনোবৃত্তির বদল দরকার। যেমন রেডিয়োর valveকে মার্কিনীরা বলে 'tube', ইংরেজরা বলে 'valve' এবং আমরা এই শব্দগুলির ব্যবহার করি। প্রথম শব্দটির অর্থ নিছক 'নল' যেমন Crookes' tube এবং দ্বিতীয় শব্দটি তৈরি হয়েছে সাধারণ mechanical valve বা 'কপাটিকা'র একমুখী ক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করে, অর্থাৎ যেমন জল বা বায়ু সাধারণ কপাটিকার ভিতর দিয়ে একটা দিকেই যেতে পারে, উল্টো দিকে ফিরতে পারে না, তেমনি electronic valveএ ইলেকট্রন্ শুধু একটা দিকেই প্রবাহিত হতে পারে একটা বিশেষ অবস্থায়, এবং সেই অবস্থাটাকে উল্টো করে দিলে ইলেক্‌ট্রন্-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য electronic valveএর জটিলতর ক্রিয়া বর্ণনার পক্ষে এই শব্দগুলি যথেষ্ট নয় ; নল বা কপাটিকার সঙ্গে এর মিল সম্পূর্ণ বাহ্যিক, কিন্তু সহজ দুটি শব্দ দিয়ে এর একটা নাম রাখা হয়েছে। জার্মান ভাষায়ও এর সোজা অনুবাদ করা হয়েছে Roehre অর্থাৎ 'নল'। কিন্তু যদি আমাদের ভাষায় এর সোজা অনুবাদ করা হয় 'নল' তবে নিঃসন্দেহে হাসির রোল উঠবে।

এ পর্যন্ত যা আলোচিত হয়েছে, তার থেকে একটা কথা বোঝা যাচ্ছে যে, পারিভাষিক শব্দ তৈরি করতে গিয়ে স্বদেশভক্তি বা বিদেশভক্তির আতিশয্য না করে বিচার করা দরকার কোন্ কোন্ আন্তর্জাতিক বা ইংরেজি শব্দকে আমাদের ভাষায় ১. নেওয়া দরকার, ২. নেওয়া দরকার নেই এবং ৩. নিলে সুবিধা

হয়। এ বিষয়ে অবশ্যই মতদ্বৈধ হবে নানাপ্রকারে। তবে কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যায়। সমাজবিজ্ঞানে bourgeois ও proletariat শব্দগুলি প্রথম গোত্রীয়; রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত প্রতিশব্দ 'পরশ্রমভোগী' ও 'পরার্থশ্রমী' খুব অর্থপূর্ণ, কিন্তু সামন্ততন্ত্র বা ধনিকতন্ত্র যে-কোনো প্রকার শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অথচ bourgeois ও proletariat শব্দগুলি শুধুমাত্র একটি বিশেষ রকমের সমাজব্যবস্থার (অর্থাৎ ধনিকতন্ত্র বা পুঁজিবাদ) সঙ্গে যুক্ত, কাজেই উল্লিখিত প্রতিশব্দগুলিকে সমাজবৈজ্ঞানিক পরিভাষা করা চলে না, ঠিক যেমন 'শোষক' ও 'শোষিত' শব্দগুলি কোনো বিশেষ এক ধরণের সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 'পুঁজিবাদী অর্থনীতি' bourgeois বা capitalist economyর অর্থপূর্ণ অনুবাদ। কিন্তু bourgeois intellectualএর অনুবাদ 'পুঁজিবাদী বুদ্ধিজীবী' হাস্যকর, কারণ এই বিদেশী শব্দসমষ্টির মানে হচ্ছে যে, সেই বুদ্ধিজীবীর চিন্তাধারার গণ্ডি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বেষ্টনীর দ্বারা সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাই বলে যে তিনি সচেতনভাবে পুঁজিবাদী শাসনের উৎসাহী সমর্থক তা মনে করার কারণ নেই, অথচ অনুবাদটির অর্থ সেই রকমই দাঁড়ায়। Capitalist অর্থে 'পুঁজিবাদী' ভালো প্রতিশব্দ, কিন্তু তার চাইতে সূক্ষ্মতর অর্থে প্রতিশব্দটি অচল, যেমন capitalist intellectual অচল। কাজেই যেসব ক্ষেত্রে অনুবাদ করতে গিয়ে সূক্ষ্ম অর্থটা বোঝানো যায় না, সে ক্ষেত্রে বিদেশী শব্দ গ্রহণীয়। কারণ অনেক দিনের সূক্ষ্ম গভীর ও উচ্চপর্যায়ের জ্ঞান আলোচনার ফলে এক-একটি বিদেশী শব্দ নানা অর্থমাত্রা বা shade লাভ করেছে, তা মানতেই হবে। বিপক্ষে বলা যায় যে, শব্দ যখন বস্তু বা ভাবের প্রতীকমাত্র তখন যে-কোনো দেশী শব্দ সক্রিয় জ্ঞানচর্চার ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন অর্থমাত্রা লাভ করবে; কথাটা সত্য; কিন্তু সে ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ প্রতিশব্দ উদ্ভাবনের চেষ্টাই নিরর্থক এবং সময়ের অপব্যয়। দ্বিতীয় গোত্রীয় শব্দ বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে, যেমন উষ্মা, তাপ ইত্যাদি। তৃতীয় গোত্রীয় শব্দাবলী হচ্ছে পূর্বালোচিত thermometer, calorimeter, oxygen, galvanometer, ইত্যাদি। Thermometerকে 'উষ্মামাপক' বা calorimeterকে 'তাপমাপক' অনুবাদ করা যেত সহজেই, কিন্তু না করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ বিদেশী বই থেকে জ্ঞানাহরণের জন্য আমরা যদি ইংরেজি জার্মান ফরাসী বা রুশ শিখি, তবে 'তাপে'র জন্য ইংরেজিতে পাব heat, জার্মানে Waerme, ফরাসীতে chaleur, রুশে teplo, কিন্তু তাপ মাপার যন্ত্রের নাম সবগুলি ভাষাতেই পাব 'ক্যালোরিমিটর্'। অতএব, এসব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমতা রক্ষা করাই ভালো। রাসায়নিক শব্দ oxygenএর আক্ষরিক অনুবাদ 'অম্লজান' (গ্রীক ভাষায় oxys—ঝাঁঝালো অর্থাৎ অম্ল, gennaō—উৎপাদন করা) এবং শব্দটি হয়তো সহজবোধ্য, কিন্তু রুশ বা জার্মান ভাষায় oxygenকে প্রায় আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করে (জার্মানে Sauerstoff ও রুশে kislorod: অর্থাৎ, যে বস্তু অম্লতা উৎপাদন করে) যে বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তি এই শব্দের মধ্যে থেকে গেছে, ঠিক সেই ভ্রান্তিই আছে 'অম্লজানে'র মধ্যে, কারণ Lavoisierএর ভুল ধারণা ছিল যে, এই গ্যাস অধাতু-জাতীয় পদার্থের সঙ্গে মিলে অম্ল বা acid উৎপন্ন করে, এবং সেই ধারণা থেকেই তিনি ঐ গ্যাসের নাম দেন 'অক্সিজেন'। কাজেই এটাকে আবার 'অম্লজান' অনুবাদ করে ভুলের বোঝা না বাড়িয়ে 'অক্সিজেন্' শব্দটাকে একটা নিছক প্রতীক হিসাবে নেওয়াই ভালো। বর্তমানে অবশ্য অম্লজান উদজান শোরাজান নামগুলি চালু করার প্রচেষ্টা ছেড়ে অক্সিজেন্ হাইড্রোজেন্ নাইট্রোজেন্ই বলা হয়। এক কথায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ প্রতিশব্দ তৈরি না করে আদি নামটিকে শব্দপ্রতীক হিসাবে নিলে দোষ নেই।

আমার বক্তব্য শেষ করব লিপ্যন্তরের (transliteration) বিষয়ে একটি মন্তব্য করে। বিদেশী নামের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই উচিত পাশে পাশে বন্ধনীর (brackets) ভিতরে রোমান্ লিপিতে বানান্ দেওয়া, যাতে ইউরোপীয় ভাষার বই, জ্ঞানকোষ ও পত্রিকা পড়তে অসুবিধা না হয়, যেমন টলেমি (Ptolemy), উস্টার্ (Worcester), দালাঁবের (D'Alembert), ইত্যাদি। রুশ ভাষার Cyrillic অক্ষরে লিপ্যন্তরিত বিদেশী নামের আসল বানান উদ্ধার করা একটা সমস্যা, যেমন Nicolet, Debye, Rayleighর রুশ লিপ্যন্তরকে ফের্ রোমান্ লিপিতে লিখলে দাঁড়ায় Nikole, Debai, Rele ; অর্থাৎ বিদেশী জ্ঞানকোষ (encyclopaedia) ও বইয়ে আসল নামগুলি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অবশ্য আজকাল কোনো কোনো রুশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে বন্ধনীর মধ্যে রোমান লিপিতে আসল বানান লেখা হয়।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার নানা সমস্যা ও নানা সমাধান। কিন্তু সব প্রচেষ্টার উৎস একটা জায়গায় —সেটা হল স্বদেশপ্রীতি। ইংরেজ রুশ বা জাপানী, সবাই বিশ্বের জ্ঞানকে নিষ্ঠার সঙ্গে আহরণ করতে সচেষ্ট এবং অর্জিত জ্ঞানকে বিতরণ করতেও প্রস্তুত, কিন্তু তাঁরা কেউই নিজ নিজ দেশের প্রয়োজন বিষয়ে উদাসীন নন, বরং তাঁদের স্বদেশপ্রীতিই তাঁদের কর্মোদ্যমের প্রধান প্রেরণা। যেখানে সেই প্রেরণা প্রবল নয়, সেখানেই সমাধান খোঁজায় দীর্ঘসূত্রতা। মনে আছে, এক জাপানী গবেষক আলোচনাসূত্রে বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, "আপনারা একটা বিদেশী ভাষা শেখার জন্য এত সময় অপব্যয় করেন!" তাঁরাও বিদেশী ভাষা শেখেন, কিন্তু তাতে তাঁদের মগ্ন হবার সময় নেই, দরকারও নেই। তাঁদের দরকার দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করে তোলা, এবং তাঁরা বুঝেছেন যে, তা সম্ভব হতে পারে, যদি প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাকে একটা অখণ্ডসূত্র হিসাবে দেখা হয়। তাঁরা সেই অখণ্ডতাকে উপলব্ধি করেছেন বলেই দৈনন্দিন ভাববিনিময়ের ভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। —১২৮৯ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শন' থেকে একটি উদ্‌ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করি: "· · দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্তিত হয়। ধাতু পরিবর্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।"

সৌন্দর্যদর্শনের তিন রূপ

রথীন্দ্রনাথ রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলাসাহিত্যে যে গভীর পরিবর্তন দেখা দিল, তার বহিরঙ্গবৈচিত্র্য ও প্রসাধনকলার অভিনবত্ব নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। মধ্যযুগীয় গতানুগতিক চিন্তাধারার অনিবার্য বাহন হয়েছিল বৈচিত্র্যহীন পয়ার ও লাচারী ছন্দ। কিন্তু নবযুগের বাংলাসাহিত্যের বহিরঙ্গবৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য হলেও সবচেয়ে বড় লক্ষণ কাব্যসংস্কার ও রসরুচির আমূল পরিবর্তন। অন্তর্মুখী কবিচেতনার সূক্ষ্ম সংবেদন জগৎ ও জীবনের উপর যে রহস্যময় ছায়াপাত করেছিল, তারই অভিব্যক্তি ঘটেছিল বাঙালি-জীবনের সারস্বতসাধনায়। বহিরাশ্রয়ী জীবন শিল্পীমনের বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়ে দেখা দিল। বিষয় যাই হোক-না কেন, আত্মনিষ্ঠ কবিভাবনাই হল তার নিয়ামক। এ যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরা যে কাব্যরচনা করলেন, তার বিষয়বস্তু হল কবির নিজের হৃদয়। অন্তর্মুখী রোমান্টিক কবিকল্পনার অর্থবহ তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার ফলে যে মানসিক বিপ্লব ঘটল, তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি এ যুগের কবিকীর্তি। নবযুগের এই বিচিত্র কবিকীর্তির মূলে যে পাশ্চাত্য সাহিত্য অনেকখানি কার্যকরী হয়েছিল, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

রোমান্টিক কবিরা প্রকৃতি ও নারীর মধ্যে অভিনব তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন। মধ্যযুগের বাংলা-কাব্যে প্রকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পটভূমিকা মাত্র। কিছু বৈষ্ণব-কবিতা ও লোকগীতিকা বাদ দিলে এ যুগের বাংলাকাব্য মানবহৃদয়ের উত্তপ্ত স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে নি। নারী-চরিত্র সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা চলে। মঙ্গলকাব্যের নারীচরিত্রগুলি সমাজবন্ধনের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। বৈষ্ণবকাব্যের রাধা কবিকল্পনার অসাধারণ সৃষ্টি। কিন্তু বৈষ্ণব মহাজনেরা তত্ত্বদর্শনের আলোকে তাকে দিব্যরূপিণী করে তুলেছেন। নবযুগের বাংলাসাহিত্যে নারীরূপের আর-এক রহস্য উন্মোচিত হল। এ নারী কোনো সামাজিক সম্পর্কের অতিনির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে ধরা দেয় না। সর্ববন্ধনমুক্ত মানসসুন্দরীর সৌন্দর্য অনুধ্যান এই যুগের রোমান্টিক সৌন্দর্যপিপাসার অন্যতম প্রধান অবলম্বন।

সৃষ্টিধর্মী কবিকল্পনাকে (Creative Imagination) রোমান্টিক কবিরা অভিনব তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন। কবি ব্লেকের একটি স্বীকারোক্তির মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা থাকলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

> This world of Imagination is the World of Eternity; it is the divine bosom into which we shall all go after the death of the vegetated body. This world of Imagination is infinite and Eternal, whereas the World of Generation, or Vegetation, is Infinite and Temporal.[১]

১ *A Vision of the Last Judgment in Poetry and Prose of William Blake*, ed. by Geoffery Keynes. Vol I, 1939, p 639

উনবিংশ শতাব্দী বাঙালির চিত্তমুক্তির পরমলগ্ন। পশ্চিমসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ শৈবালস্তম্ভিত বদ্ধ জলাভূমির মধ্যে এনেছিল অভিনব শিহরন। এই যুগের সামাজিক আন্দোলনের একটি বিরাট অংশই নারীসম্পর্কিত। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশে ও চিত্তমুক্তির উদ্‌বোধনে এই আন্দোলনগুলি হল প্রত্যক্ষ সামাজিক কারণ। সামাজিক বন্ধনের মধ্যে ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যাদের দেখতে অভ্যস্ত, তাদের মধ্যে কবিরা আবিষ্কার করলেন এক দুরধিগম্য রহস্য। এ যুগের কবিরা যেমন নারীমহিমা সম্পর্কে সচেতন হলেন, তেমনি সমাজসত্তার ঊর্ধ্বে নারীকে প্রতিষ্ঠিত করলেন বিশ্বসৌন্দর্য ও সূক্ষ্ম প্রেমানুভূতির বৃহত্তর পটভূমিতে। নারীকে ঘিরে এই যুগের বাঙালি কবিদের আত্মচৈতন্যের তিনটি বিশিষ্ট রূপ লক্ষ্য করা যায়: সৌন্দর্যানুভূতি প্রেমানুভূতি ও সর্বব্ধর প্রকৃতিচেতনা। বন্ধনমুক্ত নারীসত্তার উপলব্ধি ও আবিষ্কার উনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনার কাব্যসংস্কারের একটি নিগূঢ় উপলব্ধি। নারী-ব্যক্তিত্বের এই বিচিত্র উন্মোচনে বাঙালিচিত্তের সর্বপ্রথম স্বাধীনচারী রোমান্টিক দূরাভিসারের পথ উন্মুক্ত হল।

লৌকিক জগতের অতিনির্দিষ্ট সমাজভূমিতে যে নারী সংসারযাত্রা নির্বাহ করে, গৃহজীবনের অতিরিক্ত সত্তা সেখানে অনুপস্থিত। 'গৃহের বনিতা'কে তখনো 'বিশ্বের কবিতা'য় পরিণত করা হয় নি। তার কারণ মধ্যযুগের দেশ-কালের মধ্যে অনুরূপ উপলব্ধির কোনো সমর্থন ছিল না, কাব্যসংস্কারের মধ্যেও ছিল না এর কোনো আভাস। প্রত্যক্ষের ঊর্ধ্বে অপ্রত্যক্ষের তত্ত্বনিরপেক্ষ লীলারহস্য তখনো অনাবিষ্কৃত। প্রত্যক্ষের লৌকিক সূত্রগুলি রোমান্টিক কবিরা কোথাও ছিন্ন করেছেন, আবার কোথাও বা তাকে ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগ-অনুভূতির দ্বারা রূপান্তরিত করে এক বৃহত্তর ভাবচৈতন্যের সঙ্গে সমন্বয় করেছেন। এই প্রসঙ্গে একজন পাশ্চাত্য সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

> The 'romantic' poet sees all things in the light of their larger relations, transcends distinctions, expresses by figure and metaphor; or, again, mingles a lyric personality in the tale he tells or the picture he paints, breaking its outlines with passion, or embroidering them with fancy.[২]

নবযুগের বাংলাসাহিত্যে সৌন্দর্যরূপিণী নারীসত্তার উপলব্ধি ও আবিষ্কারের মূলে সমালোচকের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য। এই যুগের কবিরা যেমন নতুন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি করেছেন পুরাতনের পুনর্বিচার। পুরাণ ও ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিয়ে যার সূত্রপাত, তার পরিণাম হল সুদূরপ্রসারী— সমাজ জীবনেও তা ছড়িয়ে পড়ল। পুরাণের চরিত্র ও ঘটনাবৃত্তকে কবিরা ব্যক্তিহৃদয়ের 'বিশিষ্ট অনুভূতি' দিয়ে রঞ্জিত করেছেন। সৌন্দর্যের অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্র উদ্‌ঘাটিত হওয়ার ফলে নবজাগ্রত কবিস্বপ্ন কত গূঢ় ও গভীর হয়ে উঠেছে, তার সর্বোত্তম পরিচয় পাওয়া যায় মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনায়। বিশেষ নারীমূর্তি আশ্রয় করে তাঁরা সৌন্দর্যচেতনার মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন। শুধু মধ্যযুগের কাব্য-সংস্কারই কাটে নি, বাংলার কাব্যকুঞ্জ 'দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে' মুখর হয়ে উঠেছিল। সেই মন্ত্রে মূর্ত হল 'গোপনচারিণী' 'মানস-সুন্দরী' কল্পলোক। নবলব্ধ চেতনার আবেগে অনুসন্ধানে ও অপ্রাপ্তির বেদনায় নবযুগের সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আরতি শুরু হল।

---

২ *The Age of Wordsworth*, C, H, Herford, 1960, p XXVII

২

বাংলাসাহিত্যে মানসসুন্দরীর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে মধুসূদনের কাব্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে বিহারীলালকে আধুনিক অন্তর্মুখী গীতিকবিতা ও আত্মমুগ্ধ রোমান্টিক চেতনার উৎসমূল হিসেবে নির্দেশ করেছেন। আর-এক দল সমালোচক ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক চেতনার মধ্যে যাঁরা ভাশুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক নির্ণয় করে থাকেন তাঁরা মিল্টন-ভক্ত মধুসূদনকে যে 'ক্লাসিক্যাল' আখ্যা দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি! সম্ভবত এই দুটি কারণেই মধুসূদনের গোত্রনির্ণয় সম্পর্কে সমালোচকেরা নিঃসংশয় হতে পারেন নি। 'ক্যাপটিভ লেডি' (১৮৪৯) তাঁর শেষ মৌলিক ইংরেজি কাব্য, 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০) তাঁর প্রথম বাংলা কাব্য। 'ক্যাপটিভ লেডি' ও প্রথমা পত্নী রেবেকা কবিজীবনের একই বৃন্তের যেন যুগলপুষ্প। 'ক্যাপটিভ লেডি'র ভূমিকায় যে রোমান্টিক প্রেম ও সৌন্দর্যের মোহময় চিত্র আছে তার অবলম্বন হল কবির যৌবনস্বপ্ন ও নারীসৌন্দর্যের ইন্দ্রিয়নির্ভর অনুভূতি। সম্ভবত, 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ছাড়া সৌন্দর্যলক্ষ্মীর এমন অপরূপ বন্দনা মধুসূদনের কাব্যে আর নেই :

Oh ! beautiful as Inspiration, when
She fills the Poet's breast, her fairy shrine ;
Woo'd by melodious worship !— Welcome then ;—
Tho' ours the home of want,— I never repine,
Art thou not there— e'en thou— a priceless gem and mine ?

Life hath its dreams to beautify its scene—
And sun-light for its desert ;— but there be
None softer in its store of brighter sheen—
Than Love— than gentle Love ; and thou to me
Art that sweet dream, mine own ! in glad reality.[৩]

'ক্যাপটিভ লেডি' ইংরেজি কাব্য, কিন্তু এই কাব্যেই সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিচিত্তের যে অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়, তাকে আধুনিক যুগের বাঙালি কবির মানসীবন্দনার পূর্বাভাস বললে অত্যুক্তি হবে না। 'ক্যাপটিভ লেডি' কাব্যের সঙ্গে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। হিন্দুকলেজে যে নীলাক্ষী সুন্দরীর অলক্ষিত ও গোপন পদসঞ্চার কিশোর কবির স্বপ্নাবেশকে অধীর করে তুলেছিল, তাকেই 'ক্যাপটিভ লেডি' কাব্যে কবি আরো নিঃসংশয়িতভাবে উপলব্ধি করেছেন। নবযুগের সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতির সেই প্রথম আরতি। আখ্যায়িকাবর্ণনা এখানে মুখ্য নয়, কবিহৃদয়ের উদ্দাম বন্ধনমুক্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের অনুসন্ধানই এখানে মুখ্য। কিন্তু 'ক্যাপটিভ লেডি' মধুসূদনের কল্পস্বপ্নের ছায়াভাস মাত্র— অস্পষ্ট নীহারিকায় তাই তারকাপুঞ্জের সংহত দীপ্তি অনুসন্ধান করা সমীচীন নয়। অসংগত হৃদয়োচ্ছ্বাস, শব্দ ও অর্থের বৃথা-উদ্ভাবন ও অসংযত খেয়ালী কল্পনার যথেচ্ছ সঞ্চরণ এই কাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। মাদ্রাজের 'এথেনিয়ম' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে একজন পাঠক এই কাব্য সম্পর্কে একখানি চিঠিতে

৩ 'ক্যাপটিভ লেডি' কাব্যের ভূমিকা-কবিতাটির সপ্তম ও অষ্টম স্তবক।

যা লিখেছিলেন, তা প্রকৃত রসজ্ঞের বিচার। তা ছাড়া চিঠিখানিতে মধুসূদনের এই সময়ের মানস-অভিপ্রায়টিও পরিস্ফুট হয়েছে :

> The poem itself, too much and too fatally perhaps for its popularity recalls the overburdened sentimentality of the Byron-school;— and may, probably, be the effusion of youthful or unpractised musing.[৪]

এই সময়ে পোপ মুর ও স্কটের প্রভাব মধুসূদন কাটিয়ে উঠেছেন, কিন্তু বায়রনের প্রভাব প্রবলতর। উনিশ শতকের বাংলাদেশের বায়রন-শিষ্যটিকে 'overburdened sentimentality'র ঊর্ধ্বে উঠতে দেয় নি। কিন্তু অপরিণত হলেও কবিমানসের স্বরূপ-লক্ষণটি এখানে নির্দ্বিধায় আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথম সর্গে বর্ণিত মধ্যরাত্রি, মেঘ-গুণ্ঠিত চাঁদের পাণ্ডুর আলো, শৈলবন্ধুর দ্বীপে ম্লান আলোছায়ার লীলা— কবির রোমান্টিক স্বপ্নসাধকে লালন করেছে। নভশ্চারী কল্পনা, নামহারা অনির্দেশ আকাঙ্ক্ষা ও দূরস্মৃতির বিষণ্ণ বেদনা রোমান্টিক কবিদের মনোজীবন-নির্দেশক। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের পক্ষে এ কল্পনা ছিল স্বপ্নাতীত, বিহারীলালের 'সারদা' তখনো ভবিষ্যতের গর্ভে।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' মধুসূদনের সৌন্দর্যচেতনার একটি তাৎপর্যময় কাব্যভাষ্য। 'ক্যাপটিভ লেডি' কাব্যে যে বাধাবন্ধহীন সৌন্দর্যচেতনার উন্মেষ, তা রোমান্সমিশ্র পুরাণকাহিনীর সঙ্গে মিলে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের কলাকৃতিতে পরীক্ষামূলক ভাবটি সুস্পষ্ট। কিন্তু নবযুগের সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর মূলীভূত সত্তা এক অবিকম্পিত বলিষ্ঠ রেখায় উদ্ভাসিত হয়েছে। তিলোত্তমাসম্ভব মধুসূদনের কাব্যকৌতূহল মাত্র, কিন্তু তিলোত্তমার উদ্ভব ও সুন্দ-উপসুন্দের মৃত্যুবৃত্তান্ত বাংলাকাব্যের রোমান্টিক সৌন্দর্যাভিলাষকে নিগূঢ় অর্থে মণ্ডিত করেছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গে বিশ্বসৌন্দর্যরূপিণী নারীর উদ্ভবের বর্ণনায় সংস্কৃত কবিপ্রসিদ্ধির অনুসরণ করা হয়েছে, কিন্তু কবির সৌন্দর্যচেতনার স্বরূপ রোমান্টিক ভাবকল্পনায় অনুরঞ্জিত। তিলোত্তমা মিল্টনের ঈভের মতোই আদিম নারী— সৌন্দর্যের আদিতম স্বরূপ তাকে ঘিরেই মূর্ত হয়েছে। তিলোত্তমা বিশ্বসৌন্দর্যরূপিণী, তার উদ্ভবের মধ্যে কোনো লৌকিক কার্যকারণ সম্পর্ক নেই, কোনো সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে সে ধরা দেয় নি। আবার এই সৌন্দর্যই শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের কারণ হয়েছে। সুন্দ-উপসুন্দ দেবজয়ী বীর, কিন্তু তিলোত্তমার কাছে শৌর্য বীর্য ভ্রাতৃপ্রেম ও স্বর্গসাম্রাজ্য সমস্ত কিছুই পরাজিত হয়েছে। নারীর মোহিনীমূর্তির কাছে তারা সবকিছুই জলাঞ্জলি দিয়েছে। উনিশ শতকের বাংলাকাব্যের রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতির দ্বৈতরূপ। ত্রিলোকসৌন্দর্য নিয়ে যার অপূর্ব মূর্তি রচনা করা হয়েছে, সে নদীজলে আপন সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হয় :

ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে
আপন প্রতিমা হেরি— ভ্রান্তি-মদে মাতি,

---

৪ 'Laelius' ছদ্মনামে লেখক সম্পাদককে চিঠিখানি লিখেছিলেন (১৬ই এপ্রিল ১৮৪৯)
নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' (১৩২৭) থেকে উদ্‌ধৃত (পৃ. ৬৭৪)।

একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে।[৫]

এই চিত্র এক ভাবমুগ্ধ আত্মতন্ময় নির্দোষ সৌন্দর্যের। তবু সে সৌন্দর্য মৃত্যুরূপিণী, নিয়তিরূপিণী। সৌন্দর্য-পিপাসা এখানে কল্যাণের বিরোধী। সুন্দরীর সর্বনাশা রূপের বহ্ন্যুৎসব তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। কারণ সে সৌন্দর্য 'অখিল মানস স্বর্গ'এর হলেও নারী-সম্পর্ক-বিবর্জিত নয়। সেই মোহিনী রূপের মধ্যে আছে একটি আত্মঘাতী কামনা। রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনার সেই প্রথম যুগে বিশ্বসৌন্দর্যরূপিণীর স্বপ্নে বাঙালি কবিচিত্তে যে বিভোরতা জেগেছিল, তার রূপ দুটি: তিলোত্তমারূপিণী বিশ্বসৌন্দর্য ও নারীর মোহিনী রূপের সর্বনাশা স্বরূপ।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে গ্রীক সৌন্দর্যভাবনা জয়যুক্ত হয়েছে। সৌন্দর্যের মধ্যে নিষ্করুণ নিয়তির অলঙ্ঘনীয় প্রভাবের কথা গ্রীক কবিরা বার বার উল্লেখ করেছেন। রোমান্টিক যুগের কবিরা সেই সৌন্দর্য-চেতনাকে অনেক সময় নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুইনবার্নের 'আটলান্টা ইন ক্যালিডন' কাব্যে গ্রীক সৌন্দর্যদর্শনের অপূর্ব সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কাব্যটি 'তিলোত্তমাসম্ভব' রচনার পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত হয় (১৮৬৫)। এই কাব্যের 'কোরাস' অংশে প্রেমের এই বিচিত্র স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে:

Thou art swift and subtle and blind as a flame of fire
Before thee the laughter, behind thee the tears of desire; · ·
And Fate is the name of her, and his name is death.

কাব্যখানির মূলতত্ত্ব সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য:

Into this Swinburn has woven two Greek conceptions. The first is that love is an extremely dangerous power. The Greek poets often dwell on this, and Swinburn agrees with them. In his play the incalculable, reckless pitiless power of love is at work.[৬]

এই গ্রীক সৌন্দর্যবাদের সঙ্গে সুইনবার্ন যুক্ত করেছেন আটলান্টার চরিত্রের অ-সাধারণত্ব— "Her cult of virginity, her lack of common ties and affections, her avoidance of wedlock and motherhood"। তিলোত্তমাসম্ভব যত অপরিণত কাব্যই হোক-না কেন, গ্রীক সৌন্দর্যভাবনার মূল সুর এখানে অনুপস্থিত নয়। 'Fatal Woman' এবং 'Impossible She'র রোমান্টিক ধারণা মধুসূদনই বাংলাসাহিত্যে প্রথম নিয়ে আসেন। তিলোত্তমাই বাংলাসাহিত্যের সর্বপ্রথম অপ্রাপনীয়া ও 'সুন্দরী সে সর্বনাশী'। এখানে প্রেমসৌন্দর্যরূপিণীর আর-এক নাম নিয়তি। এইভাবে মধুসূদন তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সৌন্দর্যচেতনার এক অনাবিষ্কৃত উৎসমুখ উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

৩

নবযুগের বাঙালি কবির সৌন্দর্যপিপাসার আর-একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে (১৮৬৬)। কপালকুণ্ডলাকে সমালোচকদের অনেকেই কাব্য বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে

---

৫ তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য: চতুর্থ সর্গ।
৬ *The Romantic Imagination* (1949): C. M. Bowra, p. 227

কপালকুণ্ডলার আধার গদ্য উপন্যাসের, কিন্তু এর অন্তরঙ্গ রূপ কাব্যের। বঙ্কিমচন্দ্রের সহজাত প্রৌঢ় উপলব্ধি কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে সৌন্দর্যতত্ত্বের এক অনাবিষ্কৃত রূপলোক উদ্‌ঘাটিত করেছে। এই উপলব্ধি রোমান্টিক সৌন্দর্যপিপাসারই আর-একটি রূপভেদ মাত্র। তিলোত্তমাকে মধুসূদন সর্বপ্রকার সামাজিক বন্ধনের ঊর্ধ্বে রেখেছেন, তাঁর কোনো সামাজিক বন্ধন নেই। তিলোত্তমা যেমন মানবীগর্ভজাতা নন, তেমনি সুন্দ-উপসুন্দর মৃত্যুর পর সূর্যলোকে অন্তর্হিত হয়েছেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা উপন্যাস। সেখানে সমাজ আছে, আছে সামাজিক মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার পূর্বপরিচয় যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলেছেন, যেটুকু না বললে নয়, ততটুকুই। বিবাহের প্রাক্কালে অধিকারী নবকুমারকে বলেছিলেন: "ইনি ব্রাহ্মণকন্যা। ইঁহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গ প্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন।" এর বেশি বঙ্কিম বলতে পারেন না, কারণ তাঁর মনে এক জিজ্ঞাসা জেগেছিল। নেগুয়া মহকুমা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় বদলি হন তার আগে কিছুদিন কাঁঠালপাড়ায় ছিলেন। দীনবন্ধু সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কাছে বঙ্কিম যে প্রশ্ন করেন তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায়[৭]:

> এই সময় বঙ্কিম তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যদি শিশুকালে কোনও স্ত্রীলোক ষোল বৎসর পর্যন্ত সমাজের বাহিরে সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কোনও কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয় ও পরে বিবাহ হইলে সমাজ-সংসর্গে আসে, তাহা হইলে তাহার বন্যপ্রকৃতির পরিবর্তন সম্ভব কি না এবং পরবর্তীকালেও কাপালিকের প্রভাব তাহার উপর থাকিবে কি না। দীনবন্ধু কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রহস্য করিয়া বলেন, যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয়, মেয়েটা চোর হইবে। পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলেন, কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামিপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে, সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে তিরোহিত হইবে। এই উত্তর বঙ্কিমচন্দ্রের মনঃপূত হয় নাই। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের গূঢ় অভিপ্রায় সঞ্জীবচন্দ্র উপলব্ধি করতে পারেন নি। সঞ্জীবচন্দ্র এই অতলস্পর্শ রহস্য-জিজ্ঞাসার সুলভ ও লৌকিক সমাধান করতে চেয়েছিলেন।

কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বপ্রকৃতির যে আদিম, বিশুদ্ধ ও অশোধিত স্বরূপে পৌচেছেন, তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মৌলিক। নবকুমার প্রকৃতির সেই নিগূঢ় রহস্যলোকের দর্শক। নবকুমারের সহযাত্রী বৃদ্ধ তীর্থদর্শনে পুণ্যসঞ্চয় করতে এসেছিলেন। নবকুমার এসেছিলেন সমুদ্রের সেই আদিম সৌন্দর্য দেখতে। পথভ্রান্ত নবকুমারের সেই প্রকৃতির ভীমকান্ত রূপদর্শন সার্থক হয়েছিল। লোকালয়বর্জিত জনহীন সমুদ্রতীরের আরণ্যক পটভূমিকায় প্রকৃতির সেই মানবীমূর্তি দর্শন সার্থক হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই নারীরূপিণী আদিম প্রকৃতির এক অসামান্য ধ্রুপদী সংগীত রচনা করেছেন:

> সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি! কেশভার—আবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন

৭ বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ ৭৪।

চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না— তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাললোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল।·· অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।[৮]

প্রকৃতির এই মানবীমূর্তি আকস্মিকভাবে আসে নি। নবকুমারের সৌন্দর্যদর্শনের আকাঙ্ক্ষারই ব্যাখ্যা হিসাবে কপালকুণ্ডলার আবির্ভাব। কিন্তু তারও আগে 'শিখরাসীন' ধ্যানস্থ কাপালিককে দেখেছিলেন। কাপালিক সমুদ্রের ভয়ালমূর্তির 'মানবরূপ', এবং কপালকুণ্ডলা 'সমুদ্রের সৌন্দর্যমূর্তির মানবরূপ'।[৯] এই দুই মিলিয়েই নবকুমারের প্রকৃতিদর্শন। কপালকুণ্ডলা ও কাপালিকের এই বর্ণনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা-দৃষ্ট 'গগনবিহারিণী ভয়ংকরী মূর্তি'র প্রভাব ও প্রেরণা যুক্ত করে প্রকৃতিসত্তার ভীষণ-রমণীয়তাকে অসাধারণ অর্থব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছেন। প্রকৃতির আদিম স্বরূপকে মানবান্বিত করে তাকে সার্থক শিল্পে পরিণত করা বঙ্কিমের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক। উপন্যাসের প্রারম্ভ ও পরিণতির মধ্যে এমন সামঞ্জস্য আছে, যা বঙ্কিমের মত দিব্যপ্রতিভাসম্পন্ন মহৎ শিল্পী ছাড়া আর কারো পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। মানুষ ও বহিঃপ্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন রোমান্টিক কবিরা। রুসোর 'প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন' সূত্রটি কবিদের লেখনীতে নানাভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

কপালকুণ্ডলা ও কাপালিক পরিকল্পনার সঙ্গে 'তান্ত্রিক-প্রথার ভীষণতা ও সহজ ধর্ম-প্রবণতা' সমন্বিত হয়ে আমাদের বাস্তবজীবনের সঙ্গে একটি সমন্বয় রক্ষা করেছে।[১০] ইয়োরোপের পূর্ণোচ্ছ্বসিত ও বহুবিচিত্র জীবনের মধ্যে রোমান্স প্রবেশের বহু বাতায়ন আছে। আমাদের সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ জীবনে রোমান্সের এতগুলি প্রবেশপথ নেই। তাই তিনি আদ্যাশক্তি প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে 'সহজ ধর্মপ্রবণতা'কে আশ্রয় করেছেন। এখানে শুধু কাপালিকের তন্ত্রসাধনার কথাই বর্ণিত হয় নি। কপালকুণ্ডলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছ— "কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান।" একজন পাশ্চাত্য সমালোচক বিস্ময়বিমুগ্ধ কণ্ঠে যে কথা বলেছেন, তার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না :

> The force that moves the whole with emotion and gives to it its subtle spell, is the mystic form of Eastern thought that clearly shows the new forms that lie ready for inspiring a new school of fiction with fresh life. Outside the *Maraige de Loti* there is nothing comparable to the 'Kapalkundala' in the history of Western fiction.[১১]

---

৮ কপালকুণ্ডলা : প্রথম খণ্ড, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

৯ বঙ্কিম-সরণী : প্রমথনাথ বিশী, পৃ. ৫৩-৫৪।

১০ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (১৯৪৮) : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ ৫৯।

১১ *Literary History of India* : R. W. Fraser (London, 1898)

ফ্রেজার কথিত এই 'Mystic form of Eastern thought'ও বঙ্কিমচন্দ্রের আদ্যাশক্তি প্রকৃতির রূপ-রহস্য অনুধ্যানের সহায়ক হয়েছিল; এই চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রের রসকল্পনাকে স্থিতি-স্থাপকতা দিয়েছিল। অথচ 'কপালকুণ্ডলা' তত্ত্ব না হয়ে কাব্য হয়ে উঠেছে।

এই উপন্যাসের পটভূমিকায় আছে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ভারত-ইতিহাস ও বাংলাদেশের তৎকালীন সামাজিক জীবন। কিন্তু ইতিহাস এখানে গৌণ, মতিবিবি আখ্যায়িকার প্রাক্‌-কথন হিসেবে এর সংকীর্ণ ভূমিকা। কিন্তু এখানকার সমাজ প্রকৃতিশক্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্যই এসেছে। সাংসারিক জীবনের মধ্যেও ঔদাসীন্য, গৃহজীবনের প্রাঙ্গণেও অরণ্যজীবনের স্বপ্নদর্শন, সামাজিক বিধি-নিষেধের মধ্যেও বন্ধনহীন জীবনের দুর্মর আকাঙ্ক্ষা কপালকুণ্ডলা চরিত্রের পরিণামকে অনিবার্য করে তুলেছিল। বন্ধনহীন সমুদ্র, বিশাল অরণ্য যার আবির্ভাবভূমি রচনা করেছে, তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে 'চৈত্রবায়ুতাড়িত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে'। বন্ধনহীন আদিম প্রকৃতির পায়ে সমাজ শৃঙ্খল পরাতে পারে নি। প্রকৃতির 'মূলীভূতা আদ্যাশক্তি'র এমন শিল্প-সার্থক সৃষ্টি বাংলাসাহিত্যে আর নেই। বাংলাসাহিত্যে কপালকুণ্ডলার নিঃসঙ্গ একাকিত্ব আজও বিস্ময়কর। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন বঙ্কিমের সুগভীর ভাবকল্পনাকে সমকালীন লেখকেরা উপলব্ধি করতে পারেন নি। পারলে, সঞ্জীবচন্দ্র সুলভ সমাধানের কথা বলতেন না, আর দামোদর মুখোপাধ্যায় করতেন না পরিশিষ্ট লেখার হাস্যকর অপপ্রচেষ্টা।

৪

মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্যপিপাসা তিলোত্তমা ও কপালকুণ্ডলা দুই নারীর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলালের হাতে যে রোমান্টিক সৌন্দর্যজিজ্ঞাসা সূচিত হল, তা সর্বোত্তম পরিণতি লাভ করেছে রবীন্দ্রকাব্যে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যজিজ্ঞাসার সর্বপ্রথম সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে তাঁর 'চিত্রা' কাব্যে। এই কাব্যে তিনি শুধু পরিণত শক্তিই লাভ করেন নি, বিশিষ্ট শক্তিও লাভ করেছেন। 'চিত্রা' কাব্যে কবি জীবনদেবতার মধ্য দিয়ে যেমন তাঁর কবিব্যক্তিত্বের রহস্য নির্ণয় করেছেন, তেমনি কয়েকটি কবিতায় মৌলিক সৌন্দর্যজিজ্ঞাসারও অবিস্মরণীয় কাব্যভাষ্য রচনা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য কবির সুবিখ্যাত 'উর্বশী' কবিতাটি (২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২)।

তিলোত্তমা-পরিকল্পনায় মধুসূদন পৌরাণিক কাহিনী আশ্রয় করে নবযুগের রোমান্টিক সৌন্দর্য-পিপাসাকে জয়যুক্ত করেছিলেন। 'উর্বশী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক উর্বশী আশ্রয় করে সৌন্দর্য-কল্পনার গভীরতর স্তরে প্রবেশ করেছেন। তিলোত্তমা বাঙালিমানসের রোমান্টিক সৌন্দর্যকল্পনার আদিযুগের সৃষ্টি, অপরিণতি ও অস্পষ্টতা এখানে অনুপস্থিত নয়। তিলোত্তমাসত্তার আভাসটুকুই চোখে পড়েছে, তার ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্মতর রঙ রেখা ও গূঢ় অভিপ্রায় তেমন ফুটে ওঠে নি। এর জন্য যে অন্তর্মুখিতা ও স্থৈর্যের প্রয়োজন, মধুসূদনের পক্ষে তা ছিল অনায়ত্ত। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পর রবীন্দ্রনাথ সেই 'তিলোত্তমা-চেতনা'কে ঐশ্বর্যে অলংকারে ও সূক্ষ্মতর ভাবব্যঞ্জনায় পরিণত রূপ দিয়েছেন। ঋগ্বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ, কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটক প্রভৃতিতে উর্বশীর বহুবিচিত্র ও বহুশাখান্বিত আখ্যায়িকা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ সেই আখ্যায়িকাগুলি থেকে উর্বশীর যে ভাবরূপ আহরণ করেছেন, তাতে 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে নবসৃষ্টি করলেন।

তিলোত্তমা সূর্যলোকবাসিনী, সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে ধরা দেয় নি। কপালকুণ্ডলার একটি পূর্ব-

কাহিনী থাকলেও তা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, সমাজবন্ধনের মধ্যে সে ধরা দেয় নি। প্রকৃতির এই আদ্যাশক্তি প্রকৃতিতেই বিলীন হয়েছে। উর্বশীও "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী"। সমাজবন্ধনের অতিরিক্ত সৌন্দর্যসত্তাকেই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকে উর্বশীর আবির্ভাবলগ্নটিকে কবি-কল্পনায় মূর্ত করা হয়েছে :

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী!
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে—

রোমান্টিক কবিরা যে সৌন্দর্যের ধ্যান করেছেন তার এক কোটিতে আছে সমাজসংস্কারের বন্ধনমুক্ত সুন্দরের স্বপ্রকাশ স্বরূপ। উর্বশী 'শুধু বিশ্বের প্রেয়সী' ও 'অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী'।

সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এই কবিতাটির মধ্যে অসংগতি দেখতে পেয়েছেন। তিনি কবিতাটির 'স্ববিরোধীভাব' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন :

কবি বলিতেছেন, এই উর্বশী, 'আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিল মন্থিত সাগরে, ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে'। বেশ,— কিন্তু বিষভাণ্ডের ভাবনা যেখানে আছে সেখানে খাঁটি সৌন্দর্যানুভূতির কথা আসিতে পারে না— কাম বা প্রেমের কথাই বড় হইয়া উঠে, কারণ— 'a thing of beauty is a joy for ever'; খাঁটি aesthetic pleasure যেখানে আছে, সেখানে বিষও অমৃত হইয়া উঠে।··কবি এ কোন্ সৌন্দর্যের বন্দনা করিতেছেন? 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ' বলিয়া যাহার উদ্‌বোধন করিয়াছেন, সে 'উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা' এবং 'অকুণ্ঠিতা' হইতে পারে; কিন্তু তাহারই 'কটাক্ষঘাতে' যদি 'ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল' হইয়া উঠে, তবে মাতা কন্যা বা বধূ না-হওয়াটা তাহার গৌরবের কারণ নয়··[১২]

মোহিতলাল শুধু এই স্ববিরোধীভাব বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টাই করেন নি, তিনি তার কারণও নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে 'য়ুরোপীয় কাব্যের অতিরিক্ত প্রভাবে' কবি তাঁর 'কবিধর্ম' বিস্মৃত হয়েছেন। সুইনবার্নের 'আটলাণ্টা ইন্ ক্যালিডন'এর অ্যাফ্রোদিতে-বন্দনার অংশ বিশেষ উদ্ধার করে 'উর্বশী'র উপর তার প্রভাব দেখিয়েছেন।

মোহিতলালের এই অভিমত বিশ্লেষণ করলে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যজিজ্ঞাসার সপক্ষেই যুক্তি জোরালো হয়ে ওঠে। আগে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি ছিল দেখা যাক। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন :

উর্বশী যে কী, কোনো ইংরেজি তাত্ত্বিক শব্দ দিয়ে তার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে চাই নে, কাব্যের মধ্যেই তার অর্থ আছে। এক হিসাবে সৌন্দর্যমাত্রই অ্যাবস্‌ট্র্যাক্‌ট্— সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ, উর্বশী তারই

১২ আধুনিক বাংলা সাহিত্য (তৃতীয় সং): মোহিতলাল মজুমদার, পৃ ৪৩-৪৪।

প্রতীক। সে সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য— সেইজন্য কোনো কর্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে কেবল অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট সৌন্দর্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু যে-হেতু নারীরূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য, সেইজন্য স্বভাবত নারীর মোহও আছে। শেলি যাকে ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বিউটি বলেছেন, উর্বশীর সঙ্গে তাকেই অবিকল মেলাতে গিয়ে যদি ধাঁধা লাগে তবে সেজন্য আমি দায়ী নই।[১৩]

উর্বশী যখন অ্যাবস্ট্রাক্‌ট সৌন্দর্য তখন সে 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ'— তখন সে সৌন্দর্যের মূলীভূত সত্তা, যার নৃত্যের ছন্দে সিন্ধুতরঙ্গ স্পন্দিত হয়, শস্যশীর্ষ লীলাচ্ছলে কেঁপে ওঠে। আবার এ কথাও সত্য বিশেষ নারীকে অবলম্বন করেই সে সৌন্দর্যের প্রকাশ— তাই নারীর মোহও তার সঙ্গে জড়িত আছে— তাই উর্বশীর কটাক্ষঘাতে 'ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল' হয়, মুনিগণের ধ্যান ভেঙে যায়। কবি উর্বশীর যে দ্বৈতরূপের কল্পনা করেছেন, তার মধ্যে কোনো স্ব-বিরোধ নেই।— বরং এতে কবিদৃষ্টির সমগ্রতাই পরিস্ফুট হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সাহিত্যে উর্বশী সম্পর্কে যেসব আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে তার মধ্যেও উর্বশীর দুই মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মহাভারতে যে উর্বশী অর্জুনকে কামনা করেছে, সেই উর্বশীই পুরুরবার কাম্য বস্তু। ভারতীয় সাহিত্যে যে ইঙ্গিত ছিল, তাকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃজনীকল্পনার আলোকসম্পাতে নতুন তাৎপর্য দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনার মধ্যে একজাতীয় দ্বন্দ্ব আছে— সেই দ্বন্দ্বই রোমান্টিক কবিদের সৌন্দর্যকল্পনাকে রমণীয় করে তুলেছে। সুধাপাত্র ও বিষভাণ্ড— দুই-ই এখানে সত্য। পাশ্চাত্য সমালোচকেরা একেই বলেছেন Fatal Woman, Impossible She। এই সুন্দরী বিশ্বমোহিনী হওয়া সত্ত্বেও সর্বনাশ ডেকে আনে, অথচ কখনো তাকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। সৌন্দর্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা দিয়েছে বিষণ্ণতা ও খেদোক্তি। সমালোচকেরা মনে করেন সৌন্দর্যানুভূতি ও মৃত্যুচেতনা রোমান্টিক কবিদের কাছে একই বৃন্তের যুগলপুষ্প :

> But there is no end to the examples which might be quoted from the Romantic and Decadent writers on the subject of this indissoluble union of the beautiful and the sad, on the supreme beauty of that beauty which is accursed. Even Victor Hugo, in whose veins certainly did not flow the tormented blood of such as Shelley, Keats, Flaubert, and Baudelair's manner, the relationship between beauty and death.[১৪]

আসলে মোহিতলাল যাকে স্ববিরোধ মনে করেছেন, তা স্ববিরোধ নয়, সৌন্দর্যের দ্বৈতরূপে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়। কবিতাটির সপ্তম স্তবকে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্বশীর জন্য ক্রন্দন, অষ্টম স্তবকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যরূপিণী উর্বশীর আভাস-ব্যঞ্জনা। এই দুটি স্তবকের জন্য কবিকল্পনা পূর্ণতর হয়ে উঠেছে। উর্বশী এখানে নিষ্ঠুরাও বটে, বিশ্বসৌন্দর্যরূপিণীও বটে। বিশ্বপ্রকৃতিও এখানে অনুপস্থিত নয়। চতুর্থ ও

---

১৩ ২. ২. ১৯৩৩ তারিখে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়।

১৪ *The Romantic Agony,* by Mario Praz ; tr. by Angus Davidson (1956), p. 31

অষ্টম স্তবকে আদিতম সুন্দরী ও বিশ্বপ্রকৃতির আদ্যাশক্তি প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে। ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল বিউটি-তে শেলি দেখেছেন সৌন্দর্যের অ্যাব্‌সট্রাক্‌ট দিকটিকেই, উর্বশী অ্যাবসট্রাক্‌ট, কংক্রীট— দুই-ই। তবে অধরা সৌন্দর্যের জন্য বেদনাবোধ দেশ-বিদেশের সৌন্দর্যরসিক কবিদের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কীটসের *La Belle Dame Sans Merci* কবিতার নাইটের বিলাপও স্মরণীয়।

তিন জন বাঙালি কবির তিনটি নারীরূপের মধ্যে সৌন্দর্যদর্শনের যে মৌলিকতা ও গভীরতা আত্মপ্রকাশ করেছে, তাকে নবযুগের সৌন্দর্যজিজ্ঞাসার ত্রিমূর্তি বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্লেটোর পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থা ও ভারতের চাতুর্বর্ণ্য

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

যাঁরা মননশীল, চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করেন, আমাদের দেশে তাঁদের বলা হয়েছে মুনি। তাই যুধিষ্ঠির বলেছেন— যিনি ভিন্ন মত পোষণ না করেন, তিনি মুনিই নন (না সৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্)। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই জন্যেই নাস্তিকশিরোমণি বেদবিদ্বেষী চার্বাকও মুনি আখ্যা পেয়েছিলেন। আমরা অনেক সময়ে 'মুনি' ও 'ঋষি' এই দুটি কথা একসঙ্গে উচ্চারণ করি, কিন্তু এই কথা দুটোর অর্থে বিস্তর পার্থক্য আছে। যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা বা সত্যদ্রষ্টা, তিনি হচ্ছেন ঋষি। অবশ্য, একই ব্যক্তির পক্ষে মুনি ও ঋষি হতে কোনো বাধা নেই, যেমন, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিও বটেন, আবার, ঋষিও বটেন। আবার চার্বাক হচ্ছেন মুনি কিন্তু ঋষি নন। যাঁরা মুনি, তাঁরা আমাদিগকে অন্ধ সংস্কার বা বিশ্বাসের হাত থেকে রক্ষা করেন, আর যাঁরা ঋষি, তাঁরা আমাদিগকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন।

প্রাচীন কালে যে দুটি জাতি সভ্যতার উন্নত শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন হিন্দু ও গ্রীক। এই দুটি জাতির চিন্তাধারায় যেমন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, তেমনি বৈসাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ভারতে ও প্রাচীন গ্রীসে যেসব মনস্বী ও তত্ত্বদর্শী পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাঁদের কথা চিন্তা করে আজও আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। ভারতীয় দর্শনে আমরা পাই মহর্ষি কপিল, কণাদ, গৌতম ও বাদরায়ণ ব্যাসকে, পাই মহামতি নাগার্জুন ও আচার্য শঙ্করকে, আবার গ্রীক দর্শনে পাই পিথাগোরাস, হেরাক্লিটাস, সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলকে। আমরা যে যুগে বাস করি, সে যুগটা হচ্ছে বিশেষজ্ঞের যুগ, আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা যতই বিস্তৃত হচ্ছে, ততই বিশেষজ্ঞের মর্যাদা বেড়ে চলেছে। এ কালে মানুষের শিক্ষণীয় বিষয় একরূপ অনন্ত বললেই চলে, কিন্তু তার জ্ঞান একটি বিশেষ বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকার জন্যে তা অসম্পূর্ণ, তা খণ্ডিত। সেকালে কিন্তু মানুষের জ্ঞান ছিল কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু প্রাচীনেরা একটা মস্ত বড়ো সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সেটা হচ্ছে : মানুষের জ্ঞান অখণ্ড, অবিভাজ্য। কাজেই সেকালে যাঁরা জ্ঞানের অনুশীলন করতেন, তাঁরা একরূপ সর্বজ্ঞই হতেন। তাঁদের বলা হত অশেষবিদ্।

দু একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যেমন প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন। যেমন রসায়নশাস্ত্রে তেমনি দর্শনশাস্ত্রে তাঁর দান চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হবে। সুশ্রুত-সংহিতা নামক বৃহৎ গ্রন্থের তিনি প্রতিসংস্কর্তা ছিলেন। তিনিই সম্ভবত সর্বপ্রথম পারদের ঊর্ধ্বপাতন, অধঃপাতন, তির্যকপাতন প্রভৃতির কথা বলেছেন। মহাযান বৌদ্ধধর্মেরও তিনি প্রবর্তক। আবার তিনি ছিলেন অসাধারণ নৈয়ায়িক প্রতিভার অধিকারী। যে যুক্তির বলে তিনি শূন্যবাদ স্থাপন করেছেন, তাতে তাঁর অপূর্ব মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য, পরবর্তী কালে শূন্যবাদ কথাটি অনেকখানি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। অনেকে মনে করেন, আচার্য শঙ্করও নাগার্জুনের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এ দিকে গ্রীক পণ্ডিত প্লেটো ও এরিস্টটলের কথা ধরা যাক। প্লেটো ছিলেন সক্রেটিসের শিষ্য, কিন্তু জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে তিনি চিন্তার স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন, আবার এরিস্টটল ছিলেন প্লেটোর শিষ্য, কিন্তু তিনি জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রেই তাঁর গুরুর

মতকে অগ্রাহ্য করেছেন। কত বিচিত্র বিষয়ের উপর আলোকসম্পাত করেছেন ভাববাদী প্লেটো ও বস্তুতান্ত্রিক এরিস্টটল। প্লেটোর নীতিবিজ্ঞান, সমাজদর্শন, রাষ্ট্রপরিকল্পনা, শিল্পচিন্তা, অধ্যাত্মভাবনা, সর্বোপরি তাঁর রচনার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভঙ্গি আজও আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। আবার এরিস্টটলের মনীষা কত বিচিত্র ভাবেই না আত্মপ্রকাশ করেছে। তর্কশাস্ত্রে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। পাশ্চাত্য দেশে অলঙ্কারশাস্ত্র বা সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় তিনি একরূপ পথিকৃৎ। তা ছাড়া রাষ্ট্রদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানে তিনি নতুন আলোকপাত করেছেন। পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, অধিবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ও তাঁর কৌতূহল জাগ্রত করেছিল। এক সময়ে ইয়োরোপের পণ্ডিতদের এমন ধারণাও ছিল যে, এরিস্টটল ছিলেন সর্বজ্ঞ, তাঁর মতবাদে কোথাও কোনো ভুলভ্রান্তি নেই।

খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে প্লেটোর জন্ম হয় ও খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে আশি বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবন ছিল ঘটনাবহুল কিন্তু অনেকটা রহস্যে আচ্ছন্ন। পিথাগোরাসের অনুগামীদের চিন্তাধারা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। পিথাগোরাস ও তাঁর শিষ্যেরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা মনে করতেন, মানুষের দেহ হচ্ছে তার আত্মার পক্ষে বন্ধন স্বরূপ। (পরমজ্ঞানী সক্রেটিসও এই বিশ্বাসই পোষণ করতেন।) দেহে আত্মবুদ্ধির জন্যেই আমরা শুনতে পাই না সেই সংগীত, আকাশে গ্রহসমূহের গতির ফলে যে সংগীত নিত্য উৎসারিত হচ্ছে।

মনস্বী প্লেটো যেসকল গ্রন্থ রচনা করেছেন তার মধ্যে 'দি রিপাব্লিক' নানা কারণে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করলেই আমরা প্লেটোর সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা ও শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে পরিচিত হতে পারি। নানা পণ্ডিতের তর্ক-বিতর্কের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। প্লেটোর রচনাবলীর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন, দুরূহ বিষয়কে সরস ভঙ্গিতে প্রকাশ করার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

প্লেটোর পরিকল্পিত সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র

মনস্বী প্লেটো যে সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র শাসনপদ্ধতির পরিকল্পনা করেছেন, তা হচ্ছে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষে মানুষে যে স্বাভাবিক বা নৈসর্গিক বৈষম্য রয়েছে, সেই দিকে প্লেটোর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বলে তিনি কোনো দিন সাম্যবাদের জয়গান করেন নি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে গেলেও বলতে হয়, মানুষে মানুষে যে রুচিগত বা প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্যবাদও সত্য। প্লেটোর পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থা ভারতের প্রাচীন সমাজব্যবস্থার মতোই স্তর-বিন্যস্ত বা hierarchical। এই সমাজে কৃষক ও কারুশিল্পীর দল খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করে সকলের প্রাণরক্ষা করবে এবং সভ্যতার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখবে, এরা হবে শ্রমজীবী সম্প্রদায় (working class), আমাদের ভাষায় আমরা এদের বলব বৈশ্য। প্লেটোর মতে এদের প্রধান গুণ হবে বশ্যতা, আত্মসংযম ও মিতাচার। এদের ঊর্ধ্বে থাকবে সেইসব দুঃসাহসী পুরুষ যারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, এদের প্রধান কাজ হবে দেশকে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা ও দেশের ভিতর শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, এরা হচ্ছে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী (warrior class), এদেরই আমরা ক্ষত্রিয় বলব। প্লেটোর মতে এদের প্রধান গুণ হবে দুর্জয় সাহস ও অজেয় পৌরুষ। সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে

অধিষ্ঠিত হবেন জ্ঞানতপস্বী নির্লোভ দার্শনিকগণ, রাষ্ট্রের শাসনভার এঁদের উপরেই ন্যস্ত থাকবে। এঁরাই দেশের জণগণকে শ্রেয় বা কল্যাণের পথে চালিত করবেন। এঁদের আমরা বলতে পারি ব্রাহ্মণ। এঁদের প্রধান গুণ হবে সত্যনিষ্ঠা ও জ্ঞানানুরাগ।

প্লেটো মানুষকে ত্রিবর্ণ বা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন কিন্তু বংশগত বর্ণভেদ তিনি স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, মানুষের ভিতর এক দিকে আছে জৈব প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় লালসা, এক দিকে আছে যুযুৎসা বা সংগ্রাম-স্পৃহা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আর অন্য দিকে রয়েছে বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি ও সত্যনিষ্ঠা। যারা প্রধানত জৈব প্রবৃত্তির অধীন, তারাই হবে শ্রমজীবী, যাদের ভিতর উদ্যম, উৎসাহ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রবৃত্তি প্রবল, তারা হবে সৈনিক, আর যাঁরা বিবেকী, সত্যানুরাগী ও যুক্তিনিষ্ঠ, তাঁরাই হবেন রাষ্ট্রের নিয়ন্তা। রাষ্ট্র প্রতিটি মানুষের জন্যে প্রকৃতিভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিটি ব্যক্তি প্রকৃতি-নির্দিষ্ট কর্ম করবেন, প্রত্যেকে স্বধর্ম পালন করবেন, কেউ অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না (everybody should mind his own business)। অবশ্য, প্রতিটি মানুষের কর্মের লক্ষ্য হবে জনকল্যাণসাধন। প্লেটোর মতে আদর্শ সমাজের ভিত্তি হবে ন্যায়পরতা বা জস্টিস, আর যখন প্রত্যেক মানুষ স্বধর্ম পালন করবে, তখনই সমাজ হবে ন্যায়পরতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

যারা প্রবৃত্তির অধীন, তারা স্বভাবতই প্রেয়ের পথে গমন করে, যা আপাত-রমণীয়, সে দিকেই তাদের চিত্ত ধাবিত হয়। এদের শ্রেয়ের পথ দেখাবেন রাষ্ট্রের নায়কগণ, প্রয়োজন হলে তাঁরা জনগণকে কল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে বলপ্রয়োগও করবেন।

রাষ্ট্রনীতি ও সমাজদর্শনে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) ও গণতন্ত্র (Democracy) বলে দুটি কথা আছে। প্লেটোর মতে যাঁরা জ্ঞানী ও গুণী, যাঁদের স্বার্থবুদ্ধি নেই, যাঁরা সমাজের যথার্থ মঙ্গলকামী, তাঁদেরই হস্তে দেশের শাসনভার ন্যস্ত হওয়া উচিত। পরবর্তী কালে মনস্বী কার্লাইলও এই মতবাদ সমর্থন করেছেন। ম্যাকেঞ্জির ভাষায় রাষ্ট্রের এই আদর্শকে বলা যায় Aristocratic Ideal বা অভিজাত-তান্ত্রিক আদর্শ। কিন্তু বর্তমান কালে অনেকে এরূপ শাসন-ব্যবস্থাকে জনসাধারণের উন্নতির পরিপন্থী বলে মনে করেন। তাঁদের মতে গণতন্ত্রই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থা, কারণ, একমাত্র এই ব্যবস্থায়ই জনগণের অধিকারকে স্বীকৃতি দান করা হয়।

প্লেটো মনে করেন, যাঁরা রাষ্ট্রের কর্ণধার হবেন, তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। প্রচুর বিত্তের অধিকারী যারা, তারা অনেক সময়ে বিপথগামী হয়। এই জন্যে যাঁরা রাষ্ট্রের নায়ক, তাঁরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হতে পারবেন না, আর সকল ব্যাপারেই তাঁরা হবেন নির্লোভ ও নিস্পৃহ। সমাজের কল্যাণ বা লোকশ্রেয়ঃই হবে তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

গীতায় চাতুর্বর্ণ্য

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলেছেন— গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করেছি।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। ৪।১৩

আমি চার বর্ণের সৃষ্টি করেছি, শ্রীভগবান এমন কথা বলেন নি, তাঁর কথার তাৎপর্য এই— আমি কোনো মানুষকে সত্ত্বপ্রধান, কোনো মানুষকে সত্ত্বমিশ্রিত রজঃপ্রধান, কোনো মানুষকে রজো মিশ্রিত তমঃপ্রধান ও কোনো মানুষকে শুধু তমঃপ্রধান করে সৃষ্টি করেছি। এটা হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক চাতুর্বর্ণ্য। শ্রীকৃষ্ণ সাম্যবাদী হলেও মানুষের গুণগত পার্থক্যকে অস্বীকার করেন নি। আবার মানুষের ভিতর গুণের পার্থক্যকে স্বীকার করতে হলেই কর্মের পার্থক্যকেও স্বীকার করতে হবে। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানীরাও মানুষের বুদ্ধিগত রুচিগত ও প্রবৃত্তিগত পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে মানুষকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান চতুর্বর্ণকে স্বীকৃতি দান করেছেন কিন্তু এ চতুর্বর্ণ সম্পূর্ণ গুণগত। তিনি বলেছেন—

হে পরন্তপ, স্বভাবজাত গুণ অনুসারেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্মসকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিভক্ত হয়েছে।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ১৮।৪১

ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্মসমূহ হচ্ছে— শম (অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম), দম (বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম), তপস্যা (তপস্যা তিন রকম : কায়িক, বাচিক ও মানসিক), শৌচ (শৌচ দুই প্রকার : বাহ্য শৌচ ও আভ্যন্তরীণ শৌচ), ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান (শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য), বিজ্ঞান (তত্ত্বোপলব্ধি) এবং আস্তিক্য (ভগবদ্ বিশ্বাস)।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ১৮।৪২

ক্ষত্রিয়গণের স্বভাবসিদ্ধ কর্ম হচ্ছে— পরাক্রম তেজ ধৈর্য কার্যদক্ষতা যুদ্ধে অপলায়ন (পলায়ন না করা, অপরাঙ্মুখতা) দান ও প্রভুত্ব (বা শাসনক্ষমতা)।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ১৮।৪২

বৈশ্যদের স্বভাবজাত কর্ম হচ্ছে কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য। আর শূদ্রগণের স্বভাবজাত কর্ম হচ্ছে সেবা।

কৃষি গৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্। ১৮।৪৪

শ্রীভগবান বলেছেন— এই বর্ণবিহিত ও আশ্রমবিহিত ধর্মই হচ্ছে মানুষের স্বধর্ম। স্বধর্ম যদি সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত নাও হয়, সেও বরং ভালো, পরধর্ম উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত হলেও তা ভালো নয়; কারণ স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম করলে মানুষ কখনো পাপের ভাগী হয় না।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ১৮।৪৭

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্বর্ণের জন্যে যেসকল কর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে, তা আলোচনা করলে দেখা যায়, বেদপাঠ ও যজ্ঞে ত্রিবর্ণেরই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। মনু মহারাজ বলেন—

বিধাতা ব্রাহ্মণের জন্যে ছয়টি কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন— অধ্যয়ন (বেদাদি শাস্ত্র পাঠ), অধ্যাপন, যজন (যজ্ঞের অনুষ্ঠান), যাজন (যজ্ঞে পৌরোহিত্য), দান ও প্রতিগ্রহ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ক্ষত্রিয়গণের জন্যে নির্দিষ্ট কর্তব্য হচ্ছে— প্রজাগণের রক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি।

বৈশ্যগণের জন্যে নির্দিষ্ট কর্ম হচ্ছে— পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুশীদ (সুদে টাকা ধার দেওয়া) ও কৃষিকর্ম।

প্রভু শূদ্রগণের জন্যে একটিমাত্র কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন, সেটি হচ্ছে, অসূয়াশূন্য হয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পরিচর্যা বা শুশ্রূষা করা।

> অধ্যয়নং অধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা।
> দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
> প্রজানং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
> বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
> পশূনাং রক্ষণং দানং ইজ্যাধ্যয়নমেব চ।
> বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥
> একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
> এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥

আমাদের মনে রাখতে হবে, প্লেটো মানুষকে গুণ ও কর্ম অনুসারে তিন শ্রেণীতে এবং ভারতীয় ঋষিগণ চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্লেটো বলেন, রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ হবেন সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয়, স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধী অর্থাৎ তাঁরা হবেন ব্রাহ্মণোচিত গুণের অধিকারী। কিন্তু ভারতবর্ষে যদিও ব্রাহ্মণগণ স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান রচনা করেছেন এবং কখনো কখনো মন্ত্রী বা অমাত্যের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন কিন্তু রাজ্যশাসনের ভার ছিল ক্ষত্রিয়ের উপর। আবার ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান যেমন বংশগত বর্ণভেদ বা জাতিভেদের কথা বলেন নি, 'রিপাব্লিক' গ্রন্থে প্লেটোও তেমনি মানুষের বংশগত জাতিভেদকে স্বীকৃতি দান করেন নি। অবশ্য ভারতবর্ষে চাতুর্বর্ণ্য প্রথমে ছিল গুণগত, পরে এ দেশে জাতিভেদ হয়ে পড়ে বংশগত। এই বংশগত জাতিভেদ-প্রথার যেমন মহৎ গুণ আছে, তেমনি মহৎ দোষও আছে। কোনো কোনো সমাজ-দার্শনিক এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

ত্রিবিধ সুখ

সংসারে মানুষকে যেমন তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, তেমনি মানুষ যে সুখ কামনা করে, সেই সুখও তিন প্রকারের হতে পারে। সকলেই সুখের বাঞ্ছা করে বটে কিন্তু কেউ সুখের সন্ধান করে জ্ঞানানুশীলনের পথে, কেউ বা বীরোচিত কর্ম ও যশোলাভের পথে, কেউ বা ধন-সম্পদ্‌ আহরণের

পথে। এই তিন প্রকারের সুখের ভিতর প্রথম শ্রেণীর সুখ সর্বোৎকৃষ্ট, দ্বিতীয় শ্রেণীর সুখ মধ্যম, তৃতীয় শ্রেণীর সুখ নিকৃষ্ট। মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষ সুখকে দু শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন— প্রদাহী সুখ ও প্রশান্ত সুখ। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ থেকে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাকে তিনি বলেছেন প্রদাহী সুখ আর জ্ঞানানুশীলন প্রভৃতি সাত্ত্বিক কর্ম থেকে যে সুখ উৎপন্ন হয়, তাকে তিনি বলেছেন প্রশান্ত সুখ। ভগবদ্‌গীতায় কিন্তু শ্রীভগবান ত্রিবিধ সুখের কথাই বলেছেন, এই তিন প্রকার সুখ হচ্ছে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সুখ (অষ্টাদশ অধ্যায়, ৩৬-৩৯ শ্লোক)। শ্রীভগবান বলেছেন—

'যে সুখ প্রথমে বিষের মতো, কিন্তু পরিণামে অমৃতের তুল্য, আত্মা ও বুদ্ধির পরিতৃপ্তি থেকে যে সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সুখকে বলা হয় সাত্ত্বিক সুখ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থেকে যে সুখ উৎপন্ন হয়, যে সুখ প্রথমে অমৃততুল্য কিন্তু পরিণামে বিষবৎ, সেই সুখকে বলা হয় রাজস সুখ। যে সুখ প্রথমে ও পরিণামে বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করে, নিদ্রা, আলস্য ও অজ্ঞান থেকে যে সুখ উদ্‌ভূত হয়, তাকে বলা হয় তামস সুখ।' গীতার মূল শ্লোকগুলো উদ্ধৃত করছি—

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

উপসংহার

প্লেটোর পরিকল্পিত সমাজব্যবস্থা কখনো বাস্তব ক্ষেত্রে রূপ পরিগ্রহ করে নি। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায়ও যুগে যুগে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ভারতীয় ঋষির বিধান ও দার্শনিক প্লেটোর পরিকল্পনার ভিতর যে শাশ্বত সত্য নিহিত রয়েছে, তা এ যুগেও আমাদের গ্রহণীয়। মনস্বী প্লেটোর সঙ্গে আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বলবেন—

১. যাঁরা রাষ্ট্রের কর্ণধার, তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হবে দেশ ও জাতির কল্যাণ। তাঁদের সত্যনিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয় ও নির্লোভ হতে হবে—ধনলোভ ও পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিসর্জন দিতে হবে।

২. যাঁরা যোদ্ধা বা শ্রমজীবী হবেন, তাদেরও কর্মের লক্ষ্য হবে জনকল্যাণ।

৩. প্রত্যেক মানুষ যথাশক্তি স্বধর্ম পালন করবেন, কেউ অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না।

৪. কঠোর হস্তে সর্বপ্রকার অত্যাচার ও অনাচার দূর করতে হবে। দেশের সর্বত্র নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৫. রাষ্ট্রের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মনে ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও বলিষ্ঠ পৌরুষ জাগ্রত হয়।

৬. কেউ যাতে বিপুল বিত্ত বা প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী না হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

(প্লেটো অবশ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী ছিলেন।) বাস্তবিক, যে সমাজে এক দিকে সীমাহীন প্রাচুর্য, অন্য দিকে অন্তহীন দারিদ্র্য সে সমাজের কখনও কল্যাণ হতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে—

উদরপূর্তির জন্যে বা বেঁচে থাকার জন্যে যে পরিমাণ ধনের প্রয়োজন, দেহীদিগের সেই পরিমাণ ধনেই অধিকার ; যে তার বেশি আত্মসাৎ করে, সে হচ্ছে চোর, তাই রাষ্ট্রকর্তৃক সে দণ্ডনীয়।

যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্‌।
যোঽধিকমভিমন্যেত স স্তেন দণ্ডমর্হতি ॥

তারাশঙ্করের 'গল্প-পঞ্চাশৎ'। মুকুন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা ৪। কুড়ি টাকা।

'গল্প-পঞ্চাশৎ' তারাশঙ্করের সর্বশেষ গল্প-সংকলন। সর্বশেষ সংকলন বটে, কিন্তু গল্পগুলো নতুন নয়। গত কয়েক বছর ধরেই তিনি আর ছোটগল্প লিখছেন না। 'কীর্তিহাটার কড়চা'র মতো বিশাল উপন্যাসের বিপুল ব্যাপ্তির মধ্যেই হয়তো তাঁর ধ্রুপদী চেতনা মগ্ন হয়ে আছে।

অতএব 'গল্প-পঞ্চাশৎ' তারাশঙ্করের পঞ্চাশটি পুরোনো এবং পরিচিত গল্পের সঞ্চয়— বলা উচিত, তাঁর নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্পের সম্ভার। 'শ্রেষ্ঠ গল্প' 'স্ব-নির্বাচিত গল্প' 'প্রিয় গল্প' ইত্যাদি বিবিধ নামে তাঁর আরো কয়েকটি বই আছে, কিন্তু আয়তনে এবং মহিমায় এই বইটিই সবচেয়ে গরীয়ান। তারাশঙ্করের যেসব গল্প পড়ে বাঙালি পাঠক বিমুগ্ধ ও সচকিত হয়েছেন, 'গল্প-পঞ্চাশৎ'এ সেই নিপুণতম রচনাগুলিই সযত্নে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ের উপযোগী এবং পরিশ্রমী মুখবন্ধ একটি প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন করেছে। তারাশঙ্করের গল্প-সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি এই শোভন-সংকলনে উপস্থিত করবার জন্য আমরা প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রধান পরিচয়ে তারাশঙ্কর ঔপন্যাসিক। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুল এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস রচনা করলেও ছোটগল্পের রূপ-রীতির বিকাশ-বিবর্তনে যেমন বিশিষ্ট মনোযোগিতা পূর্বাপর রক্ষা করেছেন, অচিন্ত্যকুমার যেমন ছোটগল্পের তন্নিষ্ঠ সাধক, তারাশঙ্কর ঠিক সেইভাবে ছোটগল্পের উপাসনা করেন নি, আঙ্গিক অথবা বক্তব্যের নতুন পরীক্ষায় উল্লসিত বোধ করেন নি। বাংলা দেশে সাময়িক পত্রিকার দাবি মেটাতে ঔপন্যাসিককে গল্প লিখতে হয় এবং উপযুক্ত মর্মপ্রেরণা না থাকলেও অন্য প্রয়োজনে বিশুদ্ধ ছোটগল্প লেখককেও বিস্তৃত উপন্যাস রচনার অব্যবসায়ে পদক্ষেপ করতে হয়। তাই যে-কোনো বাঙালি কথাসাহিত্যিকই একাধারে গাল্পিক এবং ঔপন্যাসিক। অথবা, কেবল বাঙালি লেখক সম্পর্কেই এ কথা বলা কেন, পৃথিবীর সাহিত্যেই বা ক'টি এর ব্যতিক্রম?

তবু সাহিত্যবিচারে মোটা দাগে ভাগ করবার যে রীতি আছে, সেদিক থেকে অনেকগুলি ভালো গল্প লেখা সত্ত্বেও, তারাশঙ্করকে মৌল-মহিমায় ঔপন্যাসিক বলেই চিহ্নিত করা উচিত। অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই বলছি, জীবিত লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্কর ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার। ছোটগল্পের বিশিষ্ট চরিত্ররীতির স্বতন্ত্র সাফল্যের চাইতেও তারাশঙ্করের গল্পগুলিতে এই ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্বাদই নিবিড়ভাবে অনুভব করা যায়। বিদেশী লেখকের সঙ্গে তুলনা করা সমীচীন কি না জানি না, কিন্তু তারাশঙ্করের প্রসঙ্গে আমার টমাস হার্ডির গল্পগুলোর কথাই বিশেষভাবে মনে পড়ে যায়।

আগেই বলেছি, 'গল্প-পঞ্চাশৎ' তারাশঙ্করের সেরা গল্পগুলোর বৃহত্তম সংগ্রহ— বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় বই। তাঁর প্রথম গল্প রসকলি থেকে নারী ও নাগিনী, অগ্রদানী, জলসাঘর, দেবতার ব্যাধি, ডাইনি, তিনশূন্য, আখড়াইয়ের দীঘি, যাদুকরী, বেদেনী, বোবা-কান্না, পৌষলক্ষ্মী, কামধেনু, তমসা এবং ইমারত ইত্যাদি সব ক'টি সুখ্যাত এবং বহুপঠিত গল্পই এই বইতে পাওয়া যাবে।

তারাশঙ্করের ছোটগল্প কি কি কারণে অনন্য সাহিত্যগৌরব অর্জন করেছে, অনেক বাঙালি

আলোচকই তা নানাভাবে নির্ণয় করতে চেয়েছেন। এই লেখকেরও সেইসব আলোচনায় অংশ নেবার সৌভাগ্য ঘটেছে। সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি না করেও বলা যায়, তারাশঙ্করের গল্প সমকালীনতা থেকে স্বতন্ত্র প্রবলতায় দেখা দিয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি কারণে: ক. চরিত্রের বিচিত্রতায়, খ. পটভূমির নবত্বে এবং গ. সর্বব্যাপী ট্র্যাজিক অনুভূতির একটা গভীর-গম্ভীর মহিমায়।

তারাশঙ্করের গল্পের সবচাইতে বড়ো আকর্ষণই হল চরিত্র। তাতে রায়বাড়ির রাবণেশ্বর রায় থেকে জলসাঘরের বিশ্বম্ভর রায় পর্যন্ত আছেন, আছে অগ্রদানীর পূর্ণ চক্রবর্তী, আছে বাজিকরী বেদেনী-হতভাগিনী 'ডাইনী'; আছে তমসার পন্থী, গাজনের সং মতিলাল, ময়ূরাক্ষীর তারিণী মাঝি, কামধেনুর গো-হত্যাকারী নাথু, তিনশূন্যের ন্যালা, ঠ্যাঙাড়ে বালী বাগ্দী, বোবা-কান্নার শশী ডোম, পৌষলক্ষ্মীর পাল, ইমারতের রাজমিস্ত্রী জনাব এবং আরো অনেকে। আকাঙ্ক্ষা আর আবেগের তীক্ষ্ণচূড় উৎক্ষেপে আদিম উপলব্ধির আলো-অন্ধকারের লীলায় এই চরিত্রগুলো বাংলা-সাহিত্যে ক্লাসিক হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল-কঠিন রেখায় আঁকা এই চরিত্রেরা যেন বাঙালির শান্ত-বিষণ্ণ স্তিমিত গৃহাঙ্গনে একটা প্রবল কলরব নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। ডাইনি বা যাদুকরীর কথা স্মরণে রেখেও বলা যায়—এমন প্রচণ্ড, এমন দীর্ণ-বিদীর্ণ, কালো-কদাকার অথচ এমন চিরকালীন আবেগ-মথিত দুরন্ত পুরুষ-চরিত্র তারাশঙ্কর ছাড়া বাংলা ছোটগল্পে আর কেউ সৃষ্টি করতে পারেন নি। কোনো লেখকের চরিত্র-চিন্তাই অসীম নয়, তারাশঙ্করও একটা বিশিষ্ট পটভূমি থেকেই এদের উত্তোলন করেছেন। খোঁড়া শেখ, পূর্ণ চক্রবর্তী, বিশ্বম্ভর রায়, কালীচরণ বাগ্দী, মুকুন্দ পাল, ফণী মিস্ত্রি, জনাব শেখ, ডাক্তার গড়গড়ি কিংবা রতন হাড়ি—এই পৌরুষেরই এক অপূর্ব শোভাযাত্রা। নারী-কেন্দ্রিক বাংলা গল্পে (উপন্যাসেও প্রধানত) তারাশঙ্কর পুরুষ-বৈশিষ্ট্যের অদ্বিতীয় রূপকার। এই পৌরুষ তির্যকভাবে বিশ্বম্ভর রায়ের 'তুফানে', দুরন্ত মহিষ 'কালাপাহাড়ে' কিংবা 'গবিন সিংহের ঘোড়া'য় পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়েছে।

এই চরিত্রগুলোর প্রধানাংশই—সর্বজনবিদিত ভাবে—একটি সবিশেষ ভূগোল-ভূমির মানবীয় শস্য। যে-সমস্ত কাহিনীর আশ্রয়ে এই চরিত্রেরা আবির্ভূত এবং আলোড়িত, সেসব কাহিনীও এই পটভূমিতেই বৃত্তান্বিত। ফলে, চরিত্র কাহিনী এবং পরিবেশ—এই ত্রি-যন্ত্রের ঐকতান তারাশঙ্করের প্রধান গল্পগুলিতে ঈর্ষাযোগ্য নৈপুণ্যে উৎসারিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত মনে পড়ল, ব্যক্তিগত আলাপে শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র একটা অত্যন্ত দামি কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'আমি গেছি তারাশঙ্কর-শৈলজানন্দের দেশে, দেখেছি ওখানকার মানুষগুলোকে, ও-দেশের মাটিকে। জানো, গল্প ওখানে খুঁজতে হয় না, বানাতেও হয় না। আশ্চর্য মানুষ আর অদ্ভুত ঘটনা নিয়ে গল্প ওখানে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে—শুধু কী করে তাদের কেটে তুলতে হবে এইটুকু জেনে নিতে হয়।'

এই তথ্য থেকে বহু বাঙালি লেখকের দীর্ঘশ্বাস পড়বে। আমরা যেখানে পরিচিত জীবনের পরিমিতির মধ্যে গল্পকে খুঁজি, অতি-ব্যবহৃত চিরকালের চরিত্রগুলোর মধ্যে রহস্য-নিবিড়তা সন্ধান করি, মধ্যবিত্ত-বিকলনের মধ্য থেকে যখন জটিলতার জট খুলতে ঘর্মাক্ত হই—তখন তারাশঙ্কর রাঢ়ের কঠিন প্রাচীন মৃত্তিকার পথ দিয়ে চলতে চলতে অনায়াসে গল্পের হীরে কুড়িয়ে পেয়েছেন। সেই কুড়িয়ে-পাওয়া হীরেকে কেটে এবং সাজিয়ে, সাহিত্যের নিপুণ মণিকার তারাশঙ্কর দুর্লভ রত্নে পরিণত করেছেন তাদের।

সমারসেট মম্‌এর মতো একান্ত গল্প-লেখকেরা দুঃখ করেছেন, আমাদের প্রতিদিনের জীবন থেকে 'গল্প' হারিয়ে যাচ্ছে। তাই গল্পের সন্ধানে, চরিত্র-আবিষ্কারের আকুলতায় তাঁদের অভিযাত্রীর মতো দেশ-বিদেশ পরিক্রমায় যেতে হয়। এ দিক থেকে তারাশঙ্কর নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। তাঁর বীরভূমের বাউড়ী-বাগ্দী-কাহার, বাউল-বৈরাগী-বেদে-সাপুড়ে, তাঁর মানুষগুলোর অন্ধবিশ্বাস-সংস্কার এবং তাদের চরিত্রের প্রবলতা— তাঁর পরিবেশের বিন্দুসীমায় গল্পের সিন্ধু-তরঙ্গ আনতে পেরেছে। সেই তরঙ্গমন্দ্রকে শোনবার এবং আত্মীকরণ করবার সহজাত শিল্প-প্রতিভা তারাশঙ্করের ছিল, তাই স্থানিকতা ছাড়িয়ে তারা বাংলা-সাহিত্যে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

কিন্তু এসবই বাইরের কথা। তারাশঙ্করের ছোটগল্পের (এবং উপন্যাসেরও) প্রধান সৌন্দর্য তাঁর ট্র্যাজিক উপলব্ধির ব্যঞ্জনায়। পৃথিবীর সব মহৎ রচনা— সব মহান সাহিত্যিকই শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজিডির মহাকাশে বিনিষ্ক্রান্ত। এই বোধের মূলে আদি-বিদ্রোহী প্রমিথিয়ুসের বন্ধন, মৃত্যুর বিদ্রূপ, আত্মাতিক্রমণের ব্যর্থতা, পৃথিবীর এক পরিণামহীন চক্রগতি-চিন্তা, দর্শনের নিরুত্তর শুব্ধতা। বস্তুতান্ত্রিক আশাবাদীরও এর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই— তিনিও জানেন না কবে যুদ্ধ-মৃত্যু-ব্যর্থতা-বন্দীত্বহীন ইতিহাসের পাতা নতুন করে খুলে যাবে; আনন্দবাদী জানেন না— কবে সেই অপূর্বতার স্বর্ণদ্বার উন্মোচিত হবে; অস্তিত্ববাদী বলতে পারেন না— কবে সব প্রভাব থেকে তাঁর আত্মা এক নিরঞ্জন শুভ্রতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

তারাশঙ্করের রাজনৈতিক চিন্তা, সমাজ-জিজ্ঞাসা, রিয়্যালিজ্‌ম্‌-ন্যাচারালিজ্‌মের মিশ্র শিল্পরীতি— সব ছাপিয়েও এই বিষাদবোধ প্রথম থেকেই যে একটা বলয় রচনা করে আসছে, তাঁর ছোটগল্পের আন্তর-পরিচয়ও সেইখানেই নিহিত। ন্যাচারালিস্ট আন্দোলনের প্রথম তত্ত্বকার গঁকুর ভ্রাতারা (এমিল জোলা যাঁদের শিষ্য) জীবনের যে নগ্ন-নিষ্ঠুর উপস্থাপনা চেয়েছিলেন, খুব সম্ভব গঁকুর না পড়েও, স্বাভাবিক অন্তর-প্রেরণায় তারাশঙ্কর 'অগ্রদানী' কিংবা 'তিনশূন্যে'র মতো গল্পে তারই সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু এই নির্মম ন্যাচারালাজিম্‌ই তারাশঙ্করের ট্র্যাজিক চেতনাকে ক্রমে ঊর্ধ্বান্বিত করে তুলেছে।

'জলসাঘরে'র কাহিনীতে নবীন এবং প্রাচীনের একটা স্থূল দ্বন্দ্ব বহিরঙ্গে থাকলেও বিশ্বম্ভর রায়ের মৃত্যু যেন হার্কিউলিস অথবা আর্থারের মৃত্যুর মতো মহিমা-ব্যঞ্জিত। জমিদার বিশ্বম্ভরের সঙ্গে 'পৌষ-লক্ষ্মী'র কৃষক মুকুন্দ পালের মৃত্যুও একই ভাবসূত্রে গাঁথা: 'পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মতো'। এ যেন টাইটানের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ার ক্লাসিক আক্ষেপ। লোভী পূর্ণ চক্রবর্তী যখন নিজের সন্তানের পিণ্ড গিলছে— তখন ঔদরিক-লোভের নিরুপায় পাপবিদ্ধ লোকটার উপর গ্রীক ট্র্যাজিডির অমোঘ বিধান নেমে আসছে; সেই একই বিধান-দণ্ডে আখড়াইয়ের দীঘির ধারে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কালী বাগ্দী; 'তিন শূন্যে'র হিসাব-নিকাশ লেখা হচ্ছে বিধাতার খাতার পাতায়; 'দেবতার ব্যাধি'র ডাক্তার আর্তনাদ তুলছে আত্ম-বন্দীত্বের অন্ধকার থেকে, খুনের অপরাধে আদালতে দাঁড়াবার আগেই অনন্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তারাশঙ্করের এই চরিত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার মিকায়েল-আন্‌জিয়োলোর সেই অভিশপ্ত পেশল পুরুষ 'উন দানাতো'কে মনে পড়ে যায়।

পাপবোধ এবং তার যন্ত্রণা, অথচ মুক্তির দুয়ার বন্ধ— তারাশঙ্করের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলো এই ট্র্যাজিক আর্তিতেই উতরোল। শেষ পর্যন্ত আরো একটু অগ্রসর হয়েছেন তারাশঙ্কর— এইসব যন্ত্রণা

হতাশা পরাভবকে এক অধ্যাত্ম-উপলব্ধির গভীরে বিস্তার করে দিয়েছেন। তারই ফলে লেখা হয়েছে 'ইমারত' 'শিলাসন' 'মাটি' কিংবা 'কামধেনু'। বিষাদ এবং বৈরাগ্যে 'সন্ধ্যামণি'র মতো এক দিনান্তিক শ্মশানের মধ্যে এরা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাঁর এই চেতনা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা এবং ক্রীশ্চান মিস্টিসিজ্‌মের এক অপূর্ব যোগফল।

কিন্তু এসব আলোচনা সুদীর্ঘ প্রবন্ধের বিষয়—এখানে তার বিস্তৃতি অনাবশ্যক। আসল কথা, তারাশঙ্করের ছোটগল্প যে আমাদের এমন সুতীব্রভাবে আলোড়িত করে, এমন গভীর বিষাদে মগ্ন করে, চরিত্র এবং পটভূমি ছাড়িয়ে আমাদের উপলব্ধির চতুর্দিকে এমন ব্যঞ্জিত ব্যাপ্তি এনে দেয়—তার মূলে এই ট্র্যাজিক চেতনারই সঞ্চার। আর এই ট্র্যাজেডির কেন্দ্রবিন্দুতে পুরুষ। অ্যান্টিগোন নয়, মীডিয়া নয়, স্বল্পায়তনে এরা প্রমিথিয়ুস, আগামেমনন কিংবা ঈডিপাসের সগোত্র।

তারাশঙ্করের শিল্পরীতি নিয়ে বিতর্ক আছে। তারা 'টেল'-ধর্মী না 'শর্ট স্টোরি'—একদা এইসব অপ্রাপ্তবয়স্ক চিন্তায় আমিও কিছু কালি খরচ করেছি। আজ এ সবই অর্থহীন বলে মনে হয়। তারাশঙ্করের শিল্প তাঁর ব্যক্তিত্ব—ভালোয় মন্দে মিশিয়ে সেইখানেই তাঁর পরিচয়। তা ছাড়া যে কথা আগেই বলেছি, মুখ্য-পরিচয়ে তারাশঙ্কর ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পের শাস্ত্রসম্মত বাঁধা ছকে তাঁর তৃপ্তি নেই—বলশালী আত্মবিস্তারে বার-বার সেই ছক তিনি পার হয়ে গেছেন। মহাকাব্যের মেজাজ যদি সনেটের সীমা ছাড়িয়ে সনেটাতীত কিছু গড়ে তোলে, তা হলে তা-ই স্বয়ংসিদ্ধ, তা-ই তার নিজস্ব শিল্পপরিণাম।

তবু এই গল্পগুলো পড়তে পড়তে একটি অতৃপ্তির কথা ভোলা যায় না। নিজেকে নিয়ে খুব কম গল্প লিখেছেন তারাশঙ্কর, খুব কম। শেষের দিকের কিছু কিছু গল্পে আত্ম আরোপ তিনি করেছেন, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সেরা গল্পলেখক নিজের মধ্য থেকে যে সত্তার বিচিত্র বিকাশ আহরণ করেন, সুদূর এবং সন্নিকট থেকে—কখনো উদ্‌ভ্রান্ত, কখনো উদ্বেলিত হয়ে, কখনো তাত্ত্বিক—কখনো বৈজ্ঞানিক গূঢ়-প্রবেশে নিজের আত্মার দিকে যে অভিযান আজকের সাহিত্যের মৌল-লক্ষণ, তারাশঙ্করের গল্পে সেই 'আমি' সুদুর্লভ। হয়তো রাঢ়ের মাটিতে গল্প আর চরিত্র দু-হাতে কুড়িয়ে পেয়েছেন বলেই এই আত্ম-সন্ধিৎসা তারাশঙ্করের ততটা প্রয়োজন হয় নি, কিন্তু তাঁর মহৎ গল্প-সাহিত্যে এইখানেই বোধ হয় কিছু ফাঁক রয়ে গেল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মস্তক-বিনিময় : টমাস মান্‌। অনুবাদ : ক্ষিতীশ রায়। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইণ্ডিয়ার পক্ষে মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২। চার টাকা।

বাংলা ভাষায় টমাস মান্-এর পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস অনুবাদ সম্ভবত এই প্রথম। টমাস মান্ যে বছর পরলোক গমন করেন (১৯৫৫) সে বছর তাঁর সাহিত্যকৃতি নিয়ে যৎসামান্য আলোচনা হয়েছিল কয়েকটি পত্রিকায়। তার পর তাঁর সম্পর্কে বাঙালি পাঠকের সসম্ভ্রম দূরত্ববোধ বিশেষ হ্রাস পেতে দেখা যায় নি। সম্প্রতি তাঁর

Transposed Heads উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ 'মস্তক-বিনিময়' প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর সম্পর্কে বাঙালি পাঠকের ঔৎসুক্য নতুন করে জেগে উঠবে আশা হয়।

টমাস মান্‌ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও চিন্তাবিদ্‌। তাঁর রচনা ও চিন্তাধারার যথার্থ অনুধাবন শ্রমসাধ্য। ঠিক বারো বছর আগে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইওরোপীয় উপন্যাসের একটা যুগের অবসান হয়েছে। মান্‌ তাঁর উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে সভ্যতা ও তার অবক্ষয়, শিল্প ও জীবন, সৌন্দর্যবোধ ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে দীর্ঘকাল গভীর পর্যালোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই অতি-আধুনিক কালে সেই মননসাধনার সঙ্গে আমাদের সেতু বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে বললে ভুল হয় না।

মান্‌ তাঁর 'ভারতীয় উপাখ্যান' *Transposed Heads* রচনা করেন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে। ইওরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝটিকাবিক্ষোভে তরঙ্গাহত হয়ে তিনি তখন আমেরিকার প্রিন্‌সটোনে বাস করছেন। নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান ও হিটলারী জঙ্গীবাদে তিনি সে সময়ে স্বদেশে অবাঞ্ছিত এবং ইওরোপ ও আমেরিকাতেও সন্দেহভাজন ব্যক্তি। তাঁর জীবন ও চিন্তা তখন গভীর সংকটে আবর্তিত। সহসা এ সময়ে তিনি এই ভারতীয় আখ্যানটি অবলম্বন করে একটি অভিনব 'দার্শনিক কৌতুক' ['metaphysical pleasantry'—দ্র. ভূমিকা, *Joseph and his Brothers*] কেন রচনা করেন তা বিশেষ কৌতূহলের বিষয়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, শিল্পকলা ও অধ্যাত্মকাহিনীর মধ্যে তিনি কি সাময়িক নিষ্কৃতি চেয়েছিলেন? অবশ্য মান্‌ এই উপন্যাসে যেসব তত্ত্বকথার অবতারণা করেছেন তা তাঁর সাহিত্যজীবনে কিছু নতুন নয়, তার সূত্র তাঁর প্রথম উপন্যাস *Buddenbrooks* থেকেই সন্ধান করা যায়।

চার খণ্ডে সম্পূর্ণ দীর্ঘ উপন্যাস *Joseph and his Brothers* রচনায় মান্‌ ষোলো বছর ব্যাপৃত ছিলেন। এই ষোলো বছর যেন একটা পরিপূর্ণ জীবন। এরই অন্তিমপর্বে, অর্থাৎ যোশেফ-উপন্যাসের শেষ খণ্ড *Joseph the Provider* রচনার অব্যবহিত পূর্বে মান্‌ দু-খানি উপন্যাস রচনা করেন— *The Beloved Returns* (১৯৩৯) এবং *The Transposed Heads* (১৯৪০)। নানা কারণে এই উপন্যাসদ্বয় তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনে গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম উপন্যাসের নায়ক স্বয়ং মহাকবি গ্যয়টে— ইতিহাসের বাস্তব পুরুষ ; এবং দ্বিতীয় উপন্যাসের নায়ক দুইজন কাল্পনিক ভারতীয়— শ্রীদমন ও নন্দ, যাদের সঙ্গে ইতিহাসের দূরতম যোগ অনুপস্থিত। এই চরিত্রদ্বয় মান্‌-এর সমস্ত জীবনের *Geist* (Intellect) ও *Natur* (Nature)-এর দ্বন্দ্বের প্রতীক। সে দ্বন্দ্বের সমাধান যেমন মস্তক-বিনিময়ের ভারতীয় আখ্যানে, তেমনি বাইবেলোক্ত যোশেফের চরিত্রেও তিনি সন্ধান করেছেন। সমন্বয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে ক্ষণিক বিরতি ; এর পরই ১৯৪৪এ যোশেফ-উপন্যাসের উপসংহার-খণ্ড *Joseph the Provider*-এর প্রকাশ। এ সমস্তই এক মহৎ ঔপন্যাসিকের সত্যানুসন্ধানের অবিচ্ছিন্ন সাধনা। তাই এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে 'মস্তক-বিনিময়' উপন্যাস তাঁর কোনো আকস্মিক খেয়ালের সৃষ্টি নয়, এ তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবনের অন্বিষ্ট সত্যের বা মৌল 'থিম্‌'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মান্‌ এই উপন্যাসের কাহিনীটি পেয়েছেন বিখ্যাত ভারততাত্ত্বিক হাইনরিখ্‌ৎসিমারের ভারতীয় পুরাণকথাবিষয়ক গ্রন্থ থেকে, এ কথা নিজেই জানিয়েছেন ['I had drawn the material for *The Transposed Heads* from his (Heinrich Zimmer) book on Indian Mythology.'— Maun, *The Genesis of a Novel*, পৃ. ২১]। ভারতীয় ধর্ম দর্শন সমাজ ও শিল্পকলা বিষয়ে তাঁর

ব্যক্তিগত জ্ঞান ও গবেষণাও কিছু কম ছিল না। কাহিনীটি পাঠ করলে ভারতীয় হিসেবে আমরা তার অব্যর্থ প্রমাণ পাই। আর বিশেষত এ কারণেই আমরা এর প্রতি আকর্ষণ ও মমতা বোধ করতে থাকি। ৎসিমার ছাড়া মান্ এ কাহিনীর প্রেরণা গ্যয়টের একটি বিখ্যাত কবিতা (Pariah) থেকেও পেয়ে থাকবেন। জর্মন তথা ইওরোপীয় সাহিত্যে গ্যয়টের সার্থক উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন মান্ এ কথা সর্বজনবিদিত। এই মহাকবির উপর মান্-এর মোট সাতটি নিবন্ধ ও একটি উপন্যাস তার স্পষ্ট নিদর্শন।

গ্যয়টের কবিতাটির পটভূমিও ভারতবর্ষ। এক ব্রাহ্মণবধূ গঙ্গার ঘাটে জল আনতে গিয়ে পরমসুন্দর এক যুবার দর্শন পায়। কলসীতে জল ভরা আর হয় না, শূন্য হাতে সে ফিরে আসে। ক্রমশঃ তার স্বামীর অন্তরে জেগে ওঠে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে সে তার স্ত্রীকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে তরবারির এক আঘাতে শিরচ্ছেদ করে। তাদের সন্তান সেই রক্তাক্ত তরবারি দেখে সব জানতে পারে। হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে সে তখন তার মা-কেই অনুসরণ করতে মনস্থ করে। পিতা তাকে আত্মহত্যায় নিবৃত্ত করে ও মাতার মস্তক দেহের সঙ্গে যুক্ত করতে বলে। পুত্র বিবেচনাহীন দ্রুততায় মাতার মস্তক সেই বধ্যভূমিতে অবস্থিত কোনো সত্যশিরচ্যুত পাপীয়সীর দেহের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। মাতা নতুন দেহে জীবন লাভ করে জেগে ওঠে ও সন্তানকে তার ভুলের জন্যে ভর্ৎসনা করে, অবশ্য বলতে ভোলে না সবই ব্রহ্মার লীলা।

গ্যয়টের কবিতায় সন্তানের এই ভুল অবশ্য ফ্রয়েডীয় 'ভ্রান্তি' নয়— কিন্তু টমাস মান্-এর উপন্যাসে নায়িকা সীতা তার স্বামী ও স্বামীর বন্ধুর মস্তক বিনিময় করেছিল নিজ অবচেতন কামনার প্রবর্তনায়— যা মান্-এর আজীবন ফ্রয়েড-মনস্কতার অনিবার্য ফলশ্রুতি। শুধু অবচেতনের লীলাই নয়, এ উপন্যাসে উপসংহারের মৃত্যুময়তায় ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের সূত্র সহজেই অনুমেয়।

ভারতীয় মাত্রেই বেতালপঞ্চবিংশতির মস্তক-বিনিময়ের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত। বেতালের কাহিনীগুলি ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' ও সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থদ্বয়ে সংকলিত হয়েছিল। বেতালের কাহিনী অবশ্য আরো অনেকে স্বতন্ত্রভাবে রচনা করেছিলেন। এইসব রচয়িতাদের মধ্যে শিবদাস ভট্টের খ্যাতি সর্বাধিক। শিবদাসের রচনার A. Luber সম্পাদিত (১৮৭৫) এবং Heinrich Uhle সম্পাদিত (১৮৮৪) জর্মন সংস্করণের সন্ধান পাওয়া যায়। লাইপ্‌জিগ থেকে প্রকাশিত *Die Vetala Pancavimsatika,* (1915) গ্রন্থটি শিবদাসের গ্রন্থের সর্বশেষ জর্মন সংস্করণ। সুতরাং জর্মন দেশেও এ কাহিনীগুলি বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই।

অষ্টাদশ শতকের সূচনায় সংস্কৃত থেকে প্রথম ব্রজভাষায় বেতালের কাহিনীর অনুবাদ হয়েছিল। এর পর নানা প্রাদেশিক ভাষাতেও এর তর্জমা আরম্ভ হয়। ১৮০৫এ হিন্দীতে 'বৈতাল পচ্চীসী' প্রকাশিত হয়েছিল। এই হিন্দী অবলম্বনেই স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর 'বেতালপঞ্চবিংশতি' বাংলায় রচনা করেন (১৮৪৭)। ভারতীয় ভাষাসমূহে বেতালের যে কাহিনীগুলি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে বিস্তর গরমিল ও রূপান্তর বর্তমান। যেমন হিন্দী, তামিল বা বাংলা বেতালের কাহিনীতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতির ষষ্ঠ উপাখ্যানটি মস্তক-বিনিময়ের। মূল কথাসরিৎ-সাগরের বেতালকাহিনীর সঙ্গে এই উপাখ্যানের প্রভূত অমিল। ছোটোখাটো ব্যাপার বাদ দিলেও একটি মৌলিক পার্থক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূল কথাসরিৎসাগরে নায়িকা মদনসুন্দরী স্বামী ও নিজ ভ্রাতার

মস্তক বিনিময় করেছিল। বিদ্যাসাগরের উপাখ্যানে আছে স্বামী ও তার বন্ধু। বলা বাহুল্য, বেতালের এই শেষোক্ত ধারাই টমাস মান্ তাঁর উপন্যাসে গ্রহন করেছেন। একটি বিষয়ে অবশ্য সবগুলি কাহিনীতেই ঐক্য দেখা যায়। উক্ত নারীর পতি কে হবে, এই গুরুতর প্রশ্নের উত্তরে যুক্তি বিবিধ হলেও সিদ্ধান্ত এক : পতির মস্তক যে দেহে যুক্ত, সেই হবে স্বামী। যুক্তিস্বরূপ কেউ বলছে মস্তক উত্তমাঙ্গ, কেউ বলছে মস্তকেই জ্ঞানবুদ্ধি, কেউ বলছে সংস্কার।

টমাস মান্ এই ক্ষুদ্র আখ্যানটিকে শুধু কাঠামো হিসেবে গ্রহণ করেছেন— তাঁর উপন্যাসের সূচনা বিন্যাস ও উপসংহার একেবারেই তাঁর নিজস্ব। বাইবেলে যোশেফের কাহিনীর আয়তন প্রায় কুড়ি পৃষ্ঠা, কিন্তু তাকে মান্ কিঞ্চিদধিক ২০০০ পৃষ্ঠার এক অতিকায় উপন্যাসে পরিণত করেছেন। মস্তক-বিনিময়েও একই ব্যাপার দেখতে পাই। আসলে মান্ এসব বৃত্তান্ত অবলম্বনে নিজের চিন্তা ও কল্পনাকে তাঁর সেই কেন্দ্রীয় অভিপ্রায়ের অভিমুখে চালিত করেছেন অবাধে। মস্তক-বিনিময়ের ঘটনাটিকে রূপক ধরে নিলে এর মধ্যে সম্ভাব্যতার সীমা কোথাও লঙ্ঘিত হয় নি। যে জটিল সমস্যা মান্ এ উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন তারই নিজস্ব গুণে একে কোথাও অবিশ্বাস্য মনে হয় না। অবশ্য এজন্য কৌশল হিসেবে একটা নৈর্ব্যক্তিক কৌতুক ও বিদ্রূপের ভঙ্গি তিনি পূর্বাপর বজায় রেখেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন প্রেম ও সৌন্দর্যের অপরূপ লাস্যময় লালিত্য।

উপন্যাসের দুই নায়ক, শ্রীদমন ও নন্দ— যেন অধ্যাত্ম শক্তি ও জৈবিক শক্তি, বুদ্ধি ও স্বভাব, Spirit ও Beautyর প্রতীক। তাদের চারিত্রিক বৈপরীত্যই তাদের বন্ধুত্বের ও পারস্পরিক আকর্ষণের ভিত্তি। অথচ মান্-এর লেখনীর বৈশিষ্ট্যে তারা নিছক দুটি তত্ত্ব নয়— তাদের স্ব ভাব আচরণ ও মনস্তত্ত্ব মান্ এত নিপুণ ভাবে ফুটিয়েছেন যে তারা দুটি জীবন্ত চরিত্রে পরিণত, তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ জীবনের সচল প্রবাহের সঙ্গে নিবিড় সংযুক্ত। নায়িকা সীতার রূপলাবণ্যকে কেন্দ্র করে প্রেমের যে বাসনার উদ্বোধন সেইখানেই তাদের সত্যানুসন্ধানে যাত্রারম্ভ।

শ্রীদমন ও নন্দ উভয়েই যেমন সীতার প্রণয় কামনা করে, সীতাও উভয়ের প্রণয়াসক্ত। শ্রীদমনের সঙ্গে বিবাহিত হয়েও তাই সীতা নন্দকে স্বপ্ন দেখে। এই স্বপ্ন দেখার কোনো বিরাম জীবনের মধ্যে নেই। মস্তক ও দেহের বিপর্যয়ে শেষ পর্যন্ত দু-জনই সীতার স্বামীতে পরিণত। তার পর তিনটি সহমরণের এক বিপুল চিতাগ্নিতে সেই স্বপ্নের উপসংহার। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগুনে এমন মিলনান্ত নাটক, বা এতখানি কৌতুকময় বিন্যাসে এমন শোচনীয় ট্রাজেডির হতাশ্বাস মান্ আর কখনো রচনা করেন নি।

কিন্তু এই উপন্যাসে মান্-এর সব থেকে কৃতিত্বের অংশ বোধ করি মস্তক-বিনিময়ের পরবর্তী অবস্থায় চরিত্র তিনটির বিবর্তন কাহিনীতে। যখন দুই বন্ধুর মস্তক স্থান-পরিবর্তন করল তখন সীতার সুখের শেষ রইল না। এখন সে স্বামীর মস্তক ও প্রেমিকের দেহের অধিকারিণী। ভারতীয় উপাখ্যানে হয়তো এই পুনর্বিন্যাস পরস্পরের সুখেরই নিমিত্তে সংসাধিত। কিন্তু মান্-এর কাহিনী এই সুখজনক পরিণামকে অতিক্রম করে গেছে। যাকে সুখ বলে মনে হচ্ছে তা ক্ষণিকের বিভ্রম। স্বপ্ন যখন বাস্তবে রূপায়িত সেই মুহূর্তেই তা ধূলিলুণ্ঠিত। মস্তকের লীলায় পুনরায় দেহের রূপান্তর ঘটতে থাকে। সীতার আয়ত্তগত প্রেমিক-দেহ ক্রমশ স্বামী-দেহে এবং দূরগত স্বামী-দেহ ক্রমশ আকাঙ্ক্ষিত প্রেমিক-দেহে নতুন করে পরিবর্তিত হতে থাকে। কামনার বস্তুকে হাতে পেয়ে আবার সীতা অপ্রাপণীয়ের জন্য কামনায় অন্তরে রক্তাক্ত

হতে থাকে। মানব-মনস্তত্ত্বের অপরিজ্ঞাত রহস্যই তিনটি চরিত্রকে তাদের নিয়তির দিকে টানে। এই উপন্যাসের চরিত্র তিনটির তিন জন্মের সেই কাহিনীকে মান্ এক জীবনের সীমায় এঁকেছেন।

একদা শ্রীদমন ও নন্দ ছিল তাদের নির্বিকার শান্তিতে ও পরস্পর-পরিপূরকতায়। সীতার আবির্ভাব তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এনে দিয়েছিল। সীতার প্রতি তীব্র আসক্তি তাদের পরম সুখের ও সৌন্দর্যের মায়া-আকর্ষণে টানল, যে আকর্ষণ একমাত্র মৃত্যুতেই স্থিতিলাভ করতে পারে। উপন্যাসে সীতার যেন দ্বৈত ভূমিকা: নন্দের মধ্য দিয়ে বস্তুকে চেতনায় উত্তরণ ও শ্রীদমনের মধ্য দিয়ে অধ্যাত্মকে জৈবিকতায় সংস্কারসাধন। তার মধ্য দিয়েই দুই নায়ক জীবন ও মৃত্যুর তাৎপর্য আবিষ্কার করতে পেরেছে।

এই উপন্যাসে মান্ তাঁর পরিণত দার্শনিক সচেতনতা সৌন্দর্যবোধ ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের অভাবনীয় সম্মিলন ঘটিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষেরই অপর একজনে পরিণত হওয়ার সূক্ষ্ম বাসনাকে শির ও শরীরের অলৌকিক বিপর্যয়ের রূপকের মধ্যে উপস্থাপিত করে মান্ বাস্তব সত্যের একটি নতুন স্তর নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। আসঙ্গলিপ্সা ও ইন্দ্রিয়চেতনার রূপায়ণে মান্ এই উপন্যাসে যে অভিনিবেশ অর্পণ ও সিদ্ধিলাভ করেছেন তা তাঁর আর কোনো উপন্যাসে দেখা গেছে কি না সন্দেহ। পরিশেষে বলা যায়, সীতার পুত্র ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন সমাধি চরিত্রটি উপস্থাপনার মধ্যে মান্ যেন এক নতুন মানবতার স্বপ্ন দেখেছেন। উপন্যাসের উপসংহারে তার মধ্যেই যেন নতুন কালের মানুষ আপনার মুখ দেখতে পায়।

টমাস মান্-এর এই অত্যাশ্চর্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়। কাহিনীটি যথাযথ ভারতীয়ত্বে প্রত্যাবর্তন করেছে, এটাই তাঁর অনুবাদের সব চেয়ে উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। এই ভারতীয়ত্বই মান্-এর অভিপ্রেত ছিল বোঝা যায়। অনুবাদচর্চায় পশ্চিমী সাহিত্যের ভারতীয়করণ সমর্থনযোগ্য কি না তা নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু ভারতীয় উপাখ্যানের পশ্চিমী রূপকে যথাযথ ভারতীয়করণ খুবই বাঞ্ছনীয়।

ভারতীয়ত্বই এই আখ্যানকে অপরিমেয় শ্রী ও শোভা দান করেছে। অথচ উপন্যাসটি ১৯৪১এ যখন প্রথম ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল তখন পশ্চিমী সমালোচকরা এই ব্যাপারটাকেই বিশেষভাবে আক্রমণ করেছিলেন [দ্র. New Statesman and Nation, Nov. 15, 1941; The Spectator, Aug. 22, 1941]। এর তাৎপর্য তাঁরা যথার্থ অনুধাবন করতে পারেন নি, বলাই বাহুল্য। অবশ্য এজন্যে হয়তো আংশিকভাবে অনুবাদিকা H. T. Lowe-Porterও দায়ী।

কথিত আছে টলস্টয় তাঁর *War and Peace*এর একটি বিখ্যাত ইংরাজি তর্জমা লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছিলেন, 'better than the original'। এটি বক্রোক্তি কি না তা তথ্যদাতা জানান নি। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে Lowe-Porter -অনূদিত *Transposed Heads* এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায়ের 'মস্তক-বিনিময়' পাশাপাশি পাঠ করে নির্দ্বিধায় বলা যায়, বক্রোক্তির বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

টমাস মান্-এর উপন্যাস অনুবাদ অত্যন্ত দুরূহ। শ্রীযুক্ত রায় সেই অসাধ্য কর্ম অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন এবং কোনো একটি স্তবকেও তর্জমার জড়তা এর সৌন্দর্য গ্রহণে বাধা হয় নি। এবারে তাঁর হাতে *Lotte in Veimar* বা *Holy Sinner*এর তর্জমা দেখতে ইচ্ছা হয়।

নির্মাল্য আচার্য

স্বরলিপি

অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান।
সূর্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু
তার লজ্জাকে সান্ত্বনা দেবার তরে।
মর্তের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে
তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব।
প্রিয়ে, সেই করুণা কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি।[১]

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II মা মা -পা । পা পা -মা I পা পা ধা । না -া [ন]র্সনা I

অ সু ন্ দ রে র্ প র ম বে ০ দ০

I ধপা -া -া । -পা -ধা -পধা I মা -া পা । পা পধপা -মপা I

না০ ০ ০ ০ ০ ০য়্ সু ন্ দ রের্ আ০০ ০০

I [প]মগা -া -া । -া -া -া I পা -া ধা । [ধ]র্সা -া র্সর্র:র্স: I

হ্বা০ ০ ০ ০ ০ ন্ সূ র্ য র ০ শ্মি০০

I না [ন]র্সা -া । র্সনা না -র্সা I ধা না নর্সা । [ধ]না ধপা -া I

কা লো ০ মে০ ঘে র্ ল লা টে০ প রা০ য়্

I পা -া না । ধা না -া I -া -া -া । -া গা -মা I

ই ন্ দ্র ধ নু ০ ০ ০ ০ ০ তা র্

I মা -া পা । পা পা -মা I পা পা -ধা । না না -র্সা I

ল জ্ জা কে সা ন্ ত্ব না ০ দে বা র্

১ শাপমোচন নাটকের গন্ত গান

I ^ধ^না ধপা -া । ধা পমা -া I পা -া না । ধা না -া I
ত রে॰ ॰ প রা॰ য় ই ন্ দ্র ধ নু ॰

I -া -া -া । -া -া -া I না -া ^র্স^র্জ্জা । র্জ্জা র্জ্জা র্জ্জা I
॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ম র্ তে র অ ভি

I র্জ্জর্রা র্রা -া । -র্রা -র্জ্জা -র্সা I র্সা -া র্রা । র্রা র্রা র্রর্জ্জাঃর্রঃ I
শা॰ পে ॰ ॰ ॰ ॰ স্ব র্ গে র ক রু॰॰

I র্সনা -া -া । { না না -া I না -া -র্সা । র্সা -া -া I
ণা॰ ॰ ॰ য খ ন্ না ॰ ॰ মে ॰ ॰

I ^প^র্সা র্সা র্সা । র্সা না -র্সা I ধা না -া । না ^র্র^র্সা -না I
ত খ নি তো মু ন্ দ রে র্ আ বি র্

I ধপা (-া -া)} । -া সা । সা সা -রা I রা -া -া । রা -া -গমা I
ভা॰ ॰ ব ব প্রি য়ে সে ই ক ॰ ॰ রু ॰ ॰॰

I ^র^গা -া গা । গা গা -মা I রা গা -া । মা পা -া I
ণা ॰ কি তো মা র্ হৃ দ য় কে কা ল্

I মা পা -া । পধা পধপা -মপা I মগা -া -া । -া সা -া I
ম ধু র্ ক॰ রে॰॰ ॰॰ নি॰ ॰ ॰ ॰ সে ই

I সা -া -রা । রা -া -গমা I ^র^গা -া -া । -া -া -া II II
ক ॰ ॰ রু ॰ ॰॰ ণা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

সম্পাদকের নিবেদন

বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্বিংশ বর্ষে পদার্পণ করল।

পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একক চেষ্টায় বঙ্গীয় শব্দকোষের মত বিরাট অভিধান রচনা করে প্রমাণ করেছেন যে, ধৈর্যের নিষ্ঠার ও শ্রমের সমবায়ে সব কাজ করাই সম্ভব, কোনো কাজই আর দুঃসাধ্য থাকে না। এই শব্দকোষ সংকলন প্রণয়ন ও মুদ্রণ করতে তাঁর একচল্লিশ বছর সময় লেগেছে— ১৩১২ থেকে ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

২৩ জুন ১৮৬৭ (১০ আষাঢ় ১২৭৪) তাঁর জন্ম। অর্থকৃচ্ছ্র তার জন্য তাঁর লেখা-পড়ার অনেক অসুবিধা ঘটে। তিনি যখন তাঁর দেশের স্কুলে পড়তেন তখন রবীন্দ্রনাথ এক বছর তাঁকে বৃত্তি দিয়েছিলেন, এবং তাঁর কলেজের অধ্যয়নও সম্ভব হয় রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায়। তার পর রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিনি আসেন শান্তিনিকেতনে। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়; এর কয়েক মাস পরে, ১৩০৯ সনের শ্রাবণে, তিনি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৩০৯ থেকে ১৩৩৯ পর্যন্ত হরিচরণ শিক্ষাভবনের প্রধান-সংস্কৃত-অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মানিত করেছেন, ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৯ (২৮ পৌষ ১৩৬৫) হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন।

সতীশচন্দ্র রায় এইরূপ নিষ্ঠার আর-একটি দৃষ্টান্ত। এই সংখ্যায় প্রকাশিত রচনায় তাঁর জীবনের ও কর্মের কথা বিবৃত আছে। তিনিও প্রায় চল্লিশ বছর বৈষ্ণব-পদাবলীর আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। তার ফলে শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর মত সুবিশাল সংকলনগ্রন্থ প্রণয়ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

নূতন বর্ষের এই প্রথম সংখ্যায় অন্যান্য রচনার সঙ্গে এই মনীষীদ্বয়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ রচনা প্রকাশ করে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হল।

১ শ্রাবণ ১৩৭৪

স্বী কৃ তি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত চিত্র দিল্লির শ্রীরামকুমার কেজরিওয়ালের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সতীশচন্দ্র রায়ের আলোকচিত্র 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু' গ্রন্থ থেকে এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোকচিত্র 'মনীষী-জীবনকথা' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

পিতা থেকে পুত্রে প্রায় আড়াই হাজার বছর যাবৎ যে কলা কুশলতা বংশপরম্পরায় পিতা থেকে পুত্রে সঞ্চারিত হয়েছে, বর্তমানের হস্তচালিত তাঁতের বস্ত্রাদিতে, আমরা তারই প্রতিফলন দেখতে পাই। যুগ যুগ ধ'রে বহু শিল্পীর সৃজনী প্রতিভা এই সুপ্রাচীন শিল্পটিকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। গত কুড়ি বছরের স্বাধীন আবহাওয়ায় সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যের অনুকূল পরিবেশে হস্তচালিত তাঁত-শিল্পটি অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কার্পাসজাত বস্ত্রাদির উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত বর্তমানে বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার ক'রে আছে এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জানেন না যে এই মোট উৎপাদনের এক চতুর্থাংশই তাঁতে উৎপাদিত হয়েছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্পে যেখানে ৮০ লক্ষ কর্মী তাঁদের জীবিকা অর্জন করেন সেখানে কাপড়ের কলগুলি মাত্র ১০ লক্ষ কর্মীর জীবিকার সংস্থান করে। হাতের তাঁতের তাঁতীগণের কাছে এই শিল্পটি শুধুমাত্র তাঁদের জীবিকার উপায় নয়, এটা তাঁদের একটা জীবনধারা।

ভারতীয়
তাঁতশিল্প
আড়াই হাজার
বছরের
কলা কুশলতা
ও ঐতিহ্য

বিশ্বভারতী পত্রিকা

নন্দলাল বসু বিশেষ সংখ্যা

আচার্য নন্দলাল বসুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আচার্য নন্দলাল-অঙ্কিত একবর্ণ ও বহুবর্ণ অনেকগুলি চিত্রে ও বিশিষ্ট লেখকদের রচনায় এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। মূল্য দশ টাকা।

বিশ্বভারতীতে টাকা জমা দিয়ে যাঁরা বার্ষিক গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত আছেন এই বিশেষ সংখ্যাটি তাঁরা সাড়ে সাত টাকায় সংগ্রহ করতে পারবেন। ডাকমাশুল দুই টাকা।

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৪ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪ · ১৮৮৯ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৪ সংখ্যা ২ · কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪ · ১৮৮৯ শক

চিঠিপত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

[শিলাইদা। ফেব্রুয়ারি ১৯১৫]

কল্যাণীয়েষু

সেই যখন জাপানি মাল জাহাজে যাওয়া হল না তখন কলম্বো থেকে দামী জাপানী জাহাজে যাবার ত দরকার দেখি নে। আমার যতদূর মনে পড়ে তাতে বোধ হচ্চে জাপানী জাহাজের ভাড়া মেসেজারির চেয়ে বেশি বই কম নয়। ফরাসী জাহাজে কুকদের যোগে যাওয়াই ত ভালো। জাপানীকে বলিস্ তিনি দুশো টাকা নিয়ে তাঁদের Cargo জাহাজে গিয়ে সেই জাপানে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন— নইলে প্রথমত কলম্বো পর্য্যন্ত রেল ভাড়া তার পরে জাহাজ ভাড়ায় বেশি টাকা পড়ে যাবে। গবর্ণর ১৯শে তারিখে আসবেন তার পরে দু চারদিন বাদে বোধহয় তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, তার পরে কিছুদিনের মত বোলপুরে গিয়ে সব ঠিকঠাক করতে হবে তার পরে দক্ষিণে রওনা হয়ে দুই একজায়গায় দু চারদিন থেমে থেকে যেতে হবে অতএব ৯ই মার্চ্চের আগে বোধহয় যাওয়া সম্ভব হবেনা। অবশ্য জাপানী জাহাজে যদি ভাড়া কম হয় তাহলে সেইটেই ধরা যাবে— তাহলে ২রা মার্চ্চই ভাল।

Gaurlay-র initialটা কি ঠিক বোঝা যাচ্চে না— বোধহয় W. R.— তাই না? যাই হোক্ তোকে চিঠি পাঠাই তুই তার ঠিকানায় রওনা করে দিস্।

আগামী শুক্রবারে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে— ডাক্তার মৈত্রের তলব।

মাছ আজ ভোরে বোধহয় পেয়েছিস্। কিছু অসময় হল বলে বোধ হচ্চে। আমার ইচ্ছা ছিল কাল সকালে পৌঁছয়— অম্বাচরণের তাড়ায় এই গোলটা ঘটল।

শাস্ত্রী মশায় সেই জমিটার জন্যে ইতিমধ্যে আমাকে দু খানা চিঠি লিখেছেন। আমরা যাবার আগে সেটা যাতে পরিষ্কার হয় করিস্।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

• খবরের কাগজ পাঠাতে বলে দিস্— আজ পাই নি।

২

ওঁ

[শান্তিনিকেতন। ফেব্রুয়ারি ১৯১৫]

কল্যাণীয়েষু

রথী, ডাক্তার মৈত্রের সভার দেরি হয়ে গেল তাই ভাবছি তোরা এসে এখানকার কাজ এই বেলা সেরে গেলে ভাল হয়। দ্বিপু তোর জন্যে ভারি ব্যস্ত। গভর্ণর আসবে তার পরামর্শ করতে চায়। এখানকার টাকাকড়ির সুব্যবস্থা করতে হবে। আজই আমি সুরুলে যাচ্ছি। ক্লান্ত হয়ে আছি। মীরার জন্যে একটা নেটের মশারি নিয়ে আসিস্। একটা মোটা মশারিতে শোয় তাতে ওর বিশেষ কষ্ট হচ্চে বলে বোধ হল। Bengal Pharmaceutical Works থেকে Extract of Basak— এক শিশি ওদের জন্যে আনিস্ খোকা মীরার খুব বেশি রকম সর্দ্দি কাশি।

বাবা

৩

ওঁ

[সুরুল। ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯১৫]

কল্যাণীয়েষু

শাস্ত্রীমশায় সেই জমিটার জন্যে তাগিদ করচেন। ওটা উদ্ধার করে নেওয়াই ত ভাল। যতদিন শাস্ত্রীমশায়ের বিদ্যালয় থাকবে ততদিন তাঁরা এটা ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু বিদ্যালয় বন্ধ হলেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় এটা অধিকার করবে এই সর্ত্ত থাকা উচিত। সুরেনের জমি সম্বন্ধেও এই রকম ব্যবস্থা যেন হয়।

আমাকে গোটা ছয়েক টিনের দুধ পাঠাস। ছয়টা বড় টিন না পাঠিয়ে এক ডজন ছোট টিন পাঠাইলেই ভাল হয়। এখানকার সেই হিন্দুস্থানী চাকর সব ছেড়ে গেছে। প্রসন্ন তাদের সঙ্গে পেরে ওঠেনা তারাও ওর সঙ্গে পারে না। এমন অবস্থায় শান্তিনিকেতনের থেকে রসদ আনানোর ব্যবস্থা করার চেয়ে টিনের দুধ শ্রেয়। বিশেষত ঠিক সকালেই ব্যবহার করে আমার কাজে বস্‌তে পারি। দেরি হলে আমার লেখার অনেক ভালো সময় নষ্ট হয়ে যায়।

Cherry tooth Paste— এক কৌটো চাই। আর তুই আসবার সময় আমার সেই ওষুধ এক বোতল সঙ্গে আনিস। ততদিন চল্‌বে। ওটাতে উপকার পেয়েছি।

কলকাতার কাঠের আড়তে একবার খবর নিয়ে দেখিস্ তারা এখান থেকে কাঠ কিনে নিতে রাজি আছে কিনা। প্রসন্ন এক এক গাড়ি বেচবার ব্যবস্থা করেচে কিন্তু কিছু করে উঠতে পারচে বলে মনে হচ্চে না। শেষকালে হয়ত বিনা পয়সায় ওগুলো সরিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে— যেমন ইতিপূর্ব্বে একবার করা হয়েছিল।

আমার নাটকটা আজ লেখা হয়েছে। এইবার একবার revise করতে হবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

[শান্তিনিকেতন। মার্চ ১৯১৫]

কল্যাণীয়েষু

তুই লিখেচিস পার্সেল পোষ্টে এখানে চাঁদোয়া মছলন্দ আসন প্রভৃতি পাঠালি। লোকের হাত দিয়ে পাঠানোই কি ভাল ছিল না। মিথ্যা একটা উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হচ্চে। আশা করি কাল পাওয়া যাবে।

কয়েকদিন পূর্বে Indian Press থেকে চিঠি পেয়েছি যে তাঁরা রেজেষ্ট্রি পোষ্টে প্রুফ কলকাতার ঠিকানায় পাঠিয়েছেন আজ পর্য্যন্ত পাইনি। সেটা কি ওখানেই পড়ে রয়েচে ?

কুষ্টিয়ায় যে এঞ্জিন ও lathe প্রভৃতি পড়ে আছে সেগুলো আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা শীঘ্র করা আবশ্যক। আমরা চলে গেলে কবে কি হবে তার ঠিক নেই।

মণিলালকে প্রুফ পাঠাবার তাড়া লাগাস।

আমার চষমা কলম যা পাঠিয়েছিস তাও এসে পৌছয়নি।

মোটর গাড়ি এখানে পাঠাবার প্রয়োজন নেই। লাটসাহেবরা নিজের দুখানা মোটর সঙ্গে আনবেন।

Uniformগুলো যেন সময়মত পাওয়া যায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

ওঁ

[শান্তিনিকেতন। মার্চ ১৯১৫]

কল্যাণীয়েষু

তুই এখন আস্‌তে পারলিনে তাতে আমি খুসি হলুম। কারণ এখানে খাওয়ার বন্দোবস্ত নিয়ে একটা ভারি গোলমাল চল্‌চে। ছেলেরা গান্ধির উপদেশে নিজেরাই রাঁধবার ভার নিয়ে কাজ চালিয়ে দিচ্চে। এই নিয়ে সত্য মিথ্যা নানা কথা ও উত্তেজনার উৎপত্তি হয়েছে। এর মধ্যে তুই এসে পড়লে আবার একচোট আলোচনা আন্দোলনের ধুম পড়ে যেত। কাজটা দুঃসাধ্য অথচ আরম্ভ হয়ে গেছে। এতে আমাদের আর্থিক সমস্যা এবং নানা সমস্যার মীমাংসা হল। সকলের চেয়ে, এতে ছেলেদের শিক্ষা হবে এবং এতদিন পরে আমাদের আশ্রমের ভাবটি পুরাপুরি জাগবার আয়োজন হবে। ছেলেদের সকলেই উৎসাহী, শিক্ষকদের কেউ কেউ নারাজ। তোকে নিজের দলে পাবার জন্যে অনেকে উৎসুক এমন অবস্থায় তোর দূরে থাকাই কর্ত্তব্য। কিছুদিন চুপ করে থাকলেই সব আপনিই ঠিক হয়ে যাবে। এর মধ্যে জটিলতা ঢের আছে কিন্তু সে সমস্ত আপনিই মিটে যাবে— আমরা ধৈর্য্য ধরে চুপ করে থাকতে পারলেই কোনো মুস্কিল থাকবে না।

কারমাইকেল সাহেবের জন্য তোর ভাবনা নেই সে আমরা সব ঠিক করে দেব। অবশ্য দ্বিপু তোর জন্যে ছটফট করচে হয়ত কোন্‌দিন তোকে টেলিগ্রাফ করে দেবে কিন্তু তুই ভাবিস্‌নে।

জিনিষপত্র এবং আমার চষমা প্রভৃতি এলে তোকে জানাব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ওঁ

[কুষ্টিয়া। জুলাই ১৯১৫]

কল্যাণীয়েষু

রথী, আজ ভোরে বোটে করে কুষ্টিয়া এসেচি। নিরঞ্জনবাবুকে পাল্কী করে শিলাইদহে নিয়ে যাওয়া ফিরে পাঠানো এমন হাঙ্গাম যে তার চেয়ে আমার আসাই সুবিধা। এমন সময় নিখিলকে দেখে মনটা আরাম বোধ করল। আমার দ্বারা ওদের বিশেষ কোনো সুবিধা হবে বলে বোধ হয় না— কারণ রাজা আমাকে ভয় করে— আমি কোনো লোককে বেচে দিলে রাজা তাকে নিয়ে আরাম বোধ করবে না। তাই আপাতত লালুকে একটা চিঠি লিখে সমস্ত খবর জানবার চেষ্টা করা গেল।

আজ এখনো তোদের ডাকের চিঠি পাই নি শিলাইদা থেকে আসতে দেরি হবে। যাই হোক্ কাওয়াগুচির হাত থেকে নিষ্কৃতি নিতে হবে। তার প্রধান কারণ প্রজাদের অবস্থা বড় খারাপ— তাতে আমার মনটা ব্যথিত হয়ে আছে— যথাসাধ্য এদের সাহায্য চেষ্টা করা উচিত— এখন এদের অনাহারের মুখে ফেলে রেখে কিছুতেই জাপানে চলে যেতে আমার মন সরচেনা। দ্বিতীয়ত কাওয়াগুচির সঙ্গে এক জাহাজে শরৎদাস যাবে— এ আমার Seasickness-এর চেয়েও নিদারুণ। একা কাওয়াগুচিই যথেষ্ট, তার উপরে শরৎদাস আমার সইবে না। অতএব এবার জাপান রইল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Unconscious memory আর Haldane's Life and Personality বই দুটো নিখিলের হাত দিয়ে ফেরৎ পাঠাচ্ছি। Haldane-এর বইটা প্রমথর— পড়ে দেখিস তোর ভাল লাগবে। আমাকে কিছু বই পাঠাস।

ব্যক্তি ও প্রসঙ্গ -পরিচয়

অম্বাচরণ। অম্বাচরণ মৈত্র : জমিদারের সার্ভে আমিন

ডাক্তার মৈত্র। ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র

ডাক্তার মৈত্রের সভা। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর উদ্‌বোধন সভা। পরে ২৮ মার্চ হিতসাধনমণ্ডলীর প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'পল্লীর উন্নতি' ভাষণ দান করেন। ভাষণটি পল্লীপ্রকৃতি গ্রন্থে সংকলিত।

লাটসাহেব। ২০ মার্চ ১৯১৫ লর্ড কারমাইকেল ও তাঁহার পত্নী শান্তিনিকেতন দেখতে আসেন।

দ্বিপু। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ মীরা। কবির কনিষ্ঠা কন্যা খোকা। নীতীন্দ্রনাথ (১৯১২-৩২)

ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে প্রুফ। দশ খণ্ডে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ (১৯১৫-১৬)। ১-৬ খণ্ড ১৯১৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

মণিলাল। পরলোকগত সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কাওয়াগুচি। জাপানী পরিব্রাজক শরৎদাস। পর্যটক পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস

প্রমথ। প্রমথ চৌধুরী সুরেন। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটক। সম্ভবত 'ফাল্গুনী'

রসতত্ত্ব : শিল্পসম্ভোগ

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য

দার্শনিক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'The Concept of Rasa' (*Studies in Philosophy*, VOL. I. ১৯৫৬, পৃ. ৩৪৯-৩৬৩) প্রবন্ধটির দুই ভাগ। প্রথম ভাগ 'Artistic Enjoyment', দ্বিতীয় ভাগ 'The Beautiful and the Ugly'। এখানে 'Artistic Enjoyment'-অংশটি (পৃ ৩৪৯-৩৫৭) অনূদিত হল।

তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কাছে— বিশেষত যাঁরা নন্দনতত্ত্বে আগ্রহী তাঁদের কাছে— এ প্রবন্ধ সুপরিচিত। আধুনিক কালে অনেকেই Phenomenologyর দৃষ্টিকোণ থেকে আর্টের আলোচনায় আগ্রহশীল হয়ে উঠছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবন্ধটিতে এই দিক থেকে যে বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিশ্চয়ই তাঁদের অবিদিত নেই। বাংলা ভাষায় নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় যাঁরা উৎসাহী, বিশেষ ক'রে তাঁদের দৃষ্টি এই প্রবন্ধের দিকে আকর্ষণ করতে চাই। কেবল দৃষ্টিকোণের বিশেষত্বের জন্যই নয়, একাধিক কারণে।

কৃষ্ণচন্দ্রের মৌলিকতা ও তাঁর রচনারীতির দুরূহতার কথা সর্বজনবিদিত। বক্তব্যের অপূর্বতা, বাচনের সংহতি এবং শব্দপ্রয়োগের বিশিষ্টতার কারণে অনেক সময় কৃষ্ণচন্দ্রের রচনা সাধারণ পাঠকের অর্থগ্রহণ-ক্ষমতাকে নির্মমভাবে অতিক্রম করে যায়। সাধারণ বোধগম্যতার খাতিরে এ অনুবাদের দু-এক জায়গায় আক্ষরিক আনুগত্যকে বিসর্জন দিতে হয়েছে। ভরসা করি, মর্মগত বিশ্বস্ততার কোনো হানি ঘটে নি।

—অনুবাদক

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে রস কথাটির ব্যবহার এত বিশিষ্ট যে, ইংরেজিতে এ শব্দটির যথাযথ সমার্থক খুঁজে পাওয়া কঠিন। রস বলতে আক্ষরিক ভাবে যা যা বোঝায়, তার মধ্যে থেকে দুটি অর্থকে এখানে বেছে নেওয়া যাক। এক, রস হল একটা সারাৎসার, যাকে বলে নির্যাস বা 'এসেন্স', অর্থাৎ কিনা একটা নির্যাসিত সত্ত্ব। দুই, রস হল একটা অনুভবের বিষয়, একটা আস্বাদ্য জিনিস। নন্দনতত্ত্বে এই দুটো অর্থই রস কথাটার মধ্যে একসঙ্গে মিশে আছে। এই রকম মিশ্রণের ফলে রস মানে দাঁড়িয়েছে অনুভূতির সারাৎসার— অনুভূতি-নির্যাস। তা এমন এক বস্তু যা কখনো বোঝায় চিরন্তন কোনো-এক অনুভূতিকে, আবার কখনো-বা বোঝায় অনুভূতির বিষয়ীভূত চিরন্তন কোনো-এক আদর্শকে— অনুভূত কোনো চিরন্তন মূল্যকে। নন্দনতত্ত্বে রস কথাটা এই দুই অর্থেই নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নির্যাস বা সত্ত্ব ব্যাপারটা সাধারণত একটা বুদ্ধিলব্ধ তত্ত্ব। তাই এ ক্ষেত্রে অনুভূতির সত্ত্ব বা অনুভূতি-নির্যাস বলতে ঠিক যে কি বোঝাচ্ছে তার একটু ব্যাখ্যা দরকার। ন্যায়শাস্ত্রে যাকে 'সামান্য' (universal) বলা হয়েছে, নির্যাস এখানে ঠিক তা বোঝাচ্ছে না। কেউ কেউ মনে করেন যে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে বস্তু-নিচয়ের মধ্যে যে 'সামান্য'-কে আমরা বস্তুর নির্যাসিত সত্ত্ব বলে জানি, অনুভূতির ক্ষেত্রে সেই 'সামান্য'-কেই

আমরা ঝাপ্‌সা ভাবে রস রূপে উপলব্ধি করি। ভারতীয় শিল্পদর্শনে কোথাও এ রকম ধরণের কোনো ইঙ্গিতমাত্র নেই। কেউ কেউ আবার এ রকমও মনে করেন যে, ন্যায়শাস্ত্রে যার নাম 'সামান্য' আর জীবনের ক্ষেত্রে যার নাম 'আদর্শ', ও দুই-ই অভিন্ন বস্তু; এবং সেই আদর্শই যখন কিনা অনুভূত হয়, তখন তার নাম হয় রস। অর্থাৎ আদর্শের অনুভূতিই হল রস। রস সম্পর্কে ভারতীয় ধারণা অন্য রকম। ভারতীয় মতে, রস আর সর্বজনীন বা সামান্য সত্য, এ দুই মোটেই এক নয়। রস আর আদর্শ— তা সে সাধ্য বা সাধিত যে-রকম আদর্শই হোক-না কেন— এরাও এক নয়। রসকে বুঝতে হবে একান্তভাবে অনুভূতির পথেই ; সম্পূর্ণভাবে অনুভূতিরই মধ্যে দিয়ে। রসকে যদি নির্যাসিত সত্ত্ব বা আদর্শ বলি, বুঝতে হবে তা নিতান্তই উপমা হিসাবে বলা। উপমাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে বিপদ ঘটতে পারে— সে শিল্প-তত্ত্বের ক্ষেত্রেও যেমন, শিল্পবস্তু-বিশেষের সমালোচনার ক্ষেত্রেও তেমনি। (নন্দনতত্ত্বে কোনো রকম দার্শনিক অথবা ধর্মীয় পূর্ব-স্বীকৃতিকে শিরোধার্য করে নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া সঙ্গত নয়, অন্তত গোড়ার দিকে তো নিশ্চয়ই নয়)। তার কারণ, শিল্পানুভূতির কাছে যে জিনিস মূল্যবান, বুদ্ধির কাছে বা বাসনার কাছে তার কোনো মূল্য— অন্তত ততটা মূল্য— না-ও থাকতে পারে। কিন্তু নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে অনুভূতির রায়কেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা উচিত।

২। 'রস' মানে হল রসোপভোগ— নান্দনিক (aesthetic) সম্ভোগ। আবার এ-ও বলা যায় যে, রস হল তাই যা কিনা নান্দনিক সম্ভোগের বিষয়বস্তু— যাকে নান্দনিক ভাবে ভোগ করা হচ্ছে তাই। এই নান্দনিক সম্ভোগ ব্যাপারটা যে ঠিক কী, তা সব থেকে ভাল করে বোঝা যাবে যদি একে আমরা অন্যান্য নানা রকম অনুভূতির পাশাপাশি রেখে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। একটু পরেই আমরা দেখতে পাব যে, শিল্পানুভূতি জিনিসটা মোটেই আর-পাঁচটার মতন সাধারণ একটা অনুভূতিমাত্র নয়, এ এক বিশিষ্টতম শুদ্ধতম অনুভূতি (the feeling par excellence)। অন্য অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক স্তরে— আমাদের মনের একটি সম্পূর্ণ অভিনব ভূমিতে এর অধিষ্ঠান। অনেক সময় আমরা অনুভূতি-বিশেষের স্থান-নির্ণয় করতে চেষ্টা করি তার সত্যতা দিয়ে, অথবা তার বিষয়বস্তু দিয়ে। অথবা মানস-বিবর্তনের ঠিক যে ধাপটিতে সেই অনুভূতির জন্ম ঘটল, সেই ধাপটিকে দিয়ে। কিন্তু অনুভূতি-বিশেষের তাৎপর্য বা মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে এ পন্থা একেবারেই অচল। মনোভূমির কোন্ স্তরে বিচার্য অনুভূতিটির অধিষ্ঠান, একমাত্র তাই দিয়েই তার মূল্য নিরূপণ সম্ভব হতে পারে।

৩। কোনো একটা বিষয়ের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং সেই প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রতি সহানুভূতি— এ দুটো নিশ্চয়ই একটু পৃথক্ ধরণের ব্যাপার। এই দুই ধরণের অনুভূতির পার্থক্যকে অনুধাবন করার মধ্যে দিয়েই আমরা অনুভূতি-বিশেষের মূল্য বা তাৎপর্য-বিচার শুরু করতে পারি।

বিষয়ের সম্ভোগ, বিষয়কে সম্ভোগ করা— এ রকম কথা আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি। এই রকম সকর্মক প্রয়োগের ক্ষেত্রে 'সম্ভোগ'-ক্রিয়াটির যথার্থ তাৎপর্য কী ? যে বিষয়টিকে সম্ভোগ করা হচ্ছে, সেই বিষয়বস্তুটি নিশ্চয়ই সম্ভোগ-ব্যাপারের একটা উপায় মাত্র নয়। অন্তত ভোক্তার নিজের কাছে কখনোই সে-রকম মনে হতে পারে না। ভোক্তার অনুভবে সম্ভোগের বিষয়বস্তু আর সম্ভোগক্রিয়া এ দুয়ের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট ভেদ ধরা পড়ে না। এই দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে, বিষয় এবং বিষয়ীর মধ্যে অন্যান্য ক্ষেত্রে যে রকম সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা হয়ে থাকে, অনুভূতির ক্ষেত্রে সেই ভেদ

অবলুপ্ত। সম্ভোগের ক্ষেত্রে বিষয়ী অর্থাৎ ভোক্তা আপন অলক্ষ্যে সম্ভোগের বিষয়কে প্রভাবিত করে, আবার তেমনি বিষয়ের দ্বারা নিজেও প্রভাবিত হয়। ভোক্তার কাছে ভোগের বিষয়টি বিশুদ্ধ তথ্যমাত্র নয়, আরো কিছু। ভোক্তার দৃষ্টিতে বিষয়টি নিজেই যেন মূল্য-সমন্বিত, বিষয়বস্তুর চেহারার মধ্যেই ভোগ্যতা বা আস্বাদ্যতা যেন আপ্‌না-থেকে ফুটে রয়েছে। অন্য দিকে, সম্ভোগের ক্ষেত্রে, ভোক্তাও বিষয়ের সঙ্গে নিজের পার্থক্যকে—বিষয়ের থেকে নিজের দূরত্বকে—বজায় রাখতে পারেন না। বিষয়বস্তুর আকর্ষণে ভোক্তা নিজেই এসে যেন বিষয়ে সংসক্ত হন, বিষয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েন।

৪। এইবারে এমন একটি অনুভূতির ক্ষেত্রকে ধরা যাক, যার প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তু হল অপর কারো মনের অনুভূতি। এই-যে একটি অনুভূতির-অনুভূতিকে এখানে কল্পনা করে নেওয়া হল, এ কিন্তু অনুভূতি-বিশেষকে নিছক তথ্য হিসাবে অনুধাবন করা নয়, এ একেবারে আলাদা ধরণের ব্যাপার। নিছক তথ্য-জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাবেগ ও নিরুত্তাপ জিনিস। এ ব্যাপারটা সে রকম নয়। অনুভূতির-অনুভূতিকে আর-একটা জিনিসের সঙ্গেও গুলিয়ে ফেললে চলবে না। অপর-কারো অনুভূতি-বিশেষের উপলক্ষে নিজের মনের মধ্যে অনুরূপ একটি অনুভূতির সঞ্চার আর অনুভূতির-অনুভূতি বা সহানুভূতি মোটেই এক জিনিস নয়। কারো প্রতি সহানুভূতি করার অর্থ হল—তাঁকে অনুভব-করতে-অনুভব-করা, তাঁর অনুভূতিটিকে অনুভব করা (to feel *him* feeling)। একমাত্র এই অর্থেই তাঁর অনুভূতিটি আমার অনুভূতির প্রত্যক্ষ বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে। এখানে বিশেষ করে সহানুভূতির কথাই বলা হচ্ছে এই কারণে যে, অনুভূতির-অনুভূতি নামক ব্যাপারের এই বিশেষ রূপটির সঙ্গেই আমরা সব থেকে বেশি পরিচিত।

৫। কোনো শিশু যখন তার খেলনা নিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে আর আমি তার সেই আনন্দ-সম্ভোগের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করছি, তখন শিশুটির মন খেলনাতে যেভাবে আসক্ত, আমার মন কিন্তু খেলনাতে সেভাবে আসক্ত নয়। আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়ে আছে শিশুর মনের আনন্দ-সম্ভোগের দিকেই। আনন্দের প্রতি সহানুভূতি নিজেও একটা আনন্দের অনুভব বটে, কিন্তু প্রাথমিক আনন্দানুভূতির থেকে তা মুক্ততর। আনন্দের অভিব্যক্তিকে—আনন্দের অভিব্যক্ত রূপকে আমি কখনোই আপন অগোচরে খেলনাতে আরোপ করছি না। শিশুটি যেমন আপন উপভোগ্যতার অভিব্যক্ত রূপকে তার খেলনার গায়ে আঁকা দেখতে পাচ্ছে, আমি মোটেই সে রকম দেখছি না। আমার ক্ষেত্রে বড় জোর এই রকম মনে হতে পারে যে, আমি যেন উপভোগ্যতার রূপকে ওই খেলনাটিতে কল্পনা করে নিচ্ছি। খেলনাটিতে নিজের কোনো মুগ্ধতার ভাব আমি টের পাচ্ছি না। খেলনাটি আমাকে তার দিকে টেনে রেখেছে, নিজেকে আমি খেলনার সঙ্গে সংযুক্ত করে ফেলেছি—এ রকম কোনো ভাব আমার হচ্ছে না।

এ কথা অবশ্য বলা চলে না যে, সহানুভূতির ক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণভাবেই মুক্ত। তা নই। কেননা, যদিও এখানে শিশুটির আনন্দানুভূতির বিষয়বস্তু আমাকে স্পর্শ করতে পারছে না, তবু—বিষয়বস্তু থেকে মুক্ত হলেও, শিশুটির আনন্দানুভব থেকে—সেই আনন্দানুভূতি-ব্যাপারটির প্রভাব থেকে তো এখনো আমি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারি নি। বিশেষ এক শিশুর বিশেষ এক অনুভূতি—এই যে বিশিষ্ট এক মানস-সংঘটন—এই সংঘটন এখনো অপ্রতিরোধনীয় শক্তিতে আমাকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। তৎসত্ত্বেও এ কথা অবশ্যই মানতে হবে যে, এমনকি এই ক্ষেত্রেও, শিশুটি যেমন করে নিজের অনুভূতি আর সেই অনুভূতির

বিষয়বস্তু— এ দুয়ের মধ্যে ভেদজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, আমার বেলায় তা হয় নি। নিজের অনুভূতি আর শিশুটির অনুভূতি, এ দুয়ের মধ্যে ভেদের বোধটি আমার মনে পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত রয়েছে।

৬। এই হল সেই যুক্তি যার গুণে অনুভূতির-অনুভূতিকে প্রত্যক্ষ বা প্রাথমিক-অনুভূতির থেকে উচ্চতর স্তরের বলে গণ্য করা যেতে পারে। সহানুভূতি এরই— এই অনুভূতির-অনুভূতি ব্যাপারটিরই একটি বিশিষ্ট নমুনা। এইবারে আমাদের বিচার্য হল শিল্পসম্ভোগ। শিল্পসম্ভোগ জিনিসটা এর থেকেও উচ্চতর স্তরে অধিষ্ঠিত কি না, সেইটেই এখন আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

মুক্তির প্রশ্নে শিল্পসম্ভোগ যে সহানুভূতির অন্ততপক্ষে সমকক্ষ হবেই, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই বলেই ধরা যায়। তবু, কেউ হয়তো বলবেন যে, বস্তুবিশেষের সৌন্দর্যকে তো আমরা সরাসরিই উপভোগ করে থাকি— একেবারে প্রত্যক্ষভাবেই। ভীত ব্যক্তি ঠিক যেভাবে তাঁর ভয়ের অভিব্যক্তিকে— ভয়ের রূপকে তাঁর ভীতির বিষয়বস্তুতে সরাসরি প্রত্যক্ষ করেন, সৌন্দর্যকেও আমরা ঠিক সেইভাবে বস্তুর মধ্যে একেবারে সশরীরী ভাবে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। তা যদি হয়, তা হলে এ প্রশ্ন তো সহজেই উঠতে পারে যে, সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে প্রাথমিক বস্তু-অনুভবের— যেমন ভয়ের অনুভবের— পার্থক্যটা কোথায়? কোন্ গুণে একে সাধারণ অনুভূতির থেকে উচ্চতর স্তরের অধিবাসী বলে দাবি করা যাবে? এমনকি, সহানুভূতির সমকক্ষ বলেই বা একে মেনে নেব কোন্ যুক্তিতে? এ আপত্তি খণ্ডন করতে হলে প্রথমেই বিচার করে দেখা দরকার যে, অনুভূতি-বিশেষের-প্রতি-সহানুভূতি উক্ত অনুভূতির বিষয়বস্তুকে ঠিক কী ভাবে এবং কতটুকু পরিমাণে স্পর্শ বা প্রভাবিত করে।

প্রত্যেক অনুভূতিই আপন বিষয়বস্তুতে রূপ বা মূল্য আরোপ করার মধ্যে দিয়ে উক্ত বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত বা পরিবর্তিত করে নেয়। সহানুভূতি তার বিষয়ীভূত অনুভূতির বিষয়বস্তুকে স্পর্শ করে না। ভীত ব্যক্তির চোখে ভয়ের বিষয়বস্তু— সে যেন নিজেই ভয়াত্মক রূপের আধার, সে যেন নিজেই ভয়-মণ্ডিত। উক্ত ভয়ের প্রতি সহানুভূতিকারীর চোখে তা নয়। তবে, সহানুভূতিকারী যদিও ভয়াত্মক রূপকে ভয়ের বিষয়বস্তুতে প্রত্যক্ষ করেন না, তিনি কিন্তু ওই ধরণের একটা ভয়াত্মক রূপকে ভয়ের বিষয়বস্তুতে সজ্ঞানে আরোপ করে নেন। সহানুভূতিকারী বেশ সচেতন ভাবে কল্পনা করে নেন যে, তিনি যেন ওই ভয়াত্মক রূপাভিব্যক্তিকে ওখানে প্রত্যক্ষই করছেন। যে অভিব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বলে সচেতনভাবে কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে আর যে অভিব্যক্তিকে সরাসরি প্রত্যক্ষ বলে প্রতীতি করা হয়েছে, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তার কারণ, যে রূপাভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ বলে প্রতীত, তা থাকে মূল বিষয়ের সঙ্গে একেবারে একাকার হয়ে। বিষয়ের সঙ্গে অভিন্ন হয়েই তা আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। তা যেন বিষয়েরই একটা বিশেষণাত্মক ধর্ম। অপরপক্ষে, যে রূপাভিব্যক্তি সচেতনভাবে কল্পনার দ্বারা বিষয়ে আরোপিত, তা বিষয় থেকে ভিন্ন, তা যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তায় আমাদের কাছে উপস্থাপিত। তা যেন বস্তুর উপরে আলগোছে ভেসে-থাকা একটা ব্যাপার। অথবা বলা যায়, সেই রূপাভিব্যক্তি যেন মূল বস্তুকে অতিক্রম করে স্বয়ম্প্রভ অস্তিত্বে দীপ্যমান। সহানুভূতির মধ্যে যে মুক্তির ভাবটি রয়েছে, বিষয়-বস্তুতে সেই মুক্তিকেই আমরা প্রতিফলিত দেখতে পাই বিষয়বস্তু আর তার রূপাভিব্যক্তির ব্যবধানের মধ্যে। রূপাভিব্যক্তি যে বস্তুতে অধিষ্ঠিত নয়, সে যে নিরালম্ব শূন্যে ভাসমান, এরই মধ্যে সহানুভূতির এই মুক্তি পরিস্ফুট।

৭। সৌন্দর্য যে শিল্পানুভূতির দ্বারা এই রকম সচেতন ভাবেই বস্তুতে আরোপিত হয়, তা অবশ্য নয়। তবু, ভয়ের বস্তুর ভয়াত্মক রূপাভিব্যক্তি যেমন ভীত ব্যক্তির কাছে বস্তুরই গুণ বা বিশেষণ বলে মনে হয়, শিল্পানুভূতির কাছে সৌন্দর্য কখনোই বস্তুর গুণ বা বিশেষণ বলে প্রতীত হয় না। সৌন্দর্যকে আমরা পাই একটি ভাসমান সত্তা রূপে। সে যেন বস্তু-অতিক্রমকারী— বস্তু-অতিরিক্ত একটা প্রকাশ। সহানুভূতির ক্ষেত্রে মূল অনুভূতির বিষয়বস্তুতে সচেতনভাবে যেমন একটি রূপাভিব্যক্তি আরোপিত হয়, সচেতন না হলেও সৌন্দর্যও তেমনি আরোপিত সত্তা— সৌন্দর্যও বস্তু-অতিক্রমী ভাসমান রূপ। সৌন্দর্য যে সজ্ঞান আরোপের ফল নয়, তাকে যে প্রত্যক্ষবৎ সশরীরী দেখতে পাওয়া যায়, এতে করে একটা পার্থক্য অবশ্যই ঘটে থাকে। একটু পরেই সে পার্থক্যের ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সৌন্দর্যকে যে বস্তুর গুণ বা বিশেষণ রূপে পাই না, এইখানেই সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে সাক্ষাৎ বস্তু-অনুভবের আসল তফাত। এবং ঠিক এই তফাতের কারণেই শিল্পসম্ভোগকে প্রাথমিক বস্তু-অনুভবের থেকে উচ্চতর স্তরে অধিষ্ঠিত বলে গ্রহণ করতে হবে। শিল্পসম্ভোগ জিনিসটা সহানুভূতির থেকেও উচ্চে অধিষ্ঠিত কি না, অতঃপর এইটেই আমাদের প্রশ্ন।

৮। আগেই দেখানো হয়েছে যে, যদিও মূল অনুভূতির বিষয়বস্তুর প্রভাব থেকে সহানুভূতি নিজেকে মুক্ত রাখে, তা হলেও সেই মূল অনুভূতিটির দ্বারা সে অভিভূত ও নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পারে না। মূল অনুভবকারীর সংস্পর্শ থেকেও সহানুভূতি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না। সহানুভূতিতে যে দূরত্বের অনুভব ঘটে, সেটা কেবল বিষয়ের দিক থেকেই দূরত্ব, বিষয়ীর দিক থেকে নয় (···the detachment is felt from objective fact but not from subjective fact)। সহানুভূতির পাত্রের সঙ্গে ভেদবোধটা তেমন সজাগ থাকে না। কিন্তু এমন এক-রকমের অনুভূতিও সম্ভব, যাকে বলা যেতে পারে সহানুভূতির-প্রতি-সহানুভূতি। তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যেমন— সন্তানের কষ্টে মায়ের মনে যে সহানুভূতি, সেই মাতৃ-সহানুভূতির প্রতি অপর কারো সহানুভূতি। কোনো ব্যক্তির অনুভূতি-বিশেষের প্রতি আমি যদি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠি, তা হলে যেমন তাঁর অনুভূতির বিষয়বস্তু আমার সহানুভূতিকে প্রভাবিত করতে পারে না, ঠিক তেমনি, যদি কোনো ব্যক্তির সহানুভূতির প্রতি আমি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠি, তা হলে সেই ব্যক্তির সহানুভূতির বিষয়বস্তু যে-এক-তৃতীয়-ব্যক্তির অনুভূতি, সেই অনুভূতিও আমার সহানুভূতিকে প্রভাবিত করতে পারে না।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, এই রকম দ্বিগুণিত সহানুভূতির স্তরেই অনুভূতি-বিশেষকে নিরাসক্ত দূরত্বে স্থাপন করে ভাবাত্মক ধ্যানের মধ্যে তাকে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে (It is thus on the level of duplicated sympathy that a feeling can be emotionally contemplated in a detached way)। বিষয়ী-বিশেষের মনোজগতের তথ্য হিসাবে অনুভূতির যেসব আনুষঙ্গিক ধর্ম, অনুভূতিটিকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অনুভব করা, অনুভূতিকে একটি স্বাধীন স্বয়ংসিদ্ধ মূল্য রূপে গ্রহণ করা, তা কেবল এই দ্বিগুণিত সহানুভূতির স্তরেই সম্ভব হতে পারে। অনুভূতি-বিশেষের প্রতি সহানুভূতি— এই রকম সাধারণ সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে যখন দেখি, তখন দেখতে পাই যে, অনুভূতির বিষয়বস্তুতে রূপাভিব্যক্তির একটা দূরত্ব এসে গিয়েছে, এবং এই দূরত্বের কারণেই সেই রূপাভিব্যক্তির বাস্তবতাও খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। দ্বিগুণিত সহানুভূতির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সহানুভূতির-প্রতি-

সহানুভূতির ক্ষেত্রে কিন্তু সে রকম দেখি না। দ্বিগুণিত সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে যখন দেখি, তখন দেখতে পাই যে, বিষয়বস্তুর রূপাভিব্যক্তিতে শুধু দূরত্বই আসে নি, তার মধ্যে একটা স্বাধীন সত্তারও আবির্ভাব হয়েছে। সেই রূপ যেন স্বয়ংসিদ্ধ— তার আধারস্বরূপ যে বিষয়বস্তু, সেটিই যেন তার একটি প্রতীকমাত্র। যেহেতু এই রূপাভিব্যক্তি বস্তু বা তথ্যের বিশিষ্টতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, সেই হেতু এই রূপকে একটি নিত্য-সত্য বলে গণ্য করতে পারি— একে একটি চিরন্তন সত্য-মূল্য বলে গ্রহণ করতে পারি।

৯। আমাদের মতে, সৌন্দর্যও এই রকম একটি চিরন্তন মূল্য; এবং শিল্পসম্ভোগ ব্যাপারটা দ্বিগুণিত সহানুভূতির— অর্থাৎ সহানুভূতির-প্রতি-সহানুভূতির সম-স্তরেই অধিষ্ঠিত। সৌন্দর্য যে আমাদের কাছে কল্পনার-দ্বারা-বস্তুতে-আরোপিত বলে মনে না হয়ে একেবারে প্রত্যক্ষ বলেই মনে হয়, এ থেকে এইটেই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, তথ্য হিসাবে বস্তুর সত্যতা যতখানি, সৌন্দর্যের সত্যতা আমাদের কাছে তার থেকে একটুও কম নয়। সৌন্দর্যকে যখন বিষয়ের গুণ বা বিশেষণ হিসাবে দেখি না, আবার বিষয়ের পাশাপাশি অবস্থিত দ্বিতীয় কোনো সত্তা রূপেও দেখি না, তখন এ থেকে স্বভাবতই মনে হয় যে, সৌন্দর্য হল এমন এক সত্য যার ক্ষেত্রে বিষয়টাই বরং বিশেষণীভূত— সে-ই যেন বিশেষ্য আর বিষয় বা বস্তুই যেন বিশেষণ, তার অধস্তন, তার অধীন। কিন্তু এ কথা বলার যেহেতু সত্যি সত্যি অর্থ হয় না যে, বস্তু সৌন্দর্যের একটা গুণ মাত্র, সেই হেতু বস্তুর এই বিশেষণধর্মিতার ব্যাখ্যা করতে হলে স্বীকার করে নিতেই হবে যে, বস্তু আর সৌন্দর্যের মধ্যের সম্পর্কটা একটু বিশেষ-ধরণের সম্পর্ক। প্রতীক-প্রয়োগের ক্ষেত্রে, প্রতীক আর যা প্রতীকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে সে (symbolised)— এদের দুয়ের মধ্যের সম্পর্কটা যে রকমের, বস্তু আর সৌন্দর্যের মধ্যের সম্পর্কটাও সেই রকমের। শব্দ আর তার অর্থের মধ্যে যুক্তিগত সম্বন্ধটা যে জাতের, বস্তু আর সৌন্দর্যের সম্বন্ধ তারই অনুরূপ। শুধু তফাত এই যে, ক্ষেত্রটা এখানে যুক্তির নয়, এখানে ক্ষেত্রটা হল অনুভূতির।

১০। অতএব দেখা যাচ্ছে, শিল্পসম্ভোগের স্থান সাধারণ সহানুভূতির থেকে এক ধাপ উঁচুতে, সাধারণ সহানুভূতির স্থান তেমনি প্রাথমিক বস্তু-অনুভবের থেকে এক ধাপ উঁচুতে। ক্ষেত্রবিশেষে শিল্পসম্ভোগকে সোজাসুজি সহানুভূতির-প্রতি-সহানুভূতি বলেই গণ্য করা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ধরা যাক, একটি শিশু যেন তার খেলনা নিয়ে খেলা করছে, আর তার বৃদ্ধ পিতামহ সস্নেহে তার খেলা দেখছেন। সেই সঙ্গে আরো ধরা যাক যে, আমি যেন সেই বৃদ্ধের সস্নেহ উপভোগকে আমার নিজের ধ্যানে ধারণ করে তার আস্বাদন করছি। এইবারে, শিশুটির খেলনাতে যে-আনন্দ, সেই আনন্দকে পিতামহের সহানুভূতির আনন্দের সঙ্গে তুলনা করে, এবং পিতামহের সহানুভূতিগত আনন্দকে আমার ধ্যানাত্মক আনন্দের সঙ্গে তুলনা করে, এই তিন রকমের আনন্দের পারস্পরিক পার্থক্যটা লক্ষ করে দেখা যাক। খেলনার উপভোগের মধ্যে শিশুটির মন যে ভাবে একেবারে মগ্ন হয়ে আছে, পিতামহের মন যদিও খেলনার উপভোগের মধ্যে সেই ভাবে মগ্ন নয়, তা হলেও পিতামহের আনন্দানুভূতিটিকে ঠিক শিল্প-সম্ভোগজাতীয় আনন্দানুভূতি বলে গণ্য করা চলবে না। তার কারণ, এখনো পিতামহের এই অনুভূতির মধ্যে ব্যক্তিগত ভাল-লাগার নির্বাচন ক্রিয়াশীল, এখনো এর মধ্যে একটি বিশেষ শিশু এবং তার বিশেষ এক অনুভূতির প্রতি ব্যক্তিগত পক্ষপাত বর্তমান। আমার ধ্যানাত্মক আনন্দে কিন্তু এই ধরণের ব্যক্তিগত কোনো-কিছুর সংস্পর্শ নেই। শিশুটির যে-উপভোগ তার পিতামহের হৃদয়ে এক চিরন্তন অনুভূতি

রূপে— একটি শাশ্বত মূল্য রূপে প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে, আমার দৃষ্টি শুধু সেইটির দিকে। আমি উপভোগ করছি অনুভূতির নির্যাসিত সারাৎসারকে। খেলনাতে মগ্ন শিশুটির মতো আমিও অনুভূতি-নির্যাসের মধ্যে মগ্নই হয়ে আছি, শুধু তফাত এই যে, তা আমাকে বিন্দুমাত্র অভিভূত করছে না— তা আমার অবাধ মুক্তিকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন করতে পারছে না। বৃদ্ধটির মনে শিশুর অনুভূতি আর তাঁর নিজস্ব অনুভূতি, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের বোধটি যেমন সজাগ, আমার মনে কিন্তু এখন আর শিশুর অনুভূতি এবং আমার নিজের অনুভূতির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্যের সচেতনতা নেই। আমার ব্যক্তিত্ব যেন বিগলিত হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে, অথচ ওই শিশুটি যেমন তার অনুভূতির বিষয়বস্তুতে বাঁধা পড়েছে, আমি মোটেই তা পড়ি নি। আমি হয়ে উঠেছি নৈর্ব্যক্তিক— সহজে এবং বিনা বাধায়।

১১। উপরের উদাহরণটিতে দেখা যাচ্ছে যে, এখানে আমার শিল্পানুভূতি হচ্ছে অপর এমন-এক ব্যক্তির সম্পর্কে আমার অনুভূতি, যে ব্যক্তির মনের মধ্যে অনুরূপভাবে তৃতীয় কোনো-এক ব্যক্তির সম্পর্কে অনুভূতি জাগরূক। উদাহরণটিতে এই অপর দুই ব্যক্তির কেউ-ই কাল্পনিক নয়, দুজনেই বাস্তব। এমন ক্ষেত্রও হতে পারে, যেখানে এই দুই ব্যক্তির যে-কোনো একজন, অথবা দুজনেই কাল্পনিক। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক যেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কাল্পনিক। ধরা যাক, পথের একটি অনাথ বালককে অবলম্বন করে আমার মনে একটা নান্দনিক (aesthetic) ভাবের সঞ্চার ঘটল। অনাথ এই বালকটি এখন আমার দৃষ্টিতে সুন্দর। কিন্তু সে যে সুন্দর হয়ে উঠেছে তা— জনৈক ধূলিধূসরিত নোংরা বালক হিসাবে নিজ-গুণে নয়। কারো-একজনের সে ভালবাসার ধন, এই হিসাবে। আমার সৌন্দর্যধ্যানে বিধৃত হয়েছে ওর সেই রূপটি, যা ওর মা জীবিত থাকলে তাঁর চোখে ধরা পড়ত। এখানে মা কিন্তু বাস্তবে উপস্থিত নেই। মা এখানে কাল্পনিক। এইবারে এমন একটি ক্ষেত্র ধরা যাক, যেখানে তৃতীয় ব্যক্তিটি কাল্পনিক। মনে করা যাক, কোনো মা তাঁর মৃত সন্তানের খেলনাগুলিকে পরম আদরে সঞ্চয় করে রেখেছেন। সন্তান জীবিত থাকলে, সে ওই খেলনাগুলিকে নিয়ে ক্রীড়ারত থাকলে খেলনাগুলির যে মূল্য হত, মায়ের চোখে এখনো খেলনাগুলির সেই আদর, সেই মূল্য। তৃতীয় ব্যক্তি— অর্থাৎ মায়ের-অনুপস্থিত-সন্তানটি— বর্তমান ক্ষেত্রে বাস্তব নয়, কাল্পনিক। কিন্তু মায়ের হৃদয়বেদনাটি বাস্তব এবং ব্যক্তিগত। আর যে-আমি মাতৃ-হৃদয়ের এই বেদনাটিকে আমার ধ্যানের মধ্যে নিয়ে আস্বাদন করছি, সেই আমার কাছেই কেবল এটি একটি সুন্দর শিল্পসামগ্রী হয়ে উঠেছে।

আবার এমন ক্ষেত্রও সম্ভব যেখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুজনেই কাল্পনিক। ধরা যাক, একটি নাটকের একটি চরিত্র-বিশেষকে আমি আমার ধ্যান-কল্পনায় রূপায়িত করে তুলেছি। নাটকের এই চরিত্রটিই এখানে আমাদের পূর্ব-কথিত তৃতীয় ব্যক্তি। এই কাল্পনিক তৃতীয় ব্যক্তিই এখানে অনুভূতির প্রাথমিক ক্ষেত্র, অর্থাৎ মূল অনুভবকারী। কিন্তু— প্রশ্ন উঠতে পারে— এ ক্ষেত্রে মাঝখানের সেই সহানুভূতিকারীটি কোথায়, যাকে বলতে পারি— দ্বিতীয় ব্যক্তি ? এই দৃষ্টান্তে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে ?

১২। কোনো-কিছুকে বাস্তব বলে কল্পনা করা আর কাল্পনিক বলেই কল্পনা করে নেওয়া, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম ক্ষেত্রে কল্পিত বস্তুটিকে এমনভাবে কল্পনা করা হয় যেন সেটি কল্পনাকারীর ইন্দ্রিয়ের সামনে একেবারে প্রত্যক্ষ। ক্ষুধিত ব্যক্তি যখন সুখাদ্যের কল্পনা করেন তখন যেমন হয়— কাল্পনিক হয়েও সেই সুখাদ্য যেন তাঁর চোখের সামনে একটা বাস্তব উপস্থিতি। অপর পক্ষে, দ্বিতীয়

ক্ষেত্রটি অন্য রকমের। কল্পিত বস্তুকে যেখানে কাল্পনিক বলেই কল্পনা করে নেওয়া হচ্ছে, সেখানে বস্তু-কল্পনা ব্যাপারটাই কল্পনার সৃষ্টি। বস্তুকে এখানে এমনভাবে কল্পনা করে নেওয়া হচ্ছে যেন সেটি অপর-কোনো ব্যক্তির কল্পনার সৃষ্টি। যেন অপর কোনো-একজন এমন আছেন, যাঁর কল্পনায় বস্তুটি রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এইবারে নাটক উপভোগের ক্ষেত্রটা দেখা যাক। নাটকের চরিত্র আমার কাছে বাস্তব নরনারী নয়। এখানে আমি এমন একজন ব্যক্তিকে কল্পনা করে নিচ্ছি, যিনি নাটকের চরিত্রগুলিকে বাস্তব জগতের সত্যিকারের নরনারী বলে কল্পনা করে নিয়েছেন। আমার মনে যে সহানুভূতির জন্ম হয়েছে, তা এই কল্পিত 'কেউ-একজনের' প্রতি— মাঝখানে অবস্থিত এই কাল্পনিক দ্বিতীয়-ব্যক্তিটির প্রতি। এই যে কল্পিত দ্বিতীয়-ব্যক্তি, এ কিন্তু কোনো ব্যক্তি-বিশেষ নয়। এ হল যথার্থই 'কেউ-একজন', একেবারেই 'যে-কোনো-এক-ব্যক্তি'। সাধারণভাবে 'জনৈক ব্যক্তি' বললে মনের মধ্যে যে ধরণের একটা সামান্য-ধারণার জন্ম হয়, আমার এই কল্পিত দ্বিতীয়-ব্যক্তির ধারণা অনেকটা সেই সামান্য-ধারণার অনুরূপ। তবে এ সামান্য-ধারণা অনুভূতিময়, অনুভূতি-বিকিরণকারী, মোটেই জ্ঞানাত্মক নয়। এর মধ্যে বুদ্ধির ক্রিয়া নেই। এই দ্বিতীয়-ব্যক্তিকে আমি আমার যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে গড়ে তুলি নি। যে-আমি নান্দনিক সৌন্দর্যধ্যানে সমাহিত, সেই-'আমি'র হৃদয়ের মধ্যে— চিন্তার মধ্যে নয়— অনুভবের মধ্যে এর জন্ম। এ হল বিশুদ্ধ অনুভব-সম্ভব সৃষ্টি। এই যে অনুভূত-ব্যক্তিসামান্য, এর যদি কোনো নামকরণ করতে চাই, তা হলে খানিকটা পুরাণ-কল্পনার সাদৃশ্যে একে বলতে পারি— সর্বজনীন হৃদয় (…the felt-person-in-general may be semi-mythologically called the Heart Universal)।

শিল্পসম্ভোগ ভোক্তার স্ব-গত সম্ভোগ নয়, এর মধ্যে ভোক্তার আত্মসচেতনতার অবলুপ্তি ঘটে। অন্যদিকে, ভোগ্য অনুভূতিটি— অর্থাৎ সেই মূল অনুভূতি যা ছিল তৃতীয়-ব্যক্তিটির একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার— তারও বন্ধন-মুক্তি ঘটে। সে আর তখন কারোই ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। বিষয়ী-বিশেষের সমস্ত সংস্পর্শ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ব-কথিত সর্বজনীন হৃদয়ে এসে সে চিরন্তনত্ব প্রাপ্ত হয়।

১৩। শিল্পগত সৌন্দর্যের বাইরে যে সৌন্দর্য, যাকে আমরা প্রাকৃত-সৌন্দর্য বলি, তার ক্ষেত্রেও কি এই রকম ব্যাখ্যা কার্যকরী? অর্থাৎ— প্রাকৃত বস্তুর সৌন্দর্যকে ব্যাখ্যা করতে হলে সেখানেও কি এইভাবে তিনটি পৃথক্ ব্যক্তি অথবা তিনটি পৃথক্ স্তরের অনুভূতি— ধ্যানাত্মক-অনুভূতি, সহানুভূতিগোত্রের-অনুভূতি এবং প্রাথমিক-অনুভূতি— এই তিন ধরণের অনুভূতি দিয়ে ব্যাখ্যা করার পরিকল্পনা সমানভাবে সার্থক? বস্তুত, এখানেও আমরা এক দিকে সৌন্দর্যধ্যানাবিষ্ট মন আর প্রাকৃত বস্তু এ দুয়ের মাঝখানে প্রচ্ছন্নভাবে-ব্যবধান-রচনা-করে-বিরাজমান দুটি কাল্পনিক সত্তাকে— দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তিকে— ধরে নিতে পারি। তবে, এই প্রাকৃত সৌন্দর্যসম্ভোগের ক্ষেত্রে উক্ত কাল্পনিক তৃতীয় ব্যক্তিও নিতান্তই একটা অদৃশ্যপ্রায় সত্তা। এই ক্ষীণ সত্তাটি নাটকের চরিত্রের মতো ব্যক্তি-বিশেষ নয়। এও নিতান্তই 'জনৈক ব্যক্তি'।

যখন আমি কোনো প্রাকৃত বস্তুর সৌন্দর্য উপভোগ করি, তখন আমাকে যা যা কল্পনা করে নিতে হচ্ছে, তার ধাপগুলি এই রকম :—

সর্বপ্রথমে আমি উক্ত প্রাকৃত বস্তুটির রূপাভিব্যক্তি অনুযায়ী একটি প্রাথমিক-অনুভূতিকে কল্পনা করে নিচ্ছি। বস্তুটির রূপাভিব্যক্তি যদি আনন্দের হয়, বিষাদের হয়, ভয়ের হয়— ঠিক যেমনটি হবে, আমার

কল্পিত প্রাথমিক-অনুভূতিও সেই অনুযায়ী আনন্দের, বিষাদের বা ভয়ের অনুভূতি হবে। তার পর এই প্রাথমিক-অনুভূতির অনুভবকারী হিসাবে একটি অনির্দিষ্ট-গোছের তৃতীয় ব্যক্তিও আমি কল্পনা করে নেব। কল্পনা করব, এ-অনুভূতি যেন তাঁরই— সেই তৃতীয়-ব্যক্তিরই অনুভূতি। পূর্বোক্ত দ্বিতীয়-ব্যক্তির কল্পনায় যে সামান্য-ধারণার ভাবটি রয়েছে, তা যেমন বুদ্ধি-সৃজিত নয়, অনুভূত, এখানে— এই কল্পিত তৃতীয়-ব্যক্তির অনির্দিষ্টতাও তেমনি বুদ্ধিজাত নয়, জ্ঞানাত্মক নয়, এও অনুভব-সম্ভূত। এই তৃতীয়-ব্যক্তির নিরবয়ব অনির্দিষ্টতা থেকে বোঝা যায় যে, এঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত কোনো ঔৎসুক্য নেই। এঁর ব্যক্তিত্বে নয়, আমার আসল আগ্রহ এঁর অনুভূতিতে।

অতঃপর, অর্থাৎ এই তৃতীয় ব্যক্তির প্রাথমিক-অনুভূতিটিকে কল্পনা করে নেবার পর, এখনকার ধাপের কল্পনা হল এই যে, উক্ত অনুভূতিটি যেন কোনো দ্বিতীয়-ব্যক্তির হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়েছে— তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ধ্যানাত্মক-অনুভবরূপে সে যেন একটি আদর্শায়িত ও পরিশুদ্ধ সত্তা লাভ করেছে। এই দ্বিতীয়-ব্যক্তিই পূর্ব-কথিত সর্বজনীন হৃদয়।

এইবারে, শেষ ধাপে, আমি। অর্থাৎ— প্রথম-ব্যক্তি। সৌন্দর্যসম্ভোগকারীরূপে এইবারে আমি উক্ত আদর্শায়িত অনুভবকে আমার সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করব।

১৪। এই বিশ্লেষণ কি কৃত্রিম বলে মনে হচ্ছে? আগেই বলা হয়েছে, বস্তুর সৌন্দর্য আমাদের কাছে কখনোই তথ্যরূপে প্রতিভাত হয় না। আবার বস্তুর বর্ণ যেমন তার একটা বিশেষণ বা গুণরূপে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়, সৌন্দর্যকে সেভাবে বস্তুর গুণ বলেও মনে হয় না। সৌন্দর্যকে পাই বস্তুর প্রকাশ বা অভিব্যক্তিরূপে— বস্তুর মূল্যরূপে। এই প্রকাশকে আমরা প্রাথমিক-অনুভূতির প্রতিবর্তির (reflex) মতো বস্তুর সঙ্গে একাত্ম করে দেখি না, এ প্রকাশ বস্তুর বিশেষণাত্মক কোনো গুণ-বিশেষ নয়। একে আমরা প্রত্যক্ষ করি বস্তুর উপরে ভাসমান সত্তারূপে— এমন এক সত্তা যা বস্তুকে অতিক্রম করে আপন প্রভায় দেদীপ্যমান। অন্যপক্ষে, সহানুভূতির প্রতিবর্তি যেমনভাবে নিরালম্ব শূন্যে ভাসমান থাকে, সৌন্দর্য কিন্তু সে রকম বায়বীয় ব্যাপারও নয়। আমাদের নান্দনিক অনুভূতির কাছে সৌন্দর্য জিনিসটা একটা সত্যিকারের মূল্য— রক্তমাংসের বাস্তবের মতো সত্য— একটা চিরন্তন মূল্য।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণের দ্বারা সৌন্দর্যকে আমরা বস্তু বা তথ্য থেকে স্বতন্ত্র করে নিতে পারি। এক, প্রকাশ বা রূপাভিব্যক্তি। দুই, বস্তু থেকে তার দূরত্ব। তিন, তার নিত্যতা বা চিরন্তনত্ব। বস্তু-বিশেষে এই লক্ষণত্রয়ের আবির্ভাবের একমাত্র সঙ্গত ব্যাখ্যা হল এই যে, তিন স্তরের তিনটি স্বতন্ত্র অনুভূতির দ্বারা এরা পৃথক্‌ভাবে বস্তুতে আরোপিত হয়েছে। প্রথম লক্ষণটি আরোপিত হয়েছে প্রাথমিক-অনুভূতির দ্বারা, দ্বিতীয়টি সহানুভূতির দ্বারা, এবং তৃতীয়টি ধ্যানাত্মক-অনুভূতির দ্বারা। এই তিন রকমের অনুভূতিকে তিনটি বিভিন্ন ব্যক্তির অনুভূতি হিসাবে গণ্য করাই বোঝার দিক থেকে সুবিধাজনক, যদিও এই তিন ব্যক্তির মূলত একই-লোক হতে কোনো বাধা নেই। অর্থাৎ অনুভূতির তিনটি স্বতন্ত্র স্তরে একই সৌন্দর্যসম্ভোগকারীকে আমরা একসঙ্গেও পেতে পারি। যেহেতু এই তিনের মধ্যে শেষের স্তরের অনুভূতিটি নিজের মধ্যে অপর দুটিকে সমন্বিত করে রাখে, সেই হেতু শিল্পসম্ভোগকে কোনোক্রমেই আর-পাঁচটা অনুভূতির অন্যতম বলে গণ্য করা যায় না। শিল্পসম্ভোগ এমন একটা বিশুদ্ধ,

অনুভব-সার, বিশিষ্ট-অনুভূতি যে, সেই কারণেই সে অপর অনুভূতিদের সবাইকে ছাড়িয়ে যায় (...the feeling par excellence)।

তা হলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রস অথবা নান্দনিক নির্যাস (aesthetic essence) নামক ব্যাপারটার, এইভাবে কেবল অনুভূতি দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে। এ ব্যাখ্যার মধ্যে বুদ্ধিগত কোনো ধারণা বা আধ্যাত্মিক কোনো আদর্শের কথা আনবার প্রয়োজন হচ্ছে না। অনুভূতির কোন্ স্তরটিতে নান্দনিক আনন্দের সঞ্চার ঘটে, সেইটে নির্ণয় করার মধ্যে দিয়েই আমরা এখানে উক্ত আনন্দের স্থান ও তাৎপর্য নিরূপণ করলাম।

রস সম্পর্কে ভারতীয় ধারণার স্বরূপকে অনুধাবন করতে হলে— এর বিশিষ্ট ভাব-সৌরভকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হলে, বিষয়টিকে আরো একটু বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে ভারতীয় ধারণা হল এই যে, শিল্পসম্ভোগ শুধু যে তথ্যের বন্ধন থেকে মুক্ত তা-ই নয়, এর মধ্যে দিয়ে এক চিরন্তন মূল্যেরও চরিতার্থতা ঘটে (the realisation of an eternal value)। এ এমন এক সার্থকতা-লাভ— এমন এক প্রাপ্তি, যেখানে এক দিকে নান্দনিক নির্যাসের সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মতাও ঘটছে, অন্য দিকে পূর্ব-কথিত মুক্তিও সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকতে পারছে। এই যে চিরন্তন মূল্যের চরিতার্থতা— নান্দনিক অনুভূতি-নির্যাসের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, এর সঠিক অর্থটা কী? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রথমেই আমাদের প্রাথমিক-অনুভূতি এবং সহানুভূতির কয়েকটি বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

১৬। পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, প্রাথমিক-অনুভূতির ক্ষেত্রে— যেমন ধরা যাক কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গত সম্ভোগের ক্ষেত্রে— বস্তু আর তার অনুভব এ দুয়ের পার্থক্যের বোধটা লুপ্ত হয়ে যায়। এক দিকে বস্তুটি রূপাভিব্যক্তি অর্জন করে, অন্য দিকে অনুভূতিটিও তার বিষয়ীসুলভ দূরত্বকে বিসর্জন দেয়। তা হলেও বস্তুমগ্ন অনুভূতির এই যে অভেদ-বোধ বা ঐক্য-বোধ, এটা খুব সুসম্পূর্ণ এবং পরিচ্ছন্ন ব্যাপার নয়। এর মধ্যে দুই বিপরীত মুখে দুটি বিকল্প ঝোঁক লক্ষ করা যায়। তার একটি হল তদ্‌গত বা বিষয়মুখী ঝোঁক —বহির্মুখী ঝোঁক। অপরটি হল আত্মগত বা বিষয়ীমুখী ঝোঁক— বলতে পারি— অন্তর্মুখী ঝোঁক। বিষয়মুখী ঝোঁকটা প্রবল হলে আত্মবোধ ক্ষীণ হয়ে আসে, বস্তুটিই সর্বেসর্বা হয়ে দেখা দেয়। আর প্রকাশ বা রূপাভিব্যক্তিকে তখন দেখা যায় বস্তুর বিশেষণ-রূপে বস্তুতে সংলগ্ন।

কিন্তু ভোক্তা যে সব সময়ই এ রকম বিষয়মুখী থাকবেন— সব সময়ই এভাবে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকারীর মনোভঙ্গী অবলম্বন করবেন এমন কোনো কথা নেই। ক্ষেত্রবিশেষে ভোক্তা অন্তর্মুখীও হতে পারেন, অনুভবকারীর মনোভঙ্গীও অবলম্বন করতে পারেন। এমন এক মনোভঙ্গী যার অন্তর্মুখী ঝোঁকের প্রবলতায় বস্তুটি ক্রমেই অনির্দিষ্ট হয়ে ঝাপ্‌সা হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকবে। তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তির মনে সুস্পষ্ট বহির্জগৎ যেমন করে কম্পিত ছায়াছবির মতো ক্রমে আব্‌ছা হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়, সেই রকম। এইটেই হল ভোক্তার আত্মগত ঝোঁক। এই অবস্থাতে ভোক্তা কখনোই নিজেকে বিষয়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলেন না। এ অবস্থায় বস্তুই বরং ভোক্তার অনুভবের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেয়— নিজেকে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত করে ভোক্তার অনুভূতির মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলে।

ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করে বুঝতে হলে একটি বিশেষ ধরণের অভিজ্ঞতার কথা আমাদের স্মরণ করে

দেখতে হবে। মনে করা যাক, কোনো একটি বিষয় যেন আমার উপভোগের জন্য আমার সামনে উপস্থাপিত— বিষয়টি যেন আমার একেবারে করতলগত। এ অবস্থাতেও, বিষয়টিকে উপভোগ করতে চেষ্টা করা আর তাকে প্রকৃতই উপভোগ করা, এ দুয়ের মধ্যে তফাত আছে। যখন ভোগের চেষ্টা করছি, সম্ভোগানুভূতির তখনই সূত্রপাত হয়েছে বটে, কিন্তু যথার্থ সম্ভোগ যে তখনো সম্ভব হচ্ছে না, এ রকম একটা অনুভূতিও এর মধ্যে রয়ে গিয়েছে। বিষয়টি যে এখনো আমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে নি, সে যে এখনো আমার অনুভূতির মধ্যে সম্পূর্ণ বিগলিত হয়ে যায় নি, নিজেকে এখনো নিঃশেষে মিলিয়ে দেয় নি, আমার মধ্যে এ বোধটা এখনো জাগ্রত। পাওয়া-না-পাওয়ায় দোলায়িত এই রকম অস্বস্তিকর একটা অভিজ্ঞতা আমার উদ্যত সম্ভোগানুভূতির মধ্যে কেমন একটা অবাস্তবতার ভাব এনে দিচ্ছে। উপভোগকে পরিপূর্ণ ও যথার্থ করে তোলা— বিষয়কে নিজের অনুভবের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গলিয়ে ফেলা, আর সম্ভোগানুভূতির মধ্যেকার অবাস্তবতার ভাবটিকে দূর করে দেওয়া, এ আসলে একই কথা। এ যখন সম্ভব হয়, তখন সম্ভোগানুভূতি বাস্তব হয়ে ওঠে বিষয়ীগতভাবে, সত্য হয়ে ওঠে অন্তর্লোকে। অনুভূতি তখন তার বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে একেবারে যেন একচ্ছত্র হয়ে বিরাজ করে।

১৭। প্রাথমিক বস্তু-অনুভবের ক্ষেত্রে যে রকম দেখলাম, সহানুভূতিতেও সেই রকম দ্বিমুখী ঝোঁক দেখতে পাওয়া যাবে। সেই অনুযায়ী দুই ধরণের সহানুভূতিকেও আমরা পৃথক্ করে নিতে পারব। এ ক্ষেত্রে অবশ্য সহানুভূতিকারী এবং সহানুভূতির পাত্র, এদের পার্থক্যটা কখনোই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় না। তা হলেও এঁরা দুজন যে একেবারে স্থিরভাবে পাশাপাশি বিরাজ করতে থাকবেন, এমনও ঘটে না। সহানুভূতির ক্ষেত্রে দেখতে পাই, হয় সহানুভূতিকারী একেবারে তাঁর সহানুভূতির পাত্রের হৃদয়ের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করেন— একেবারে সেই পাত্রের হৃদয় দিয়েই যেন অনুভব করতে থাকেন, অন্যথায়— সহানুভূতিকারী তাঁর সহানুভূতির পাত্রকেই নিজের হৃদয়ে গ্রহণ করেন এবং নিজের হৃদয়ের মধ্যেই তাঁকে অনুভব করতে থাকেন।

প্রথম ক্ষেত্রে আমি আমার অনুভূতিকে বাইরে প্রসারিত করে দিচ্ছি পাত্রের দিকে। তখন আমি অনুভব করছি যে, তাঁর সঙ্গে আমার দূরত্বের যে ব্যবধান, এইটেই একটা অশুভ অন্তরায়। আমি যেন তখন নিজেকেই ভুলতে চাই, নিজেকেই হারিয়ে ফেলতে চাই। আমি তখন এইটেই অনুভব করতে চাই যে, আমি যেন সেই অনুভবে-রত অপর ব্যক্তিটি। এই দিক থেকে, আমার তখনকার সাধনা হল সেই অপর-ব্যক্তি হয়ে ওঠার সাধনা। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমি অনুভব করি যে, আমার সহানুভূতির পাত্রটি যতক্ষণ আমার বাইরে, যতক্ষণ তিনি আমার থেকে স্বতন্ত্র— যতক্ষণ তিনি অপর-ব্যক্তি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সহানুভূতি পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠে নি। যতক্ষণ তাঁর অনুভূতিকে একটি স্বতন্ত্র তথ্য রূপে জানছি— আমার নিজস্ব অনুভূতি বলে অনুভব করতে না পারছি, ততক্ষণ তাঁর প্রতি আমার সহানুভূতি যেন মোটেই যথার্থ সহানুভূতি হয়ে উঠতে পারে নি। প্রথম ক্ষেত্রে আমার আপন দূরত্বেই আমার অসন্তোষ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সহানুভূতির পাত্রের স্বাতন্ত্র্য— তাঁর অপরত্ব, এতেই আমার অসন্তোষ। উভয় ক্ষেত্রেই আমার মূল প্রযত্নটি অভিন্ন। সে হল নিজের মুক্তির অব্যাহত আস্বাদন। প্রথম ক্ষেত্রে এই মুক্তি-আস্বাদনের প্রয়াসে নিজেকে বাইরের দিকে প্রসারিত করে দিচ্ছি, নিজেকে বহির্বিষয়ে প্রক্ষেপ করছি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেই

একই মুক্তি-আস্বাদনের উপায় হিসাবে বাহিরকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে তাকে স্বাঙ্গীকৃত করে নিচ্ছি, অপরের অনুভূতিকে নিজের অনুভূতির মধ্যে আকর্ষণ করে তাকে স্বকীয় করে তুলছি। সহানুভূতির এই দুই রূপের প্রথমটিকে অর্থাৎ বহির্মুখী রূপটিকে বলতে পারি প্রক্ষেপাত্মক (projective) সহানুভূতি, দ্বিতীয়টিকে বলতে পারি স্বীকরণাত্মক (assimilative) সহানুভূতি।

১৮। নান্দনিক সম্ভোগের ক্ষেত্রে যখন বিষয় বিষয়ীর একাত্মতা ঘটে, তখন তার মধ্যেও আমরা অনুরূপ বিকল্প প্রবণতার দ্বৈততা দেখতে পাই। এই প্রবণতাদ্বয়ের একটি প্রক্ষেপাত্মক বা সৃজনধর্মী (creative), অপরটি স্বীকরণাত্মক বা নিষ্কর্ষণধর্মী (abstractive)। বস্তুর মধ্যে আসলে যে জিনিসটিকে আমরা সম্ভোগ করি সে হল সৌন্দর্য। তাকে আমরা এমন এক স্বয়ংসিদ্ধ এবং চিরন্তন মূল্য রূপে গ্রহণ করি, বস্তু যার একটি প্রতীক মাত্র। নান্দনিক সম্ভোগের ক্ষেত্রে বস্তুর এই যে প্রতীকীভবন, এটি দু ধরণের প্রক্রিয়ায় হতে পারে। এক— হতে পারে যে, প্রতীকে-পরিণত বস্তুটির সুনির্দিষ্ট তথ্যগত বিশিষ্টতাগুলি তখনো অটুট আছে, কিন্তু তারই মধ্যে এমন এক মূল্যের সঞ্চার হয়েছে যা তাকে সম্পূর্ণ ছাপিয়ে গিয়ে বস্তু-অতীত এক ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্যে নিজেকে প্রকাশিত করছে (express a value as its transcendent significate)। অথবা— এমন হতে পারে যে, বস্তুটির সমস্ত তথ্যগত বিশিষ্টতা মিলিয়ে গিয়েছে, আর প্রতীকায়িত মূল্যটিই যেন সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে দিব্যদেহী হয়ে উঠেছে— চিত্তলোকের ঈথার-তরঙ্গে ভাসমান স্বপ্নের মতো সে যেন দেশকাল-অনালিঙ্গিত (nowhere in space and time) এক ভাসমান দিব্যসত্তা !

উভয় ক্ষেত্রেই সম্ভোগকারী সমভাবে নিজেকে ওই চিরন্তন মূল্যের সঙ্গে একাত্ম করে দেখছেন। কিন্তু দুই ক্ষেত্রে দু রকম ভাবে। প্রথম ক্ষেত্রে সম্ভোগকারী অবলীলাক্রমে বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বস্তু অনচ্ছতাকে পরাভূত করছেন, নিজেকে অবলোকন করছেন বস্তুর আত্মা রূপে— বস্তুর হৃদয়স্থিত মর্মসত্য রূপে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি তথ্যরূপী বস্তুর সমস্ত সম্পর্কজাল থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন, যার ফলে বস্তুটির কঠিন-ভাবে-উচ্চারিত সীমারেখাগুলি কোমল হয়ে, ঝাপ্‌সা হয়ে, হারিয়ে গিয়েছে, তার বস্তুসত্তাটাই দ্রবীভূত হয়ে বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং সম্ভোগকারী অনুভব করছেন— অবলোকন নয়— স্পষ্টতই অনুভব করছেন যে, বস্তুর আত্মাটি যেন বস্তু থেকে মুক্ত হয়ে এসে তাঁর সম্ভোগের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছে।

প্রথম ক্ষেত্রের সম্ভোগানুভূতি বিষয়গত। বিষয়গত— কিন্তু তথ্যে আবদ্ধ নয়। অনুভূতি এখানে তথ্যকে মূল্যে রূপান্তরিত করে নিয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে— ভোক্তা নিরাসক্ত দূরত্বে প্রতিষ্ঠিত। দূরত্ব বটে, কিন্তু এই দূরত্ব সম্ভোগের মধ্যে কোনো অবাস্তবতার ভাব এনে দেয় নি। এখানে বস্তুর আত্মা বা বস্তুর মূল্যকে বস্তু থেকে যেন নিষ্কর্ষণ করে নিয়ে নিশ্চিন্ত প্রশান্তির মধ্যে তাকে আস্বাদন করা হচ্ছে। প্রথম ক্ষেত্রে, সম্ভোগে বস্তু-সংযোগ থাকা সত্ত্বেও, ভোক্তার মুক্তি অব্যাহত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ভোক্তার দিক থেকে দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও, সম্ভোগের পরিপূর্ণতা ও বাস্তবতা অক্ষুণ্ণ।

১৯। ভারতীয় শিল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্কর্ষণধর্মী বা ধ্যানাত্মক— অর্থাৎ মননধর্মী শিল্প। তার পথ বেগবান্ সৃজনশীলতার পথ নয়। ভারতীয় শিল্পদর্শনে নান্দনিক নির্ধাসকে গ্রহণ করা হয়েছে মনোময়

তত্ত্ব হিসাবে তারই পরম মূল্যে। তাকে বিষয়গত তত্ত্ব হিসাবে দেখা হয় নি, বিষয়গত তত্ত্বের যে-পরমমূল্য, সেই মূল্যে তাকে গ্রহণ করা হয় নি। অর্থাৎ, রস হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে অন্তর্লোকের সত্যতায়, সৌন্দর্য হিসাবে— বহির্লোকের সত্যতায় গ্রহণ করা হয় নি (the aesthetic essence is conceived as a subjective absolute or rasa rather than as an objective absolute or beauty)।

অনুবাদ : সত্যেন্দ্রনাথ রায়

বানানপদ্ধতির দুইটি সূত্র

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্‌যোগে ১৯৩৬ সালে বাংলা বানানের যে একটি নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় দেশের শিক্ষিত সমাজ তাহা একরকম মানিয়া লইয়াছেন বলা চলে। মানিয়া লওয়ার অর্থ ইহা নয় যে হাতের লেখায় এবং মুদ্রিত পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থাদিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সর্বতোভাবে অনুসৃত হইতেছে। অনুসরণের ইচ্ছা অনেকের আছে, অনুসরণের চেষ্টারও অসদ্ভাব নাই, কিন্তু কার্যতঃ অভীষ্ট ফল পুরাপুরি পাওয়া যাইতেছে না। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের লেখাতেও নিয়ম লঙ্ঘনের অবিরল দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এক প্রকাশকের পাঁচটি বই খুলুন পাঁচ রকমের বানান দেখিতে পাইবেন। একই লেখকের একাধিক গ্রন্থে একাধিক বানান দেখা যাইবে। একই লেখকের একাধিক গ্রন্থ বিভিন্ন প্রকাশকের হাতে মুদ্রিত হইলে বানানে বিভিন্নতা না হইয়া পারে না। এমনকি একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ভিন্ন ভিন্ন বানান দৃষ্টিগোচর হইবে।

এইরূপ গণ্ডগোলের প্রধান কারণ বানান সম্পর্কে লেখকের ঔদাসীন্য, অবশ্য অজ্ঞতার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। অনেক লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের পক্ষপাতী হইয়াও দ্রুত লিখনের সময় এত ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিতে পারেন না। লেখা শেষ করিবার পর পাণ্ডুলিপির বানান সংশোধন করিবার সময় এবং ধৈর্যেরও অভাব ঘটে। তাঁহারা প্রেসকপি প্রণয়নের ভার প্রকাশকের হাতে তুলিয়া দেন। প্রুফ দেখার ভারও প্রকাশকের হাতেই অর্পিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান পদ্ধতি মানিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশ ছিল পাণ্ডুলিপিতে অভ্যাসবশে পুরাতন বানান লেখা হইলেও মুদ্রণের জন্য যে প্রতিলিপি প্রস্তুত করা হইবে তাহাতে নূতন বানান ব্যবহার করিতে হইবে। মুদ্রণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নির্দেশ ছিল। শুধু নূতন গ্রন্থে নয় তাঁহার পুরাতন গ্রন্থের নূতন সংস্করণেও নূতন বানান অনুসৃত হইয়াছে। রবীন্দ্র-রচনাবলীতেও নূতন বানান ব্যবহার করা হইয়াছে।

বিশ্বভারতীর মত একটি বৃহৎ এবং অভিজাত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকাশন-সংস্থার পক্ষে সব সময় তাহা সম্ভব হয় না। তবে এ কালে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত প্রকাশনসংস্থায় এবং মুদ্রণালয়ে কপি ও প্রুফ সংশোধনের জন্য অভিজ্ঞ এবং দক্ষ কর্মী নিযুক্ত আছেন। বড় বড় গ্রন্থকারের পরিত্যক্ত কাজটুকু গ্রন্থকারের নির্দেশ লইয়া তাঁহারাই সম্পূর্ণ করিয়া দেন। প্রেস ও প্রকাশক যেখানে উদাসীন অথবা অক্ষম সেখানেই যথেচ্ছাচার। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকাশন-বিভাগে ঔদাসীন্য এবং অক্ষমতা কোনোটারই অসদ্ভাব নাই। তাহার যে ফল স্বাভাবিক তাহাই ফলিতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান "কিয়ৎপরিমাণে নিয়ন্ত্রণ ও সরল করিতে" চাহিয়াছিলেন। তাহার জন্য যতটুকু পরিবর্তন নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন তাহার অধিক করেন নাই।

তৎসম শব্দের বানান সম্পর্কে তাঁহারা দুইটি মাত্র নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটি হইল, "রেফের পর দ্বিত্ব হইবে না।"

অন্যান্য নিয়ম সম্বন্ধে মতান্তর থাকিতে পারে কিন্তু রেফের পর দ্বির্বচন সম্বন্ধে মতানৈক্য দেখা যায়

নাই। কেবল শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ কিছু আপত্তি তুলিয়াছিলেন, আরও দুই একজন তাঁহার সহিত যোগ দিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু সে আপত্তি জনমতের উপর যে কোনো প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই তাহা আজিকার বানান দেখিলেই বোঝা যায়। শুধু মুদ্রণে নয় হাতের লেখাতেও রেফের পর বর্ণের দ্বিত্ব বিরল হইয়া আসিতেছে।

তবে দ্বিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না। পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় এখনও নির্দিষ্ট সময়ে 'স্বর্য্যোদয়' 'সূর্য্যাস্ত' হয়। এখনও 'ধর্ম্মানুষ্ঠান' করিতে হইলে 'শুভকর্ম্মের' নির্ঘণ্ট দেখিতে হয়। 'চতুর্দ্দশীতে' 'পূর্ব্বদিকে' যাত্রা বিধেয় কি না, 'পর্ব্ব'দিনে 'চর্ম্ম'পাদুকা পরিধান শাস্ত্রসম্মত কি না, 'কার্ত্তিকে' 'বার্ত্তাকু' ভক্ষণ করিলে কি অপরাধ হয় পঞ্জিকার পাতায় অদ্যাবধি তাহা দ্বৈতাক্ষরে লিখিত হইতেছে। তবে দ্বির্বচনের বিলুপ্তির দিকে সর্বসাধারণের যে ঝোঁকটা দেখিতেছি তাহাতে মনে হইতেছে 'গ্রহাচার্য্যগণ'ও অল্পদিনের মধ্যেই অদ্বৈতবিধান করিতে বাধ্য হইবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিত্ব বর্জনের যে বিধান দিয়াছেন তাহাতে অভিনবত্ব কিছু নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণকেই তাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধানে রেফের পর দ্বিত্ব গ্রহণ না করাটাই পুরাতন সংস্কৃত ভাষার সাধারণ রীতি ছিল। এখনও কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত, কি সংস্কৃত কি আঞ্চলিক কোনো ভাষাতেই, রেফের পরস্থিত ব্যঞ্জন দ্বিত্ব গ্রহণ করে না। ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে সংস্কৃত ভাষায় রেফের পর দ্বিত্ব গ্রহণ অজ্ঞাত না হইলেও অপ্রচলিত। অসংস্কৃত শব্দের বানানে তো রেফের পর দ্বিত্ব দেখাই যায় না।

আমাদের এখানে রীতি ছিল অন্য রকম। আমরা মর্দ্দনে দুইটা দ তো দিয়াই আসিতেছিলাম পরে পর্দ্দাতেও দুইটা দ না দিয়া পারি নাই। আমাদের উচ্চারণ-রীতিই এইরূপ। র্-এর পর ব্যঞ্জন বসিলে আমরা অজ্ঞাতসারেই উচ্চারণ করিবার সময় বর্ণটার দ্বিত্ববিধান করিয়া বসি। আমরা 'কর্‌ম' বলিতে পারি না, বলি 'কর্‌ম্‌ম'। 'মুর্‌ছা' বলিতে আমরা অভ্যস্ত নই, বলি 'মুর্‌চ্‌ছা'। ভারতবর্ষের আরও কোনো কোনো অঞ্চলে এইরূপ উচ্চারণরীতি সম্ভবতঃ বর্তমান ছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণকার তাহা লক্ষ্য করিলেন। দেখিলেন এই রীতি অনেক লোকের মধ্যে প্রচলিত। এই রীতির প্রভাবে অনেকে সর্ব লিখিতে গিয়া সর্ব্ব লিখে, যেখানে অর্ধ লিখিলেই চলে সেখানে অর্দ্ধ না লিখিয়া পারে না, ভূর্জপত্রে দুইটা বর্গীয় জ দেয়, সূর্যের য-য়ে আর একটা য-ফলা লাগায়। ব্যাকরণকার বুঝিলেন এক বা একাধিক অঞ্চলে প্রচলিত এই রীতিটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ওই অঞ্চলের অধিবাসীরা স্ব স্ব প্রাকৃত ভাষায় এই রীতি অনুসরণ করিতে অভ্যস্ত, সংস্কৃতচর্চা করিতে আরম্ভ করিয়াও সে রীতি ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। তখন তাঁহারা এই রীতিটাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। বলিলেন,— যাহারা 'সর্ব' লিখে তাহারা ঠিকই লিখে তবে যাহারা 'সর্ব্ব' লিখিবে তাহাদের বানানও অশুদ্ধ বলিব না।

পুরাতন ব্যাকরণকে নূতন রীতির কাছে মাঝে মাঝে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, সকল ভাষায় তাহার প্রমাণ আছে। অনেক বিকল্পবিধানে এইরূপ আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত লক্ষ্যগোচর হইবে।

রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বিকল্পে হয়।— সংস্কৃত ব্যাকরণের এই নূতন সূত্রকেও প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হইল। প্রশ্ন উঠিল, বিকল্প কি সর্বক্ষেত্রেই হয়? অর্চনা অর্চ্চনা, সর্ব সর্ব্ব, কার্য কার্য্য, ধর্ম ধর্ম্ম, কর্ণ কর্ণ্ণ, কর্পূর কর্প্পূর হয়। কিন্তু স্পর্শ-এর বিকল্প স্পর্শ্‌শ, হর্ষ-এর বিকল্প হর্ষ্‌ষ হইবে কি?

সাধারণতঃ হয় না। তাহা দেখিয়া একটি রক্ষাসূত্র দিয়া নিয়মটিকে সংকুচিত করিয়া বলা হইল "উষ্মবর্জম্", অর্থাৎ রেফের পরে থাকিলেও শ ষ স-এর দ্বিত্ব হইবে না। অন্য দল এই রক্ষাসূত্রকেও অখণ্ডনীয় মনে করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন—রেফের পরবর্তী উষ্মবর্ণমাত্রই দ্বিত্বলাভ করিবে না এমন কথা বলা সংগত নয়। ঈর্ষ্যা ঈর্ষ্ষ্যা, দর্শ্যতে দর্শ্শ্যতে এরূপ বানান হইতে পারে। এরূপ বানান নিশ্চয় কোথাও কোথাও প্রচলিত ছিল, ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। অন্য দলের নজরেও তাহা পড়িয়াছিল। প্রতিবাদীরা তাহা অস্বীকার করিলেন না। তাঁহারা রক্ষাসূত্রটিকে আর একটু সংকুচিত করিয়া বলিলেন,—শ ষ স-এর দ্বিত্বভাব হয় বটে কিন্তু তাহার ক্ষেত্র নিতান্তই সীমিত। শ ষ স-এর দ্বিত্বভাবও বিকল্পে হইবে যদি স্বরবর্ণ পরে না থাকে। স্পর্শ হর্ষের বেলা দ্বিত্ব হইবে না; দর্শ্যতে ঈর্ষ্যার বেলা হইলেও হইতে পারে। বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন উষ্মবর্ণের কোনো অবস্থাতেই দ্বিত্ব হইবে না। ইঁহাদের মধ্যে শাকল্য প্রধান। শাকল্য 'ঈর্ষ্ষ্যা' 'দর্শ্শ্যতে' বানান স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। সম্ভবতঃ এই ধরনের বানান অত্যন্ত বিরল ছিল। একটি দুইটি শব্দে এইরূপ দ্বিত্বসংঘটনকে দেখিয়া তিনি ইহাকে একটা নিয়মের মধ্যে ফেলিতে আপত্তি করিয়াছিলেন।

যতদূর বুঝা যাইতেছে সংস্কৃত ভাষার আদি যুগে রেফের পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব হইত না। ঋগ্বেদের ভাষায় দ্বিত্বসংঘটনের নিদর্শন নাই।

রেফের পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্বসাধন প্রবর্তিত হয় পরবর্তী কালে, সম্ভবতঃ প্রাকৃতের যুগে। এই দ্বির্বচনে প্রাকৃত ভাষার প্রভাব সুপরিস্ফুট। প্রাকৃত ভাষায়, কি মহারাষ্ট্রী কি শৌরসেনী কি মাগধী কোনো প্রাকৃতেই, বিভিন্ন দুই উচ্চারণস্থান হইতে উদ্ভূত দুই বর্ণ একত্র থাকিতে পারে না। প্রাকৃতে যুক্তাক্ষরের নিয়ম সে দিক্ দিয়া অত্যন্ত সরল। সংস্কৃত শব্দে যে যুক্তাক্ষরের প্রথম বর্ণ র্, প্রাকৃতের নিয়ম মতে তাহার ঐই র্ লোপ পায়।[১] এবং অবশিষ্ট বর্ণটির দ্বিত্ব হয়।[২] এই নিয়মে ধর্ম হয় ধম্ম, বর্ণ হয় বণ্ণ, অর্ক হয় অক্ক, সর্ব হয় সব্ব। এই দ্বিতীয় নিয়মটি হইতেই অনুমান করা যায় যে সংস্কৃতের আদি যুগে রেফ-যুক্ত অক্ষরে রেফের পরবর্তী বর্ণে দ্বিত্ব হইত না। সর্ব ধর্ম বর্ণ প্রভৃতি শব্দের র্ব্ব র্ম্ম র্ণ্ণ-যুক্ত বিকল্প রূপ অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত ছিল। প্রাকৃত উচ্চারণে র্ লোপ পাইয়া পরবর্তী বর্ণের দ্বিত্ব ঘটাইল এবং সেই শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণের কালেও কোনো কোনো প্রদেশে সে দ্বিত্বের আর একত্ব সাধিত হইল না। এই প্রাকৃত উচ্চারণের প্রভাব যে-সকল অঞ্চলে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, বঙ্গদেশ তাহার অন্যতম। আমাদের অদ্যকার উচ্চারণরীতি বিশ্লেষণ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। বাঙ্গালীর উচ্চারিত সংস্কৃত পাঠে বঙ্গীয় উচ্চারণের প্রভাব শুধু বর্ণদ্বিত্বের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও সুপ্রচুর। আমাদের উচ্চারণরীতির বৈশিষ্ট্য বিদেশী ভাষা শিক্ষার কালেও প্রকাশ পায়। বানানেও তাহার ছায়া পড়ে। ত্রিশ বৎসর আগে পর্যন্ত ফর্ম্মা (forme), ফর্দ্দ, কুর্ত্তি, কুর্ব্বানি, আর্ম্মাণি, আর্দ্দাশ, আর্দ্দালী, জার্ম্মান, হার্ম্মাদা বানান লিখিয়াছি। আজ বানানে দ্বিত্ব প্রয়োগ করি না বটে, কিন্তু কান পাতিয়া শুনিলে উচ্চারণে দ্বিত্বের রেশ পাওয়া যাইবে।

১ সর্বত্র লবরাম্। প্রাকৃতপ্রকাশ ৩।৩

২ শেষাদেশয়োর্দ্বিত্বমনাদৌ। ঐ ৩।৫

পুরাতন বাংলা পুঁথিতে সংপুন্ন, স্বগ্‌গ, প্রকীন্নক, কন্ন, তীত্থ, সব্ব, বর্ত্তে (বর্ত্থে) বত্তই (<বর্ততে) ভত্তারহু (<ভর্তারম্) পরিপূন্নএ, নিব্বাণ, ধম্ম, দুজ্জণ, উদ্ধ (<ঊর্ধ্ব) প্রভৃতি বানান অজস্র দেখা যায়। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপে রেফ্ থাকিবার কথাই নয়। প্রাচীন বাংলায় সংস্কৃত 'দুর্জন' শব্দ হয় দুজ্জন নয় তো দুরুজন হইয়া যাইবে। 'বর্ণ' হইবে বন্ন বাণ বরণ। 'ধর্ম' ধম্ম হইতে পারে, নহিলে হইবে ধাম বা ধরম। দেশীয় উচ্চারণরীতির অনুসরণেই স্বগ্‌গ, সংপুন্ন, পরিপুন্ন, দুজ্জন, ধম্ম, বন্ন, তীত্থ, বর্ত্ত প্রভৃতি বানানের উদ্ভব। এই রূপই স্বাভাবিক। কিন্তু পণ্ডিতেরা এগুলিকে অশুদ্ধ মনে করিয়া ইহাদের মাথায় রেফ চাপাইয়া 'শুর্দ্ধ' করিতে আরম্ভ করিলেন। যুক্তাক্ষরের উপরেই রেফ চাপিল। সে ব্যাপারটাও অস্বাভাবিক নয়। তাহা বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের বিরোধী নহে।

দেখা যাইতেছে রেফের পরবর্তী কয়েকটি ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করাটা আমাদের অভ্যাস, বানানে সেই অভ্যাসেরই প্রতিফলন ঘটিয়াছে। সে প্রতিফলনও কেবল সংস্কৃতে নয় অন্য জাতীয় শব্দেও, এমনকি বিদেশী শব্দেও।

এমন সুদৃঢ় অভ্যাসও যে আমরা এত সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? কোনো পক্ষ হইতেই কোনো প্রবল বাধা আসিল না কেন?

দ্বিত্ব বর্জনের একটা প্রবণতা মধ্যযুগের শেষ ভাগ হইতেই দেখা যাইতেছিল। কৃষ্ণকীর্তনে র্ব্ব র্ব, র্গ্‌গ র্গ, র্ম্ম র্ম, র্ত্ত র্ভ, র্জ্জ র্জ, সদ্বৈত অদ্বৈত দুই রকম বানানই পাই। র্প, র্ষ, র্শ, র্ণ-এর ক্ষেত্রে দ্বিত্ব নাই। পরবর্তীকালে দ্বিত্ব বর্জনের প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত চ ছ জ ত দ ধ ব ম য— এই নয়টি বর্ণ ছাড়া অন্য সর্বত্র দ্বিত্ব উঠিয়া গেল।

ইহাদের মধ্যেও কোনো কোনো স্থলে দ্বিত্ব বর্জিত হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' প্রথম সংস্করণে (১৯১৭) আর্য্য আচার্য্য-এর সঙ্গে সঙ্গে নির্যাত নির্যাতন বানান ধরা হইয়াছে। নির্ব্বাণ নির্ব্বন্ধ নির্ব্বাত নির্ব্বাপক নির্ব্বাপণ নির্ব্বিন্ধ্যা প্রভৃতির দ্বিত্বহীন বিকল্পরূপও উক্ত অভিধানে স্থান পাইয়াছে। এই অভিধানে বিদেশী শব্দ 'মর্দ্দানা'র ক্ষেত্রেও বিকল্প বানান 'মর্দানা' গৃহীত হইয়াছে। 'মর্জ্জি' বানানে দুইটা জ কিন্তু 'মর্চে'তে একটা চ আছে। এই-সকল দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বোঝা যায় যে রেফের পর দ্বিত্বগ্রহণের অভ্যাসটা শিথিল হইয়া আসিয়াছিল।

কাশী ও বোম্বাই অঞ্চলে মুদ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থে, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের লিখিত ও সম্পাদিত নাগরী এবং রোমান হরফে ছাপা বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থে রেফের পর দ্বিত্ব না দেওয়াটাই সাধারণ নিয়ম। সেই সকল গ্রন্থও পণ্ডিতসমাজের মনে ক্রিয়া করিতেছিল। এ যুগে হিন্দীর প্রচলন হওয়ার ফলেও দ্বিত্বের সংস্কারটা দুর্বল হইতেছিল। কাজেই দ্বিত্ববর্জনের বিধান সহজেই গৃহীত হইল।

মুদ্রাকর-সমাজও দ্বিত্ব বর্জনে খুশি হইলেন। দ্বিত্ব চলিয়া যাওয়ায় টাইপরাইটার এবং লাইনো যন্ত্রের পক্ষেও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখন যদি কেহ দ্বিত্ব পুনরায় প্রবর্তন করিতে চাহেন তো মুদ্রাকর সম্প্রদায় হইতেই সর্বাধিক বাধা পাইবেন। কিন্তু সে রকম আশঙ্কার কোনো কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। বাংলা বানানে দ্বিত্ব বর্জন করিয়া আমরা সর্বভারতীয় বানানপদ্ধতির কিছুটা নিকটবর্তী হইয়াছি। আমাদের গৃহীত রীতি সমগ্র পূর্বাঞ্চলে প্রবর্তিত হইতে বিলম্ব হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রচিত বানানপদ্ধতিতে সংস্কৃত অর্থাৎ তৎসম শব্দ সম্বন্ধে নির্দেশিত দ্বিতীয় নিয়মটি এই :—

"সন্ধিতে ঙ্ স্থানে ং।—যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে ং অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়, যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, সংঘাত' অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর, সঙ্গীত, সঙ্ঘাত'।"

রেফের পর দ্বিত্ববর্জনের নিয়ম নিত্য, কিন্তু এই নিয়মটি বিকল্প। এরূপ নিয়ম প্রণয়নের সার্থকতা কি? বিকল্প বানান যতটা কম হয় ভাষার পক্ষে ততই মঙ্গল। যেখানে একই শব্দের অনেক বানান নির্বিচারে ব্যবহার করা হয় সেখানে সবগুলির ব্যবহারে উৎসাহ না দিয়া একটিকে প্রচলিত রাখিবার চেষ্টা করাই ভাল। তাহাতে বিশৃঙ্খলা কমে, যথেচ্ছাচার কমে। ক-বর্গীয় বর্ণের পূর্ববর্তী ম্ স্থানে বিকল্পে ঙ্ এবং অনুস্বারের বিধান দিয়া কি বিশৃঙ্খলা কমাইবার কোনো ব্যবস্থা হইল?

বর্তমান বানানপদ্ধতি প্রবর্তিত হইবার পূর্বে এ বিষয়ে কি নিয়ম অনুসৃত হইত দেখা যাক। আমরা ১৯৩৬-এর পূর্বে মুদ্রিত তিনটি প্রচলিত অভিধান হইতে কয়েকটি শব্দের বানান তুলিয়া দিতেছি।

৬ষ্ঠ সং, ১৯২৮ সুবল মিত্রের সরল বাঙ্গলা অভিধান	১ম সং, ১৯১৩ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গলা ভাষার অভিধান	২য় সং, ১৯৩৩ রাজশেখর বসুর চলন্তিকা
অলঙ্কার	অলঙ্কার	অলঙ্কার
শঙ্কর	শঙ্কর	শঙ্কর
শুভঙ্কর	শুভঙ্কর	শুভঙ্কর
ভয়ঙ্কর	ভয়ঙ্কর	ভয়ঙ্কর
প্রলয়ঙ্কর	প্রলয়ঙ্কর	প্রলয়ঙ্কর
অহঙ্কার	অহঙ্কার	অহঙ্কার
সঙ্ক্ষিপ্ত/সংক্ষিপ্ত	সঙ্ক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত
সঙ্ক্ষুব্ধ, সঙ্ক্ষোভ	সঙ্ক্ষুব্ধ/সংক্ষোভ	সংক্ষুব্ধ/সংক্ষোভ
সঙ্ক্ষেপ/সংক্ষেপ	সঙ্ক্ষেপ	সংক্ষেপ
সঙ্খ্যা/সংখ্যা	সঙ্খ্যান (সঙ্খ্যা বা সংখ্যা ধরা হয় নাই)	সংখ্যা
সঙ্গতি	সঙ্গতি	সঙ্গতি
সঙ্গীত	সঙ্গীত	সঙ্গীত
সঙ্কীর্ত্তন/সংকীর্ত্তন	সঙ্কীর্ত্তন	সঙ্কীর্ত্তন/সংকীর্ত্তন
সঙ্ঘ/সংঘ	সঙ্ঘ	সঙ্ঘ/সংঘ
সঙ্ঘটিত/সংঘটিত	সঙ্ঘটিত	সঙ্ঘটন/সংঘটন
সঙ্ঘাত/সংঘাত	সঙ্ঘাত	সঙ্ঘাত/সংঘাত
সংক্রম/সঙ্ক্রম	সংক্রম	সংক্রমণ
সংক্রান্ত/সঙ্ক্রান্ত	সংক্রান্ত	সংক্রান্ত

সংক্রান্তি/সঙ্ক্রান্তি	সংক্রান্তি	সংক্রান্তি
সংগোপন/সঙ্গোপন	সংগোপন	সংগোপন
সংগ্রহ/সঙ্গ্রহ	সংগ্রহ	সংগ্রহ
সংগ্রাম/সঙ্গ্রাম	সংগ্রাম	সংগ্রাম
সংগ্রাহক/সঙ্গ্রাহক	সংগ্রাহক	সংগ্রাহক

অলঙ্কার অহঙ্কার শঙ্কর শুভঙ্কর সঙ্গতি সঙ্গীত— এই শব্দগুলিতে তিনটি অভিধানেই ঙ্ দিয়া বানান করা হইয়াছে, বিকল্পে অনুস্বারের বিধান নাই।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন কয়েকটি শব্দের ঙ্ দিয়া এবং কয়েকটির অনুস্বার দিয়া বানান করিয়াছেন। তিনি কোনো শব্দেরই বিকল্প বানান ধরেন নাই।

সঙ্কীর্ত্তন সঙ্ঘ সঙ্ঘটিত সঙ্ঘাত— এই শব্দগুলির বিকল্প বানান ধরা হইয়াছে সুবলচন্দ্রের অভিধানে এবং চলন্তিকায়। উভয় অভিধানই দুই বানান স্বীকার করিলেও ঙ্‌কে প্রথম স্থান দিয়াছেন। এই চারিটি শব্দে জ্ঞানেন্দ্রমোহনও ঙ্ বানান সমর্থন করেন। অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তন সঙ্ঘ সঙ্ঘাত সঙ্ঘটিত শব্দের ঙ্-যুক্ত বানান সম্পর্কে তিন অভিধানেরই পক্ষপাত।

সঙ্ক্ষিপ্ত সঙ্ক্ষুব্ধ সঙ্ক্ষোভ সঙ্ক্ষেপ সঙ্খ্যা—সুবলচন্দ্রের অভিধানে বিকল্প বানান, প্রথমে ঙ্ পরে অনুস্বার। জ্ঞানেন্দ্রমোহনে এক বানান— ঙ্ দিয়া। চলন্তিকাতেও এক বানান, কিন্তু অনুস্বার দিয়া। হিসাবে ঙ্-এর দিকেই পাল্লা ভারী হয়।

সংক্রম সংক্রান্ত সংক্রান্তি সংগোপন সংগ্রহ সংগ্রাম সংগ্রাহক— জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও রাজশেখর উভয়েই কেবলমাত্র অনুস্বার দিয়া বানান করিয়াছেন। সুবলচন্দ্র অনুস্বার ও ঙ্ দুইই দিয়াছেন, কিন্তু অনুস্বারের স্থান প্রথমে। সুতরাং অনুস্বারের প্রতিই ঝোঁকটা যে প্রবল তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে।

প্রাচীন বাংলায় ঙ্-এর ব্যবহারই প্রচলিত। অনুস্বারও দেখা যায়। এমনকি অনুচিত স্থানেও দেখা যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে শংখ সংপুন (সম্পূর্ণ) সংপুটে (সম্পুটে) লংঘিব বানানও আছে।

চর্যায় পদান্তস্থিত ম্-এর স্থলে অনুস্বার বা ঙ্ দেখাইবার মত তৎসম শব্দের একান্ত অভাব। একটি শব্দ পাইয়াছি সংকলেউ, এই শব্দে অনুস্বার আছে, ঙ্ নাই।

সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধানমতে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদান্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। বিকল্পে যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে পদান্তস্থিত ম্ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন কিছু করেন নাই, সংস্কৃত ব্যাকরণের এই নিয়মকেই সমর্থন করিয়াছেন। বহু নিয়মের মধ্য হইতে একটিকে নির্বাচন করিয়া এরূপ সমর্থনের কি প্রয়োজন ছিল? যতদূর মনে হইতেছে পদান্তস্থিত ম্ স্থলে সর্বত্রই অনুস্বার বসুক ইহাই সমিতির মুখ্য সভ্যদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। হিন্দীতে (ं) এই ঊর্ধ্ববিন্দু অনুস্বার-চিহ্ন সকল পঞ্চম বর্ণের কাজ অনায়াসে চালাইয়া যাইতেছে। পদমধ্যস্থ ন্ ও ম্— এর পরে বর্গীয় বর্ণ থাকিলে ওই ন্ ও ম্-এর স্থানে বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের এ বিধান নিত্য। কিন্তু হিন্দীতে এ নিয়ম কদাচিৎ রক্ষিত হয়। আশংকা, বাংছা, কংপন, গংতব্য, ক্ষাংতি, শাংতি প্রভৃতি অনুস্বার-যুক্ত বানানই হিন্দী লেখায় ও ছাপায় সুপ্রচলিত। বানানসমিতি সম্ভবতঃ বাংলা বানানে এইরূপ অনুস্বার

প্রচলন কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন সর্বত্রই পঞ্চম বর্ণের স্থলে অনুস্বার প্রবর্তন করিতে পারিলে অনেকগুলা শব্দের বানান সরল হইয়া যাইবে, মুদ্রণের ক্ষেত্রেও অনেকগুলা যুক্তাক্ষরের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। মনে রাখিতে হইবে তখনও লাইনো-মুদ্রণ শুরু হয় নাই।

তাঁহাদের নিয়মাবলীতে এই প্রসঙ্গে এই মন্তব্য মুদ্রিত হইয়াছিল,—

"সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা—'সংজাত স্বয়ংভু' অথবা 'সঞ্জাত স্বয়ম্ভু'। বাংলায় সর্বত্র এই নিয়ম অনুসারে অনুস্বার দিলে বাধিতে পারে, কিন্তু ক বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, বরং বানান সহজ হইবে।"

এই মন্তব্যের আলোকে বানান সংস্কার সমিতির মনোভাবটি সহজেই পাঠ করা যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে যেখানে ইম্ স্থানে অনুস্বার করা যায় বাংলায় সেখানেই অনুস্বার হউক। তবে কিনা চ-বর্গ ট-বর্গ ত-বর্গ প-বর্গে ম্ স্থানে অনুস্বার দিলে "বাধিতে পারে", তাই সে বিষয়ে তাঁহারা জোর দিতে চান না। ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটির দিকে লক্ষ করুন। "বাধিবে" বলেন নাই, বলিয়াছেন "বাধিতে পারে"। "বাধিতে পারে"র মধ্যে না বাধার সম্ভাবনাও যে নিহিত আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইচ্ছা থাকিলেও চ ট ত প বর্গে ম্ স্থানে অনুস্বার হউক এ কথা বানান সংস্কার সমিতি স্পষ্ট করিয়া বলিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু ক-বর্গের ক্ষেত্রে অনুস্বার ব্যবহার করিলে উচ্চারণেও বাধিবে না, বানানও সহজ হইবে এ কথা দ্বিধাহীন-ভাবেই বলিয়াছেন। ক-বর্গের বর্ণ পরে থাকিলে পদান্তস্থিত ম্ স্থানে কেবল অনুস্বার হইবে পঞ্চম বর্ণ হইবে না—এইরূপ নির্দেশ দিতে পারিলেই সুবিধা হইত। বিকল্প বিধানের কোনো যুক্তি ছিল না। বিধানের পূর্বেও যে কোনো কোনো শব্দে বিকল্পে ঙ্ ও অনুস্বার হইত তাহা তো আমরা দেখিয়াছি।

যুক্তি থাক বা না থাক অভীষ্ট কিছুটা সিদ্ধ হইয়াছে। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে ক বর্গের পূর্ববর্তী ম্-এর স্থলে ঙ্ আর বড় একটা দেখা যায় না। এখন অহংকার অলংকার সংকীর্তন সংখ্যা সংখ্যান সংগীত সংগতি সংঘ সংঘাত প্রভৃতি শব্দে আর লোকে ঙ্ দেয় না।

কিন্তু অনুস্বারের অধিকতর প্রচলনের ফলে একটি নূতন বিপত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। যেখানে ব্যাকরণ মতে অনুস্বার অশুদ্ধ এবং ঙ্-ই অপেক্ষিত সেখানেও অনুস্বার অনধিকার প্রবেশ করিতেছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের হাতেও অংগ বংগ কলিংগ গংগা বংকিম রংগ সংগে অংকন পংক বাহির হইতেছে। এটা যে ভুল, লেখকদের মনে সেরূপ সংশয়েরই উদয় হয় না। তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তাক্ষরে ঙ্ তুলিয়া দিয়াছেন, ঙ্ স্থানে সর্বত্রই অনুস্বার বিহিত হইয়াছে। হিন্দীর (ं) ঊর্ধ্ববিন্দু এই ধারণার প্রসারে সহায়তা করিয়াছে।

পঞ্চম বর্ণস্থলে অনুস্বার (ं) মানিয়া লওয়ায় হিন্দীর পক্ষে মুদ্রণাদির কাজ যে সহজ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলার ক্ষেত্রেও হিন্দীর মতই পঞ্চম বর্ণস্থলে সর্বত্র অনুস্বার ব্যবহার করিলে কেমন হয়? এ বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।[৩] বলিয়াছি ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্-এর স্থলে সর্বত্রই অনুস্বার ব্যবহার করা চলে। এই প্রসঙ্গে রাজশেখর বসু মহাশয় এক সময় বলিয়াছিলেন, অনুস্বারকে অনুস্বার বলিয়া নয় যুক্তাক্ষরে ব্যবহৃত ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্-এর চিহ্ন বলিয়া মনে করিয়া লইলেই অনুস্বার ব্যবহারে আর

৩ লেখকের 'লিপিবিবেক' গ্রন্থের 'অনুস্বার' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দ্বিধা থাকে না। হিন্দীভাষী লেখকগণ নাগরী লিপিতে রঙ্গ, কাঞ্চন, কণ্টক, মন্দির, কুম্ভ, প্রভৃতি তৎসম শব্দকে **রংগ, কাংচন, কংটক, মংদির, কুংভ** এইরূপ বানানে লিখিয়া থাকেন। এই-সকল ক্ষেত্রে অনুস্বার বিভিন্ন পঞ্চম বর্ণের প্রতিনিধিমাত্র। বাংলাতেও রঙ্গ কাঞ্চন কণ্টক মন্দির কুম্ভ-এর জায়গায় যদি রংগ কাংচন কংটক মংদির কুংভ লিখি তো ক্ষতি কি ?

কিন্তু এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে একটি অসুবিধা হইবে। অনুস্বার কোথায় স্বাধিকারে বসিয়াছে আর কোথায় পঞ্চমবর্ণের স্থানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না। অলংকার-এ অনুস্বার দিলে আপত্তি নাই কিন্তু অঙ্ক না লিখিয়া অংক লিখিলে তর্ক উঠিবে। সংস্কৃত ব্যাকরণমতে এখানে অনুস্বার বসিতে পারে না, কেবল ঙ্-এরই বসিবার অধিকার। ঙ্-এর প্রতিনিধি বলিয়া অনুস্বারকে বসাইলে একটা সংশয় থাকিয়া যায়। হিন্দীর ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য আছে। হিন্দীভাষীরা হয়তো এটাকে তৎসম বলিয়া মানিবেন না। হয়তো অর্ধতৎসম বলিবেন। বাঙালী লেখক অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। সংস্কৃত শব্দকে সজ্ঞানে ঈষৎ বিকৃত করিয়া তাঁহারা লিখিতে পারেন না। উচ্চারণ যতই দূরবর্তী হউক তবু সংস্কৃত বানানের দিকেই তাঁহাদের পক্ষপাত। গমনার্থক 'যা' ধাতু হইতে হিন্দী 'জানা' ধাতুর উৎপত্তি। আমাদের 'যাওয়া' ধাতুর উৎপত্তিস্থলও ওই 'যা'। হিন্দী বা বাংলা কোথাও মূল ধাতুর উচ্চারণ রক্ষিত হয় নাই। কি হিন্দী কি বাংলা কোথাও yā উচ্চারণ নাই। হিন্দীতে jānā এবং বাংলায় jāwā উভয়ত্রই জ ধ্বনি। হিন্দীতে দিব্য জ ব্যবহৃত হইতেছে কিন্তু বাংলাতে আমরা মূল সংস্কৃতের মুখ চাহিয়া য-এর প্রয়োগ করিতেছি।

বাঙালীর পক্ষে তাই ব্যাকরণের অননুমোদিত ক্ষেত্রে পঞ্চমবর্ণের স্থলে অনুস্বার ব্যবহার করিতে একটু বাধিতে পারে। তাহা ছাড়া কোন্ অনুস্বারটা পঞ্চমবর্ণের প্রতিনিধিরূপে বসিয়াছে তাহাও নিঃসংশয়ে জানা যায় না। এই কারণে একটি স্বতন্ত্র চিহ্ন প্রস্তাব করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম নাগরীর (˙) এই অনুস্বার চিহ্নটিকে আমরা অনায়াসে কাজে লাগাইতে পারি। আমরা অংশ বংশ সংশয় বানান করিব অনুস্বার দিয়া, কিন্তু অ˙গ ব˙গ কলি˙গ বানান করিব ঊর্ধ্ববিন্দু দিয়া। অহংকার অহ˙কার অলংকার অল˙কার যেমন খুশি বানান করিতে পারি। ক-বর্গ ভিন্ন সর্বত্রই ঊর্ধ্ববিন্দু চলিবে। কুঞ্জ – কু˙জ, অঞ্চল – অ˙চল, ঝঞ্ঝা – ঝ˙ঝা, বাঞ্ছা – বা˙ছা। বণ্টন – ব˙টন, কুণ্ঠা – কু˙ঠা, গণ্ড = গ˙ড। সন্ত – স˙ত, পন্থা = প˙থা, বন্দী = ব˙দী, অন্ধকার = অ˙ধকার। সম্পূর্ণ = স˙পূর্ণ, গুম্ফ – গু˙ফ, লম্বা – ল˙বা, গম্ভীর – গ˙ভীর।

বিশ্ববিদ্যালয় যে অনুস্বারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার প্রয়োগের ক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ। কেবলমাত্র ক বর্গীয় বর্ণের পূর্ববর্তী পদান্তস্থিত ম্ অনুস্বার হইলেও হইতে পারে। অন্যান্য বর্গের বেলা অনুস্বার হইবে না, কেবল পঞ্চমবর্ণ হইবে। ইহাতে লাভ খুব বেশি হয় নাই। অনুস্বার-এর ব্যবহার কিছু বাড়িল মাত্র কিন্তু পঞ্চমবর্ণ যুক্ত সকল যুক্তাক্ষরই (ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড ণ্ঢ ন্থ ন্ত ন্দ ন্ধ ম্ব) রহিয়া গেল। বর্তমান প্রস্তাব গ্রহণ করিলে এতগুলি যুক্তাক্ষরের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হইবে।

কাব্যানন্দের প্রকৃতি

প্রবাসজীবন চৌধুরী

কাব্যানন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাব-প্রকাশ থেকে এর উৎপত্তি। এই সম্পর্কে প্রথম কথা— কাব্যের স্বরূপ বুঝতে হলে কাব্য হতে সৃষ্ট বিশেষ ধরণের আনন্দটিকে প্রথমে চিনতে হবে।[১] এই আনন্দের প্রকৃতিটি জানতে হলে তার উৎপত্তি বা উৎসের রূপটিকে জানতে হবে। মানবচিত্তের যে-কোনো ভাবের ভাষাগত প্রকাশ হলেই কাব্য ও তার বিশেষ ধরণের আনন্দটির সৃষ্টি হয়। এই ভাব বলতে ঠিক কি বোঝায় এবং এর প্রকাশের সঠিক অর্থটিই বা কি তার বিশদ বিশ্লেষণ ক্রমান্বয়ে পরিচিত হবে এবং এইভাবে কাব্য-মীমাংসার অন্তর্গত বহু বিচিত্র তত্ত্বের বা গূঢ় সংজ্ঞার যথার্থ ও ক্রমিক ব্যাখ্যা— অর্থাৎ সাধারণের বোধগম্য ধারণার সাহায্যে বা মাধ্যমে "অনুবাদ" সার্থক হলেই কাব্যের স্বরূপটি পরিস্ফুট হবে। কাব্যের স্বরূপটি প্রস্ফুটিত করে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। কাব্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে 'আনন্দ' 'ভাব' 'প্রকাশ' প্রভৃতি শব্দের পারিভাষিক অর্থ আছে এবং এগুলির ক্রমিক ব্যাখ্যা অপরিহার্য। কিন্তু এগুলির সাধারণ অর্থ গ্রহণ করলেও আপাততঃ কাজ চলে যাবে। মানবচিত্তে যখন কোনো ভাবের আলোড়ন উপস্থিত হয় তখন তার উভয়বিধ পরিণতি হয়। প্রথমতঃ— মানুষ ঐ ভাবটি ভোগ করে— যেমন সে ভীত বা শোকার্ত হয় আর এমন-কিছু করতে উদ্যত হয় যাতে সে ঐ ভাবটি হতে নিষ্কৃতি পায়। যদি ভাবটি শোক বা ভয়ের মতো দুঃখকর না হয় বরং কামনা-বাসনা-সংশ্লিষ্ট কোনো সুখকর ভাব হয় এবং সেই ভাবটির যথোপযোগী পরিপোষণ হয়— তবে সেই ভাবটি লৌকিক ক্রিয়ারূপেই প্রকাশ পায়। ভাব এখানে সীমিত ও ব্যক্তিগত মানস-ব্যাপার এবং ভোক্তার চিত্তকে অভিভূত করে।

দ্বিতীয়তঃ— মানুষ ভাবকে ভোগ করার বদলে তাকে উপভোগ করতে পারে। তখন অবশ্য সে ভাবটিকে ঠিক লৌকিক ও বাস্তবিক -রূপে পায় না এবং তার দ্বারা চালিত বা অভিভূত হয় না। সে তখন ভাবটির মর্ম জানতে পারে এবং তাকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে একটি সর্বজনীন বিষয়বস্তুরূপে অবলোকন আলোচন অথবা মনন করে। সে তখন ভাবটিকে মনন দিয়ে জয় করে— তার দ্বারা নিজে বিজিত হয় না— এবং তখনই মানুষ সেই ভাবটির অজস্র রসধারায় অবগাহন করে এবং তার পূর্ণ স্বরূপটি জানতে পারে। তখন সে ভাবটি সম্পর্কে কিছু বলতেও পারে অর্থাৎ তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে। আবার তা না পারলেও 'ভাব' তার কাছে এমন উপভোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে যে সে ভাবটি দুঃখকর বা বেদনাঘন হলেও ভাবের প্রাণ 'আনন্দবিন্দু-রসসিন্ধু' সে আঁকড়ে ধরতে চায়। এই আনন্দ বা রসের কারণ চিত্তের সক্রিয় ও স্বচ্ছ অবস্থা— তার জ্ঞানধর্মের প্রকাশ অভিব্যক্তি বা চরিতার্থতা। ভাবের লৌকিক সুখ অথবা দুঃখ হতে তার এই আনন্দ-ধর্মিতা পৃথক করতে হয়। এই 'আনন্দ'কে 'রস' নামে অভিহিত করা হয় এবং এই আনন্দকে 'অলৌকিক' 'লোকোত্তর' ও 'চমৎকার' বলা হয়।[১] এই

---

১ অভিনব ভারতী।

আনন্দের মূল কারণ আপনারই চৈতন্যস্বরূপ— যা এই ভাবালোচনার সময় তার মূল সাত্ত্বিক রূপটি গ্রহণ করে যা একাধারে অখণ্ড, স্থির, নৈর্ব্যক্তিক, জ্ঞানধর্মী ও আনন্দঘন। সাধারণতঃ আমাদের চৈতন্য খণ্ডিত ও লৌকিক স্বার্থবোধ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে— কিন্তু রসাস্বাদনের সময় আমাদের এই সাধারণ ব্যবহারিক পরিচ্ছন্ন সত্তার সাময়িক অবসান ঘটে এবং আমাদের বিজ্ঞানঘন আনন্দময় চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তখন আত্ম-পরের জ্ঞান থাকে না এবং সমস্ত অন্তর একটি অপূর্ব স্ববিশ্রান্ত আনন্দানুভূতির মধ্যে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। যে ভাবটি এই অলৌকিক আনন্দের নিমিত্ত হয়— তা এই আনন্দানুভূতিকে চিত্রীকৃত বা অনুরঞ্জিত করে। সুতরাং যদিও রস মূলতঃ এক, কারণ তা হল আমাদের চৈতন্যের আনন্দমাত্র এবং এই চৈতন্য আমাদের সকলের মধ্যে একভাবে বিরাজ করে— তবু বিভিন্ন ভাবের দ্বারা চিত্রিত হয়ে এই রস-রূপই বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। তাই শৃঙ্গার করুণ বীর প্রভৃতি রস রতি শোক উৎসাহ প্রভৃতি ভাবদ্বারা উৎপন্ন বলেই সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয়।[২] এই মতবাদের পৃষ্ঠভূমিরূপে যে আধ্যাত্ম্য-দর্শন উহ্য রয়েছে তার বর্ণনা পরে আছে।

কিন্তু সাধারণতঃ আমরা আমাদের লৌকিক ভাবগুলিকে রসে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হই না। আমরা আমাদের ব্যবহারিক সত্তাকে অতিক্রম করে একটি নির্বিশেষ সার্বিক সত্তায় উত্তীর্ণ হতে পারি না। জগৎকে রসের দৃষ্টিতে দেখে তার সকল ভাবকে বিশুদ্ধ জ্ঞানালোকে অবলোকন করা সহজসাধ্য নয়। সেই নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক চিত্ত-ধর্ম সাধনাসাপেক্ষ এবং এই রসসাধনার কথা অনেক মনীষী বলেছেন। কিন্তু সে সাধনায় খুব অল্প মানুষেই সাধক হতে পারেন। রসাস্বাদনের ক্ষেত্র সাধারণতঃ এই জীবন নয়— যেখানে ভাব আমাদের আরও আত্মসচেতন করে তোলে ও কর্মে প্রবৃত্ত করে। রসাস্বাদের ক্ষেত্র কাব্যকলা। কাব্যে যখন উপযুক্ত শব্দ-সংযোগে বিভিন্ন বিভাব ও অনুভাবের বর্ণনা করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে পাঠকের চিত্তে ভাবের সঞ্চার হয়— তখন সেই ভাব লৌকিক ভাবের মতো পাঠককে অভিভূত করে না বরং তা পাঠকের চৈতন্যের বিজ্ঞানাংশকেই বেশি জাগিয়ে দেয়। তখন সে সেই ভাবটিকে স্পষ্ট বুঝতে পারে এবং সেই বোধের সঙ্গেই সে নিজের বিজ্ঞানধর্মী মূল চৈতন্যটিকেও চিনতে পারে। অর্থাৎ কাব্য তার কাছে শুধু রূপে-রসে ভাবটিকেই প্রকাশ করে না— উপরন্তু তার আপন আত্মপুরুষকেও প্রকাশ করে। সুতরাং দেখা যায় যে, কাব্যানন্দের উৎপত্তি বা উৎস সন্ধান বা নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা যে "ভাবের প্রকাশ" কথাটি ব্যবহার করেছি এর অর্থ গূঢ় ও ব্যাপক। এই সম্বন্ধে ক্রমে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হবে। তবে এখানে এ কথাটিও স্মরণীয় যে, "ভাবের প্রকাশ" বলতে প্রথমতঃ এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সীমিত অর্থে কোনো ভাব-বস্তুর যথা করুণা বা ঘৃণার প্রকাশ বুঝি না বরং সেই সঙ্গে কবি ও পাঠকের (বিশেষতঃ পাঠকের) মনোগত ভাব ও তাদের চৈতন্যস্বরূপেরও প্রকাশ বুঝি— যে স্থলে এই ভাব বিরাজিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই 'প্রকাশ-কার্য'টি হয় প্রধানতঃ পরোক্ষভাবে বিভাব ও অনুভাবের মাধ্যমে কেননা ভাব কখনও লৌকিক রূপে প্রতিভাত হয় না। লৌকিক ভাবে আমরা শোক পাই যখন শোকের কোনো বাস্তবিক কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু অলৌকিক ভাবে, রস-রূপে যখন কাব্য-মারফত শোক-ভাবটিকে পাই তখন কোনো শোকার্ত ব্যক্তির কাল্পনিক রূপ পাই এবং তার শোকের কারণ রূপে কোনো ঘটনা বা বস্তুর এবং সেই শোকের

২ অভিনব ভারতী পৃ. ২৮৪, ২৯১, ২৯৩, ধ্বন্যালোকলোচন (Chowkhamba Series পৃ. ৫১, ৮১)

বহিপ্রকাশরূপে 'অশ্রুপাত' 'শিরে করাঘাত' আদি শারীরিক বিবশতারও কল্পনা-কৃত অনুকৃতি পাই। প্রথমটিকে আলম্বন বিভাব, দ্বিতীয়টিকে উদ্দীপন বিভাব ও তৃতীয়প্রকার কাল্পনিক বিষয়টিকে অনুভাব বলা হয়। কল্পনাই এদের সত্তা— তাই এদের মাধ্যমে উদ্রিক্ত ভাব লৌকিক বা ব্যবহারিক রূপে পাঠককে বিচলিত করতে পারে না। এরা 'বিশেষ'-রূপেও প্রতিভাত হয় না কারণ যদিও কাব্যে যেমন একটি বিশেষ শোকার্ত ব্যক্তির বিশেষ শোকের কারণ-রূপ কোনো বিশেষ ঘটনার বর্ণনাই দেওয়া হয় এবং অনুভাবগুলিও সেই ব্যক্তিরই বিশেষ সময়ের শারীরিক বিকার হিসাবে বর্ণিত হয়— তবু এ কথাও সহজবোধ্য যে যেহেতু এ সবই প্রকৃতপক্ষে কাল্পনিক— সেইহেতু এরা দেশ-কালে সীমাবদ্ধ বিষয়বস্তু নয়। কাব্যে এই ব্যাপারটিকে "সাধারণীকরণ" বলা হয়। ইহার দ্বারা বিভাব ও অনুভাবগুলি সকলের পক্ষে সমান— "সকল-সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী" বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। সেইজন্য তারা আর বিশেষ বা ব্যক্তিগতভাবে কোনো পাঠককে প্রভাবিত করে না বরং সার্বিক বস্তু-রূপে সকলের জ্ঞানের ও সহানুভূতির বিষয় হয়ে ওঠে। আর এই কারণেই তাদের দ্বারা দ্যোতিত ভাবও একটি সার্বিক রূপ-পরিগ্রহ করে রসের কারণ হয়[৩] এবং এই রসও সাধারণভোগ্য বিষয়-রূপে প্রতিভাত হয়— নিছক ব্যক্তিগত আস্বাদন ব্যাপার হয়েই থাকে না।[৪] এই সাধারণীকরণ ব্যাপারটি ও ভাবের রসনিষ্পত্তির উপযোগী 'কারণ'গুলির বিস্তারিত আলোচনা ক্রমশঃ দেখা যাবে। এখানে এ কথা স্মরণীয় যে "ভাবের প্রকাশ" বলতে যে একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থ-জ্ঞাপন করা হয় তেমনই "ভাবের জ্ঞান" অর্থে সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বোঝায় না বরং এমন-একটি বিশেষ প্রকারের জ্ঞান বা বোধকে ইঙ্গিত করে যা কেবল কাব্যপাঠের দ্বারাই সম্ভব হয়। কাব্যে বর্ণিত বিভাব অনুভাব -সাহায্যে পরোক্ষভাবে জাগরিত, ব্যঞ্জিত বা "ধ্বনিত" ভাবটিকে পাঠক ঠিক লৌকিকরূপে ভোগ না করলেও যেন সেটা লৌকিক এইরূপ ভান কিছুটা পাঠকের মনোজগতে সঞ্চারিত হয় এবং কাব্যবর্ণিত হর্ষ ঘৃণা রতি শোক আদি-ভাবের কিছুটা ভাবাপন্ন হয়ে সেই ভাবের আংশিক ভোগের মাধ্যমে ভাবটির স্বরূপ বা মর্মসত্যটির সহিত পাঠকের পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়টিকে ভাব বিষয়ে পাঠকের জ্ঞান বলা যেতে পারে। কিন্তু এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান— যা প্রত্যক্ষ বা অনুমান হতে পাওয়া যায় তার থেকে এবং যোগীদের অপরের ভাবসম্বন্ধে অলৌকিক জ্ঞান হতে পৃথক। এই রস-সম্পূর্ণ জ্ঞানেও আত্ম-চিত্তের মূল স্বরূপটির প্রকাশ ঘটে এবং সেইজন্য এক অপরূপ আনন্দের আস্বাদও পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে এই জ্ঞানকে যোগীদের "একঘন" প্রতীতির সহিত একীকরণ করা চলবে না। কারণ সেই প্রতীতির মধ্য বহির্বিষয়ক কোনো অনুভূতি (উপরাগ) থাকে না এবং তার আনন্দ এক বিশেষ ধারায় প্রবাহিত হয়। আর রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে আনন্দ হয় বিচিত্র ও মনোরম বিভিন্ন ভাবসম্পৃক্তিতে। রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে মানবহৃদয়ের সংস্কারগত কোনো বাসনার স্ফুরণ ঘটে ও তৎসম্পৃক্ত ভাবের (যা সেই বাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) অনুরঞ্জনে আনন্দঘন চৈতন্যকে জাগরিত করে।[৫]

---

৩ অভিনব ভারতী, পৃ. ২৮৬, ২৯১। ধ্বন্যালোকলোচন, পৃ. ৫১।

৪ অভিনব ভারতী : [রসকে আত্মগত বা আন্তর ব্যাপার বলে অভিহিত করে রসবাদীরা। কিন্তু তাতে রসের সংজ্ঞাকে অস্বীকার করা চলে না।]

৫ অভিনব ভারতী, পৃ. ২৯১।

রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে যে আনন্দের অনুভূতি হয় সেটি সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আনন্দ হতে যেমন ভিন্ন তেমন আবার অসাধারণ যোগজ জ্ঞান থেকে পৃথক। যোগজ জ্ঞানের মতো এই রসপ্রতীতিতেও একটি শান্ত সমাহিত চৈতন্যের পরিচয় ঘটে— যার নিজস্ব আনন্দ আছে। কিন্তু রসপ্রতীতি সাধারণ মানুষেরও অলভ্য নয়— কারণ রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে ভাবের আবেশ ও সৌকুমার্যের যথেষ্ট অবকাশ আছে। সাধারণ জ্ঞানের মতো রসপ্রতীতির বেলায় ভাবের বোধ জন্মে যা সাধারণ ভাব-সম্ভোগে অনুপস্থিত। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে চিত্তের সেই "একঘন"তা ও সার্বিক বা নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা আসে না যা রসপ্রতীতির ক্ষেত্রে ঘটে এবং যার কারণে এই অনুভূতিকে "লোকোত্তর" "চমৎকার" বলা হয়। সুতরাং আমাদের "ভাবপ্রকাশ" কথাটির যথার্থ ও সম্যক অর্থটি স্পষ্ট করে ধরতে হবে। এই অর্থের অধিকাংশই প্রচলিত অর্থ থেকে গূঢ়তর ও ব্যাপক। এই অর্থের সম্যক অনুধাবনে কাব্যানন্দের বিশেষ রূপটি এবং সেই সঙ্গে কাব্যের স্বরূপটি ধরা পড়ে যাবে।

দ্বিতীয় কথা: কাব্যানন্দের মূল উৎসটি হল ভাবপ্রকাশ ও তার সঙ্গে আপন চৈতন্যের নৈর্ব্যক্তিক শান্ত স্বরূপটির প্রকাশ। এই আনন্দের সঙ্গে সাধারণতঃ অন্য কয়েক প্রকার আনন্দও সন্নিহিত হয়— যাদের ঠিক কাব্যানন্দের অন্তর্গত করা যায় না। এদের মধ্যে প্রথমটি হল কাব্যানুশীলন ও কাব্য-উপভোগের মধ্য দিয়ে এক পাঠকের চিত্তের অন্যের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আনন্দ। এই আনন্দটির বিশেষ আবির্ভাব ঘটে নাটক বা নৃত্যকলার ক্ষেত্রে— যেখানে অভিনব গুপ্ত বলছেন যে, রসানুভূতির জন্য বহুসংখ্যক দর্শকের প্রয়োজন, কারণ তাতে দর্শকচিত্ত এক সর্বজনীন নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা পরিগ্রহ করতে পারে এবং সেই অবস্থা থেকেই হয় রসের উৎপত্তি। কিন্তু অভিনবের এই উক্তি সম্ভবতঃ কিছুটা মতদ্বৈধের অবকাশ রাখে। কেননা যে-আনন্দ-ঘন সম্বিতের আস্বাদকে তিনি রস আখ্যা দিয়েছেন— তার আবার 'আত্ম-পর' জ্ঞান থাকে কি করে? এবং অন্যান্য দর্শক নাটকটিকে একাগ্রচিত্তে গ্রহণ করছে কি করছে না— তার খবরই বা রসিক রাখবে কেন? এবং রাখলেও তার সঙ্গে রসিকের রসাস্বাদের সম্পর্ক কি? অপরের সমভাব ও রসপ্রতীতি নিশ্চয় সহৃদয় দর্শকজনের কাছে আনন্দকর— তথাপি এই আনন্দ কাব্যানন্দ নয়। অধিকন্তু এ কথাটি ভাববার যে 'দৃশ্যকাব্যে'র বেলায় যে কথা তবু বিচার্য মনে হয়— 'শ্রাব্য' বা 'পাঠ্য'-কাব্যের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। যদিও কাব্যপাঠের বা শ্রবণের সময় যদি মনে মনে জানি যে এই কাব্য অনেকের হৃদয় জয় করেছে তা হলে পাঠক মনোলোকে অনেকের সঙ্গে এক একাত্মীয়তা লাভ ক'রে এক প্রকার চিত্তের প্রসার অনুভব করে। কিন্তু এই মানসব্যাপারটি বা তদ্‌জনিত আনন্দকে কোনো ক্রমেই কাব্যরসের অন্তর্গত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সাহিত্যালোচনায় কয়েক স্থলে সাহিত্যকে মানুষের সঙ্গে বহির্বিশ্বলীলা ও অপর মানুষের মিলনের সেতু হিসাবে দেখেছেন। মানবাত্মার ধর্ম হচ্ছে আত্মীয়তা করা[৬] এবং এই আত্মীয়তার তাগিদেই সাহিত্য রচনা হয়। 'সহিত' শব্দ থেকে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। ধাতুগত অর্থ ধরলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখা যায়।[৭] আবার সেই মনের বিশ্বের সম্মিলনে মানুষের মনের দুঃখ জুড়িয়ে যায়, তখন সেই সাহিত্য থেকেই সাহিত্য জাগে।[৮]

---

৬ পঞ্চভূত (১ম সংস্করণ) পৃ. ৩২।

৭ সাহিত্য (১ম সংস্করণ) পৃ. ১০৯।

৮ সাহিত্যের পথে (১ম সংস্করণ) পৃ. ৭০।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথও মানবাত্মার একটি বিশ্বমানবিক বিস্তৃত রূপ দেখতে চেয়েছেন যা বহুকে সম্বলিত করে বিরাজ করে এবং সাহিত্য বলতে এই বিরাট বিস্তৃত চৈতন্যের প্রকাশ ও আনন্দকে বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা এই ধরণের ব্যাপারটি ও অনুভূতিকে— যেটিকে সাহিত্য-রসের সঙ্গে একত্রিত দেখা যায়— তাদের এই রসের অনুষঙ্গ-হিসাবেই দেখতে বলি— সেই রসের অন্তরঙ্গ বলি না। টলস্টয়ও সাহিত্যকলার ধর্মহিসাবে মানুষে-মানুষে মিলন সংঘটনাকেই জেনেছেন— In this freeing of our personality from separation and isolation, in this uniting of it with others, lies the chief characteristic and the great attractive force of art.[৯] এখানেও আমরা সাহিত্যের লক্ষণ ও ধর্ম আলোচনায় কোনো-একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদের প্রতিপত্তি দেখতে পাই— যার জন্য সাহিত্যালোচনায় অনেক ভ্রান্তি ও অনর্থক অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়।

তৃতীয় কথা : মানবহৃদয়ের ভাব হতেই কাব্যের উৎপত্তি এ কথা অনেকেই বলেন— কিন্তু যে গভীর এবং বিস্তৃত অর্থে আমরা এখানে কাব্যকে ভাবের প্রকাশ বলেছি— এবং যা মূলতঃ ভরত মুনি ও অভিনব গুপ্তের মত— সে সম্বন্ধে অনেকেই তেমন ভাবেন নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক অর্থে কাব্যানন্দের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি কাব্য-রসের অনুভূতিকে নিজের অখণ্ড আত্মসমাহিত আত্মার স্বাভাবিক আনন্দ বলেছেন : 'আত্মা একাকী, অখণ্ড, সম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। তাহার নীল ললাটে বুদ্ধির রেখামাত্র নাই, কেবল প্রতিভার জ্যোতি চিরদীপ্যমান।'[১০] আবার অন্যত্র : 'আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ, অস্পষ্টতাতেই অবসাদ'[১১] পুনশ্চ: 'সাহিত্যেও মানুষ কত বিচিত্র-ভাবে নিয়ত আপনার আনন্দরূপকে, অমৃতরূপকে ব্যক্ত করিতেছে— তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়।'[১২] রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের অনেকগুলি তত্ত্বের অনুসরণ করেছেন, যেমন— 'আনন্দ' 'সত্য' 'মঙ্গল' 'প্রকাশ' ও 'সৌন্দর্য'[১৩] এবং এই-সকল সংজ্ঞার মাধ্যমে সাহিত্যের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্ফুট ধারণা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। সে-ধারণার মর্মবাণীটি হল— সাহিত্যসৃষ্টি ও উপভোগে মানবাত্মা তার শুদ্ধ ও মৌলিক অবস্থায় অধিষ্ঠিত হয় এবং কোনো বিষয়বস্তুর মর্মসত্যটি উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে আপন আধ্যাত্মিক স্বরূপটিরও পরিচয় পায়। বিষয় ও বিষয়ী দুইয়েরই সম্মেলনে আত্মার প্রসার ও প্রকাশমানতার নিদর্শনও পাওয়া যায়। এই সমস্তই আনন্দকর। এই আনন্দ সাধারণ সুখ হতে ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ সুখের অনুভূতিতে থাকে চাঞ্চল্য— কিন্তু এই অনুভূতিতে ব্যাপ্ত থাকে বিভ্রান্তি। তাই লৌকিক হিসাবে কোনো দুঃখকর ভাবও, যথা— শোক, সাহিত্যরূপে দ্যোতিত হলে আনন্দ-ভারাক্রান্ত হয়। ভাবানুভূতির চাঞ্চল্যই মানবচিত্তকে শ্রান্ত করে এবং তা গভীর অর্থে দুঃখকর, যদিও তা সাধারণ অর্থে সুখকর। মহামুনি কপিলের সাংখ্য-দর্শনের এই মত গ্রহণ করে অভিনব গুপ্তও বলেছেন যে, কাব্যানন্দের অনির্বাণ উৎসে শোকের ভাবটিও এক স্থির অচঞ্চল অবস্থায় চিত্তপটভূমিতে উপস্থিত হয় এবং সহৃদয়চিত্ত তখন

৯ Tolstoy : *What is Art.* (Trans. A. Maude, 1896 : Chap. 15)

১০ পঞ্চভূত, পৃ. ১১৪।

১১ সাহিত্যের পথে, পৃ. ৪১।

১২ সাহিত্য, পৃ. ৮৪

১৩ লেখকের গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন' দ্রষ্টব্য।

একঘন বা একনিষ্ঠভাবে সেই ভাবটিকে মনন করে। তখন বিজ্ঞানঘন চিত্তের কোনো বিঘ্ন থাকে না— যে বিঘ্নর সৃষ্টি হয় এক বিষয় হতে অপর দিকে নিরন্তর ছোটা হতে। কারণ ব্যবহারিক মানবচিত্ত সর্বদাই নিজের স্বার্থ আর বাসনার পেছনে ছুটছে। কিছুতেই তার মনে সন্তোষ নেই। কিন্তু কাব্যানুভূতিতে চিত্ত তার এই আপন-পর জ্ঞান ভুলে যায় এবং প্রত্যেকটি ভাবই নিরাসক্ত ও তন্ময়ভাবে উপভোগ করে।[১৪] রবীন্দ্রনাথ এই কথাটি অন্যভাবে বলেছেন: 'মনের বোঝাটা যে অবস্থায় অনুভব করি না—সেই অবস্থাটাকেই বলি আনন্দ।'[১৫] মন দুরন্ত বালকের মতো বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ছুটতে থাকে, বুদ্ধিও সেইরূপ। মনের এই গতির কথা বোঝাতে গিয়ে পতঞ্জলি বলেছেন: 'চৈত্র যখন এক রমণীকে ভালোবাসে তখন এ কথা মনে করা যায় না যে সে অন্যদের প্রতি অনাসক্ত।'[১৬] অভিনব গুপ্ত পতঞ্জলির এই উক্তিটি উদ্ধৃত করে তাঁর নিজের বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন। কাব্যানন্দে চিত্তের এই অশান্তির স্থলে বিরাজ করে আত্মসংহতি ও পরম বিশ্রান্তি। অথচ পূর্ব-কথিতমতো-চিত্ত তখন যোগীলভ্য তুরীয় অবস্থায় উপনীত হয় না, কারণ বিভাব অনুভাব আদি বিষয়বস্তু এবং তাহাদের দ্বারা দ্যোতিত কোনো ভাব চিত্তে অবস্থান করে এবং তাকে চিত্রিত বা অনুরঞ্জিত করে।[১৭]

চতুর্থ কথা: কাব্যে যে ভাবের প্রকাশ হয় এবং সেই সঙ্গে ভাবের জ্ঞান ও ভাব হতে মুক্তিলাভ হয়—এ কথা পাশ্চাত্য কাব্য-দর্শনেও পাওয়া যায়। হেগেল (Hegel) বলেন যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাব আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলে কিন্তু কাব্যকলায় সেই ভাবেরই বিভাবন বা মনন হয় এবং আমরা সেই ভাবের দৌরাত্ম্য হতে নিষ্কৃতি পাই।[১৮] ক্রোচেও (Croce) কাব্যকলাকে আমাদের ভাবাবেগ হতে বিমুক্তির পন্থারূপে দেখেছেন।[১৯] 'ভাবের প্রকাশ' অর্থে তিনি ভাবের অস্পষ্টতা ও অন্ধ দৌরাত্ম্যকে জয় করে তাকে স্পষ্ট বা পরিস্ফুট করে জ্ঞানের আয়ত্তে আনাকেই বোঝাতে চেয়েছেন। অ্যারিস্টটলও (Aristotle) এই রকম কিছুটা অর্থে তাঁর 'ক্যাথারসিস' (Catharsis) শব্দ ব্যবহার করেছেন মনে হয়। অন্ধ ভাবাবেগের খুব বেশি মূল্য তিনি দিতে চান নি—সুতরাং, নাটকে যে ভাবের প্রকাশ হয়— সেগুলির 'ক্যাথারসিস' বলতে তিনি খুব সম্ভব 'শোধন' বলতে চেয়েছেন।[২০] ভাবগুলি লৌকিক অর্থে আত্মকেন্দ্রিক হয় এবং কাব্যে সেগুলি সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে। কাব্যানুভূতি তাই আনন্দদায়ক— যদিও তাতে দুঃখ শোক ভয় আদির বর্ণনাও থাকে। ট্র্যাজেডিকে (tragedy) তিনি সুন্দর বলেছেন এবং বলাবাহুল্য 'সৌন্দর্য' বলতে তিনি কোনো বস্তু বা সত্তার সত্য প্রকৃতির (essence or form)

---

১৪ অভিনব ভারতী, পৃ. ২৮৩।

১৫ পঞ্চভূত, পৃ. ১১৩।

১৬ যোগসূত্র, ব্যাসভাষ্য (২, ৪)।

১৭ অভিনব ভারতী, পৃ. ২৮৪।

১৮ Hegel: *The Philosophy of fine arts* (Tr. Osmaston, 1920) vol. 1, p. 67.
... 'Already, for the reason that they come before him rather as objects than a part of himself, he begins to be free from them as aliens.'...

১৯ Croce: *Aesthetics*, Chap. II (1901) দ্রষ্টব্য। [আরও বলেন: 'Poetic realisation is not a frivolous embellishment, but a profound penetration in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation.' (European Literature in the 19th century, 1924) p. 52]

২০ S. H. Butcher: *Aristotle's theory of poetry and fine arts* (1831) pp. 254-268 দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানকে বুঝতেন। এখন, ট্র্যাজেডি (tragedy) যেহেতু 'করুণা' ও 'ভয়' এই দুটি ভাবকে আশ্রয় করে— সুতরাং, এই দুইটি ভাবের উন্মেষ চিত্তভূমিতে এমনভাবে হতে হবে— যাতে তাদের এই মর্মসত্যটি প্রকাশিত হয়। আবার, ট্র্যাজেডিকে (tragedy) তিনি সংগীতের মতোই অনুকৃতি বলে মনে করতেন এবং বলেন : 'এ একটি গম্ভীর এবং সম্পূর্ণ মানবীয় ঘটনাকে (action, that is serious and complete in itself) অনুকরণ করে'। এর থেকে বুঝতে হবে যে তিনি মানবজীবনের সেই অংশটি— যা 'করুণা' ও 'ভয়'— ভাব-দ্বারা রঞ্জিত-অনুকরণ করতে বলেন এবং এই অনুকরণের অর্থ সেই জীবন ও ভাবদ্বয়ের তাত্ত্বিক বা সত্যরূপটির প্রকাশ। কারণ, সাধারণ অর্থে, যথা : কোনো মানুষের ভাব-ভঙ্গীর অনুকরণ বা নকল-করা বা কোনো বস্তুর প্রতিকৃতি আঁকা— এ স্থলে প্রযোজ্য নয়।[২১] এই ব্যাখা-দ্বারা অ্যারিস্টটলকে আমাদের রস-বাদের পক্ষে কিছুটা পাই। (যদিও অ্যারিস্টটলের মতবাদের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও আছে)। প্লেটো (Plato) সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই ধারণাই প্রচলিত যে, তিনি সাহিত্য-কলাকে বাস্তব-জগতের অনুকৃতি মনে করতেন— যার দ্বারা মানুষের মনে ভাবাবেগের সঞ্চার করে তাকে দুর্বল করে ফেলে।[২২] মানুষের কর্তব্য তার বুদ্ধি-বিচারকে উন্নত করা এবং ভাবাবেগ দমন করা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্য-সমূহের মধ্যেই দৃষ্টি আবদ্ধ না করে এবং তাদের অনুকরণ না করে তাদের অন্তরালে যে তত্ত্ব বিরাজ করে তাকে জানাই কাম্য। সুতরাং দর্শনচর্চার প্রয়োজন, কাব্য-কলার নয়। কিন্তু প্লেটোর সমস্ত রচনা অনুধাবন করলে এমন সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যায় যে তিনি দুই রকম কাব্য-কলার কথা বলেছেন— এক ভালো, অন্য মন্দ। এই ভালো কাব্য-কলার কবি বা শিল্পী তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা-দ্বারা জগৎ ও জীবনের গূঢ় তত্ত্বকে প্রকাশ করে এবং ভাব-সম্বন্ধে আমাদের সচেতনও করে।[২৩]

কিন্তু কেহ কেহ এই ভাবকে সংহত করার কথা তেমন ভাবেন নি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটি উক্তির কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করে কেহ কেহ বলেন[২৪] যে, তিনি কাব্যরসের শান্ত মননশীলতার কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অন্যরূপ হতে পারে। কারণ কবি বলেছেন : 'I have said that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings, it takes its origin from emotion recollected in tranquility— the emotion is contemplated till, by a species of reaction, the tranquility gradually disappears and an emotion, kindred to that which was before the subject of contemplation, is gradually produced, and does, itself actually exist in the mind.'।[২৫] সুতরাং

---

২১ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা লেখকের প্রবন্ধ Cathersis in the light of Indian aesthetics দ্রষ্টব্য— [Journal of Aesthetics and Art Criticism (U. S. A.) Dec. 1956 pp. 215-26]

২২ *Republic*, Book VII and X দ্রষ্টব্য।

২৩ Constantine Carvarnos : Plato's teaching on fine art দ্রষ্টব্য [Philosophy and Phenomenological research (June 1953)]।

২৪ অতুলচন্দ্র গুপ্ত : কাব্যজিজ্ঞাসা।

২৫ Wordsworth : [ভাবের মার্জিত ও সুষ্ঠু উপভোগেই কাব্যের বা সেই নাটকের সার্থকতা— তাতে পাঠক বা দর্শকের চিত্তবৃত্তিকে রুচি খাদ্য ও আনন্দ দেয়।]

দেখা যায় যে কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থও রসবাদের সত্যটি থেকে বেশ দূরেই ছিলেন। তবু তাঁর কথা থেকে বোঝা যায় যে কাব্যের মধ্যে তিনি শুধু ভাবের উদ্দামতাই দেখেন নি— ভাবের মননেরও স্থান দিয়েছেন। কিন্তু কাব্যানন্দের উৎস ঠিক কোথায় তা তিনি নির্দেশ করতে পারেন নি। স্মৃতি-দ্বারা ভাবের পুনরুদ্ধারকেই তিনি কাব্যের কার্য বলে জেনেছেন এবং প্রত্যক্ষ আনন্দকে (immediate pleasure) তার লক্ষণ বলেছেন। সুতরাং, ফলতঃ— তিনি ভাবের মননকেই কাব্যানন্দের কারণ রূপে দেখেছেন মনে হয়। কারণ তা না হলে দুঃখকর ভাবগুলির স্মরণে এবং পুনরুজ্জীবনে আনন্দ হবে কেন? অথচ সব কাব্যই আনন্দকর। এ বিষয়ে কবি কোলরিজ (Coleridge) আরও স্পষ্ট কথা বলেছেন। তিনি বলেন যে, ভাবের কাব্যিক প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি স্থৈর্য ও নিয়মের প্রয়োজন হয় এবং সেইজন্য এক ধরণের আনন্দের উৎপত্তি হয়।[২৬] এখানে প্রায় হেগেল ও ক্রোচের মতানুযায়ী কথাই বলা হয়েছে এবং আমাদের ভাষায় তিনি ভাবের রসে রূপান্তরের কথাই অস্পষ্টভাবে বলেছেন। কবি শেলী (Shelly) তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ Defence of Poetryতে কাব্যকে আনন্দের উৎস বলেছেন কিন্তু এই আনন্দের কারণটি কি তা তিনি জানেন না বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি কাব্যের প্রধান লক্ষণ বিচার করতে গিয়ে বলেছেন যে, কাব্য মানুষের কল্পনাশক্তি (imagination) উদ্‌বুদ্ধ করে— যার দ্বারা সে আপন সুখ-দুঃখের সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে অপরের অনুভূতির সহিত সংযোগ স্থাপন করে। কাব্য মানুষের এই সহানুভূতি বা সমবেদনার শক্তিকে উন্নত করে এবং এইজন্য কাব্যের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। এই কল্পনা-শক্তিকে শেলী প্রতিভার মতো দেখেছেন এবং তাকে বিচার-বুদ্ধির উপরে স্থান দিয়েছেন। সেইজন্য কাব্যে জীবনের চিরন্তন সত্যটি প্রতিফলিত হয় এমন উক্তিও করেছেন। আমরা এইসব উক্তি হতে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শেলীর মতে কাব্যের আনন্দ প্রথমত নিজের সহানুভূতি ও কল্পনাশক্তির ক্রিয়া হতে এবং দ্বিতীয়ত একান্ত নিজের ভাবসমূহের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তাদের অতিক্রম করে অপরের সহিত যোগের আস্বাদ হতে জন্মে। এক কথায়, কাব্যানুশীলনে কবি বা পাঠক তার মানসিক ক্ষমতার বা মানস-জগতের এক আনন্দময় স্তরের সন্ধান পায়। এখানে আমাদের রসবাদের তত্ত্বের কাছাকাছি এসে পড়েছি মনে হয়। শেলী কি দূর হতে মানুষের আনন্দঘন চৈতন্যের আভাস পেয়েছিলেন? পাশ্চাত্য কবিদের মধ্যে যদি কেউ তা পেয়ে থাকেন তো তিনিই তা পেয়েছেন মনে হয়। কারণ কবিপ্রতিভা ছিল তাঁর কাছে এমন এক দৈবশক্তি যার উপর মানুষের বুদ্ধি-বিচারের কোনো হাত নেই এবং যার আসা-যাওয়া সবই কোনো অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি প্রেরণায় বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও কবিপ্রতিভাকে অতিমানসিক মনে করতেন ও কবিকর্মকে যোগসাধনার প্রকার-বিশেষ বলেছেন।[২৭] প্লেটোও তাই বলেন। এই প্রতিভাবলে যে কবি বা পাঠক ভাবের মনন করবে, তার ব্যক্তিগত ব্যবহারিক

---

২৬ Coleridge : On Poesy (1808) in *Biographia Literaria* (Oxford 1907) p. 254,— [...'By excitement of the associative power passion itself imitates order and the order resulting produces a pleasurable passion, and thus (poetry) elevates the mind by making its feeling the object of its reflection.']

২৭ পঞ্চভূত, পৃ. ১২১-২২।

চিত্তবৃত্তি বা মানসিকতার অন্তরালে তাহারই অধিষ্ঠানরূপে এক সর্বজনীন বিশ্বচৈতন্যের অনুমান স্বতঃই মনে আসে।

পঞ্চম কথা : কাব্যানন্দের কারণ 'ভাবের প্রকাশ' বলা হয়েছে। এই সূত্রে একটি প্রচলিত ধারণার খণ্ডন করতে হয়, যে ধারণা অনুসারে কাব্যকলাকে বাস্তব জীবনের অনুকরণ বলা হয়। কথাটি পশ্চিমে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের ভাষ্যে[২৮] এবং ভারতে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে[২৯] প্রথম পাওয়া যায়। অবশ্য মনে হয় প্লেটো অনেক স্থলেই সেইরকম কাব্যকলার উল্লেখেই তাদের 'অনুকরণ' বলেছেন যা বহির্জগতের সত্যই অন্ধ নকল। কিন্তু যখন তিনি প্রকৃত কবিকে ভগবৎ-শক্তি-দ্বারা প্রভাবিত বলেছেন এবং তাঁর মতে এই জগতের বস্তুসমূহের পশ্চাতে তাত্ত্বিক বস্তুসমূহ (ideas) আছে— যাদের প্রতিফলন ঐ প্রথমগুলি— তখন তিনি কেন স্বীকার করবেন না যে প্রকৃত ক্ষমতাবান কবি বা শিল্পী সেই তাত্ত্বিক বস্তুগুলির প্রতিফলন করে। সুতরাং সে সৃজনই করে বলতে হবে এবং তার সৃষ্টি সত্য, মিথ্যা নয়। অ্যারিস্টটলের ভাষ্য হতে স্বতঃসিদ্ধভাবেই বোঝা যায় যে তিনি 'অনুকরণ' অর্থে তত্ত্বের অনুকরণই বলেছেন, বাহ্যিক তথ্যকে বোঝাতে চান নি। কারণ, তা না হলে, তিনি সংগীত বা ট্র্যাজেডিকে (tragedy) অনুকরণ বলেছেন কি অর্থে? তিনি কাব্যকে ইতিহাস হতে ভিন্ন এবং দর্শনের সমগোত্রীয় বলেছেন।[৩০] কাব্যে বর্ণিত কোনো ঘটনা ইতিহাসের বিচারে বিচার্য নয়— কাব্যিক বিচারেই তার মূল্যনির্ণয় করতে হবে। সুতরাং কাল্পনিক ও অলৌকিক ঘটনারও স্থান কাব্যে আছে— অবশ্য তাদের কল্পনায় বা ভাবদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।[৩০] ভরতমুনি নাটককে বাস্তবের অনুকরণ বলেছেন বটে কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ হল (অভিনবগুপ্তের মতানুসারে) "অনুব্যবসায়"।[৩১] তিনি মনে করেন নাটকে আমরা বাস্তবঘটনার প্রতিকৃতি দেখি না বরং সেই ঘটনাগুলিকে 'যেন' একপ্রকারে প্রত্যক্ষ অথবা পুনর্দর্শন করি। নাটক-দর্শনে "সাক্ষাৎকারাসদয়মানত্ব" অথবা "প্রত্যক্ষ কল্পনাতে" তিনি বিশ্বাস করেন। সুতরাং কাব্যেও অনুকরণ সমর্থন করা যায় না। হেগেল এই অনুকরণবাদের খণ্ডন করেছেন[৩২] এই বলে যে — প্রথমতঃ, নিছক অনুকরণ আমাদের ক্লান্তই করে— শিল্পী কেন তা করতে যাবেন? দ্বিতীয়তঃ, অনুকরণ নিখুঁত হতে পারে না এবং তা করতে চেষ্টা করলে সফল হলেও দোষ, বিফল হলেও দোষ হবে। কারণ চেষ্টা করে বিফল হলে দর্শক নিন্দা করবে এবং সফল হলে দর্শক কেবল শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টি ও তার কারিগরীর কৌশলের প্রশংসা করবে— তার সৃজনী-প্রতিভার নয়। তৃতীয়তঃ, যদি বলা যায় যে কবি এমন-সব বস্তু ও ঘটনার অনুকরণ করে যা আমাদের জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ জ্ঞানকে বিস্তৃত করে। যা আমরা জীবনে পাই না— তা কাব্যকলা হতে আহরণ করি। বিরাট ও বিচিত্রের স্পর্শলাভ করি— যা আমরা জীবনের বৈচিত্র্যহীন ছোট গণ্ডীর মধ্যে পাই না। কিন্তু বিচারে এ যুক্তিও প্রামাণ্য

---

২৮ Plato: *Timacns* : 719. *Republic* pp. 596, 597। Aristotle: *Poetics* (By water's trans.) pp. 23, 25, 28, 29, 35। **(গ্রীক কথাটি memesis)**

২৯ নাট্যশাস্ত্র (Gaekword Oriental series) I, pp. 36, 40, 43 (সংস্কৃত কথাটি— অনুকরণ, অনুকীর্তন।)

৩০ Aristotle *Poetics,*

৩১ অভিনব ভারতী।

৩২ Hegel: *The Philosophy of fine arts.*

নয়। কারণ সার্থক ও শ্রেষ্ঠ কাব্যকলা আমাদের বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব দিয়ে চমৎকৃতই করে না, বরং আমাদের পুরাতন অভিজ্ঞতারই নব নব অর্থ প্রকাশ করে 'নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার' সোনার কাঠির স্পর্শে।

কিন্তু তাই বলে কাব্যকলা বিশুদ্ধ সৃষ্টি নয়। শিশু যেমন বিশুদ্ধ ও স্বাধীন কল্পনাদ্বারা নানা ভাববস্তু তৈরি করে ও ভাঙে— কবি বা শিল্পী তা করেন না। কারণ শিশু কোনো দর্শকের জন্য কিছু করে না এবং সে কোনো স্থায়ী বস্তুও রচনা করে না। শিশু তার কল্পনার খেলাকে অপরের বোধগম্য করতে চায় না— কিন্তু কবি বা শিল্পীর মনে পাঠক বা দর্শকের আসনটি যে পাতা। কবি বা শিল্পী চান আপন সৃষ্টির সার্বভৌমতা— সর্বজনীন আবেদন। তাই তাঁরা অপরের মানসিক ও সাংস্কৃতিক গঠন ও বহির্জগতের বাস্তব রূপ এই দুইটির খবর রাখেন— এবং তাঁদের সৃষ্টি সাধারণতঃ সৃষ্টিছাড়া হয় না।[৩৩] অনুকরণ না হলেও কবি অথবা শিল্পীর রচনা মানবপ্রকৃতি ও বহিপ্র্কৃতিকে আশ্রয় করেই থাকে। তাঁর সত্যনিষ্ঠা বা বাস্তববোধ ততটুকুই প্রয়োজন— যতটুকু রসসৃষ্টির পক্ষে আবশ্যক। সুতরাং কাব্যের আনন্দ প্রকৃতপক্ষে ভাবপ্রকাশের ও নিজের সম্বিতের স্বচ্ছ সংহত রূপ-আস্বাদনের আনন্দ— অনুকরণ কিংবা সৃষ্টি— কোনোটিরই নয়।

ষষ্ঠ কথা : এই ভাবপ্রকাশ ও মনন যদি কাব্য রচনার যথার্থ উদ্দেশ্য হয়— তা হলে নীতি বা ধর্ম-শিক্ষার স্থান কাব্যে নেই বলতে হয়। রসবাদে তাই ধর্মের কথা নেই। সেখানে কাব্যের মূল্য উপযুক্ত উপকরণ-সাহায্যে (বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাব ও অলংকার-আদি) ভাবের রসনিষ্পত্তি দিয়ে বিচার করা হয়। রস বলতে কাব্যানন্দকে বোঝায়— যা আপন সম্বিতের ও কোনো ভাবের সম্যক এবং যুগপৎ উপলব্ধি হতে উৎপন্ন হয়। সবরকম ভাবই কাব্যের সামগ্রী হতে পারে; রতি হাস শোক ক্রোধ ভয় জুগুপ্সা মনুষ্য-স্বভাবে স্থায়ী সংস্কাররূপে অবস্থিত। এদের নৈতিক দৃষ্টিতে সমর্থন করা কঠিন— কিন্তু রসবাদে এদের স্থান উৎসাহ বিস্ময় ও শমের পাশেই এবং এই ভাবগুলির কাব্যিক প্রকাশে শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত ও শান্ত রসের আবির্ভাব হয়। ইহাদের প্রত্যেকেরই সমান মূল্য স্বীকৃত হয়েছে, যদিও কেহ কেহ শৃঙ্গার-রসকে ও অন্যেরা শান্ত-রসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতরাং রসবাদীরা অনুভবের প্রকাশমানতা ও উল্লাসের বিচারেই কাব্যের ভালো-মন্দ নির্ধারণ করেছেন —নৈতিক বা ধর্মীয় বিচারে নয়। কাব্যের লক্ষ্য "প্রীতি" বা "আনন্দ"— এই কথা অভিনব বলেন এবং যদিও তিনি এর সঙ্গে জড়িত এক প্রকার শিক্ষার কথাও বলেন— যা নীতিধর্মগত ও ইতিহাস-দর্শনের শিক্ষা হতে বিলক্ষণ এবং যা পাঠকের রসাস্বাদনের শক্তি-সামর্থ্যকে উন্নত ও সংস্কৃত করে। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে আনন্দদান ও পরোক্ষভাবে রুচিশিক্ষাদান কাব্যের উদ্দেশ্য। কাব্যের আরো একটি পরোক্ষ ফলের কথা অভিনব বলেছেন— রতিভাবের বীক্ষণের দ্বারা আমাদের কামভাবের চরিতার্থতা হয় এবং এর মাধ্যমে বা সাহায্যে আমাদের অর্থ ও ধর্ম এই দুই পরমার্থেরও লাভ হয়। ক্রোধ ও উৎসাহ ভাবের দ্বারাও অর্থ ও ধর্মের উন্নতিসাধন হয় এবং শম দ্বারা মোক্ষের সহায়তা হয়। সুতরাং কাব্য এই চারিটি স্থায়ী ভাবের প্রকাশক হয়ে আমাদের চারিটি পরমার্থ— ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ লাভের সহায়ক। কিন্তু যেহেতু কাব্যে অন্যান্য ভাবগুলিরও প্রকাশ হয় এবং এই ভাবপ্রকাশের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য রসপরিবেশন

---

৩৩ Aristotle : *Poetics*

সেইহেতু কাব্যের কোনো নীতিমূলক বা ধর্মগত অভিসন্ধি অথবা অর্থ নেই বলাই সমীচীন। কাব্যের স্বরূপ বিচারে তার নীতি ও ধর্ম -গত ফলাফলের স্থান নেই— এরা কাব্যের তটস্থ লক্ষণ হিসেবেই অবস্থান করে —স্বরূপ লক্ষণ ভাবে থাকে না। এই রকম কথাই দার্শনিক ক্রোচেও বলেছেন। কবির কাছে সকল ভাবই প্রকাশ লাভের জন্য সমান তাগিদ দেয় এবং কবি-হিসেবে তিনি এদের বাছ-বিচার করতে পারেন না যে— যা নীতি এবং ধর্মের দিক দিয়ে উপযোগী তাই প্রকাশ করবেন অন্যগুলিকে বাদ দিয়ে। ভাবের গভীরতা ব্যাপকতা প্রকাশ-প্রবণতা ইত্যাদি কাব্যিক গুণ-বিচারেই তিনি একটিকে প্রকাশ করেন— অপরটিকে করেন না। কিন্তু কবি মানুষ হিসেবে সমাজের একজন দায়িত্বশীল সভ্য এবং সেইজন্য সমাজের লাভ-ক্ষতি ভালো-মন্দর বিচার করে তিনি তার ভাবসামগ্রীর মধ্য হতে অবশ্যই কিছু নির্বাচন করেন। এই নির্বাচন-কার্যটি করে ব্যবহারিক মানুষ এবং সাধারণতঃ কবি খুব কমই বিশুদ্ধ কবিকর্ম করেন, সুতরাং কাব্যের একটি ব্যবহারিক ও নৈতিক দিক নজরে পড়ে। এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে এই দিকটি কিন্তু কাব্যের স্বরূপ-নির্ণয় করে না— কারণ, কাব্যের নীতিধর্মগত গুণাগুণ তার বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ নয়।

এ বিষয়ে দার্শনিক কাণ্টের (Kant) মতামত বিচার করলেও এইরকম একটি সিদ্ধান্তের সন্ধান পাই। কাব্যকলার লক্ষণ হিসেবে তিনি একটি বিশেষ ধরণের আনন্দের কথা বলেন— যে আনন্দের উৎস হল আমাদের মানসগত দুটি শক্তির কল্পনা ও বুদ্ধির (imagination and understanding) স্বাধীন ক্রিয়া এবং সামঞ্জস্য। এই শৈল্পিক আনন্দ ইন্দ্রিয়জ সুখ অথবা বুদ্ধিগত নীতিগত জ্ঞান বা শিক্ষাগত আনন্দ হতে সম্পূর্ণ পৃথক। তথাপি কাণ্টের মতে শিল্প ও নীতির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন গূঢ় যোগ আছে। সার্থক শিল্পের মধ্যে নীতির সূক্ষ্ম ধারণাগুলির প্রতীক ও ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং মানুষের সৌন্দর্যানুভূতির বা শৈল্পিক রুচির সঙ্গে তার মঙ্গলের প্রতি প্রবণতার একটি গভীর সম্পর্ক আছে। নীতিজ্ঞান ভিন্ন মানুষের শিল্পবৃত্তি সম্পূর্ণ ও সার্বিক হতে পারে না। কিন্তু কাণ্টের এই শেষোক্ত উক্তিটির সমর্থন বা যৌক্তিকতা বিতর্কমূলক। কারণ তিনি নিজেই দেখিয়েছেন যে শিল্পের আনন্দ কোনোরূপ লৌকিক বা ব্যবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধি বা স্বার্থের উর্ধ্বে নিরাসক্ত এক পরম পরিতৃপ্তি মাত্র। লৌকিক সুখ, সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নীতিমূলক তত্ত্ব-জ্ঞান তো মানুষের অনুভবের ব্যাপার— এর আবশ্যকতা ও সার্বিকতার প্রমাণ কি? সুতরাং এর সাহায্যে শিল্পবৃত্তিকে বর্ণনা ও প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া সমীচীন নয়। অতঃপর, কাণ্টের গ্রহণযোগ্য ও সঙ্গতিপূর্ণ মতানুসারে বলা যায় যে— নীতিজ্ঞান সাধারণ সুখ বা জ্ঞানের মতোই কাব্যকলার সঙ্গেও প্রচ্ছন্নভাবে সহ-অবস্থিত বা সহব্যাপ্ত দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথও সাধারণভাবে শিল্পকে নীতিশিক্ষার উর্ধ্বে রেখেছেন এবং মঙ্গলের একটি বিশেষ উন্নত অর্থেই তিনি শিল্প ও সৌন্দর্যের মধ্যে মঙ্গলকে দেখেছেন। "মঙ্গলে"র চলতি ধারণা এই যে— যা আমাদের হিতসাধন করে ও শক্তি-সামর্থ্যের সহায়ক হয়ে প্রয়োজন পূরণ করে। কিন্তু নীতিবাগীশের এই সংকীর্ণ ধারণা হতে রবীন্দ্রনাথ "মঙ্গলে"র আদর্শকে উর্ধ্বে দেখেছেন— যা প্রয়োজনের উর্ধ্বে এবং ঐশ্বর্যময়, প্রাচুর্যময় অলোকসামান্য এক ধামের সঙ্গে যার নিগূঢ় সামঞ্জস্য বা মিল ব্যাপ্ত হয়ে আছে অহেতুক আনন্দে। কাব্যকলার মধ্যে এই রূপেই "মঙ্গল"কে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন। কাব্যকলায় যে আনন্দলাভ হয়— রবীন্দ্রনাথের মতে তা মানুষের আপন "আত্মপুরুষে"র উপলব্ধির আনন্দ— যে আত্মপুরুষ সর্বদাই খণ্ডিত ব্যক্তিমানস দ্বারা আবৃত থাকে এবং সহসা কাব্যকলার অনুভূতির সময় সেই আবরণ ভেঙে বাহিরের

প্রকৃতি বা অন্যান্য ব্যক্তিচৈতন্যের সঙ্গে ঘটে তার মিলন। শিল্পরসের এই ব্যাখ্যা প্রাচীন রসবাদীদের মোটামুটি অনুসরণ করে। অতএব দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কাব্যকলার সঙ্গে সাধারণ অর্থে মঙ্গলকে সম্পর্কিত করতে চান নি : "কোনো দেশেই সাহিত্য স্কুল-মাস্টারির ভার নেয় নি।" অথচ একটি বৃহৎ ও সঙ্গত অর্থে মঙ্গলের সঙ্গে শিল্পকলার ন্যায়গত যোগ আছে : "মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্যের, বিষ্ণুর সঙ্গেই লক্ষ্মীর মিলন পূর্ণ।"— রবীন্দ্রনাথের এই মত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

প্লেটো কিন্তু মঙ্গলের সাধারণ অর্থেই সুন্দরকে মঙ্গলের সঙ্গে আবশ্যিকরূপে সম্পর্কিত করেছেন এবং বলেছেন যে— যা অমঙ্গল তা কখনোই সুন্দর ও গ্রহণীয় হতে পারে না। যেসব কাব্য মানুষের মনে রতি শোক ভয় ইত্যাদি ভাব জাগায় এবং মানুষকে এইসব ভাবে প্রভাবিত করে তাকে একপ্রকার আনন্দদান করে যার ফলে মানবচিত্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। এইসব কাব্য বর্জনীয়। অ্যারিস্টটল এর উত্তর দিলেন। তাঁর ভাষ্যের প্রথম কথা হল যে মানবদেহ ও মনের সকল রকম স্বাভাবিক ক্রিয়াই স্বাস্থ্যকর ও স্বীকারযোগ্য। ভালো কাব্য ও নাটকে আমাদের ভাবগুলির মার্জিত এবং সুষ্ঠু প্রকাশ হয় ও সেই কাব্যপাঠে বা নাটক-দর্শনে আমাদের ঐ ভাবগুলিকে উচিতভাবে ও মাত্রায় ভোগ করি এবং তা হতে স্বাভাবিক আনন্দলাভ করি ও তাদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও সদ্‌অভ্যাস জন্মে। অ্যারিস্টটল তাঁর ট্র্যাজেডির বিচারে কিন্তু নীতিকে কখনও কাব্যিকস্বরূপ ও মাননির্ধারণের কাজে লাগান নি। তাঁর বিচার নীতি-শাসিত নয়। ট্র্যাজেডির উৎকর্ষ 'ভীতি' ও 'করুণা' এই দুইটি ভাবের নিপুণ প্রকাশ দ্বারাই বিচারিত হবে। এই প্রকাশের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তো দুর্নীতিও নাটকে স্থান পাবে। অনাবশ্যক দুর্নীতি প্রদর্শন বর্জনীয়— কিন্তু এর কারণ নীতিগত ধারণার জন্য নয় বরং এইরূপ দৃশ্যে নাটকের রসনিষ্পত্তি ব্যাপারে অন্তরায় হয় এই কারণে। এই রস-নিষ্পত্তির তাগিদেই নাটকের নায়ককে অতিশয় সাধুপুরুষ হলে চলবে না, কেননা, তার কিছুটা দোষ থাকতে হবে, আর যার জন্য তাকে দোষের অতিরিক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবেই ভীতি ও করুণা ভালোভাবে ফুটে উঠবে। ভালোর ভালো এবং মন্দের মন্দ— এই নীতি নাটকে প্রতিপন্ন করলে সব সময় তা ট্র্যাজেডি ও উত্তম কাব্য হবে না। সুতরাং ন্যায়বুদ্ধিকে প্রধান করলে ট্র্যাজেডি রচনা ও উপভোগ করা চলবে না। সুতরাং দেখা যায় যে অ্যারিস্টটল আমাদের প্রাচীন রসবাদীদের মতোই কাব্যের বিচার তার ভাবপ্রকাশনের সামর্থ্য দিয়েই করেছেন— কোনো নীতিসূত্রের সাহায্যে নয়। অথচ তিনি এই রসবাদীদের মতো কাব্যের একটি অন্তিম ও পরোক্ষ উপকারিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কাব্যের প্রথম ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ও তার স্বরূপ লক্ষণ হল তার "ভাবপ্রকাশন" ব্যাপারটি। তার শেষ ও পরোক্ষ ফল বা পরিণাম— যার সম্বন্ধে একপ্রকার আত্মসংস্কার যা তার তটস্থ লক্ষণ।

সপ্তম কথা : এই প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় রসবাদকে অনুসরণ করেই কাব্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে অগ্রসর হব। এই সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের আরও বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে। কাব্যে ভাবের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক বা লৌকিক সম্ভোগের পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক মননপ্রধান ও অলৌকিক উপভোগের বা রসোদ্বোধের সম্ভাবনা কোথা হতে আসে? এই প্রশ্নের উত্তর মোটামুটিভাবে এই যে, কাব্যে ভাবের প্রকাশ হয় বিভাব ও অনুভাবের সাহায্যে। অতএব কাব্যের কাজ হল কোনো ভাবকে সরাসরি

তাদের শাব্দিক নাম দিয়ে নির্দেশ না করে সেই ভাবটি যে প্রকার জাগতিক অবস্থায় সাধারণতঃ আমাদের মনে জাগরূক হতে পারে সেই অবস্থায় বর্ণনা করা। যেমন রবীন্দ্রনাথ "সুখ-দুঃখ" কবিতায় দুইটি শিশুর ও মেলাতলার বর্ণনা সহকারে সুখ ও দুঃখের ভাব দুটিকে পাঠকচিত্তে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। এই বিভাব অনুভাবের দ্বারা ভাবের রসনিষ্পত্তি বা রসরূপ-ধারণ সম্ভব হয় তাদের "সাধারণীকরণ" ব্যাপার দ্বারা। এই ব্যাপারটি কি? এক কথায় বলা চলে কাব্যে বর্ণিত শিশু-চরিত্র ও তাদের সুখ-দুঃখের কারণ হিসাবে তাদের পাওয়া-না-পাওয়ার ছবি এমনভাবে পাঠকের মনে উপস্থিত হয় যে তাঁর কল্পনা-জগতে ঐ ভাব দুটি পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। শিশু-দুইটি পাঠকের আত্মীয় নাইবা হল কিংবা তাদের প্রতি পাঠকের ব্যক্তিগত মমতা বা বিরূপভাবের প্রশ্নও এখানে নেই। তেমনই কবিতায় বর্ণিত বাঁশি বা লাঠির প্রতি পাঠকচিত্তের কোনো দুর্বলতা আছে কি না— সে প্রশ্নও আসে না। পাঠক এই চরিত্র এবং বস্তুগুলিকে অভিনিবেশ সহকারে কল্পনা করেন অথচ এরা তাঁকে সাধারণ বা লৌকিকভাবে আকর্ষণ না করে তাদের এক অসাধারণ অলৌকিক মানসরূপ দ্বারাই পাঠকের চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করে। কাব্যে বর্ণিত এবং কাব্যপাঠে কল্পিত বা মানসপ্রত্যয়ী এই-সকল চরিত্র ও বস্তু-সকলকে বিভাব অনুভাব বলা হয় এইজন্যই যে এরা লৌকিক চরিত্র বা বস্তু নয়— বরং অলৌকিক। অন্য কথায় বলা হয় যে, কাব্যে প্রাকৃত চরিত্র ও বস্তুর সাধারণীকৃতি হয়। অর্থাৎ সার্থক কাব্যপাঠে পাঠক এইসব চরিত্র ও বস্তু -সকলের কল্পনা করেন একটি বিশেষ চিত্তভূমিতে আরোহণ করে— যেথান হতে এসবই ব্যবহারিক জগৎ হতে ভিন্ন এক কল্পনা-রাজ্যের সামগ্রী হয়ে বিরাজ করে। তখন এদের প্রত্যেকেরই যে-রূপটি প্রতিভাত হয় তা সকল পাঠকের পক্ষেই সমান এবং সেইজন্য প্রত্যেকটিই রসিক বা সহৃদয় পাঠক সকলের কাছে একই আবেদন বা অর্থ নিয়ে হাজির হয়, এবং তাদের পরস্পরের চিত্তে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে। এখন এই বিভাব অনুভাবকে অবলম্বন করে থাকে কোনো-না-কোনো ভাব, এবং এই ভাবের অনেক অংশে সাধারণীকৃতি হয়, যেমন হয় প্রাকৃত চরিত্র সংস্কৃত কাব্যে সমর্পিত হবার সঙ্গে সঙ্গে; প্রথমতঃ, কাব্যবর্ণিত প্রণয়চিত্রে পাঠকচিত্তে প্রেমভাবের পরিস্ফুটন ঘটে আবার সেইসঙ্গে এক নৈর্ব্যক্তিক আনন্দও তিনি লাভ করেন। এই দুইটির প্রকারভেদ লক্ষণীয়। লৌকিক ভাব মানুষের পরিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তিত্বের উপর প্রভুত্ব করে এবং অলৌকিক ভাবরস মানুষের মুক্ত অখণ্ড সর্বব্যাপক ব্যক্তিত্বের মনন ও উপভোগের সামগ্রী। সুতরাং লৌকিক ভাব লৌকিক সুখ-দুঃখের কারণ হয় আর অলৌকিক ভাব-রস অলৌকিক কাব্যানন্দের বা 'রসানুভূতি'র কারণ হয়।

এখন আমাদের বিচার্য বিষয় এই সাধারণীকৃতি ব্যাপারটি। এই ব্যাপারটি সার্থক হতে হলে কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ করা প্রয়োজন তা দেখতে হবে। অর্থাৎ কাব্যের ভাবরসোত্তীর্ণ হতে হলে কি কি শক্তি ও ব্যাপার কার্যকরী হয়। কাব্যে বর্ণিত চরিত্র-বস্তু-সকল একান্ত আপন বা পর বলে মনে না হবার পিছনে কাজ করে অনেকগুলি শক্তি ও ব্যাপার। এইগুলি বোধগম্য হলে সাধারণীকৃতি ব্যাপারটি ও কাব্যে লৌকিক ভাবের রস-রূপ-পরিগ্রহের রহস্য চমৎকারভাবে উপলব্ধি করা যাবে। কাব্যের রসাস্বাদ-গ্রহণের আনন্দকে অভিনব গুপ্ত 'চমৎকার' বলে অভিহিত করেছেন এবং ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন— এ যেন চিত্তের প্রগাঢ় নিমজ্জিত বা তন্ময় অবস্থা যা কাব্যানন্দে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। এই আনন্দের 'চমৎকার' অবস্থা প্রাপ্ত হবার পথে নানা বিঘ্ন পাঠকচিত্তে অন্ধকার এনে দেয়। এই বিঘ্নগুলি কি এবং তাদের

কিভাবে দূর করা যায়— তারও বিচারটি আমাদের প্রয়োজন এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য। অভিনবের আলোচনা অনুসারে এই বিঘ্ন বিভিন্ন প্রকারের : প্রথমতঃ, কাব্যে বর্ণিত বিষয়বস্তু বাস্তব হতে 'বিলক্ষণ' ও অবিশ্বাস্য হলে তা পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করতে অসমর্থ হয়। পাঠকচিত্ত সেই কাব্যে অভিনিবেশ আনতে পারে না— সুতরাং রসোপলব্ধি সম্ভব হয় না। এর প্রতিকারকল্পে পাঠক-চিত্তকে সহৃদয় হতে হবে— অর্থাৎ, পাঠকচিত্তকে একটি নির্মল মুকুরের মতো হতে হবে— যার মধ্যে কাব্যে বর্ণিত বস্তুর পরিষ্কার প্রতিবিম্বটি প্রতিফলিত হয়— অর্থাৎ সেই চিত্ত ঐ বস্তুর সহিত তন্ময়তা-প্রাপ্ত হয়। এই সহৃদয় চিত্তটি গড়ে তুলতে হয় কাব্যানুশীলনের অভ্যাস দ্বারা। এই বিঘ্নের আর-এক নিরসন হয় কবির যত্নসাপেক্ষে। কবিকে এমনসব বর্ণনা বাদ দিতে হবে— যা অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য এবং এদের শুধু সেই-সকল অনুষঙ্গে স্থান হতে পারে— যেখানে এইরূপ অসাধারণ কার্যকলাপের প্রসিদ্ধি আছে— যেমন শ্রীরামচন্দ্রের আকাশযানে (পুষ্পক রথে) যাত্রা অথবা হনুমানের সমুদ্র-লঙ্ঘন।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় বিঘ্ন হল পাঠকের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ভালোমন্দের বোধ তাকে কাব্য-বর্ণিত চরিত্র বা বস্তুসকলের প্রতি ব্যবহারিক প্রতিক্রিয়া করাতে উদ্যত করে এবং এইভাবে "সকল-হৃদয়-সংবাদী" কাব্যরস বা সাধারণীকৃত বিভাব-অনুভাবের ধারণার অর্জনে সে অসমর্থ হয়। 'সুখ-দুঃখ' কবিতায় রথযাত্রার মেলাকে অর্থহীন বা স্থূলবুদ্ধি মানুষের ভিড় বলে যদি তার মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে তা হলে কবিতাটির রসগ্রহণে সে সমর্থ হবে না। কিংবা কারুর যদি শিশুদের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা বা অহেতুক বিরাগ থাকে, বা রথযাত্রা ও মেলা বা দোকানপাট ও খেলনার প্রতি অসামান্য প্রীতি অথবা বিরক্তি থাকে তা হলে তার পক্ষেও কবিতাটির যথাযথ অর্থ-গ্রহণ এবং মর্যাদা-দান সম্ভব হবে না। কাব্য-পাঠককে এমন এক মানসিক অবস্থায় বিরাজিত হতে হবে যেখানে তার যা-কিছু একান্ত-রূপে ব্যক্তিগত অথবা নিছক নিজস্ব মনোভাবে অনুরঞ্জিত— তার সম্পূর্ণ অপসরণ অন্ততঃ সাময়িকভাবেও ঘটবে। কাব্য-পাঠকের চিত্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে এক সর্বজনীন চিত্তরূপে। তার রুচি এবং মনোগতি— সবই অনুসরণ করবে এক সার্বিক নীতি বা নিয়মকে। একেই বলা হয় চিত্তের সাধারণীকৃতি এবং কাব্যরসিককে এই চিত্তসংস্কারটি করতে হয় জীবনের অভিজ্ঞতা এবং কাব্যানুশীলনের অভ্যাস-দ্বারা। অবশ্য এখানে 'কাব্য' বলতে আমরা প্রামাণ্য কাব্য-রচনাকেই বোঝাতে চাইছি এবং এই সার্থক কাব্যের কবির চিত্ত ও তার সমস্ত উৎকেন্দ্রতা বা সংকীর্ণ বৈশিষ্ট্য ছেড়ে একটি সর্বজনীন রূপ গ্রহণ করবে— প্রকারান্তে এই কথাই রবীন্দ্রনাথ ও কয়েক জন পাশ্চাত্য মনীষী ও কবি যেমন কীট্‌স, হেগেল ও এলিয়ট বলেছেন। কবি ও কাব্যামোদীকে জগৎ ও জীবনের অভিজ্ঞতা-সমূহকে এমন সুষ্ঠু ও সুসম অনুভূতি-সহকারে গ্রহণ করতে হবে যে প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়াটি হবে কাব্য-স্বীকৃত। কাব্যকলা কবি ও পাঠককে অপর পাঠকের সঙ্গে মেলায়। সাহিত্যের মাধ্যমে এই মানুষে মানুষে সম্মেলনের কথা অনেকেই বলেছেন— বিশেষ করে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয়। এই সম্মেলনের মূলে আছে সাধারণীকৃতি-ব্যাপারটি যার ধারণা প্রথম পাই ভট্টনায়কের কাছে এবং যে ধারণাটির স্পষ্টতর ব্যাখ্যা পেয়েছি অভিনব গুপ্ত ও পরবর্তী আলংকারিকদের কাছে।

অতএব দেখা যায় পাঠকের চিত্তের সাধারণীকৃতির অভাবের জন্য পাঠকও যেমন দায়ী, কবিও তেমনই হতে পারেন। অপিচ, পাঠকচিত্তকে উপযুক্ত অবস্থায় আনবার উপায় হিসাবে ভরত ও

অভিনব নাট্যকলা-প্রয়োগে বিচিত্র রঙে ঢঙে রঙ্গমঞ্চ সজ্জা, রূপযৌবনযুক্ত কলাকুশল নটনটীর অপরূপ অঙ্গরাগ ও সাজসজ্জা, সুন্দরী নিপুণা নর্তকীবৃন্দ এবং নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতির সময়োপযোগী সমাবেশ করার উপদেশ দেন যার দ্বারা পাঠক বা দর্শকের পরিমিত ব্যক্তিসত্তা বা আত্মবোধ অন্তর্হিত হয়ে তার বৃহৎ ও ব্যাপক আত্মসত্তার প্রকাশ হয়। রঙ্গালয়ের প্রাণবন্ত বিচিত্র উৎসাহব্যঞ্জক পরিবেশে দর্শক তার সংকীর্ণ দেশকালাশ্রয়ী মানসিকতা বিস্মৃত হয়ে এক সার্বিক চিত্তভূমিতে আরোহণ করে। তা ছাড়া নাট্যাভিনয়ে থাকে বিভিন্ন প্রকারের অভিনয়-কৌশল— যেমন, বাচিক, আঙ্গিক (অঙ্গভঙ্গী যোগ), সাত্ত্বিক (অশ্রুবর্ষণ, স্বেদ, কম্প প্রভৃতির প্রদর্শনে ভাবপ্রকাশ) ও আহার্য (পরিধেয় বা সাজসজ্জা-সাহায্যে নানাবিধ ভাবাভিনয়)।

বিভিন্ন প্রকারের নাট্যবৃত্তির বা styleএর যথোচিত সমাবেশ, যেমন : শৃঙ্গার-রসের অভিনয়ের জন্য উল্লাসকর ওজস্বিনী 'কৈশিকী-বৃত্তি' ও রৌদ্র রসোদ্গমের জন্য গম্ভীর 'স্বাওতী' বৃত্তি সাহস, দৃঢ়তা প্রভৃতির ভাবাভিনয়ের উপযুক্ত।

এই-সকল প্রযুক্তি এবং উপকরণ দর্শককে সহৃদয় করে তুলতে সহায়ক হয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে— তাহলে কাব্যের বেলা কি হয়? এর উত্তরে ভট্টনায়ক বলেন যে কাব্যের বিবিধ গুণ এবং অলংকারের প্রভাবে পাঠকচিত্তের সাধারণীকরণ হয় ও কাব্যপাঠকের সহৃদয়ত্ব উদ্বুদ্ধ হয়। অভিনবও অনেকাংশে এই মতের সমর্থন করেন।

বৈয়াকরণ দার্শনিকগণের মতে কাব্যের শব্দপ্রয়োগের ফলে বর্ণিত বিষয়বস্তু এমন স্পষ্টভাবে মানস-দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয় যে তা নাট্যাভিনীত বস্তু সকলের মতই চিত্তকে প্রভাবিত করে। যদিও অনেকের মতে কাব্যের ক্ষমতা এ বিষয়ে নাটকের সমতুল্য নয়,— তবু কাব্যে শব্দ-পাঠ দ্বারা 'অভিধেয়' 'লাক্ষণিক' এবং 'ব্যঞ্জিত' অর্থের অনুধাবনায় ও তার ছন্দ, মিল ও বিবিধ অলংকারের সৌন্দর্য উপভোগ করায় ব্যাপৃত পাঠকচিত্ত স্বতঃই তার সংকীর্ণ ব্যবহারিক বোধ ছেড়ে আর-এক বৃহত্তর এবং অলৌকিক চৈতন্যভূমিতে উন্নীত হয়।

কাব্যরসাস্বাদনের আর-একটি বিঘ্ন কবির দোষে উপস্থিত হতে পারে এবং তার প্রতিকারও কবির হাতেই সম্ভব। কোনো এক কাব্যে একটি রসকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত এবং এই রসটি যে ভাবকে আশ্রয় করে থাকবে তা একটি স্থায়ীভাব হওয়া চাই— অর্থাৎ, 'রতি' 'হাস' 'শোক' 'ক্রোধ' আদি ভাবের একটি— যেগুলি মনুষ্য-চরিত্রে ব্যাপক ও দৃঢ় নানা আকারে অবস্থিত। মানুষ এইরূপ কতকগুলি বাসনা ও সহজাত বৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং এরা এমনই ব্যাপক ও দৃঢ়মূল যে এমন কেহ নেই (কদাচিৎ ছাড়া) যে এদের প্রভাব হতে নিষ্কৃতি পেয়েছে। যদি কেহ দীর্ঘকাল এদের কোনোটির চরিতার্থতা না করে তা হলেও তার সেই বাসনার নিবৃত্তি হয় না— বরং তা চিত্তে সুপ্ত থাকে এবং সুযোগ পেলেই জেগে ওঠে। তা হলে কাব্যে এইরূপ একটি স্থায়ীভাবকে প্রধান না করলে পাঠকের মন বেশিক্ষণ কাব্যে অভিনিবেশিত হবে কেন? যে ভাবটি তার মনের উপর প্রাধান্য বা প্রভুত্ব বিস্তার করে আছে তার অর্থ ও আকর্ষণ প্রগাঢ় হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং ভাবপ্রকাশ বা প্রতিরূপায়ণই কাব্যে প্রাধান্যলাভ করবে এবং অন্য সকল ভাব— যেমন, 'লজ্জা' 'বিষাদ' 'গর্ব' ইত্যাদি অপ্রধান হয়ে সেই প্রধান ভাবকে প্রকাশ করার সাহায্য করবে।

আশা করছি এবার আমরা 'সাধারণীকৃতি' ব্যাপারটির তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গমের পথে কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছি। কাব্য বা নাটকের রসপ্রতীতির মূলে আছে অনেকগুলি ব্যাপার (তার মধ্যে প্রধানটির আলোচনাই এতক্ষণ হল) যাদের অনুকূল সংঘটনার উপর নির্ভর করে সেই সাধারণীকৃতি এবং রসপ্রতীতি।

এই সংঘটনগুলির কিছু পাঠক বা দর্শকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং কিছু কবি বা নাট্যকারের সহিত। কবি বা নাট্যকারের চিত্তেই ভাব রসোত্তীর্ণ হয় এবং তা পাঠক বা দর্শকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং এই দুই পক্ষের পরস্পরের সহযোগে কাব্য বা নাটকের রসনিষ্পত্তি সম্ভব হয়।

কাব্য-রচয়িতার চিত্ত নৈর্ব্যক্তিক বা বৃহৎ ব্যক্তিক হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন এবং তাঁর কাব্য বা নাটক রচনার জন্য দক্ষতা থাকা প্রয়োজন— যা তাঁর রচনা-পাঠে বা ভাবসৃষ্টিতে পাঠক বা দর্শকের চিত্তকে 'সাধারণীভূত' বা নৈর্ব্যক্তিক হতে সাহায্য করে রসাস্বাদনের উপযোগী করে। অবশ্য পাঠক বা দর্শককেও এ বিষয়ে যত্নবান্ হতে হবে। তাঁকে জীবন জগৎ ও কাব্য-নাটক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং রসিক হতে হবে— তা ছাড়া, কাব্যপাঠ বা নাট্যদর্শনের সময় তাঁকে আপন ব্যবহারিক জীবনের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রিয়-অপ্রিয় বোধ ইত্যাদি মনোভাব তাৎকালিকভাবে অপসারিত করে একটি অতিশয় সহানুভূতিশীল অথচ (এক অর্থে) অনাসক্ত, সর্বব্যাপক ও সর্বজনপ্রতিভূ মানসিকতার বা চিত্তধর্মতার অধিকার লাভের জন্য ইচ্ছুক হতে হবে। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, চিত্তের সংবেদনশীল রুচিবোধ ও রস গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা আর কবি বা নাট্যকারের সার্থক সাধারণীভূত রসোচ্ছল প্রতিভা এবং কাব্য বা নাট্যরচনার দক্ষতা এই দুইয়ের সংযোগেই কাব্যে বর্ণিত ও নাট্যে প্রতিরূপায়িত বস্তু, চরিত্র ও ভাবসকলের 'সাধারণীকৃতি' ব্যাপারটি সফল হয়, অর্থাৎ, তারা পাঠক বা দর্শকের চিত্তে তাদের দেশকালাতীত 'সকল-হৃদয়-সংবাদী' তাত্ত্বিক বা ভাবরূপ ধরে আবির্ভূত হয় এবং এই কারণে তাদের মাধ্যমে ভাব বা রসরূপে প্রকাশ পায়। রসনিষ্পত্তির এই ব্যাখ্যার পৃষ্ঠভূমিতে আছে একটি মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মদর্শন— যা এর পর আলোচিত হবে।

অষ্টম কথা: রসোৎপত্তির ব্যাখ্যায় আমরা অভিনবকে অনুসরণ করে একটি মনস্তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম-দর্শনকে বাহ্যরূপে স্বীকার করে নিয়েছি— তার স্পষ্ট ও পরিস্ফুট উল্লেখ এবং বিচার প্রয়োজন। মানবচিত্ত বা ব্যক্তিত্বকে আমরা দুইটি স্তরে ভাগ করেছি: প্রথমটি তার সাধারণ ব্যবহারিক স্তর— যেখানে সে সাংসারিক ব্যক্তি হিসেবে জগতের সকল বস্তুর সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রয়োজনসিদ্ধির মনোভাব আসক্তি রুচি এবং নীতিবোধ নিয়ে সম্পর্কিত। অন্যটি হল আর এক স্তর— যা অব্যবহারণীয় বা অলৌকিক— যেখানে সে বিশ্বচরাচরের কোনো কিছুকেই তার জাগতিক বা জৈবিক প্রয়োজনবোধ দিয়ে দেখে না বরং সকলই সুন্দর বলে ভালোবাসে। আলঙ্কারিকদের মতে এই স্তরটিকে সাধনা দ্বারা পরিস্ফুটিত করতে হয় এবং কাব্য ও নাট্যকলানুশীলন এই সাধনার সহায়ক। কারণ কাব্য বা নাট্যকলার রসগ্রহণের জন্য চিত্তের এই রসপ্রবণতা একান্ত প্রয়োজন। চিত্তের এই রসোন্মুখতা এবং রসপ্রতীতি তখনই সম্ভব হয় যখন সে তার ক্ষুদ্র ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য ছেড়ে একটি বৃহৎ আত্মবোধ লাভ করে। এটিই চিত্তের 'সাধারণীকৃত' সংঘটন— যার সাহায্যে সার্থক কাব্য বা নাট্যকলার সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমে সুকবি বা বিদগ্ধ নাট্যকার তাঁর হৃদয়ের সাধারণীভূত ভাবকে পাঠক বা দর্শকের চিত্তে সঞ্চারিত করতে সফল হন। কাব্যের

ছন্দ মিল অলঙ্কার ও নানা বিভব— বিশেষতঃ নাটকের বিচিত্র আবেদন পাঠক বা দর্শক -চিত্তকে তার পরিচ্ছিন্ন ব্যবহারিক ব্যক্তিবোধ হতে সাময়িকভাবে নিষ্কৃতি দেয়।

এই দুইটি স্তর বা অবস্থার কথা অনেক পাশ্চাত্য সাহিত্য-মীমাংসক স্বীকার করেন এবং কাব্যকে এক অনাসক্ত অলৌকিক আনন্দ (disinterested extraordinary pleasure) বলে অভিহিত করেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-মীমাংসাতেও এই স্তরভেদ সুস্পষ্ট। তিনি রসানুভূতির মধ্যে মানবাত্মার একটি 'বেহিসাবী' দিক দেখেছেন— যা 'আত্মীয়তার বাজে কাজে' ব্যাপৃত থাকে। সৌন্দর্য এই প্রয়োজনাতীত আধ্যাত্মিক কার্য হতে সৃষ্ট এক অলৌকিক আন্তর বস্তু। সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হয় হৃদয়ের ওই হৃদয়ধর্ম হতে— যেখানে মানবহৃদয় চায় বাহিরের বস্তু ও অপর হৃদয়ের সঙ্গে অনাবিল মিলন। কিন্তু 'শৈবপ্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনে' (যা অভিনব গুপ্তের চিন্তার অধিষ্ঠান) এই দুইটি স্তরের অস্তিত্বকে যতখানি স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে— তা অন্যত্র দেখি না।

প্রত্যভিজ্ঞাবাদীদের মতে আমাদের চৈতন্যের তিনটি অংশ আছে যার সাহায্যে 'আমি আছি' 'আমি জানি' ও 'আমি সুখী' এইরূপ অনুভব হয়। এই অংশগুলি সাধারণত আবরক দিয়ে আংশিকভাবে আচ্ছাদিত থাকে— যার কারণে মানুষ বা ব্যক্তি চৈতন্য-জগতের সমস্ত 'বিষয়'বস্তুকে ও নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানে ও আনন্দে উপলব্ধি করতে পারে না। সে কিছু বিশেষ বস্তুকেই জানে এবং তার দ্বারা আনন্দ লাভ করতে পারে। অন্য কথায় তার জ্ঞান ও আনন্দ পরিমিত— বিস্তৃত নয়। পক্ষপাতশূন্যভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে না তার জ্ঞান আর আনন্দ— আর সে নিজের সত্তা বা চৈতন্য-স্বরূপকেও আংশিক ও সন্দিহানভাবে জানে। কাব্য বা নাটকের রসাস্বাদনের সময় পাঠক বা দর্শকের উচ্চতর চৈতন্যে সেই আবরণগুলি ভেঙে যায় এবং সে তার পূর্বের খণ্ডিত ও পরিচ্ছিন্ন অহংতা বা আত্মবোধ ছাড়িয়ে এক অখণ্ড পরিব্যাপ্ত অহংতায় উপনীত হয়। এই অবস্থাকে বেদান্ত-দর্শনের 'জীবন্মুক্ত' অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে— যেখানে মানবচিত্ত অহংকার-শূন্য হয়ে বিরাজ করে। কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিক অবস্থা বেদান্ত-মতে এমন বিচিত্র, আনন্দময় ও রসপূর্ণ বলে বর্ণিত হয় না যা 'শৈবপ্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনে' পাই। কারণ তখন এই দ্বিতীয় দর্শন মতে চৈতন্য তখন গভীর সংবেদনাশীল হয়ে সকল বিষয়ের সহিত তন্ময়তা প্রাপ্তির যোগ্য হয় এবং সকল রকম অভিজ্ঞতাই আগ্রহ ভরে উপভোগ করে ও গভীর আনন্দ লাভ করে। বেদান্ত-মতে চৈতন্য জীবন্মুক্ত অবস্থায় উদাসীন-ভাব প্রাপ্ত হয় এবং তার সুখ-দুঃখ কিছুরই বোধ থাকে না। সাংখ্য-মতের সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিদ্বারা আবৃত চৈতন্যের সঙ্গে এই রসচর্চনারত সাধারণীভূত চৈতন্যের তুলনা করলে দুইয়ের মিল ও বৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে। প্রধান বৈলক্ষণ্য এই রসপ্রতীতির আনন্দ— দুঃখস্পর্শরহিত নির্বিশেষ আনন্দ এবং তা চৈতন্যের ধর্ম বলে রসবাদী জানেন, কিন্তু সাংখ্য-মতে 'চৈতন্য' বা 'পুরুষে'র 'আনন্দ' বা 'নিরানন্দ' কোনোই ধর্ম নেই। কারণ আনন্দ বা নিরানন্দ প্রকৃতি বা জড়ের ধর্ম এবং চৈতন্যে তাদের ছায়া পড়ে মাত্র ও চৈতন্য এদের আপন বলে ভ্রম করে। তা ছাড়া, প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান হলেও সেখানে রজঃ ও তমোগুণের সম্পূর্ণ অপসরণ হতে পারে না কারণ প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং রসপ্রতীতির আনন্দ (সাংখ্য-মতে) দুঃখস্পর্শহীন অনাবিল সুখ হতে পারে না। ভট্টনায়ক ও অভিনব গুপ্ত দুজনেই কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন এবং 'শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে' বিশ্বাসী ছিলেন (ওই শাস্ত্রচর্চা তখন ঐ অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছিল)। যদিও এঁদের সাহিত্য-মীমাংসা

সম্বন্ধে রচনায় স্থানে স্থানে সাংখ্য ও বেদান্ত-দর্শনের কয়েকটি কথা পাওয়া যায় কিন্তু তার থেকে তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী বা তাঁদের চিন্তাধারার পটভূমি যে সাংখ্য বা বেদান্ত দর্শন ছিল তা মনে করা সংগত হবে না। ভট্টনায়ক সাধারণীভূত চিত্তের রসপ্রতীতির আনন্দকে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরা' বলেছেন। অভিনবও একই কথা বলেন। তবুও তাঁরা এই রসপ্রতীতিকে রসাস্বাদী সহৃদয়-চিত্তভূমি ও তার বিশেষ আনন্দকে বৈদান্তিক যোগীদের ব্রহ্মানুভূতির অবস্থা হতে ভিন্ন বলেও জেনেছেন। ভট্টনায়ক এক স্থলে বলছেন: রস গাভীর দুগ্ধের মতো স্বতঃই গোবৎসের জন্য প্রস্রবিত হয়, এর থেকে যোগীদের (ব্রহ্মানন্দের) আনন্দ-রসের বৈলক্ষণ্য এইখানে যে তাদের এই রস দোহন করতে হয়।

অভিনবও বলেন যে, যোগীদের আত্মদর্শনের অনুভব হতে রসাস্বাদের তফাত এই যে প্রথমটিতে দ্বিতীয়টির মতো সৌন্দর্য নেই—তা একপ্রকার চিত্তের রিক্ত বা শূন্য অবস্থা—যেখানে চন্দ্র সূর্য ও বিশ্বচরাচর সকলই বিলীন হয়ে যায় শিব বা ভৈরবের ধ্যানে। এই তুরীয় অবস্থায় আত্মার আনন্দময় স্বরূপটুকু মাত্র আর যোগ-ধ্যানের কেন্দ্র বা বিষয়রূপে দেবতা বা শক্তি বিরাজিত থাকে। কিন্তু রসাস্বাদের বেলায় চিত্তে কোনো বাসনা—যেমন, রতি শোক হর্ষ বিষাদ বা উৎসাহ রস-রূপে স্ফুরিত হয়ে চিত্তকে অনুরঞ্জিত করে। রসাস্বাদন সহৃদয় চিত্তের আনন্দ, তাই যোগীদের আনন্দের মতোই মূলতঃ আপন সম্বিতের অনুভব-জনিত হলেও এর মধ্যে এমন সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য এবং মাধুর্য ওতপ্রোত আছে যা দ্বিতীয়টিতে অবর্তমান। প্রথমটি তাই পেলব অনুভূতি-নন্দিত সুকুমার মনন-শিল্পীদেরই উপযোগী এবং দ্বিতীয়টি তপঃক্লেশসহিষ্ণু যোগীদের সাধনযোগ্য।

এখন দেখতে হবে যে, কাব্য-মারফৎ ভাব কি প্রকারে সাধারণীভূত অবস্থায় পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। সাধারণতঃ আমরা বলি ও মনে করি যে—কবির হৃদয়ের ভাব কাব্যে ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং সেই কাব্যপাঠে পাঠকের চিত্তেও সেই ভাবটির উদয় হয় এবং যেহেতু কবি ও পাঠক দুজনেই 'সহৃদয়' সুতরাং তাদের ভাব একান্ত নিজস্ব রূপটি ত্যাগ করে একটি সাধারণ বা সর্বজন-বোধ্য রূপ ধরে। সুতরাং 'হৃদয়-সংবাদ' সম্ভব হয়। একেই বলে থাকি কাব্যের 'রস-পরিণতি'। অভিনীত নাটকের বেলায় বলে থাকি নটনটীর মনের ভাব তাদের বাচনিক আঙ্গিক সাত্ত্বিক ও আহার্য অভিনয়-গুণে দর্শকের মনে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু এইরূপ সরল ব্যাখ্যারও কিছু ত্রুটি আছে। অভিনবের মতে কাব্য বা নাটকের রসাস্বাদ একান্তই সহৃদয়ের আন্তর ব্যাপার। সুতরাং কোনো বহির্বিষয় এই রসাস্বাদের কারণ হতে পারে না। সহৃদয়ের নিজের অন্তরের অনাদি অনন্ত রস-চৈতন্যই রসাস্বাদনের পরম ভোক্তা। তাই কাব্যে বর্ণিত বা নাটকে অনুকৃত বিভাব অনুভাবের মানস-প্রত্যক্ষের দ্বারা বা সাক্ষাৎদর্শন দ্বারা—এরা সবই বস্তুতঃ তার মানসগত বিষয়বস্তু—কারণ (যেমন বিজ্ঞানবাদীরা বলেন) মনের বাহিরে অপ্রত্যক্ষিত বস্তুর অস্তিত্ব নেই—যেহেতু মন তা জানতে পারে না। 'সহৃদয়ে'র চিত্তে স্থায়ীভাবের উদয় তার বাসনালোক হতেই হয় এবং এই স্থায়ীভাবের কোনো লৌকিক বা ব্যক্তিগত ধর্ম বা পরিণতি থাকে না কিংবা এক কথায় তা সাধারণীভূত এবং তার মূলে কোনো লৌকিক কারণ বিদ্যমান থাকে না। কাব্যাশ্রিত বিভাব অনুভাব অলৌকিক বস্তুমাত্র এবং এদের সংযোগে স্থায়ীভাবটির চিত্তে আবির্ভাব হয়। এখানে 'সংযোগ' অর্থে এই বিভাব-অনুভাবগুলির পরস্পরের সহিত সংযোগ বোঝায়, আবার (অভিনব-মতে) পাঠক বা দর্শকের চিত্তের সহিত তাদের সংযোগ বা তন্ময়তাও

বোঝায়। এখন এই কয়েকটি বাসনা যে আমাদের সকলের মধ্যে সর্বদাই থাকে তা অনস্বীকার্য এবং অভিনব এদের প্রতিষ্ঠা করে এদের সাহায্যে কাব্য-জিজ্ঞাসার দুটি সর্বতোস্বীকৃত ব্যাপারের ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমটি এই যে, রসার্চনা পাঠকের (বা দর্শকের) আন্তর ব্যাপার— সুতরাং তার নিজের স্থায়ীভাবের উপভোগ। আর দ্বিতীয়টি পাঠক (বা দর্শক) সাধারণতঃ নিজের থেকে অনেক বিলক্ষণ চরিত্র ও তাদের নানা বিচিত্র ভাবাবেশের সঙ্গে অনায়াসে (যেমন শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার সীতা-বিসর্জন-জনিত বেদনা) সহানুভূতি বোধ করতে পারে। তা না হলে তার পক্ষে কাব্য বা নাটকের অতি-পরিমিত অংশেরই রসগ্রহণ সম্ভব হত। পরন্তু, অভিনব শুধু এই কথামাত্রই বলেন না যে কয়েকটি বাসনা বা স্থায়ীভাব আমাদের সকলের মধ্যে বিদ্যমান— বরং আরও প্রগাঢ় অধিবিদ্যা-তত্ত্বের কথা বলে কাব্য বা নাটকের ব্যাপক আবেদনের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের চৈতন্য অনাদিকাল হতে নানা জীব, নানা স্তর ও অবস্থার মানুষের আকার ধারণ করে অভিজ্ঞতার অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে চলেছে। সুতরাং একটি মানুষ আজ যে অবস্থায় আছে তাই তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়— সে সমুদয় জীব-সকলের সবপ্রকার অভিজ্ঞতার সঙ্গেই পরিচিত। জন্মজন্মান্তরের সংস্কার সঞ্চিত আছে তার চৈতন্যে এবং কাব্য বা নাটকে, যখন কোনো জীব বা মানুষের বর্ণনা বা অনুকৃতি পায়— তখন সে তার সঙ্গে নিজকে একীকরণ করে তার ভাবটিকে আপনারই ভাব বলে উপভোগ করে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে এই সহানুভূতি ও ভাবভুক্তি লৌকিক নয়— যেখানে ভোক্তা রসানুভূতির আনন্দের পরিবর্তে ভাবটির সুখ-দুঃখ-গুণ দ্বারা অভিভূত হয়ে সুখী বা দুঃখী হয়। আর আগের ক্ষেত্রে সে ভাবটিকে লৌকিক রূপে 'ভোগ' (suffer) না করে সেটিকে 'উপভোগ' (enjoy) করে। একেই ভাবের ও পাঠক বা দর্শকের 'সাধারণীকৃতি' বলে। এইসঙ্গে লক্ষণীয় যে এখানে পাঠক বা দর্শকের নিজেরই ভাবের অভিব্যক্তি হয়, অন্যের ভাবের ভুক্তি হয় না। অভিনবের কাব্য-মীমাংসাকে 'অভিব্যক্তি-বাদ' এবং ভট্টনায়কের মীমাংসাকে 'ভুক্তিবাদ' বলা হয়। ভট্টনায়কের মতে কাব্যের রস-নিষ্পত্তির মূলে কাজ করে তিনটি শক্তি। প্রথমটি শব্দের অভি বা শক্তি, দ্বিতীয়টি অর্থের ভাবনা-শক্তি যার বলে শব্দ-দ্বারা অভিধেয় পদার্থসমূহ একটি অলৌকিক আপন-পর-সম্বন্ধ-রহিত অবস্থায় চিত্তে আবির্ভূত হয়— যাকে সেই মানস-গত পদার্থসমূহের সাধারণীভূত অবস্থা বলা হয় এবং যে অবস্থায় তাদের বিভাব অনুভাব ও ভাব এইরূপ শ্রেণীভাগে বিভক্ত করে বর্ণনা করা হয়। তৃতীয় ভাবাশ্রয়ী পাঠক বা দর্শকচিত্তের 'ভোগীকৃতি' শক্তি— যার বলে পাঠক বা দর্শকের রসপ্রতীতি হয়। অভিনব শেষের দুইটি শক্তি ও তাদের কার্যকারিতা অস্বীকার করেন— কারণ তারা অনুভব-বিরুদ্ধ। অভিনবের মতে কাব্যে-বর্ণিত বা নাটকে-প্রতিরূপায়িত পদার্থসকল (অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ভাব) যে সাধারণীভূত অবস্থায় প্রকাশিত হয়— তার মূলে ভাবনা ও ভোগীকৃতি শক্তিদ্বয়ের কল্পনার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ সহৃদয় চিত্তে সেই পদার্থসকল স্বতঃই এই অবস্থা-প্রাপ্ত হয় এবং রসপ্রতীতি জাগায় এবং এই ব্যাপারের সরল ব্যাখ্যা 'ধ্বনন'-ব্যাপার বা 'ব্যঞ্জন'-ব্যাপার দ্বারা সম্ভব।

কাব্যে শব্দ-দ্বারা বিভাব অনুভাব বর্ণিত হয় এবং নাটকে নটনটীর আবির্ভাব ও তাদের বাচনিক আঙ্গিক সাত্ত্বিক এবং আহার্য অভিনয় দ্বারা এদের মানস-গোচর করা হয়। এই চিত্ত-অনুভাব পাঠক

বা দর্শকের হৃদয়গত ভাবকে সেই পরম চৈতন্য বা ভাবটির মাঝে লয়প্রাপ্ত করে লাভ করে এক সার্বিক ভাবের অভিব্যক্তি ও সঙ্গে সঙ্গে আপন ভাবময় সত্তা বা সম্বিতের আস্বাদন।

রসাস্বাদনের এই ব্যাপারটি সম্ভব হয় ধ্বনি দ্বারা। কাব্যের শব্দ ও নাটকের সংলাপ এবং তাতে প্রদর্শিত বিভাব অনুভাব এরা সকলেই ধ্বনিত বা ব্যঞ্জিত করে ভাবকে এবং ধ্বনিত বা ব্যঞ্জিত ভাবই রস-রূপে প্রতীত হয়। বিভাব-অনুভাব (অর্থাৎ বস্তুর) ও অলঙ্কার সমূহও ধ্বনিত হয় তবে শেষপর্যন্ত এসবের উদ্দেশ্য 'রস' এবং রস-ধ্বনিই ধ্বনন-ব্যাপারের প্রধান কাজ। ভট্টনায়ক ধ্বনিবাদ অস্বীকার করেন কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁর ভাবনা ও ভোগীকৃতি ব্যাপার দিয়ে রসের ব্যাখ্যাটি দোষশূন্য নয়। ভট্টনায়কের পূর্বে ভট্টলোল্লট এবং শঙ্কুক ভরতের রসসূত্র 'বিভাব-অনুভাব ও ব্যভিচার-ভাবের সংযোগ দ্বারা রসনিষ্পত্তি ঘটে'— এই ভাষ্যের ব্যাখা করেছিলেন। তার বর্ণনা অভিনবের রচনায় পাওয়া যায়। প্রথম জনের মতানুসারে আমরা বলতে পারি যে— রস উৎপন্ন হয় প্রকৃতপক্ষে অনুকার্য নায়কের চিত্তে উপযুক্ত বিভাব-অনুভাব ও ব্যভিচার-ভাবের দ্বারা— যেমন মহারাজা দুষ্মন্তের লাবণ্য-রূপিণী শকুন্তলা-সন্দর্শন ও নয়নাভিরাম তপোবন পটভূমির অনুকূল পরিবেশের গুণে (যারা বিভাবের কাজ করে) তীব্র অনুরাগে (রতিভাব) আকুল হয় এবং তাঁর এই ভাবের প্রকাশ অঙ্গের নানাবিধ ভঙ্গী ও মুদ্রা (যথা, স্বেদ, কম্প, লোচন ও করবিন্যাস আদি) দ্বারা হয় এবং কয়েকটি ক্ষণস্থায়ী ভাব যেমন শঙ্কা, অসূয়া, গ্লানি প্রভৃতি দ্বারা উপচিত হয় বা পুষ্টিলাভ করে। মূল রতিভাবই এইরূপে উৎপন্ন এবং উপচিত হয়ে রস-আকার ধরে। আর এই 'রস' স্থায়ীভাব রতি হতে স্বরূপতঃ পৃথক নয়। নাট্যে অনুকৃত নটের (বা কাব্যে-বর্ণিত ও মানস-চক্ষে উপস্থাপিত চরিত্রের) উপর অনুকার্য নায়কের (যেমন দুষ্মন্তের) ও তাহার ভাবের (যথা রতিভাবের) আরোপ হয় এবং এইরূপ আরোপই একপ্রকার আরোপিত চরিত্র ও ভাবের অলৌকিক সাক্ষাৎকার এবং ভাবের এইপ্রকার 'সাক্ষাৎকার'ই রসাস্বাদ। ভট্টলোল্লটের এই মতের প্রধান ত্রুটি এই যে, এখানে দুষ্মন্তের লৌকিক ভাবকে রসের সঙ্গে একীকরণ করা হয়েছে। অথচ আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে এই দুইয়ের পার্থক্য কত মৌলিক। উপরন্তু এ কথাও অনুভব-বিরুদ্ধ যে— মহারাজা দুষ্মন্তের প্রেম-বিহ্বল অনুরাগ বা রতিভাবদর্শনে অথবা দুষ্মন্তের অনুকর্তার উপর সেই রতিভাবের আরোপ দ্বারা (কিংবা 'অলৌকিক' সাক্ষাৎকার দ্বারা) কারও প্রেমভাব (বা শৃঙ্গার-রসের) আনন্দানুভব হতে পারে। শঙ্কুকের মতে দর্শকের চিত্তে নটাশ্রয়ী রতিভাবের অনুমান হয় এবং তার ফলেই রসাস্বাদ হয়। কিন্তু এ যুক্তিও অনুভব-বিরুদ্ধ এবং ভট্টনায়ক এর সমালোচনা করে তাঁর 'ভুক্তিবাদ' প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাকে খণ্ডন করে অভিনব তাঁর 'অভিব্যক্তি-বাদে'র অবতারণা করেন।

আমরা অভিনবের মতটিকে সমর্থন করি বটে— তবু এ কথাও বলতে হয় যে অভিনবের বিজ্ঞানবাদ আমাদের পক্ষে অনিবার্য নয়। রস ও ভাব যে কেবল কবি বা নাট্যকারের এবং পাঠক বা দর্শকের চিত্ত ব্যতীত থাকতে পারে না— এ কথা না মানলেও চলে। যেমন সাধারণতঃ নীল লাল রঙ বা মিষ্ট ও তিক্ত -রস সাক্ষাৎ প্রতীতি ছাড়াও বিষয়রূপে বিদ্যমান বলেই আমরা মনে করে থাকি এবং এদের অস্তিত্ব ব্যক্তি-প্রতীতিতেই সীমাবদ্ধ নয় বরং স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ বস্তু— যার প্রতীতি স্বতঃই মানবচিত্তে আবির্ভূত হয়। এই রকম ধারণাই স্বাভাবিক এবং এর সপক্ষে বাস্তবপন্থীদের যুক্তিও সারবান। বিভিন্ন প্রকারের ভাব ও রস, বিভিন্ন প্রকারের রঙ, শব্দ, গন্ধ বা আস্বাদের মতোই সামান্য বা সর্বজনীনভাবে

প্রতীত হয়। এই প্রতীতির 'সামান্য'তার ব্যাখ্যাটি তাহলে কি? এগুলির প্রত্যেকটির এক একটি 'সামান্য' রূপ (বা আদর্শ-আকার অথবা ভাব-সত্তা) মনে করতে হয়— যা উপযুক্ত অবস্থা-সমাবেশে বাস্তব-আকার পায় কোনো ব্যক্তি-মানসের সাক্ষাৎ-প্রতীতিতে। একেই ভাববাদী বস্তুবাদ (idealistic realism) বা বিষয়নিষ্ঠ ভাববাদ (objective idealism) বলা হয়। এইরূপ দর্শনভঙ্গীই আমাদের সহজাত ও আমাদের সাধারণ ভাষাপ্রয়োগের মূলে অবস্থিত। সাহিত্য-মীমাংসায় এইরূপ সহজাত দর্শনকেই আলোচনার পৃষ্ঠভূমি বা অধিষ্ঠানরূপে স্বীকার করে নেওয়া সংগত মনে হয়। তা না হলে অনর্থক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। অভিনবের দর্শন-দৃষ্টি-অনুসারে রস 'রসপ্রতীতি' ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কিন্তু তা হলে রসের সামান্য-রূপ ও তার একটি সর্বনাম-করণ এবং সংজ্ঞা-নিরূপণ সম্ভব হত না। রস-পদার্থের ভাবগত বাহ্যসত্তা স্বীকার করাই সমীচীন মনে হয়। তা ছাড়া অভিনব তো তাঁর দর্শনে স্থায়ীভাব বা 'বাসনা'র এইরূপ বাহ্যসত্তাকে প্রকারান্তরে স্বীকার করেন বলা যায়, কারণ অভিনব বলেন স্থায়ীভাবগুলি মনুষ্যচিত্তে 'সংস্কার' রূপে সুপ্ত থাকে।

এইরূপ অবস্থায় তা হলে অস্তিত্ব কিরূপে বোঝা যায়? ভাবটির একটি 'সামান্য' ও 'অমূর্ত' ভাবসত্তা কল্পনা করতে হয় এবং চিত্তে বাস্তবিক ক্ষেত্রে ভাবোদ্রেকের ব্যাপারে এই অমূর্ত সামান্য-রূপ ভাবটির এক বিশেষ মূর্তি-পরিগ্রহ ঘটে— সরল কথায় ভাবটি বাস্তব-জগতে আত্মপ্রকাশ করে। ভাবের সাধারণীকরণ বুঝতে হলে আমাদের এই 'দেশ-কাল-ব্যক্তি-নিরপেক্ষ' মুক্ত নিরাশ্রয়ী ভাবের অমূর্ত সামান্য-সত্তাকে কল্পনায় প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। ভাবের বিশেষ কোনো বাস্তবিক প্রকাশ বৃত্তিরূপে চিত্তে আলোড়িত হয়। সেটি ভাবের লৌকিক রূপ— যা নিতান্তই ব্যক্তিগত ভাবে মানুষে ভোগ করে। ভাবের সামান্য ভাব-ভিত্তিক রূপ— যাকে ভাবটির স্বরূপ বা মৌলিক সত্তা বলা যায়— সেটি হল অধিবিদ্যক জ্ঞানের বিষয়। এই 'বাঞ্ছিত'কেই কাব্যকলার মাধ্যমে কবি বা শিল্পী 'সহৃদয়ে'র চিত্তে উদ্বোধিত করতে চান; দার্শনিক যাকে ধরতে চায় বিচার আর বৌদ্ধিক সংজ্ঞা-সাহায্যে, কবি বা শিল্পী তাকেই পেতে চায় তার রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় মূর্তিতে। অথচ সেটি প্রকৃতপক্ষে অমূর্ত অবাস্তব দেশ-কাল-ব্যক্তি-সম্পর্ক-শূন্য ভাব-পদার্থ মাত্র। সুতরাং যেসব উপকরণ— যেমন, বিভাব-অনুভাব বা ব্যাভিচারী-ভাব-সাহায্যে এই অমূর্তের কাব্যিক বা শৈল্পিক প্রকাশ সাধিত হয় — সেগুলি বাস্তবানুকরণ হয়েও অবাস্তব এবং মূর্তিমান হয়েও ভাব-শরীরী। যথা, রতিভাবের উপমায় 'আলম্বন-বিভাব' হিসাবে প্রেম-ব্যাকুল সম্রাট দুষ্মন্ত ও তার 'উদ্দীপন-বিভাব' হিসাবে অতুলনীয়া বনবালা শকুন্তলা ও মনোভিরাম অনুকূল পরিবেশ ও 'অনুভাব'-রূপে মহারাজা দুষ্মন্তের রতিভাবানুযায়ী অঙ্গভঙ্গী, স্বেদ, রোমাঞ্চ এবং ব্যাভিচারী-ভাবরূপ অভিলাষ, আবেগ, গ্লানি, অসূয়া, বিতর্ক আদি ভাবের প্রকাশ— এ সকলই বাস্তবক্ষেত্র অনুযায়ী দেখা গেলেও— ঠিক কোনো বাস্তব বস্তু বা ঘটনার সাক্ষাৎ-দর্শনের মতো মনে হয় না, বরং এগুলির ঐকতানে এক কল্পনার অপরূপে মায়া-জগৎ সৃষ্টি করে— যা বাস্তবের ছায়ারূপে তার মর্মসত্যটি বা মূল তত্ত্বগুলি রূপায়িত করতে চায়।

দেশ-কালাশ্রয়ী এই বাস্তব-জগতের সেই মূলতত্ত্বগুলি বা সামান্যরূপ অমূর্ত ভাব-পদার্থগুলির বিশদ ও সম্যক আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং দার্শনিক এই বাস্তব-জগৎকে পরিলক্ষণ, বিচার ও বিশ্লেষণ করেই সেই তত্ত্বগুলির ধারণামূলক জ্ঞান লাভ করেন। কবি বা শিল্পী তাঁদের বিশেষ প্রতিভাবলে এই তত্ত্বগুলি

প্রত্যক্ষ করেন তাঁর জীবন ও জগতের অভিজ্ঞতায় এবং প্রকাশ করেন এমনসব বস্তুর প্রতিরূপায়ণের সাহায্যে— যেগুলি বাস্তব-জগতে সেই তত্ত্বগুলির নিত্য অনুষঙ্গ এবং যাদের মানস-প্রত্যক্ষে ও প্রসঙ্গে সেই তত্ত্বগুলির আভাস চিত্তে উদয় হয়।

শব্দ, অভিনয়, রেখা-রঙ, মূর্তি-গঠন বা ধ্বনি-সমাবেশের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের শিল্পী প্রকাশ করতে চান কোনো-না-কোনো ভাবকে এবং এই ভাবটি এবং তাদের প্রকাশক উপকরণগুলি সবই কোনো বাস্তব ভাব ও তাদের প্রকাশক-সহকারীদের প্রতিনিধিস্বরূপ— ভাবশরীরী। এই ভাবের ও বিভাব-অনুভাবের সাধারণীকৃতি। এই অবস্থায় সেই ভাব ও তার সহকারী আনুষঙ্গিক বস্তুসকল লৌকিক ভাবে পাঠক বা দর্শককে স্পর্শ করে না। তাদের একপ্রকার রূপান্তর ঘটে। কাব্য ও শিল্পে বাস্তব-জগতেরই ঘটে এক রূপান্তর— যাকে অন্যভাবে সাধারণীকৃতি বলা যায়। এ তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করতে প্রয়োজন ভাব ও বস্তুসকলের বাহ্য সত্তা স্বীকার করা। সেই সঙ্গে রসেরও ঐরূপ একটি সত্তা স্বীকার করতে হয়। এইখানে অভিনবের সঙ্গে আমাদের কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য দেখা যায়।

রসের আস্বাদনের ব্যাপারটির এই ভাবের সামান্যরূপী বাহ্যসত্তার ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা হতে পারে। রসপ্রতীতির মধ্যে যে একটি নিবিড় আত্মানুভূতির ভাবের কথা অভিনব বলেছেন (যা আমরাও স্বীকার করেছি)। অভিনবের ব্যাখ্যা-অনুসারে বিভাব অনুভাব -দ্বারা পরোক্ষভাবে কোনো ভাব উদ্বোধিত হয় তখনই যখন চিত্ত অতিশয় মননশীল এবং আত্মসচেতন অবস্থায় থাকে। লৌকিক ভাবোদ্রেকের ক্ষেত্রে চিত্ত জীবধর্মের তাগিদে ভাব-দ্বারা চালিত হয় এবং প্রয়োজন মতো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তখন সে ভাবকে মনন বা উপভোগ করতে পারে না। কাব্য, নাটক বা অন্যান্য শিল্প-সম্ভোগের সময় চিত্তের এই অন্তর্মুখিতা সহজবোধ্য। কারণ এ ক্ষেত্রে সম্ভোগকারীর সম্মুখে কোনো বাস্তব-বস্তু থাকে না এবং যা থাকে তার কিছুটা থাকে মানসচক্ষে আর কিছুটা মনন-সাহায্যে গ্রহণ করতে হয়। বর্ণিত বা অনুকৃত বস্তুসকলকে সক্রিয়ভাবে মানস-প্রত্যক্ষ করতে হয় এবং তাদের অন্তর্নিহিত বা ব্যঞ্জিত অর্থ বা ভাবগুলিকে তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। এখানে বুদ্ধি শিক্ষা সহানুভূতি ও মননকার্যের তৎপরতা প্রয়োজন এবং এসবই কাব্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ লাভের জন্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে কাব্য বা শিল্পকলার কোনো ভাবালোচনার সময়ে রসজ্ঞ ব্যক্তি যে আপন রসসত্তা বা আনন্দ-স্বরূপের আস্বাদকেও লাভ করেন এবং সেই ভাবটির দ্বারা নিজের চৈতন্যকে উপরঞ্জিত মনে করবেন তা স্বাভাবিক। রসপ্রতীতি অন্যান্য সাধারণ প্রতীতির (যেমন— বস্তু, গুণ ইত্যাদি) তুলনায় অত্যধিক আত্মসচেতনতাযুক্ত এ কথা আমরা স্বীকার করি এবং তার সুপ্রচুর ব্যাখ্যাও দিতে পারি কিন্তু তাই বলে 'রসপদার্থ' বলে কোনো বাহ্য-সত্তাকে অস্বীকার করার কারণ দেখি না। প্রতীতি হলে কোনো বাহ্যবস্তুর 'বিষয়'রূপে স্থিতি আবশ্যক— যার 'প্রতীতি হল' বলতে হয়। অভিনব এই প্রতীতি বা আস্বাদনের দিকটির উপর জোর যতটা দিয়েছেন— 'বিষয়বস্তু'র উপর ততটা নয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে কাব্য বা নাট্যে আমরা ভাবের বিশুদ্ধ জ্ঞান পাই না বরং পাই তার নিবিড় আত্মগত অনুভূতি— সুতরাং এ আমাদেরই চিত্তগত এক অভিব্যক্তি— এমন বলা যেতে পারে। এইরূপে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী কাব্য-মীমাংসকদের মতবাদের সংশোধন করেন। কিন্তু এ কথাও স্বীকার না করলে চলে না যে এই ভাবকে আমরা যে অবস্থায় পাই— তাকে ঠিক আপনার বা পরের বলতেও বাধে।

ভাবের এই সাধারণীকৃতি ব্যাপারটির কথা আমরা পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। সাধারণীভূত ভাবের মনন বা বিভাবনে ভাবটির ঠিক তাত্ত্বিক জ্ঞান হয় না— অথচ ভাবটির উদ্রেকঘটিত লৌকিক পরিচয়ও হয় না। এই দুই সীমান্তবর্তী অবস্থার মাঝামাঝি একটি ক্ষেত্রের কল্পনা তাই অপরিহার্য। এই জন্যই সাহিত্য-কলায় 'ভাব-বিভাবন' ও তার ফলে রসপ্রতীতি— এই দুইটি ব্যাপারকেই 'অলৌকিক' বলা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে অভিনবের রস-ব্যাখ্যা মূলতঃ যথার্থ হলেও কিছুটা বিতর্কের অবকাশ রাখে — কারণ তাঁর ব্যাখ্যার প্রবণতা কিছুটা বিজ্ঞানবাদী বা আত্মমুখী। এই দোষের কারণ তাঁর পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাগুলির অতিরিক্ত বিষয়নিষ্ঠা।

ভট্টলোল্লটের মতে প্রকৃত নায়ক বা তার অনুকর্তা নটের উপর আরোপিত স্থায়ীভাবের অলৌকিক সাক্ষাৎকার রসের কারণ এবং শঙ্কুকের মতে নটনিষ্ঠ স্থায়ীভাবের অনুমান এর কারণ। এই দুই ক্ষেত্রেই স্থায়ীভাবের জ্ঞানমূলক পরিচয় ঘটে এবং এর দ্বারা রসোদ্বোধের ব্যাখ্যা সম্ভব নয় কারণ এই বোধের একটি আন্তরিকতা আছে যা নিছক জ্ঞানধর্মী নয়। ভট্টনায়ক এই দিকটির প্রতি ন্যায়াচরণ করতে চাইলেন তাঁর 'ভোগীকৃতি'র ধারণাটির সাহায্যে। কিন্তু এইটির সবিশেষ ব্যাখ্যা না দিয়ে এটি চিত্তের একটি ধর্ম বলেই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এখানে এই প্রশ্ন ওঠে যে যার চিত্তে কোনো একটি ভাবের কোনোই সংস্কার নেই—তার সেই ভাবপ্রকাশক কাব্য বা নাটকপাঠে বা দর্শনে তেমন রসোদ্বোধ হবে কি? অভিনব বললেন—'হবে না'। এবং বাস্তবিকপক্ষে যে সকলেরই সবরকম রসোদ্বোধ অল্পবিস্তর ঘটিত হয়—তার কারণ হিসেবে বললেন: 'আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার বিদ্যমান এবং আমরা ইতিপূর্বে নানা বিচিত্র জীবন ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসেছি'।— সুতরাং অভিনব-দর্শনে রসোদ্বোধ হয় নিজেরই অন্তরের সুপ্তভাবের প্রকাশে এবং আস্বাদনে। কিন্তু এখানে যেমন তিনি যথার্থই ভট্টনায়কের মতটির সংশোধন করেছেন বলতে হবে— তেমন এ কথাও বলতে হবে যে তিনি একটু বেশি অন্যদিকে এগিয়ে গেছেন। সাহিত্য-শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভাবের সাধারণীকৃতি হয় তা ভট্টনায়ক ও অভিনব দুজনেই স্বীকার করেন। এখন সাধারণীভূত ভাবটি যেরূপে রসিকচিত্তে গৃহীত হয় এবং যাকে নৈর্ব্যক্তিক ও নিরাসক্তভাবে বিভাবিত বা মননীকৃত বলা হয় এবং যা লৌকিক ভাব-সম্ভোগ থেকে বিলক্ষণ— তার প্রতি লক্ষ রাখলে ভাবটিকে ঠিক রসিক-চিত্তের আত্মগত বা পরগত কিছুই বলা যায় না। ভাবটিকে আশ্রয়হীন ভাসমান বিজ্ঞান-পদার্থমাত্র বলা যায়। এ হেন ভাবের অনুভূতিকে একান্ত আত্মগত বা পরগত ব্যাপার বা দর্শনে বা যোগধ্যানে প্রাপ্য ভাবের তাত্ত্বিক জ্ঞান— কোনোটিই বলা যায় না। এই ভাবানুভূতিকে এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করতে হবে। ভাবের শৈল্পিক বা সৌন্দর্যগত উপলব্ধি বলা যেতে পারে। মোটকথা, অভিনবের রসব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্থকতা স্বীকার করেও আমাদের তার কিছুটা বিচার ও সংশোধনের অবকাশ রাখতে হবে।

গগনেন্দ্রনাথ

রেখার রঙের তীর হতে তীরে
ফিরেছিল তব মন
রূপের গভীরে হয়েছিল নিমগন।
গেল চলি তব জীবনের তরী
রেখার সীমার পার
অরূপ ছবির রহস্য মাঝে
অমল শুভ্রতার।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৭ - ১৯৩৮

সমর ভৌমিক

ইউরোপের ললিতকলার ইতিহাস নানারূপ সামাজিক ধর্মনৈতিক অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন ও সংঘাতে পুষ্ট। অবস্থার ব্যতিক্রম সত্ত্বেও সেখানকার শিল্পীদের আন্দোলনের মধ্যে একটা নিষ্ঠা ছিল যা বহুমুখী বিতর্কের মধ্যেও শিল্পীদের সত্যভাবে প্রণোদিত করেছিল। আজকের দিনে তাঁদের সাধনার ক্ষেত্রে যে সাফল্যের লক্ষণ দেখা যায় তা যে তাঁদের ঐকান্তিক উপলব্ধির ফল তাতে আর সন্দেহ কি।

আমাদের ললিতকলার ইতিহাসে দুটি প্রধান স্তর। শিল্পচিন্তার একটি স্তরকে monumentalism অন্যটিকে miniaturism বলা যেতে পারে। দুটি স্তরই প্রাণবান। কিন্তু প্রথানুগত বা ভাবগত দিক থেকে দুটি স্তর এত আলাদা যে এঁদের কোনো ধারাবাহিক বিচার চলে না। একটিকে বাদ দিয়ে আর-একটির বিচার করতে হয়। কাজেই আমাদের ইতিহাস একটু বিচ্ছিন্ন। আবার, সমকালীন ইউরোপের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন ভারতবর্ষের শিল্পচিন্তাকে যদি দেখা যায় তা হলে স্পষ্টভাবে আমাদের দুর্বলতাই চোখে পড়ে বেশি। আমাদের আসল পথ যে কি সে সম্বন্ধেই প্রচণ্ড সংশয়। স্বকীয় শক্তিকে বিচার করে দেখার মত স্নায়বিক সবলতার অভাবও এর কারণ বলা যেতে পারে।

এমনি লক্ষণাক্রান্ত একটা যুগে আদি ও মধ্যের সঙ্গে আধুনিকতার যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার ও বহুমুখিতার তুলনা নেই। কিন্তু আজকের এই ছোট দুনিয়ায় সমান্তরাল দৃষ্টিকোণ থেকে দেশ-বিদেশের শিল্পধারা আলোচনার সুযোগ যখন রয়েছে তখন অবনীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সমকালীন সমান্তরাল স্তরে স্থাপন করতে সংশয় হয়। সমকালীন শিল্পের একটা বিশেষ লক্ষণ হল এ নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং অদম্য। তাই অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে স্থায়ী ইতিহাস রচনা করা চলে কিন্তু আর্টের বৈদ্যুতিক-সক্রিয়তা তাঁর মধ্যে হয়তো পাওয়া যায় না। অবনীন্দ্রনাথের অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথের শিল্পধারায় আর্টের এই দিকটার উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যে যুগে গগনেন্দ্রনাথের জন্ম সে যুগে এ প্রয়াসই প্রথম। একটা বিশিষ্ট পারিবারিক পরিবেশে স্বদেশের আবহাওয়ায় মানুষ আধুনিক গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন চিন্তায় খাঁটি ভারতীয়। আধুনিক ভারতীয় চিন্তার দিগন্তটিকে তাই একসময় তিনি উজ্জ্বল করে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর কালের মানুষরা তাঁকে যথার্থ মর্যাদা দেন নি এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু এ কালেও কি তাঁর মর্যাদা স্থায়ী আসন পেয়েছে! প্রচণ্ড শক্তিতে অভিভূত হয়ে যখন আমরা পিকাসো, পল ক্লী, ম্যাক্স আরনেস্ট আর action painterদের নকলনবীশী করি, তাঁদের stuntকে যতখানি বড় করে দেখি শক্তিটাকে ততটা দেখি না। তাই এ দেশে একজন অবনীন্দ্রনাথ বা একজন গগনেন্দ্রনাথ যে কি উত্তরাধিকার রেখে গেলেন তা তলিয়ে দেখা দূরের কথা সাধারণ ভাবে নাড়াচাড়ার সময়ও আমরা পাই না।

ইউরোপে বলিষ্ঠরেখা ও সুবর্ণবর্ণের চর্চা হয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে। সমসাময়িক কালে আমাদের

চিন্তার দৈন্যের ফলে সেই বলিষ্ঠ রেখা ও স্থবর্ণবর্ণকেই আমাদের চিন্তার উপজীব্য করে তুলেছি, আত্মাটিকে নয়। গগনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আজ সে কথাই আগে মনে হয়। অন্ধতাবশত ইউরোপীয় প্রভাবকে আমরা যতখানি স্থান দিয়েছি, যত আলোচনা করেছি ততখানিই কি পেরেছি ইউরোপীয় সমাজে আমাদের স্থান করে নিতে। নকলনবীশীরও পুরস্কার যখন পাই বিনা দ্বিধায় তা নিয়ে আনন্দে মত্ত হই। চেষ্টা করলে এখানেও কারো নেতৃত্ব পেতে পারতাম, এ কথা ভাবি না।

গগনেন্দ্রনাথ চরম আধুনিক পথ ও মত আয়ত্ত করেছিলেন, আধুনিক চিত্ররচনার ক্ষেত্রে সমতল রচনা, রৈখিক আকৃতি -নির্ভরতা, বর্ণ ও বস্তু সংগঠন— এই প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। প্রাচীন শিল্পমালায় দেখি নানা ধরণের কাহিনীসমস্যা যেমন প্রকৃত শিল্পের নেতিবাচক দিকটিকে প্রবল করেছিল, তেমনি সব রকমের ব্যাকরণ ও উপকরণের সম্মিলিত রূপ ভাব ও ক্রিয়াকাণ্ডের দৈন্যকে প্রকট করে তুলেছিল। কিন্তু আধুনিকবাদ—যা হল সংক্ষিপ্ত সংহত এবং আকস্মিকের অবদান—তা ঐসব রচনা উপকরণগুলোকে শিল্পান্বিত করেছে। গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন এ দেশে সেই পথেরই পথিক ও উদ্গাতা। গগনেন্দ্রনাথের শিল্পকে বুঝতে হলে আধুনিক চিত্রের সমস্যা সম্বন্ধে একটা ধারণা হওয়া দরকার। আধুনিকতার সমস্যা অনেক—এ আজ ললিতকলা ও সাহিত্যের সূক্ষ্ম সীমা অতিক্রম করে ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজের অলিতে গলিতে প্রবিষ্ট। কিন্তু ললিতকলা ও সাহিত্যের ধর্ম এবং ব্যক্তি ও সমাজ -গত জীবনে আধুনিকতার ধর্ম এক নয়।

মননশীলতার ক্ষেত্রে, রূপ ও রসের রাজ্যে এর প্রকাশভঙ্গী স্বভাবতই জটিল। চিন্তার জগতে তো বটেই, সমতল রচনা, রৈখিক আকৃতি -নির্ভরতা, বর্ণ ও সংগঠনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পৃথক পৃথক ভাবে জটিলতার সৃষ্টিকারক শক্তি নিয়ে আধুনিকতা বিরাজমান। ক্ষণিকের সুখের বস্তু ভোগের চিন্তার ও স্বপ্নের জিনিসের মূল্যও এর কাছে অপরিসীম। তাই শিল্পপ্রকাশের ক্ষেত্রেও এর নানা মত ও পথ। কোনো বিশেষ রসের বা রূপের প্রবক্তাই এ যুগে জোর করে বলতে পারেন না—যা হল, এই চরম—এই শেষ; এর পর যা হবে সব এই ধারার বিশ্লেষণ বা নকল মাত্র। আবার আর-এক যুগ প্রকাশ করল তার চরম ইচ্ছা—দৃপ্তস্বরে জানাল, এও শেষ। এই যে একটার পর একটা শেষ আর তাদের চরম অবস্থা—এরা সবই সত্যই শেষ। প্রতিটি প্রবাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সত্য। অতএব বিচ্ছিন্নতা আধুনিকতার এক বিশেষ ধর্ম।

এক শতাব্দী আগেও ঐতিহাসিকগণ নির্ভুল রায় দিতে পারতেন, কিন্তু বিংশশতাব্দীর গোড়ার দিকে এমন-সব সাহিত্যরসিক ও শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁদের সৃষ্টির বিচার কেবল মাত্র ঐতিহাসিক বিশ্লেষণী পদ্ধতিতেই সম্ভব ছিল না, মনোজগতের গূঢ়তত্ত্ব, অতিপ্রাকৃত জগৎ, আকস্মিক ভাবে পাওয়া বস্তুর নিয়ত প্রবহমান ও পরিবর্তনশীল অধ্যায়গুলোরও বিচার প্রয়োজন ছিল। সমসাময়িক কালে শিল্প ও সাহিত্যের সমস্যা কত জটিল—যখন দেখি বিভ্রান্তি, অবাস্তবতা, শূন্যতা এগুলো সমস্ত এক-একটি অভিব্যক্তি। শিল্পরস-বিচারে তাই আগের ধারাবাহিকতা রাখা চলে না। যেমন ধরা যাক রচনার বিষয়বস্তু যদি এমন হয়—জলের কল, ফুলের গাছ আর যন্ত্রের কিছু ভাঙা অংশ। গতানুগতিকভাবে শিল্প বিচার করলে এই জিনিসগুলোর সঙ্গে পরস্পর সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন, কিন্তু সমতল ও পদার্থের উপর যদি জোর (emphasis) দেওয়া যায় তা হলে মোটামুটি ভাবে ঐ রচনার অর্থ এবং সৌন্দর্য আমাদের

কাছে স্পষ্ট হয়। এ জাতীয় রচনা বিচার কালে প্রতি পদে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। শিল্পী কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এঁকেছেন তাই আগে নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। বাঁধা পথে চলতে যাঁরা অভ্যস্ত লক্ষ্য হয়ত তাঁদের স্থির; কিন্তু জীবনের অসতর্ক মুহূর্তগুলো, যাতে এ কালের শিল্পীর রুচি তা বিচার করতে গেলে পাকা শিল্পীর মতো বিচারককেও স্পর্শ ধ্বনি ও বস্তু-কাতর হতে হবে। এই ব্যতিক্রমকে শুধুমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে বিচার করা চলবে না। 'পুষ্পে কীটে'র সৌন্দর্যটুকু উপলব্ধি করার জন্য দরকার আরও সহানুভূতি, দৃঢ় সংযোগ, ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি। শিল্পবিচারক আর শিল্পী আজ অনেক কাছের, অনেক ক্ষেত্রে দুজনে একই ব্যক্তি; অনেক ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ ও বিচারের পথ অনেক প্রশস্ত।

গগনেন্দ্রনাথ যে কালে জন্মেছিলেন সে কালে আমাদের দেশে এই জিনিসটাকে এ ভাবে নেওয়ার মতো মানসিক পরিণতি আসে নি। কাজেই তাঁর নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে যেমন তাঁর সংশয় ছিল তেমনি বিচারকেরও। কাজেই তাঁর যুগে তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়ন ঠিকমত হয় নি বললে চলে।

আধুনিকতার আর-একটা ব্যাখ্যা হতে পারে— নিছক বাস্তববাদ বা প্রাকৃতবাদ শিল্পমাধ্যমকে ছদ্মবেশ ধারণে সাহায্য করে, আধুনিকতার পর্যায়গুলো শিল্পকে শিল্পের দিকেই টেনে নিয়ে যায়। এ কথা কতখানি সত্য গগনেন্দ্রনাথের সৃজনশীল রচনা দেখলেই তা বুঝতে পারা যায়। কতকগুলো বঙ্কিম ও ঋজু রেখা যেন ঘনক ও বৃত্তের বাহু ভেদ করে বিচিত্রের অভিসারে যাত্রা করছে। নদী আঁকা-বাঁকা পথে চলতে চলতে যেমন অনেক ভাঙে আর গড়ে, অবশেষে সাগরে এসে বিলীন হয়, তেমনি একটা অনন্তের (timelessness) আভাস গগনেন্দ্র-চিত্রে পাওয়া যায়। এই মুহূর্তের পাওয়া, ক্ষণিকের প্রেম, আকস্মিক আঘাত ও বিস্মৃতি এ সমস্তই timeless বা চিরন্তন করার মধ্যে একটা অহেতুক আনন্দ আছে, অথচ তা অবিস্মরণীয়— হয়তো এমন আর কখনও হয় না বা আসে না। এই প্রকৃতি শিল্পের আধুনিকতার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। প্রাগৈতিহাসিক শিল্পে এ লক্ষণ দেখা যায়। এ যুগ এই লক্ষণকে সজ্ঞানে নিয়ে আর্টের মহত্ত্বকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। এইভাবে সংক্ষেপে আধুনিক শিল্পের লক্ষণগুলো প্রকাশ করা যায়।

ইউরোপীয় বিচারে আধুনিকতার নানা শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। আধুনিকতা সম্পর্কে ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসাবে প্লেটোর নাম উল্লেখ করা যায়। প্লেটো তাঁর শেষ সৃষ্টি 'Philebus'এ বলেছেন—

'I mean straight lines and curves and the surfaces or solid forms produced out of these by lathes and rulers and squares.'

তিনি আরও বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে কোনোটাই সুন্দর নয় অন্যান্য জিনিসের তুলনায়। কিন্তু একটা জিনিস ঠিক যে এগুলোর সৌন্দর্যের উপর এগুলোর ব্যবহারিক দিক নির্ভর করে না বা এগুলোর সৌন্দর্যের পারস্পরিক তুলনাও চলে না। কিন্তু স্বভাবত এগুলোর প্রয়োগ সুন্দর। প্লেটোর এই উক্তিতে কেবলমাত্র যে বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায় তা নয়, এগুলোর ব্যবহারিক দিক, প্রয়োগবিদ্যা এবং গণিতের আভাসও পাই। তবে ইউরোপে বাইজানণ্টাইন ও কিছু কিছু আদিবাসী শিল্পের মধ্যেই প্রথম পরিমিতির প্রয়োগ কার্যত পাওয়া যায়। এই দুই জাতের শিল্পই পরস্পরের পুষ্টিসাধন করেছে। অবশেষে আধুনিক কিউবিজমের জন্ম হয়েছে। এই কিউবিজম থেকে পরবর্তীকালে নানা শৈলীর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

গ্রীষ ব্রাক্ ওজেনফাণ্ট জিনারেট দিলাউনে মারকৌসিস মেটজিঙ্গার গ্লাইজেজ লেজার ও পিকাসো প্রভৃতি ফ্রান্সের ও জার্মানীর মার্ক, ফেইনিঙ্গার এবং বেউমেইস্টার প্রভৃতি শিল্পীরা—ফ্রান্সে পিকাসোর এবং জার্মানীতে কাণ্ডিনস্কির নেতৃত্বে কিউবিজমএর চর্চা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলতে কি ঘনক ও বৃত্ত, ঋজু ও বক্র রেখায় এঁরা যে বক্তব্য পেশ করছিলেন তাঁর মধ্যে ব্যক্তিত্বই মুখ্য উপজীব্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে কোনো আকৃতিকে যে কোনো সমতলে ভাঙার কৌশল তাঁরা জানতেন। কিন্তু ব্যক্তিত্ব সে দেশে কারুর শিল্পপ্রকাশকে আর-একজনের শিল্পপ্রকাশের সঙ্গে একাকার করে দেয় নি। কাজেই দৃঢ়তার সঙ্গে এঁদের প্রাধান্য এই বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়া যায়। জ্যামিতিক ছকের মধ্য দিয়ে অবচেতন মনের ভাষা ও দৃশ্যসমূহ তাদের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত রূপ লাভ করে। এখানে বস্তুর ও বর্ণের প্রক্ষেপণ শিল্পীনির্ভর; পূর্বকালের ও উত্তরকালের সমস্ত সম্পর্ক থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। নানা ধরণের বস্তু তার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে বর্ণ বা আকৃতির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভাবে একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হোক বা পরিণতি লাভ করুক, সে ভাবেই তাকে গ্রহণ করতে হবে। শিল্প হল শিল্পের জন্য— এই অনুভূতি আজকের দিনে সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

ইউরোপের দার্শনিকগণ বহু পূর্বে যে জিনিস উপলব্ধি করেছিলেন অত্যন্ত আধুনিক যুগে তথাকার শিল্পীরা তা কাজে লাগান। বাহির ও অন্তরপ্রকৃতির প্রতীকের দিক, দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিক অনেক পরে দৃশ্যচিত্রে আবির্ভূত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে বিলীনভাবে (sublime) এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় অপেক্ষাকৃত ঐতিহাসিক যুগে দৃশ্যচিত্রেই পাওয়া যায় যা নিয়ে ব্যাপক আলোচনার দরকার ছিল অথচ কোনো কালেই হয় নি। গগনেন্দ্রনাথ দেশের মাটি থেকেই তাঁর কল্পনার রসদ আহরণ করেছিলেন। এ কথাটাই না বোঝার ফলে আমরা গগনেন্দ্রনাথের যথার্থ মূল্যায়ন করার সুযোগ পাই নি মনে হয়। তাই যখনই ইউরোপীয় মানে তাঁকে বিচার করা হয় তখন কেবল যে তাঁকেই খাটো করে ফেলা হয় তাই নয় অতীতের সৃজনশীল কলাসৃষ্টির প্রতিও অবিচার করা হয়।

অজন্তার বাঘ গুহায় কিছু কিছু ম্যুরাল-পর্বতাবলীর ও স্থাপত্যের সন্নিবেশ দেখা যায়। এগুলোতে দূরত্ব বা নৈকট্য বোঝাবার জন্য সর্বক্ষেত্রে কতকগুলো কৌণিক, সমতল, গভীর বা স্বচ্ছ বর্ণের প্রলেপে সৃষ্টি করার প্রযত্ন দেখা যায়। ভারী ও হাল্কা বস্তুর পরিবেশন এবং সংস্থাপন লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া দেবদেবীর পরিকল্পনায়, তাঁদের অঙ্গসংস্থান ও বিকৃতির ব্যাপারে সেকালের শিল্পীদের কৌতূহল কম ছিল না। পটের দেবদেবীর মধ্যে জগন্নাথের প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে—এঁর অক্ষিগোলক ও চতুষ্কোণ ও আয়তক্ষেত্রাকৃতি দেহাবয়বের যে অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যাই থাকুক-না তা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে cubism ছাড়া আর কিছুই নয়। পটের ছবিতে যে নানা বর্ণের ফোঁটা সমতলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বিভিন্ন ভাব ও বর্ণের আভাস দেবার চেষ্টা দেখা যায় এটাকে অনায়াসে 'ধারণাবাদ' (impressionism) বলে আখ্যাত করা যায়। তা ছাড়া লৌকিক পটচিত্রের রচনাপদ্ধতি, মনুষ্য, বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, সময়, বর্ণ ও সমতলের বিকৃতি দেখেও অবাক হয়ে যেতে হয়। অথচ যাঁরা এই শিল্পসৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের না ছিল শিক্ষাদীক্ষা না ছিল অর্থানুকূল্য। উত্তরাধিকারসূত্রে এঁরা যুগের পর যুগ শুধুমাত্র আনন্দ জুগিয়েছেন। 'ধারণাবাদে'র শিল্পী হিসাবে কেউ পরিগণিত হন নি। উনবিংশ শতাব্দীর কালীঘাট চিত্রমালার প্রচার বিদেশী সমালোচকরা নিজেদের তাগিদেই করেছিলেন, তারই ফলে ইউরোপীয় আধুনিক চিত্রকররাও

ভীরু শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এগুলোর অত্যাশ্চর্য শক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত আধুনিক চিত্রকররা নিজস্ব ক্ষমতা দ্বারা এগুলোর উন্নতিসাধনে প্রয়াসী হন নিজেদের চিত্রেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। শুধুমাত্র কালীঘাট নয়, পৃথিবীর যাবতীয় অনগ্রসর জাতির অঙ্কিত চিত্রই ইউরোপীয় চিত্রকররা আয়ত্ত করে তাঁদের নব্যতা আমদানী করেছেন বলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। কিন্তু দুঃখের কথা এই, শিল্পীরা তাঁদের বক্তব্যে তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা উৎসসমূহের কাছে শুধুমাত্র প্রীতি জানিয়েছেন, জঠরের সন্তানের মতো গভীর মমতা, প্রেম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি।

আমরা পূর্বেই ভারতীয় ললিতকলাকে দুটি প্রধান স্তরে ভাগ করেছিলাম। এই দুটি স্তরে আর-একটি আধুনিকতার লক্ষণ দেখা যায় যা হল 'অতিরঞ্জন' (emphatic treatment)। কাহিনীর নায়ককে বা চিত্রের উপজীব্যকে বৃহদাকারে বা উচ্ছ্বসিত বর্ণ বা রেখায় কাছে টেনে আনা এবং অন্যান্য জীবিত বা নির্জীত রূপকে আকৃতিতে বর্ণে বা রেখায় দূরে সরিয়ে দেওয়ার আভাস অজন্তায় তো বটেই, মধ্যযুগের পশ্চিম-ভারতীয় জৈনচিত্র, রাজপুত ও মোগলচিত্র, পটচিত্র এবং লৌকিক আলপনায়ও অত্যন্ত স্পষ্ট। আধুনিকতার ক্ষেত্রে এই বিশেষ ব্যবহারের প্রতি অসামান্য মূল্য আরোপ করা হয়ে থাকে। আলো-আঁধারি রূপের মধ্যে সত্য আলোক (focal point) নির্ধারিত করার যে রীতি এখনকার শিল্পীরা অবলম্বন করে থাকেন তা বৈচিত্র্যের মধ্যে নতুন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে নতুন নয়, পূর্বোক্ত উদাহরণ দ্বারা এ কথা অনুমান করা কষ্টকর নয়।

সংগীত ভারতশিল্পের অনেক রসদ জুগিয়েছে। সুর থেকে নানা রৈখিক প্রতীক ও বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। মিশ্র ঘরানার সুরের থেকে পূর্ণ চিত্রের সৃষ্টি হয়েছে। সমসাময়িক কালে সংগীত বিষয় করে আমাদের শিল্পীরা অ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্র রচনা করে থাকেন। বিদেশী ঐকতানই অনেক ক্ষেত্রে এঁদের চিত্রের উপজীব্য বিষয় হয়ে ওঠে। এ দেশের প্রকৃতিতে যে সুর আছে, তার প্রতীক আছে— সেটা বুঝি খেয়াল হয় না।

শিল্প-ইতিহাসের প্রবক্তাদের কাছ থেকে ভারতশিল্পের যে আধুনিক লক্ষণগুলো উদ্ধার করা হল তার মর্ম অবনীন্দ্রনাথ এক জীবনে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি, অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ তাঁরই পাশে বসে নির্বিকার চিত্তে সেই অপঠিত সত্যগুলোর রূপ দিয়েছিলেন। একের তরঙ্গ অন্যকে আঘাত করে নি কিন্তু ভারতশিল্পের দুই মহাসমুদ্র পাশাপাশি চলেছেন। বিদেশী প্রভাব গগনেন্দ্রনাথকে প্ররোচিত করেছে বার বার কিন্তু স্বদেশব্রতী গগনেন্দ্র তাতে প্রলুব্ধ হন নি, পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার নিয়ে আধুনিক চিত্রজগতে নিঃসঙ্গ বিচরণ করেছেন।

গগনেন্দ্রনাথের শিল্পীজীবনের চারটি স্তর। এই স্তরগুলো গতানুগতিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীর শিল্পকর্মের মতো কোনো ধারাবাহিকতা, সমধর্মিতা বা ক্রমোন্নতি সূচিত করে না। প্রথম স্তর তাঁকে দিয়েছিল সাধারণ শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা (academic style), দ্বিতীয় স্তরে তাঁকে দেখতে পাই সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় (cartoonist), তৃতীয় স্তরে আবার এক অভূতপূর্ব অবস্থা (cubic style)— শিল্পী তাঁর ধ্যানের শেষ সর্গে উপনীত। আলো-আঁধারে ঘেরা এই স্তরে তিনি জীবনশিল্পী, শিল্পের বিধাতা। চতুর্থ স্তর যেন একটা pause, একটু থামা, পথ চলতে চলতে ফিরে তাকানো, সেই অবসরে প্রয়োজনের জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখা ; জীবনের রঙ্গমঞ্চে কোন্ মুহূর্তে যে আশা-আনন্দ, স্বপ্ন, মায়ার খেলার

অভিনয় আরম্ভ হবে তারই প্রস্তুতি (stage layout)। প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্তরে মূলগত ভাবে তাঁর সংশয়াচ্ছন্ন মানসিক অবস্থার কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। শিল্পীর জীবনের সে সময়ে দেশের এমন-একটা কাল যাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে পদে পদে ভয়, ভাবীকালের বিচারে হেরে যাওয়ার ভয়।

বর্তমানে এই সংশয়ের স্তরগুলো আলোচিত হল না। প্রত্যেকের জীবনে একটা স্বকীয়তা থাকে। সেই স্বকীয়তা হল গগনেন্দ্র-জীবনের তৃতীয় স্তর। যেখানে শিল্পীর আত্মা অন্ধকার ঘরে প্রদীপের আলোর মত মুক্তি পাচ্ছিল। শিল্পীর মন বাড়ির আনাচ-কানাচ, সিঁড়ি, বৃক্ষলতা, মানুষের দৈনন্দিন জীবন, হিমালয়, দেবতা পরমাত্মা কিছুকেই বাদ দেয় নি। চতুষ্কোণ আর বৃত্তকে ভেঙে (geometric এবং organic elements) রুক্ষতার সঙ্গে সজীবতা, আনন্দের সঙ্গে দুঃখ, আলোর সঙ্গে আঁধারের সংমিশ্রণে যে মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন বাকি তিন স্তরের সঙ্গে তার তুলনা কৈ।

পারিবারিক প্রতিবেশের জন্য সংগীত, কবিতার ঝংকার ও নাটকের প্রভাব তাঁর সমগ্র জীবনের বেদ এবং উপনিষদ। প্রতিটি চিত্র সাতটি সুরের শেষ পর্দা পর্যন্ত বাঁধা। সপ্তম পদে একটা অত্যুজ্জ্বল আলোক পরিলক্ষিত (high light) যার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে পদ্মসরোবরের অথৈ জলের নীচে সোনার কৌটো— তার মধ্যে মুক্তোর কৌটো— তার ভেতর হতে দৈত্যের প্রাণভ্রমরটিকে বের করে আনার সঙ্গে। ইংরাজিতে একে বলা চলে revelation। এ জাতীয় ছবির মধ্যে তাঁর 'মায়াপ্রদীপের' উল্লেখ করা যেতে পারে। যে পদার্থ দিয়েই যে কম্পজিশন গঠন করা হোক-না কেন প্রতিটি ধাপে রোমাঞ্চ হয় যে অতলগর্ভ থেকে প্রাণের আলোটি ক্রমশ মুক্তি পাচ্ছে। এই প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ হত না যদি না তিনি উপনিষদের সাধনাকে উপলব্ধি করতেন। আধুনিককালে উপনিষদের মন নিয়ে এ এক নৈর্ব্যক্তিক সাধনা (impersonal creativity)। নৈর্ব্যক্তিক না হলে চিরন্তন (timeless) করার অসুবিধাগুলি তিনি নিশ্চিতই উপলব্ধি করেছিলেন। আর একটি ছবি— শিল্পীর মৃত্যু— জনতার শিল্পীর মৃত্যু যেন, বিষাদের সাতটি সুরের দেওয়ালে সাতটি আলোকে প্রতিবিম্বিত ক'রে জড় ও মর জগতকে এক করে দিচ্ছে। এই একাত্মতা, ভূয়োদর্শন— ভারতীয় সাধনা। 'সাত ভাই চম্পা'তে আনন্দের সাতটি সুন্দর স্বর, প্রাণ, সাতটি রঙে ধরানো আর পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো। একটি জায়গাতেই যেন শিল্পী মনের সবখানি উজাড় ক'রে দিয়েছেন।

সমতল পর্দায় সমতল ভাবে স্তরবিন্যাস খাঁটি ভারতীয় চিত্রে দেখা যায়। স্তরগুলোর পাশে রেখার প্রাবল্য বিশেষ নেই, তবে গভীর বর্ণের ঘের আছে। এই ঘেরই হল গগনেন্দ্র-শিল্পজীবনে আঙ্গিকের দিক হতে সবচেয়ে বড় অবদান (depth charge)। ঘের দিয়ে যেন বিধাতার মতো তিনি তাঁর সর্বস্ব প্রাণ দিয়ে রক্ষা-করবার চেষ্টা করছেন।

চিত্ররচনায় বর্ণ ছাড়াও বিভিন্ন পদার্থের ব্যবহার আমরা আমাদের শিল্পশাস্ত্রে পাই। আজকাল constructivist শিল্পীদের কাজে নানা পদার্থের ব্যবহার দেখা যায়। গগনেন্দ্রনাথ কাগজ ছাড়া আর যেসমস্ত পদার্থ চিত্রকর্মে নিয়োজিত করেছিলেন সেগুলো হল— কাগজের পাটা, দস্তার পাত ও কাঠের পাটা। জলরঙ ছাড়া তিনি এঁকেছিলেন পেন্সিলে, সোনা ও রুপার তবক ও খনিজ রঙ দিয়ে। তাঁর আঁকা চিত্রগুলোর মধ্যে সাদা-কালোয় চিত্রই বেশি, তার পরেই রেখাপ্রধান চিত্রের (sketch ও portrait) স্থান।

আজ তাঁর জন্মশতপূর্তি-উৎসবে গগনেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয় পাশ্চাত্যের আর-এক জন প্রাজ্ঞ অথচ কর্মচঞ্চল শিল্পী পিকাসোকে, যাঁর শিল্পীজীবনেও সৃষ্টির চিন্তা বহুধাবিভক্ত হয়ে এসেছে, অবশেষে ইনি আজ একটি কি দুটি রেখার সাহায্যে তাঁর সৃষ্টিসমস্যা নিরসন করছেন। এখনকার জীবন তাঁর হয়ে উঠেছে রেখাপ্রধান। ক্যানভাসের উপর স্পন্দন। তাঁর বস্তুর ঘের হচ্ছে রেখার ঘের। গগনেন্দ্রনাথের হচ্ছে আবরণের ঘের। একজনের বিধাতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডময় অখণ্ড মণ্ডলাকার, আর-এক জনের কাল রেখা যেন বলে 'অয়মহম্ ভোঃ'। একজনের জীবনদীপ নির্বাপিত, আর-এক জনের সাধনা এখনও অব্যাহত। কোনো বিচারক নয়—জীবিত এই শিল্পীই বলতে পারবেন শিল্পের শেষ কোথায় কালো রেখায় না আবরণে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে পূর্ব ও পশ্চিমে দুই শিল্পী প্রায় একই সময়ে প্রায় সমান্তরাল দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখেছিলেন, অথচ এঁদের ব্যক্তিগত যোগ কিছুই ছিল না। ইউরোপের প্রবল আন্দোলনের সামনে গগনেন্দ্রনাথের কালের আন্দোলন যেন বন্যার মুখে তৃণ। তবু কত শক্তি তাঁর। এক শতাব্দী পরও তাঁকে আমরা স্মরণ করছি। তাঁর ক্ষমতা হয়তো আমরা অনুভব করতে শুরু করেছি। তাঁর আত্মা, দেশের আত্মা বর্তমান শিল্পীদের প্রাণে কাজ শুরু করেছে। ভুল করে যাকে ভুল ভাবা হয়েছে নিজেদের সংশোধন করে সে ভুল ভাঙার চেষ্টা শুরু হয়েছে।

জীবনের একাত্তর বছর বয়েস পর্যন্ত তিনি দু হাজারেরও বেশি রচনা রেখে গেছেন। তার মধ্যে মাত্র এক হাজারের মত চিত্রের খোঁজখবর আমাদের জানা আছে। বাকি সব তাঁর সংশয়ের দিনে, দুঃখের দিনে লুঠের বাতাসার মত হরিজনের কাছে পৌচেছে—যা কোনো দিনই হয়তো একালের গগনেন্দ্র-সচেতন শিল্পীরা দেখতে পাবেন না। গগনেন্দ্রনাথের চর্চা আজ পর্যন্ত মুষ্টিমেয় সুধীজন করে থাকেন। সম্পূর্ণ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে একদা তিনি যা উপলব্ধি করেছিলেন এই পরিবর্তনের কালে সে সম্বন্ধে সর্বাত্মক সচেতনতা এলে সত্যায় বলতে গেলে বিদেশীদের কাছে আমাদের মান বাড়বেই। ইউরোপ-আমেরিকার শিল্পীরা বড় বড় চিত্র আঁকেন এজন্য সেটা আমাদের অনুপ্রেরণা কতখানি দেয় জানি না তবে প্রলোভন আনে। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট। জলরঙে আঁকা চিত্রের মাধ্যমমূল্য (medium value) আপাতদৃষ্টিতে কম। এ কারণেও এর মূল্য নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের প্রক্ষেপণমূল্য (projection value) জানা ছিল না। যদি প্রক্ষেপণ করা যায় তা হলে নিশ্চয়ই বুঝব আকৃতি ছোট হলেও মূলতঃ তার প্রকাশভঙ্গী কত মহান (monumental), কত বিরাট পরিমণ্ডল নিয়ে তিনি তাঁর চিত্রের উপাদানকে ভেঙেছেন, কিন্তু এক জায়গায় ছুরির ফলার মতো ঝলকে বেরিয়ে গেছেন। এটাই হচ্ছে গগনেন্দ্রনাথের আর্ট।

ভারতশিল্পের একটা বৈশিষ্ট্য চিত্রের বিষয়বস্তুর সুন্দর উপস্থাপনে। সে জীবতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস, বীরগাথা, দৈনন্দিন জীবন, সমাজতত্ত্ব, ব্যঙ্গরস যাই হোক-না কেন। গগনেন্দ্রনাথের চিত্রদর্শনও সেই সুন্দরেরই দর্শন। সুন্দর জিনিসটা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে, অনেকে কুৎসিত ও বীভৎসতার মধ্যেও সুন্দরকে দেখেছেন। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথের সুন্দর সুন্দরই ; সুন্দরের প্রতীক।

মহাকবি ভাস

মনোমোহন ঘোষ

এ নশ্বর জগতে যশের স্থায়িত্ব যে কি পরিমাণে কালস্রোতের অধীন, তার এক মুখ্য দৃষ্টান্ত মহাকবি ভাস। তাঁর নাটকাবলীর গৌরব কালিদাসের নাটক রচনার আগে পর্যন্তও অটুট ছিল। অসামান্য কবিত্বশক্তি সত্বেও নাটক লিখে খ্যাতিলাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি তিনি; কারণ তখনো সেক্ষেত্রে প্রবল বাধা ছিল ভাসের মতো নামজাদা কবির রচনাবলী। এসকল জাজ্বল্যমান থাকতে কি শ্রোতারা আমল দিতে চাইবেন তাঁর মতো নূতন কবিকে? এ ধরণের আশঙ্কা নিয়েই তিনি লিখে-ছিলেন প্রথম নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র প্রস্তাবনা। সূত্রধার এই নাটকের অভিনয় ঘোষণা করতেই পারিপার্শ্বিক বলে উঠলেন:

"একটু থামুন, জানতে চাই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাস-সৌমিল্লক-কবিপুত্রাদির লেখা ফেলে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী কেন বর্তমান কবির রচনার সমাদর করছেন?"

উত্তরে সূত্রধার বললেন, "এ যে অবিবেচকের মতো কথা হল; দেখো—পুরানো হলেই ভালো হয় না সব কিছু, আর নূতন হলেই, হয় না তা নিন্দার। যাঁরা বিদ্বান্, পরীক্ষা করেই তাঁরা নিয়ে নেন দুয়ের একটিকে; আর মূঢ়তাগ্রস্ত যাঁরা, তাঁরাই পরের বুদ্ধিতে চলেন (এ ক্ষেত্রে)।"

কালিদাসের এহেন উক্তি হয়তো রূঢ়তার মতো শুনিয়েছিল সেকালের কারো কারো কানে; কিন্তু তা সত্বেও কাব্যলক্ষ্মীর বরমাল্যলাভে যে তাঁর বিলম্ব ঘটে নি, এ কথা আন্দাজ করলে বিশেষ ভুল হবে না। তার পর থেকে দেড় হাজার বছর ধরে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য হয়েছেন তিনি। আজও তাঁর যশ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যে মহাকবি ভাসের অসামান্য জনপ্রিয়তার কথা ভেবে তিনি নিজের খ্যাতিলাভ সম্বন্ধে ছিলেন শংকাকুল, সে-ভাসের রচনাবলী তার পর আস্তে আস্তে তলিয়ে গেল বিস্মৃতির অতল মহাসমুদ্রে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ভাসের অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ ছিল দু চারখানি গ্রন্থে উদ্ধৃত তাঁর রচনার ছিটে-ফোঁটা। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ, ১৯১২ সালে ত্রিবাঙ্কুরের পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী ভাসের রচনাবলীকে মুক্তি দিলেন তাদের সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাস থেকে। তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'স্বপ্নবাসবদত্তা' প্রমুখ নাটকাদি ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় যোজনা করল।

কেউ কেউ এখানে জিজ্ঞাসা করতে পারেন ভাস যদি এত বড়ো কবিই ছিলেন, তবে তিনি কালসমুদ্রে এমন করে তলিয়ে গেলেন কি করে? এ প্রশ্ন খুব যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু উত্তর মোটেই শক্ত নয়। কালে কালে লোকের রুচির হয় বদল। পুরাতন যতই ভালো হোক্ তার প্রতি অনুরাগ ক্রমেই হয়ে আসে বাধাগ্রস্ত। সত্যিকারের প্রতিভাযুক্ত নূতন লেখক শেষ পর্যন্ত তাঁর স্থানটি নিতে পারেন দখল করে। অবশ্য উঠ্‌তি লেখকদের নিতান্ত অসুবিধা এ দিক দিয়ে। যাঁরা কিছুকাল আগে থেকেই জনপ্রিয়তার গদি চেপে বসে আছেন, প্রশংসামুখর জনতা তাঁদের পাশে নবাগতকে সহসা স্থান দিতে ইচ্ছুক হয় না, তা তিনি যতই শক্তিমান হোন না কেন। সত্যিকারের যোগ্য এবং দরদী সমালোচক খুব সুলভ নয়;

এমন-কি কখনো কখনো অতি দুর্লভ। অথচ এই শ্রেণীর সমালোচকই কেবল পুরস্কৃত করতে পারেন নূতন সাহিত্যব্রতীকে।

যে ভাসের রচনা আমরা আলোচনা করতে বসেছি, তাঁর কালে তিনিও যে সুযোগ্য সমালোচক বেশি পান নি, এমন মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে; অবশ্য তিনি কোনো নাটকের (যে কখানি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে) প্রস্তাবনায় তার প্রসঙ্গও করেন নি, এবং এসকল প্রস্তাবনায় তাঁর নিজ নামেরও উল্লেখ নাই। তবু স্বপ্নবাসবদত্তার এক স্থলে তিনি বেশ সুকৌশলে এ সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত রেখে গেছেন বলে মনে হয়। চতুর্থ অঙ্কের শেষে বিদূষক যখন প্রাপ্ত সম্মানের প্রতিদানরূপে মগধরাজকে সম্মানিত করার উপদেশ দিয়েছেন, তার উত্তরে রাজা উদয়ন বললেন :

"এ সংসারে বিশাল গুণগ্রাম এবং গুণগ্রামের সমাদরকর্তা সর্বদা সুলভ; কিন্তু গুণ সমুদয়ের মূল্য বোঝেন এমন ব্যক্তি দুর্লভ।"

এমন অবস্থা সত্ত্বেও ভাস এত সুবিপুল খ্যাতিলাভ করেছিলেন যে, দীর্ঘকাল পরেও উদীয়মান নাট্যকার কালিদাস তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রীর মতে ভাসের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী বা তারও আগে। এ মত অগ্রাহ্য করার পক্ষে কোনো প্রবল যুক্তি নেই। অতএব মনে করা যেতে পারে যে, ভাসের নাটকগুলি কালিদাসের অন্যূন আটশো বছর আগে লেখা হয়েছিল এবং তাদের অসাধারণ নাট্যগুণের জন্যে এই সুদীর্ঘকাল ধরে ভাসের জনপ্রিয়তা বজায় ছিল।

নাটক লিখে দেশজোড়া নাম কিনবার উপায় কি, তা বলা শক্ত হলেও এ কথা সত্যি যে, কোনো জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে কলম ধরাই হল এর মুখ্য সোপান। কারণ, নাটকের ক্ষেত্রে লব্ধকীর্তি কালিদাস বলে গেছেন, "ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোকদের নানা উপায়ে এক জায়গায় সন্তুষ্ট করাই হল নাটকের কাজ।" এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অভিজ্ঞ সমালোচকদের মতে, শেকস্পীয়রের অসামান্য কৃতকার্যতার মূলে রয়েছে, জাতীয় আত্মাভিমানের পরিপোষক বহু ঐতিহাসিক নাটকের রচনা। আমাদের দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতির মূলও কি দেশপ্রেমের উদ্দীপনা নয়? কাজেই ভাসের অতুলনীয় নাট্যরচনার যশের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখতে হবে, কোন্ ভাব বা আদর্শ নিয়ে কলম চালিয়ে, তিনি তৎকালীন জনসাধারণের মনোহরণ করে-ছিলেন। একটু গভীরভাবে পড়লেই দেখা যাবে যে, তিনি তাঁর নাটকাদিতে পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শের উপরই জোর দিয়েছেন বেশির ভাগ। পতিপত্নীর মধুর সম্পর্ক, স্বামীর পক্ষে সকল স্ত্রীর প্রতি দাক্ষিণ্যপূর্ণ আচরণ, সপত্নীদের পরস্পরের প্রতি ভগিনীর মতো ব্যবহার, শ্বশুর শ্বশ্রূর প্রতি কেবল নারীর নয়, পুরুষেরও ভক্তি এবং সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণ ইত্যাদি পারিবারিক ব্যাপার ভাসের নাটকাদিতে বেশ নিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর, বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাজা ও মন্ত্রীদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, রাজার মঙ্গলের জন্য মন্ত্রীদের অনলস চেষ্টা ও ত্যাগস্বীকার, মন্ত্রীদের উপরও রাজার অসামান্য প্রীতি এবং বিশ্বাসের ভাব— এ সকলই বিশেষভাবে ভাসের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। নাটক রচনার বেলায় ভাসের উদয়ন কথামূলক নাটক দুখানির মূল্য সম্যক্ উপলব্ধি করতে হলে, এ কথা কয়েকটি মনে রেখেই এগুতে হবে।

তার পরেই বিচার্য ভাসের বিষয়বস্তু নির্বাচন। নাট্যকারদের কৃতকার্যতা এই বিষয় নির্বাচনের উপরও কম পরিমাণে নির্ভর করে না। আগেই বলা হয়েছে, জাতীয় ইতিহাসের প্রতি শেক্সপীয়র তথা আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল এই উভয়ের পক্ষপাত। অতএব বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্যে ভাস যে বেশির ভাগে

রামায়ণ ও মহাভারতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়। 'প্রতিমা' ও 'অভিষেক' নাটক লেখা হয় রামায়ণের কাহিনী নিয়ে; আর 'পঞ্চরাত্র' 'কর্ণভার' 'দূত-বাক্য' 'ঊরুভঙ্গ' 'মধ্যম ব্যায়োগ' এবং 'দূতঘটোৎকচ' মহাভারতের কাহিনী-সংসৃষ্ট। এ-সকল ছাড়া ভাস লোকপ্রচলিত পুরাণ-কাহিনী এবং গাথাকাব্য থেকেও নিজ নাটকাদির উপাদান সংগ্রহ করতে পিছপা হন নি। এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রথম পর্যায়ে পড়ে কৃষ্ণলীলামূলক কাহিনীগুচ্ছ, যা নিয়ে 'বালচরিত' রচিত। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে উদয়নকথামূলক নাটক দুখানি এবং 'অবিমারক'। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, 'বালচরিতের' জন্যে ভাস 'বিষ্ণুপুরাণ' বা 'হরিবংশে'র কাছেই ঋণী। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো দৃঢ় প্রমাণ নেই।

'স্বপ্নবাসবদত্তা' ও 'প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' নামক নাটকের কথাবস্তুর জন্যে ভাস, যে উদয়নকথার উপর নির্ভর করেছিলেন তা ইতিহাসমূলক। বৎসরাজ উদয়ন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে তাঁর শ্বশুর অবন্তীরাজ প্রদ্যোত ছিলেন ভগবান বুদ্ধের সমকালীন। কিরূপে অরণ্যপরিসরে স্থাপিত কৃত্রিম মহাগজ দেখিয়ে উজ্জয়িনীর মন্ত্রীপ্রযুক্ত চরেরা বীণাবিশারদ ও হস্তিশিক্ষাভিমানী রাজা উদয়নকে বন্দী করেছিল, এবং বন্দী রাজাকে উজ্জয়িনীরাজ নিজ কন্যা বাসবদত্তার বীণাশিক্ষার শিক্ষকত্ব গ্রহণ করিয়েছিলেন, আর কিরূপে নিজ মন্ত্রীদের সুকৌশল-চক্রান্তে উদয়ন অবশেষে রাজকুমারী বাসবদত্তাসহ দ্রুতগামী হাতিতে চড়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন এসকল রোম্যান্টিক ঘটনা নিয়ে নানা গাথাকাব্য সেকালে ছড়িয়েছিল সে অঞ্চলের লোকের মুখে মুখে। এই লোকায়ত গাথাগুলির জনপ্রিয়তা কালিদাসের কালেও একেবারে নিষ্প্রভ হয় নি। তাই তাঁর দূতকাব্যের যক্ষ, মেঘকে উজ্জয়িনী চেনাবার প্রসঙ্গে বলেছেন: "প্রাপ্যাবন্তীন্ উদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্—"। ভাসের পূর্বোল্লিখিত আবির্ভাব-কাল মনে রাখলে দেখা যাবে যে, প্রায় আট শো বছরেও উদয়নকথার মনোহারিত্ব একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি। কাজেই এ বিষয়ে ভাসের সুবিবেচনার প্রশংসা করতে হয়। তাঁর প্রৌঢ় লেখনীর মুখে নবকায় পরিগ্রহ ক'রে এই সর্বজনমনোরম কাহিনী যে সহজেই আপামর সাধারণের হৃদয়মন লুঠ করতে পেরেছিল তাতে সংশয়ের কোনো কারণ নেই।

বীণা বাজিয়ে গজরাজকে আয়ত্ত করতে গিয়ে রাজা উদয়ন প্রদ্যোতের পক্ষীয় লোকদের হাতে বন্দী হয়েছেন, কৌশাম্বীতে এই সংবাদ পৌছানো থেকে 'প্রতিজ্ঞা' নাটকের আরম্ভ। তার পর কৌশাম্বীর প্রচ্ছন্ন চরেরা উন্মাদবেশী মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের নেতৃত্বে কি করে বাসবদত্তাসহ উদয়নের পলায়ন সম্ভবপর করলেন, এবং যৌগন্ধরায়ণের বন্দীদশা, ও রাজা প্রদ্যোত কর্তৃক তাঁর সমাদর এবং মুক্তিবিধান, এই-সকল হল নাটকখানির বিষয়বস্তু।

উদয়নকথা থেকে মালমসলা সংগ্রহ করলেও ভাস 'স্বপ্নবাসবদত্তা'র কথাবস্তুতে কিছু কিছু রদবদল করেছিলেন নিশ্চয়। আমরা এই উদয়নকাহিনীর আদিরূপ জানতে না পারলেও এ অনুমানের কোনো বাধা নেই। যেহেতু সব ক্ষমতাবান লেখকই এরূপ পরিবর্তন করে থাকেন। তাই মনে হয় যে কাহিনীকে অবলম্বন করে ভাস নাটকখানি লিখেছিলেন তা ছিল এরূপ:

আরুণি নামে কোনো প্রবল শত্রুর আক্রমণে রাজা উদয়ন রাজধানী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে তাঁর রাজ্যের প্রান্তস্থিত লাবাণক গ্রামে বাস করছিলেন। তখন মন্ত্রীরা নূতন বিবাহসম্পর্ক দ্বারা রাজার শক্তিবৃদ্ধির কথা চিন্তা করলেন। কিন্তু রাজ্ঞী বাসবদত্তা বেঁচে থাকতে তা সম্ভবপর হবে না জেনে

তাঁরা এ সম্পর্কে এক কৌশল অবলম্বন করলেন। একদিন রাজা মৃগয়ায় গেলে তাঁরা রানী বাসবদত্তাকে সরিয়ে রেখে অস্থায়ী রাজভবন দিলেন পুড়িয়ে, আর প্রচার করলেন, গৃহদাহে রানী পুড়ে মরেছেন এবং তাঁকে উদ্ধার করতে গিয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণেরও হয়েছে সেই শোচনীয় গতি। তার পরে এই মন্ত্রী আবন্তিকাবেশিনী বাসবদত্তাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন মগধের এক তপোবনে। সেখানে ঘটনাক্রমে উপস্থিত ছিলেন মগধরাজ ভগিনী কুমারী পদ্মাবতী। যৌগন্ধরায়ণ এই বলে বাসবদত্তাকে রাজকুমারীর হাতে সমর্পণ করলেন যে, আবন্তিকা তাঁর ভগিনী ; নিরুদ্দিষ্ট স্বামী ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি পদ্মাবতীর আশ্রয়ে থাকবেন। এ দিকে বহু বিলাপের পর খানিকটা সুস্থ হয়ে রাজা উদয়ন, মন্ত্রীদের উপদেশে মগধরাজ দর্শকের রাজধানীতে গিয়ে হলেন উপস্থিত। তখন উদয়নকে রাজ্ঞীহীন জেনে রাজা দর্শক স্বীয় ভগিনীকে তাঁর হাতে সমর্পণের প্রস্তাব করলেন। আশ্রয়দাতার এই সমাদর প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না উদয়ন। তার পর অচিরকাল মধ্যে নিজ রাজ্য ফিরে পেলেন তিনি, মন্ত্রীদের চেষ্টায় ও মন্ত্রকৌশলে। এই হল স্বপ্নবাসবদত্তার মূল ইতিহাস।

এই নাটকখানির সমস্ত দৃশ্যই কল্পিত হয়েছে মগধে, বিশেষভাবে রাজ-অন্তঃপুরে। রাজ্ঞী বাসবদত্তা সেখানে ভাবী সপত্নী পদ্মাবতীকে পেয়েছিলেন কতকটা তার অভিভাবিকা রূপে, কতকটা সখীরূপে। এরূপ নাটকীয় অবস্থার পারিপার্শ্বিকে ঘটেছিল রাজা উদয়নের সঙ্গে মগধ-রাজকুমারী পদ্মাবতীর পরিণয়। এ সম্পর্কে সব চেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে, বাসবদত্তাকে নিজ সপত্নীর বিবাহ-অনুষ্ঠানের অঙ্গীয় 'কৌতুকমাল্য'ও গাঁথতে হয়েছিল। এ দিকে রাজা উদয়নের মনের অবস্থাও ছিল না খুব সুখকর। আশ্রয়প্রার্থীরূপে মগধের রাজসহোদরাকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েও তিনি বাসবদত্তার অতুলনীয় ভালোবাসা ভুলতে না পেরে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না। তার উপর বিদূষকের পীড়াপীড়িতে একদিন প্রমোদবনে বসে তাঁকে স্বীকার করতে হল, বাসবদত্তা সম্বন্ধে তাঁর স্থায়ী ও দৃঢ় পক্ষপাত। ঠিক তার কিছু আগেই আবন্তিকাবেশিনী বাসবদত্তাসহ পদ্মাবতী সে প্রমোদবনে ঢোকবার মুখে রাজা ও বিদূষককে দেখতে পেয়ে আড়ালে করছিলেন অপেক্ষা। বাসবদত্তা সম্বন্ধে রাজার স্বীকৃতি দুজনেরই গেল কানে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে সৃষ্টি করল সমান হৃদয়ালোড়ন। এমন-সব চমৎকার নাটকীয় ঘটনা-সংস্থানের মধ্য দিয়ে ভাস ফুটিয়ে তুলেছেন উদয়ন, বাসবদত্তা, পদ্মাবতী এবং তাঁদের সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যক্তির চরিত্রের বিচিত্র মহিমা। আখ্যানবস্তুর এমন সুকৌশল বিন্যাস খুব অল্পসংখ্যক নাট্যকারের রচনাতেই যায় দেখা।

বিষয়নির্বাচন এবং কথাবস্তু নির্মাণের পরেই আলোচ্য ভাসের চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্য। এ প্রসঙ্গে উদয়নকথামূলক নাটক দুখানির মধ্যে 'প্রতিজ্ঞা'ই প্রথম আলোচ্য। বীররসপ্রধান এ নাটকের বিষয় হচ্ছে উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত আর বৎস-রাজমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ এ দুই মুখ্য ব্যক্তির সুদৃঢ় ইচ্ছার অনিবার্য সংঘর্ষ। প্রদ্যোত নিজ সামরিক বলের জন্য পরম দৃপ্ত এবং সেই হেতু তাঁর উপাধি 'মহাসেন' অর্থাৎ দেবসেনাপতি স্কন্দ। অপর সব রাজারাই তাঁর কাছে নতমস্তক এবং তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থী, বাদে বৎসরাজ উদয়ন। এর কারণ, উদয়নের অদ্বিতীয় বংশমর্যাদা, অপর নানা গুণ এবং তাঁর সহায় যৌগন্ধরায়ণের মতো বিচক্ষণ মন্ত্রী। ঠিক এ-সকল কারণের জন্যেই, প্রদ্যোতের তাঁর সম্বন্ধে একটা আকর্ষণ ছিল। তাঁর অভিপ্রায় ছিল নিজ কন্যারত্ন বাসবদত্তাকে উদয়নের হস্তে সমর্পণ। অপর রাজগণ তাঁর কন্যাকে

প্রার্থনা করে দূত পাঠালেও বৎসরাজ ছিলেন এ সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। এ অবস্থা যে প্রদ্যোতের মতো বলশালী এবং মানী রাজার পক্ষে অসহ্য ছিল তা বলাই বাহুল্য। তাই তাঁর মন্ত্রীরা কৃত্রিম মহাগজের কথা উদয়নের কানে তুলে প্রতারণাপূর্বক তাঁকে বন্দী করে উজ্জয়িনীতে নিয়ে এলেন। এ দুঃসংবাদ কানে আসামাত্রই যৌগন্ধরায়ণ প্রতিজ্ঞা করলেন, "চাঁদ যেমন রাহুগ্রাসে পড়ে, রাজাও তেমনি হয়েছেন শত্রুবলের দ্বারা বন্দীকৃত; যদি তাঁকে আমি না ছাড়িয়ে আনি, তবে আমার নাম যৌগন্ধরায়ণ নয়।" নাটকের অন্তে দেখা যাবে যে এ প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হয় নি। পরাজয়ের গ্লানি ও অযশ থেকে মুক্ত করেছেন তিনি উদয়নকে। কিন্তু রাজা প্রদ্যোতের গৌরবও এতে ম্লান হয় নি। বন্দী উদয়নের কাছে যে তাঁর পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব তোলা হয় নি, তার কারণ প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা। তিনি এ বিষয়ে কৌশলের আশ্রয় নিলেন। বীণাবাদনে পারদর্শী উদয়নের নিকট প্রস্তাব করা হল যে তিনি যেন কুমারী বাসবদত্তাকে বীণা বাজাতে শেখান। স্বাভাবিক কারণে উদয়ন তাতে অসম্মত হলেন না।

ভাস এমন নিপুণতার সঙ্গে চরিত্র দুটি এঁকেছেন যে, তাতে দুই প্রধান ব্যক্তিই প্রায় সমান মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছেন। ভাসের এরূপ কৃতকার্যতার কারণ এই যে, মাঝে মাঝে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ সাধারণ মানুষের অনুভূত হৃদয়বৃত্তির খেলা দেখিয়ে তিনি তার সৃষ্ট বীররসের নাটককে সর্বজনের সমান উপভোগ্য করে তুলেছেন। এর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

'প্রতিজ্ঞা'র দ্বিতীয় অঙ্কে কাঞ্চুকীয় বাদরায়ণ যখন বললেন, "এমনি করে দিনের পর দিন সম্ভ্রান্ত রাজকুল থেকে কন্যার বিবাহ সম্পর্কে দূত আসছে। মহাসেন না করেন কাউকে প্রত্যাখ্যান, না করেন কাউকে অনুগ্রহ। এ কী রকম ?"

রাজা উত্তর দিলেন, "এক দিকে কাম্য বরের গুণাতিশয়ের প্রতি লক্ষ, অপর দিকে কন্যার প্রতি প্রবল স্নেহ; তাই আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি না।"

রাজা প্রদ্যোতের এ উত্তর, তাঁকে তাঁর যে-কোনো সাধারণ প্রজার পর্যায়ে এনে ফেলেছে। স্নেহশীল পিতা হিসাবে তিনি আর এক পৃথক শ্রেণীতে নন। রাজার এই চরিত্র স্ফুটতর হয়েছে তাঁর পরবর্তী কথোপকথনে :

রানী— বাসবদত্তা বীণা শিখতে চাইছে; তার জন্যে আচার্য চাই।

রাজা— মেয়ের এখন বিয়ের সময়; আচার্য এনে কি হবে? স্বামীই হবেন এ বিষয়ে তার আচার্য।

রানী— মেয়ের এখন বালিকা-কাল।

রাজা— বিয়ে দেওয়া হোক্, নিত্য এই বলে বলে এখন কেন দুঃখ পাচ্ছ ?

রানী— বিয়েতে আমার ইচ্ছা আছে; কিন্তু ছাড়াছাড়ি হবে ভেবে কষ্ট পাচ্ছি। আচ্ছা, কাকে দেওয়ার কথা ভাবছেন, মহারাজ ?

রাজা— এ বিষয়ে এখনো কিছু ঠিক করি নি।

রানী— এখনো করেন নি ?

রাজা— মেয়ের বিয়ে হয় নি বলে লজ্জা, আর দেওয়ার কথা হলেই দুঃখ। ধর্ম আর স্নেহের মাঝখানে প'ড়ে মায়েরা বড়ই দুঃখ পান। বাসবদত্তা এখন সর্বতোভাবে শ্বশুরপরিচর্যার উপযুক্ত হয়েছে—

মেয়ের বিয়ে নিয়ে পিতামাতার এ ধরণের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রায় সর্বজনীন। এ ক্ষেত্রে রাজারানী আর রাজারানী নন। সাধারণ গৃহস্থ-দম্পতির সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য যায় ঘুচে। স্নেহের সুর নরনারী নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয়বীণায়ই সমান সুরে বাজে। কেবল হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়ে নয়, আদর্শ অনুসরণের দিক দিয়েও রাজা প্রদ্যোত সাধারণ মানুষের পর্যায়ে। "বাসবদত্তা এখন সর্বতোভাবে শ্বশুর-পরিচর্যায় সমর্থ" এই কথাতেই তার প্রমাণ। ভাসের কালে সমাজের আদর্শ ই ছিল সব চেয়ে মনোযোগের বস্তু। রাজার মুখে কন্যার শ্বশুর-পরিচর্যার কথা দিয়ে, তিনি অগণিত জনসাধারণের কাছে এই আদর্শকেই মহীয়ান করে তুললেন। সেকালকার একান্নবর্তী পরিবারের যুগে এ আদর্শের কত প্রয়োজন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আগেই বলা হয়েছে যে, ভাসের অসামান্য জনপ্রিয়তার এক মুখ্য কারণ সামাজিক আদর্শের অকুণ্ঠিত অনুসরণ। রাজার রানী হবেন প্রদ্যোতের কন্যা, শত শত দাসদাসীতে পরিচর্যা করবে তাঁকে, তবু অন্য দশজনের মতো শ্বশুর-পরিচর্যা যে তাঁরও করণীয়, এ কথা ভাবতে তিনি ইতস্তত করেন নি। কারণ সাহিত্যিক রসদৃষ্টির সঙ্গে সমাজের কল্যাণ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, এই মহাসত্যটি ভাসের নিতান্ত হৃদ্গত ছিল।

এর পরেই আলোচ্য যৌগন্ধরায়ণ, যাঁর নাম নিয়ে লেখা হয়েছে এ নাটক। রাজা উদয়নের সুকৌশলে পলায়নের পর শেষাঙ্কে যখন হাতবাঁধা অবস্থায় যৌগন্ধরায়ণকে দেখা যাচ্ছে, তখন তিনি বলছেন, "শত্রুমধ্যগত বৎসরাজকে মুক্ত করে, অস্ত্র ভেঙে যাওয়ার ফলে বন্দী হয়েও, আমি সুখের সঙ্গে রাজভবনে প্রবেশ করছি; কারণ, প্রভুর দুঃখ দূর করতে পেরে আমার জয়ই হয়েছে। অহো, যারা বিপত্নীক, বনে যাওয়া তাদের পক্ষে সুখের; আর যাঁরা নিজ সঙ্কল্প সিদ্ধি করতে পেরেছেন, মৃত্যু তাঁদের পক্ষে আরও সুখকর, এবং যাঁরা ধর্মসঞ্চয় করেছেন, মৃত্যুতে তাঁদের অনুশোচনা নেই।"

তার পর রাজানুচরের দল এই অদ্ভুতকর্মা পুরুষকে দেখবার জন্য ভিড় করতে এলে যখন রক্ষীরা তাদের তাড়িয়ে দিতে চাইছিল, তখন তিনি বলছেন: "যারা আমাকে দেখতে চায়, তাদের বারণ করা উচিত হবে না। সাহসী রাজপুরুষেরা দেখুক আমাকে, যে স্বীয় রাজার প্রতি অনুরাগবশতঃ এরূপ বিপদগ্রস্ত হয়েছে। যাঁরা মনে মনে অমাত্যপদ কামনা করেন, আমাকে দেখে, হয় তাঁদের অভিলাষ দৃঢ় হোক, নয়তো একেবারে যাক চলে।"

নিজ প্রভুর মঙ্গলের জন্য এমন আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত যে যৌগন্ধরায়ণের চরিত্রকে সর্বজন-সমাদৃত করেছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ প্রভুভক্তি সমাজস্থিতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

এরূপ সামাজিক আদর্শের মহিমা ঘোষণা আরো উচ্চ গ্রামে পৌঁচেছে 'স্বপ্ন' নাটকে। পারিবারিক আদর্শের বিশুদ্ধি এবং মাধুর্য যে আন্তঃরাষ্ট্রিক ক্ষেত্রেও সমান মূল্য বহন করে, তা বেশ বোঝা যায় এ নাটকখানি থেকে। এ বিষয়ে প্রধান দৃষ্টান্ত এর শেষ অঙ্ক। উজ্জয়িনী থেকে দুইব্যক্তি রাজারানীর সন্দেশ নিয়ে এসেছেন এ খবর জেনে উদয়ন পদ্মাবতীকে ডেকে পাঠালেন। উদ্দেশ্য, পূর্বতন শ্বশুরকুলের সঙ্গে নূতন শ্বশুরকুলের সম্পর্ক যাতে সমান প্রীতিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে দুজনের সংলাপ বেশ অর্থপূর্ণ।

পদ্মাবতী— জ্ঞাতিকুলের খবর শুনব, সে তো আমার সৌভাগ্য।

রাজা— 'বাসবদত্তার স্বজন, আমারও স্বজন' এ তোমার যোগ্য কথাই হয়েছে। তা বোসো, বসছ না কেন ?

পদ্মাবতী— উপস্থিত ব্যক্তিরা মহারাজকে আমার সঙ্গে বসা দেখলে কি ভাববেন ?

রাজা— তাতে দোষ কি ?

পদ্মাবতী— আর্যপুত্রের অপর পত্নী দেখে তাঁরা উদাসীনের মতো হবেন।

রাজা— কিন্তু যাদের পক্ষে পত্নীকে দেখবার বাধা নেই, তাদের কাছে পত্নীকে প্রকাশ না করায় অনেক দোষ আসতে পারে। কাজেই বোসো।

তার পরে উজ্জয়িনীর কঞ্চুকীর সঙ্গে রাজা উদয়নের যে কথাবার্তা হয়েছিল তাও লক্ষ্য করার মতো।

রাজা— পৃথিবীর সকল রাজবংশের অধীশ্বর রাজা, যাঁকে আমি বান্ধব হিসাবে কামনা করে এসেছি, তিনি কুশলে আছেন তো ?

কঞ্চুকী— মহাসেন কুশলে আছেন বৈ কি। তিনিও এখানকার সর্বাঙ্গীণ কুশল জানতে চাইছেন।

রাজা (আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে) মহাসেন কি আদেশ করছেন ?

কঞ্চুকী— এ ব্যবহার বিদেহদৌহিত্রেরই উপযুক্ত। আসনে বসেই আপনি মহাসেনের সন্দেশ শুনতে পারেন।

পদ্মাবতীর সামনেও পূর্বতন শ্বশুরের সম্পর্কে উদয়নের এই সম্মানপূর্ণ ব্যবহারে তাঁর হৃদয়বত্তা এবং সুবিবেচনা প্রকাশ পেয়েছে। রাজা প্রদ্যোত সামাজিক ব্যবহারে কেবল তাঁর পিতৃস্থানীয় নন, পরন্তু প্রিয়তমা বাসবদত্তার জনক ; কাজেই এ সম্মান বাসবদত্তার প্রতি তাঁর গভীর প্রেমেরও নিদর্শন এবং খুবই স্বাভাবিক। অবন্তিরাজের কঞ্চুকী, রাজ্যপুনঃপ্রাপ্তির জন্য আনন্দ জ্ঞাপন করলে উদয়ন বললেন, "আর্য, এ-সকলই মহাসেনের প্রভাব। তিনি আমাকে নিজ পুত্রের মতোই দেখেন ; আমি তাঁর কন্যাকে হরণ করলেও তিনি যে আমাকে আত্মজন মনে করছেন, তাই আমার রাজ্য পুনরুদ্ধারের কারণ।

তার পর কঞ্চুকী রানীর প্রেরিত সন্দেশ নিবেদনের জন্যে বাসবদত্তার ধাত্রীকে পরিচয় করিয়ে দিলে, উদয়ন বললেন, "রাজার ষোড়শ মহিষীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আর পুণ্যময়ী নগরদেবতা-সদৃশী, এবং আমার রাজ্য-ভ্রংশের জন্য দুঃখিতা মাতা কুশলে আছেন তো ?

ধাত্রী— ভট্টিনীর শারীরিক কুশল, তিনিও মহারাজের সর্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন।

উদয়ন— মাতঃ, এই তো আমার কুশল।

ধাত্রী— এখন আর বেশি শোক করা উচিত নয়।

কাঞ্চুকীয়—আর্যপুত্র, ধৈর্যধারণ করুন ; আপনার এমন অনুকম্পা লাভ করে মহাসেন-দুহিতা মৃত হয়েও বেঁচে আছেন।

রাজা উদয়ন তার পর আবেগবশতঃ যখন বাসবদত্তা সম্পর্কে সুগভীর প্রীতির কথা উল্লেখ করে বললেন যে, মৃত্যুর পরেও তিনি তাঁকে ভুলতে পারবেন না, তখন বাসবদত্তার ধাত্রীর উক্তি :

"ভট্টিনী বলেছেন, 'বাসবদত্তা আর বেঁচে নেই। আমার বা মহাসেনের কাছে যেমন দুই ছেলে গোপাল আর পালক, তেমনি তুমি, আমাদের প্রথম অভিপ্রেত জামাতা। এ জন্যেই তোমাকে উজ্জয়িনীতে আনা হয়েছিল। অগ্নি সাক্ষী না করে বীণা শিক্ষার ছলে মেয়েকে তোমার হাতে

দিয়েছিলাম ; তোমার চপলতার জন্য বিবাহ অনুষ্ঠানের আগেই তুমি চলে গেলে। তার পর তোমাদের দুজনের ছবি আঁকিয়ে তার সাহায্যে বিবাহ কার্য সম্পাদন করেছি। এই সে চিত্রফলক ; তা দেখে তুমি মনে শান্তি পাবে'।"

উদয়ন তখন উত্তর করলেন, "এরূপ গভীর স্নেহের কথা কেবল তিনিই বলতে পারেন। তাঁর এই বাক্য শত রাজ্যলাভ থেকেও আমার প্রিয়তর, যেহেতু আমার মতো অপরাধীর প্রতিও তাঁর স্নেহ চলে যায় নি।"

এর পরে চিত্রফলক দেখে পদ্মাবতী কেমন করে আবন্তিকার প্রকৃত স্বরূপ জানলেন, যৌগন্ধরায়ণ কেমন নাটকীয় ভাবে এসে স্বীয় ভগিনী-পরিচয়ে প্রদত্ত আবন্তিকার প্রত্যর্পণ দাবি করলেন, এবং এ-সকলের মধ্য দিয়ে পুনর্মিলন হল সকলের, তাতেই রয়েছে ভাসের অপূর্ব নাট্যনির্মাণ-কৌশলের পরিচয়। কিন্তু ভাস সব চেয়ে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন পারিবারিক সম্পর্কের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ঐক্যবিধান করে।

প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিতে রাজাদের পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্কের অর্থ ছিল রাজনৈতিক, অথচ সর্বজনীন বিবাহের আদর্শ কেবল ধর্মমূলক এবং পরস্পরের স্নেহ ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নাটকে প্রায় অবলীলাক্রমে এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান করে ভাস এক অসাধ্যসাধন করে গিয়েছেন। ভাসের এই কৃতকার্যতার জন্যে তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার বলা যেতে পারে। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এমন নাম আর একটি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

ফ্রি ভার্স ও রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

একজন ফরাসী অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন[১]: 'আপনি বাঙলায় ফ্রি ভার্স রচনা করেছেন কি?' রবীন্দ্রনাথ উত্তরে বলেন: 'আমি অনেক ফ্রি ভার্স রচনা করেছি।' রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য একজন বিশিষ্ট সমালোচককে সংশয়াচ্ছন্ন করেছে।[২] রবীন্দ্রনাথ ফ্রি ভার্স বলতে কি বুঝিয়েছেন তা সমালোচকের কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। বলাকা, পলাতকা কিংবা পুনশ্চ কোন্ বইএর বিশেষ বিশেষ কবিতাগুলিকে ফ্রি ভার্স বলা যেতে পারে তাও সমালোচকের মতে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তাঁর মতে:' ওদের ফ্রি ভার্স প্রবোধচন্দ্রের মুক্তক নয়, গদ্যছন্দও নয়; ওদের ফ্রি ভার্স হলো মিশ্রছন্দ, যাতে একই কবিতায় একাধিক রকম ছন্দ স্থান পায়, কিংবা গদ্যপদ্য মেশানো থাকে।' এই কথা বলে তিনি যে কবিতাগুলি উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেগুলিতে এক এক পংক্তিতে এক এক রকমের ছন্দের সমাবেশ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর মত অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধে উদ্ধৃত একটি প্রাকৃত কবিতার কবিকৃত অনুবাদ এবং 'স্ফুলিঙ্গে'র দুটি কবিতা মিশ্রছন্দে অর্থাৎ ফ্রি ভার্সের ভঙ্গিতে লেখা।

উক্ত গদ্যকবিতার লক্ষণা দেবার আগে সমালোচক মন্তব্য করেছেন: 'এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, কোনো ইংরেজ বা ফরাসির কাছে ফ্রি ভার্সের যা অর্থ, তা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন নি।' কিন্তু ফ্রি ভার্স বলতে শুধু বিভিন্ন ছন্দের মিশ্রণ বা গদ্যপদ্যের মিশ্রণ বোঝায় না। ইংরেজের কাছে নয় ফরাসির কাছেও নয়। ফ্রি ভার্সের পরিষ্কার কোনো সংজ্ঞার্থ ইংরেজ বা ফরাসি দিতে না পারলেও (না দেওয়াই নিরাপদ বলে অনেকে মনে করেন) মোটামুটি কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণের ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁরা।[৩]

> First and most obvious, the lines will be of irregular length, and these variations in length will not occur in any definite pattern. While the staple may be something like length of the Standard English heroic line— ten syllables— there will be many short lines, and very likely some a great deal longer than any recognised in traditional versification.
>
> Secondly, many of these lines are not assignable to any recognised metrical scheme; we cannot label them iambics, trochaics, anapaests, or anything else. In extreme cases no line of any recognised verse-form appears at all; and there are who cherish the suspicion that what they are presented

---

১ ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ: প্রবোধচন্দ্র সেন। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২ সাহিত্যচর্চা: বুদ্ধদেব বসু: ১৩৬১। 'বাঙলাছন্দ' প্রবন্ধ: পৃ. ১৩২-৪ দ্রষ্টব্য।

৩ *Image and Experience*: Graham Hough: 1960। এই বইএর Free Verse প্রবন্ধ: পৃ. ৮৬ দ্রষ্টব্য।

with is simply prose printed in short lengths. This suspicion is regarded as shrewd and damaging by those who dislike free verse, and as callow and Philistine by those who approve it. And leaving value judgments out of it, it may turn out to have something in it after all. Thirdly, rhyme may be altogether absent ; or if it appears, it does so sporadically, in no regular pattern, and many lines are left blank.

গদ্যকবিতা সম্পর্কে আর-এক জন কবি তাঁর আলোচনায় ফরাসিদের বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন[৪] :

M. Dujardin then describes what the elements of the new verse, i.e. rhythm without metre, must logically be. Since the elements of the new verse can no longer be the syllabic feet of the metrical system, they must (he says) be rhythmic sense-units which are in revolt against them : and so (a) line of free verse is a grammatical unit or unity, made of accentual verbal units combining to a rhythmical import, complete in itself and sufficient in itself ; (b) the line may be various in length, and of any length, only not too long ; (c) the line is absolutely indifferent to syllabic numeration or construction apart from its own propiety of sense and pleasant movement ; (d) and being free from all metrical obligations, such as caesura, hiatus etc, these and all other artifices proper to metrical prosodies are forbidden to it.

এই উদ্ধৃতি থেকে ইংরেজ ও ফরাসিদের মনোভাব বিচার করলে দেখা যাবে যে ইংরেজরা ফ্রি ভার্সের ক্ষেত্রে ছন্দময় পংক্তিকে গ্রাহ্য করেছেন, তবে এ কথাও বলেছেন যে তাকে ভিত্তি করে বড়-ছোট নানা পংক্তির সমাবেশ হতে পারে, বা এমন পংক্তি থাকতে পারে যাকে ঠিক পরিচিত ছন্দ লক্ষণে ধরা যায় না, যা পদ্যের লক্ষণাক্রান্ত নয়। মিল থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। থাকলে মাঝে-মধ্যে-শেষে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত থাকবে। এই প্রসঙ্গেই টি. এস. এলিয়টের সংজ্ঞার্থের সার্থকতা খানিকটা বুঝতে সুবিধা হয়[৫] :

...there are two ways of coming at free verse— by starting with a conventional pattern and continually receding from it and by starting without any pattern at all and continually approaching some conventional one.

এই দিক থেকে বিচার করলে এলিয়টের 'Prufock'এ Jacobean blank verseএর ভিত্তিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে। লরেন্সের 'Snake' গদ্যের ছন্দস্পন্দ বা ধ্বনিস্পন্দ ছেড়ে প্রায়ই Iambic decasyllable ভিত্তিক blank verseএর দিকে ঝুঁকেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' ও 'পলাতকা'য়

৪ *Collected Essays, Papers of Robert Bridges:* **Oxford University Press** : 1930। পৃ. ৪২।

৫ *Image and Experience* : পৃ. ১০-১১।

বিশিষ্ট কলামাত্রিক ও দলমাত্রিক রীতির ভিত্তিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই ইংরেজি মতে এগুলি ফ্রি ভার্স।

কিন্তু ফরাসিদের যে মত দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় এ ব্যাপারে তাঁরা আরও বেশি মুক্তিলিপ্সু। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে। উদ্ধৃতিতে যে মুক্তছন্দকে বোঝানো হয়েছে তাকে ফরাসিতে বলে vers libre। ফরাসিতে আর-এক প্রকার ছন্দ আছে তাকে বলে vers libéré।[৬] সংক্ষেপে এই দুই রীতির সংজ্ঞার্থ দিয়ে পার্থক্য সূচিত হতে পারে: vers libre হল 'verse which is born free'। Vers libéré হল 'verse which has been liberated from some pre-existing chains'।[৬] কাজেই এই vers libéré ই হচ্ছে প্রচলিত ছন্দরীতিকে ভিত্তি করে মুক্তিপ্রাপ্ত গদ্যছন্দ। কাজেই রবীন্দ্রনাথের বলাকা বা পলাতকার ছন্দ ইংরেজি মতে free verse, ফরাসি মতে vers libéré। আর vers libre— উদ্ধৃতি থেকে প্রমাণ হবে যে তার মধ্যে rhythmic sense-unit ছাড়া কোনো প্রচলিত ছন্দরীতির নামগন্ধ নেই— পাওয়া যাবে 'লিপিকা'য়, পুনশ্চের বেশির ভাগ কবিতায়, এবং শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলীতে।

কাজেই ফরাসি ও ইংরেজের গদ্যছন্দ বিষয়ক মতামতগুলিকে সামগ্রিক বিচার করলে দেখা যায় যে প্রচলিত ছন্দকে ভিত্তি করে বৈচিত্র্যসৃষ্টি যেমন ফ্রি ভার্স, তেমনি ছন্দের নামগন্ধহীন স্পন্দনময় ধ্বনিযুক্ত sense-unitনির্ভর কাব্যও মুক্তছন্দের কাব্য বা ফ্রি ভার্স। ফরাসিতে যেমন vers libéré ও vers libreএর পার্থক্য মানা হয়, ইংরেজিতে তেমন মানা হয় না। ইংরেজিতে free verse বললে উভয়প্রকার মুক্তছন্দকেই বোঝানো হয়। এর কারণ আছে। ফরাসিতে ছন্দের বন্ধন ইংরেজির তুলনায় অনেক বেশি কঠিন বলে মানা হত। তাই ফরাসিতে ছন্দের মুক্তির ইতিহাসে verse libreএ পরিণতির আগের ধাপটিকে vers libéré বলে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে ছন্দ-মুক্তি এত কঠিন বাধা ঠেলে আসে নি। কাজেই ইংরেজিতে vers libéré কে আলাদা মর্যাদা দেওয়া হয় নি।[৭] Free verse কথার দ্বারা সমস্ত রকম ছন্দমুক্তিকেই বোঝানো হয়ে থাকে। যাই হোক, ফ্রি ভার্সের লক্ষণের যা পরিচয় আমরা পেলাম তাতে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা, 'মানসী'র নিষ্ফল কামনা কবিতায় যার সূচনা, 'বলাকা' ও 'পলাতকা'য় যার বিস্তার, 'লিপিকা' 'পুনশ্চ' 'শেষ সপ্তক' 'পত্রপুট' 'শ্যামলী'তে যার বৈচিত্র্য এবং জীবনের একেবারে শেষ পর্বে প্রবহমান ছন্দের আশ্চর্য কবিতাগুলির মধ্যে যার সমাপ্তি— তা সমস্তই ফ্রি ভার্স।

২

ইউরোপ ও আমেরিকায় এই নতুন কাব্যবাহন বা ফ্রি ভার্স অনুভূতিকে বিচিত্রভাবে প্রকাশ করবার উপায় হিসাবেই গৃহীত হয়েছিল এবং প্রতীক আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল। ফ্রি ভার্স রচনার এই নতুন প্রচেষ্টাকে সমর্থকগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই সমর্থকদের মধ্যে প্রায় সকলের রচনার সঙ্গেই

---

৬ *Image and Experience* : পৃ. ৮৭ এবং *Collected Essays, Papers of Robert Bridges* : পৃ. ৪১-৪২ দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের 'বাঙলা ছন্দের ক্রমবিকাশ', মহাজাতি প্রকাশক, ১৯৬২, পৃ ৬৫-৬৭ দ্রষ্টব্য

৭ এই প্রসঙ্গে Graham Hough এর Free Verse প্রবন্ধটির পৃ. ৮৭-৮৮ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথ অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলেন।[৮] গদ্যকাব্যের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যেসব কৈফিয়ত দিয়েছেন তার সঙ্গে এই সমর্থকদের কৈফিয়তের অনেক সাদৃশ্য আছে।

এই নতুন কাব্যবাহনের অন্যতম সমর্থক গুস্তাভ্ কাহ্ন্ এই ভঙ্গির মধ্যে নতুন সংগীত ও জটিল ভাবনার অনুরণন শুনেছিলেন (une musique plus complexe)। লাফোর্গ এই বাহনে পেয়েছিলেন মনোগত অভিপ্রায়ের নিকটতম প্রকাশের উপায়। মালার্মে কবিতার পোশাকি গাম্ভীর্য ছেড়ে কবিতাকে অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত করবার পথ দেখতে পেয়েছিলেন। এর কিছু আগে ভের্লেন একেবারে নিরেট গদ্যকবিতা (vers libre) পছন্দ করতে না পারলেও প্রচলিত ছন্দভিত্তিক মুক্তকের (vers libéré) মধ্য দিয়ে ছন্দ-ধ্বনিকে যথাসম্ভব ক্ষীণ, সংকুচিত বা দূরান্তরিত করবার চেষ্টায় ছিলেন। ইংল্যাণ্ডেও ইয়েট্সের প্রবন্ধগুলিতে ভের্লেনের কথার প্রতিধ্বনিরূপে শোনা গিয়েছিল 'faint, fluid, and tenuous kind of verse rhythm'এর সমর্থনের কথা, কাহ্নের 'নতুন সংগীতধ্বনি'র কথা। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে লেখা টি. ই. হিউমের আধুনিক কবিতা সম্পর্কিত এক রচনায় দেখা যায় কাহ্নের কথারই অনুসরণ। হিউমের স্বকৃত ব্যাখ্যায় নতুন ভঙ্গিকে গভীরতর মনোবিশ্লেষণের দর্পণ, ব্যক্তিগত অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত ও অধিকতর সুযোগ রূপে দেখানো হয়। অনেকটা মালার্মের কথারই প্রতিধ্বনি করে হিউম বলেন যে, প্রচলিত রীতির কবিতায় স্থায়িত্ব, চিরকালীন সত্য ও সৌন্দর্যের প্রতি কবিদের প্যাশান দেখা যায়, কিন্তু ফ্রি ভার্সে চলতি জীবনের চাঞ্চল্য* দেখতে পাওয়া যায়, উপরন্তু ব্যক্তিত্বচিহ্নিত ও অন্তরঙ্গতর অনুভূতি প্রকাশ করবার একটা নিরন্তর প্রচেষ্টা থাকে। এই ধরণের অন্তরঙ্গ ক্ষুদ্রায়তনিক কবিতাকে প্যাটার্নের মধ্যে বাঁধা ছোট শিশুকে লোহার ফ্রেমে আঁটার মতোই। পরে এজ্রা পাউণ্ডের গদ্যকবিতার সমর্থনের মধ্যেও লাফোর্গ ও মালার্মের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। ডি. এইচ. লরেন্স অন্যভাবে বললেও গদ্যকবিতা যে অন্তরঙ্গ অনুভূতির প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ— এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন।[১০]

গদ্যকবিতার সমর্থকদের এই কৈফিয়তগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা রচনার কৈফিয়তগুলির মিল বিশেষভাবেই আছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারে। কবি এক জায়গায় লিখছেন :[১১]

> কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তা হলে সাহিত্যসংসারের আলংকারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিকে অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময় যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচু নিচু বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো— কখনো ঘাসের উপর, কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

---

৮ ওয়াল্ট হুইট্ম্যানের কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আযৌবন পরিচিত। পরবর্তীকালে বহু আধুনিক কবির সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন তাঁদের কাব্যের মাধ্যমে বা ব্যক্তিগতভাবে। বহু আধুনিক কবিতার সংকলন তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে ছিল। তার কিছু এখন বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে আছে। এ সম্পর্কে পৃথক আলোচনা হতে পারে।

৯ 'পুনশ্চ' কাব্যের 'নাটক' কবিতার শেষাংশ স্মরণীয়।

১০ লরেন্স *New Poems* (New York, 1920)এর ভূমিকায় এক জায়গায় বলেছেন : '...in free verse we look for the insurgent naked throb of instant moment.' —Selected Literary Criticism, 1955 Page 88

১১ ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা চিঠি। দেওয়ালি ১৩৩৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড, ১৩৫৩। পৃ ৪২১।

এই উক্তির মধ্যে কবি যে অভিপ্রায়ের কথা বলেছেন তা হচ্ছে ইউরোপীয় গদ্য কবিতার সমর্থকদের কথিত 'নতুন সংগীত'।

ওই চিঠিতেই অন্যত্র কবি লিখছেন :

> যে সংসারটা প্রতিদিনের, অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলেছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না তাকে কাব্য-শ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেই জন্যই চারিত্রশক্তি আছে।

এই উক্তির মধ্যেও মালার্মে ও হিউমের চলতি জীবনের চাঞ্চল্যকে প্রকাশ করবার যে অভিপ্রায় তাই প্রকাশ পেয়েছে। ওই চিঠির আর-এক জায়গায় কবি বলছেন :

> সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদ্‌জনক হবেই এমন আশঙ্কা করি নে। এমনকি বাম দিক থেকে রুনুঝুনু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটের উপর বেশভূষাটা হল আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধারীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হল এই যে, উভয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সংসারযাত্রার বৈচিত্র্য সহজ রূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানাভাবে দেখা দিতে লাগলো।

এই উক্তির মধ্যে প্রাত্যহিকতা, ছন্দের ক্ষীণ দূরশ্রুত আভাস ('বাম দিক থেকে রুনুঝুনু…'), প্রকাশের ভাষায় আটপৌরে সহজ রূপ (spontaneity) ও ব্যক্তিগত মনোভাব প্রকাশের নানা বৈচিত্র্য ('স্থূল সূক্ষ্ম নানাভাবে')— গদ্যকাব্য-সমর্থকদের উক্তির মধ্যেকার সব কটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।[১২]

'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন :

> গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না।…

এই উক্তির মধ্যে 'a slighter and more hesitant rhythm' ভ্যের্লেনের এই অন্বিষ্ট সত্যেরই আভাস পাওয়া যায়।

কাজেই কোনো সন্দেহ নেই গদ্যকাব্যের কবিদের ও তাঁদের কৈফিয়তগুলি তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে, প্রভাবিত করেছে। ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান, এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, এমি লাওয়েল, এড়ুইন আর্লিংটন রবিনসন, অরিক জন্‌স্ ইত্যাদির গদ্যকবিতার তিনি অনুবাদ করেছেন। আর্থার ওয়েলির চীনা কবিতাসংকলন গদ্যকাব্য সম্পর্কে তাঁকে নিঃসংশয় করেছে। এ ছাড়া বাইবেলের অনুবাদ, তার মধ্যেকার সলোমনের

---

১২ *New Poems*এর ভূমিকায় লরেন্স যেসব কথা বলেছেন তার অনেক কিছুর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলি মেলে। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'প্রাত্যহিকতা' তাকেই লরেন্স বলেছেন : 'The pure present' বা 'the instant'। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন সহজ রূপ, লরেন্স তাকে বলেছেন : 'Spontaneous and flexible as a flame'। রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলছেন : 'স্থূল সূক্ষ্ম নানাভাবে', লরেন্স বলেছেন সেখানে : 'That utterance rushes out without artificial form or artificial smoothness'।

গান ও ডেভিডের গাথার কাব্যরসের কথা তিনি বলেছেন, আমাদের দেশের উপনিষদ-সাহিত্যের গদ্যকাব্যরস ও সংস্কৃত গদ্যকাব্যও যে এ ব্যাপারে আদর্শ হতে পারে এ কথাও জানিয়েছেন। সমসাময়িক ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যে ছন্দ পরীক্ষা বা ছন্দে স্বাধীনতা গ্রহণ করবার যে চেষ্টা সর্বক্ষণ চলেছে তার সম্বন্ধে কবি যে ওয়াকিবহাল থাকতেন তার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে একটি চিঠি উদ্ধার করে। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন[১৩] :

> ইদানীং দেখছি, গদ্য আর রাস মানছে না, অনেক সময় দেখি তার পিঠের উপর সেই সওয়ারটিই নেই যার জন্যে তার খাতির। ছন্দের বাঁধা সীমা যেখানে লুপ্ত সেখানে সংগত সীমা যে কোথায় সে তো আইনের দোহাই দিয়ে বোঝবার জো নেই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই বাঁধন ছাড়ার বিধান আপনি গড়ে উঠবে— এর মধ্যে আমার অভিরুচিকে আমি প্রাধান্য দিতে চাই নে। নানারকম পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠছে। সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা আদর্শ ক্রমে দাঁড়িয়ে যাবে। আধুনিক ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে এই পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।

৩

গদ্যকবিতার উদ্দেশ্যগুলিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে কবি একটি কথা বলেছেন যা উল্লিখিত গদ্যকাব্যের সমর্থকদের উক্তির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য গুস্তাভ কাহ্ন্-এর 'নতুন সংগীত' কথাটিকে একটু বৃহত্তর অর্থে নিলে কবির সে কথাটিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সে হল 'পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি' ত্যাগ করে প্রকাশের মধ্যে একটা 'বলিষ্ঠতা' 'দুরন্তপনা' 'পৌরুষ' আনবার চেষ্টা। কবি 'টবের কবিতা'কে রোপণ করতে চেয়েছিলেন মাটিতে। 'আভিজাত্যের স্বর্ণাসন' ভেঙে দুরন্ত নাচের জায়গা করে নিতে চেয়েছিলেন ('শেষ সপ্তক', পঁচিশ নম্বর কবিতা) কবিতার কোমল বনিতার রূপকে অগ্রাহ্য ক'রে তাকে বীরাঙ্গনা রূপে সাজাতে চেয়েছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি বলছেন[১৪] :

> গদ্যের প্রতি গদ্যের সম্মান রক্ষা করে চলা উচিত। পুরুষকে সুন্দরী রমণীর মতো ব্যবহার করলে তার মর্যাদাহানি হয়। পুরুষেরও সৌন্দর্য আছে, সে মেয়ের সৌন্দর্য নয়— এই সহজ কথাটা বলবার প্রয়াস পেয়েছি পরবর্তী কবিতাগুলিতে।[১৫]

অন্য আরেকটি চিঠিতে লিখছেন :

> বক্ষ্যমাণ কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষসহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে বলেই ভরসা করেছিলুম।

কতকগুলি কবিতায় এই বলিষ্ঠতা— মাংসপেশী বহুলতা সত্যই লক্ষণীয়। তুলনার জন্য একই বর্ণনীয় বিষয়ের ওপর দুটি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি 'কল্পনা' কাব্যের বহুপরিচিত 'বর্ষশেষ'

---

১৩ শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষকে লেখা চিঠি। ২৮ আশ্বিন ১৩৪৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী একবিংশ খণ্ড, ১৩৫৩। পৃ ৪২৫।

১৪ ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা চিঠি। ২৬ আশ্বিন ১৩৩৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড, ১৩৫৩। পৃ ৪১৮।

১৫ ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা চিঠি। দেওয়ালি ১৩৩৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড, ১৩৫৩। পৃ ৪২০।

কবিতা, অপরটি 'পত্রপুটে'র ৯-সংখ্যক কবিতা।[১৬] ছন্দোবদ্ধ কবিতা 'বর্ষশেষে'র রূঢ় রূপান্তর হল পত্রপুটের গদ্য-কবিতাটি। এই দুটি কবিতার মধ্যেকার প্রস্ফুটিত ছবি দুটির তুলনা করলে বোঝা যাবে, প্রথম কবিতাটির তুলনায় দ্বিতীয় কবিতাটিতে 'সংগীতের রসকে পরুষের স্পর্শে ফেনায়িত উগ্রতা দেওয়া' হয়েছে। এই পৌরুষের কথা বলতে গিয়ে কবি লিখছেন: '…গদ্যকে কাব্য হতে হবে। গদ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাব্য পর্যন্ত পৌঁছল না, এটা শোচনীয়। দেবসেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তা হলে শুম্ভনিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না।…(বাংলাদেশের ময়ূরে-চড়া কার্তিকটিকে সম্পূর্ণ ভোলবার চেষ্টা করো)।[১৭] অর্থাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট গদ্য কবির কাছে পালোয়ানরূপী কার্তিক অথবা ময়ূরে-চড়া কার্তিক।

প্রকৃতপক্ষে গদ্যকাব্যের শক্তির প্রতীক হল 'বর্ষশেষ' কবিতার সেই কুমার—'সদ্যোজাত মহাবীর'[১৮] যিনি হাস্যমুখে ধনুকে টান দিয়ে সুতীব্র ঝংকার তোলেন। কবির কথায় "তাঁর 'পৌরুষ' যখন 'কমনীয়তা'র সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখনই তিনি দেবসাহিত্যে গদ্যকাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন।"[১৯]

১৬ 'বর্ষশেষ' কবিতার প্রথম দুটি স্তবকের আংশিক উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া—
হানি দীর্ঘধারা।…
ধূসর পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় উর্ধ্বমুখে,
ছুটে চলে চাষি—
ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি—
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখি।

পত্রপুটের ৯-সংখ্যক কবিতা থেকে তুলনার জন্য আংশিক উদ্ধার করছি :

হেঁকে উঠলো ঝড়,
লাগাল প্রচণ্ড তাড়া,
সূর্যাস্তসীমার রঙিন পাঁচিল ডিঙিয়ে
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ভিড়,
বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুন-লাগা হাতিশালা থেকে
গাঁ গাঁ শব্দে ছুটছে ঐরাবতের কালো কালো শাবক শুঁড় আছড়িয়ে।
মেঘের গায়ে গায়ে দগ্‌দগ্‌ করছে লাল আলো,
তার ছিন্নত্বকের রক্তলেখা। ইত্যাদি।

১৭ ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা চিঠি। ১৭ মে ১৯৩৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড, ১৩৫৩। পৃ ৪২৪।

১৮ 'বর্ষশেষ' কবিতায় আছে : 'সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বহন'
'হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান।'

Gaganendranath Tagore. রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি · কলিকাতা ৭, আসাম বুক ডিপো. কলিকাতা ৯। পঁচিশ টাকা

পৃথিবীর শিল্প-ইতিহাসে দেখা যায় যে সময়ে সময়ে এমন এক-এক শিল্পীর উদ্ভব হয়ে থাকে যাঁদের অভ্যুত্থান চিরাচরিত শিল্পপথের অনুসরণে হয় নি। এই শিল্পীদের এমনও বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাঁদের জীবনে বহু বিলম্বে ও অপ্রত্যাশিতভাবে শিল্পসৃজন-ক্ষমতা উপলব্ধ হয়েছিল এবং তার পর থেকে তাঁদের রূপসৃষ্টির ধারা অব্যাহত প্রবাহিত থেকেছে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত। ভ্যানগগ্, গগ্যাঁ, আঁরি রুশো, গ্র্যাণ্ড মা মোজেস প্রভৃতি ছিলেন এই ধরণের শিল্পী। এই শিল্পীদের অনেকের রচনার বর্ধন কোনো বিশিষ্ট শিল্পভাবধারাকে অবলম্বন করে হয় নি, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধরণের শিল্পীদের রচনাকে পরিচিত শিল্পধারা বা শিল্পান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার উদাহরণ শিল্প ইতিহাসে বিরল নয়।

নব্যবঙ্গীয় শিল্পধারার জনক হিসাবে আমরা পেয়েছি শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর বহু সুযোগ্য শিষ্য হয়েছিলেন এই শিল্পধারার সক্রিয় পরিবাহক। কালে হয়তো অবনীন্দ্রনাথের অগ্রজ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথকে এই শিল্পধারার অন্যতম হোতা হিসাবে পরিচিতি দেওয়া হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই শিল্পধারার একই সময়ে ও পরিসরে সৃষ্ট ব্যতীত গগনেন্দ্রনাথের রচনাকে নব্যবঙ্গীয় শিল্পধারার সঙ্গে তুলনা বা সম্পর্কের বাস্তব স্বীকৃতি তৈরি করা যায় না।

সাহিত্য সংগীত নাটক শিল্পাদি পরিবৃত ঠাকুরপরিবারে যৌবনে গগনেন্দ্রনাথের এক নিপুণ অভিনেতা ছাড়া তাঁর প্রতিভার বিকাশে অন্যকিছু দেখা যায় নি। তাঁর মধ্যে যে সুদক্ষ চিত্রশিল্পীর সম্ভাবনা নিহিত আছে এর উপলব্ধি এবং তাঁর রচনার গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটে গগনেন্দ্রনাথের বেশ পরিণত বয়সে। তাঁর চৈতন্য-জীবন চিত্রাবলী ও কয়েকটি নিসর্গ চিত্রে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রধর্মের কিছুটা সাদৃশ্য দেখা গেলেও সেগুলিকে তাঁর ভ্রাতার রচনার প্রত্যক্ষ প্রভাব বলা চলে না। সেগুলি অবনীন্দ্র প্রবর্তিত চিত্রধারার সঙ্গে পরোক্ষ সংলাপের আভাসমাত্র বহন করছে বলাই সংগত।

গগনেন্দ্রনাথের রচনাবলীকে চারটি বিশিষ্ট অধ্যায়ে অনায়াসে ভাগ করা যায়, যথা: রেখাময় প্রতিকৃতি, নব্যবঙ্গীয় শিল্পধারাদ্যোতক চিত্রাবলী, জ্যামিতিক নকশায় সাজানো সাদা কালো বা রঙীন ছবি এবং সমাজ-সংস্কারক ব্যঙ্গচিত্রগুলি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি কেবলমাত্র এর যে-কোনো একটি অধ্যায়কে অবলম্বন করে রূপসৃষ্টি করে গেলেও চিত্রজগতে তাঁর সম্মান কিছুমাত্র খর্ব হত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের ভাবধারা ও চিত্ররূপ বর্তমান ভারতীয় শিল্পীদের ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত করেছে এবং এর আগামনীকে যেন গগনেন্দ্রনাথ অনাগত সময়ে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন এবং এই শিল্পপথের নিশানাকে যেন তাঁর তথাকথিত কিউবিস্টধর্মী রচনাগুলিতে চিহ্নিত দেখা যায়। এই শতাব্দীর ভারতীয় শিল্প-ইতিহাস যখন সঠিকভাবে লিখিত হবে তাতে এ যুগের এক বিশিষ্ট শিল্পনায়ক হিসাবে গগনেন্দ্রনাথকে যে গুরুত্বপূর্ব নিবন্ধে প্রতিষ্ঠিত করা হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর শিল্পের উপযুক্ত সমাদর ও উপলব্ধিকারীলিখিত ও চিত্রিত কোনো বিবরণী বিশেষভাবে আজও প্রকাশ করা হয় নি। সেইজন্য রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি ও আসাম

বুক ডিপো কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত গগনেন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর প্রতিলিপি-সম্বলিত বইটি প্রশংসনীয় উদ্যম বলতে হয়। এই গ্রন্থে তাঁর রচনা সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ একটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই পুস্তকের কতকগুলি প্রতিলিপির অতি খর্বায়তন অন্য প্রিন্টগুলির তুলনায় কিছুটা বিসদৃশ দেখায়। সবুজাভ কাগজের মাউণ্টএ পড়ে অনেক প্রতিলিপির বর্ণমান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এগুলি সাদাটে কাগজের উপরে দিলে আরো নয়নরঞ্জক হতে পারত। প্রতিলিপির সূচীতে মূল রচনার আয়তন উল্লেখ করা থাকলে ভালো হত। কিন্তু পুস্তকের শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠায় শিল্পীর মুখ্যরচনাবলীর বিশদ তালিকাটি প্রকাশকদের যে অতি প্রশংসনীয় পরিকল্পনা যে বিষয়ে নিশ্চয়ই দ্বিমত থাকবে না। পুস্তকের আয়তন, প্রতিলিপির সংখ্যা এবং উচ্চাঙ্গের মুদ্রণ ও মণ্ডনের মানে মূল্য যৎসামান্যই বলতে হবে।

চিন্তামণি কর

ভ্রমণকারিবন্ধুর পত্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সম্পাদক মোহনলাল মিত্র। নবভারতী, কলিকাতা ১২। চার টাকা

চলো যাই। অমিয় চক্রবর্তী। শ্রী প্রকাশ ভবন, কলিকাতা ১২। এক টাকা আশি পয়সা

যেতে যেতে। বারীন মৈত্র। জয়দীপ প্রকাশনী, কলিকাতা ১২। সাত টাকা

গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত : জনাথান সুইফট। লীলা মজুমদার অনূদিত। সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী। দশ টাকা

কোনো এক সময়ে বাঙালী ঘরকুনো জাত বলে পরিচিত ছিল। এখন সে-অপবাদ অনেকটা অপসারিত। 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী'র কীর্তিকথার সঙ্গে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। মধ্যযুগেও বাঙালী একেবারে বাইরে যায় নি সে কথা সত্য নয়। অন্তত তীর্থদর্শনের জন্যও বাঙালী ভ্রমণে বেরিয়েছে। মঙ্গলকাব্যে বাণিজ্যব্যপদেশে বিদেশগমন হয়তো স্মৃতিরোমন্থন ছাড়া আর কিছুই নয়, তথাপি এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে সেকালের বাঙালী এই স্মৃতিরোমন্থনে আনন্দ পেয়েছে।

এখন আর স্মৃতিরোমন্থন নয়, তীর্থদর্শনও নয়—নিছক ভ্রমণের নেশায় আমরা দেশবিদেশ করি। লক্ষ্য হয়তো সব সময় ভ্রমণ নয়, কিন্তু উপলক্ষ্যটাও যে উপেক্ষিত নয় সে কথা জোর করেই বলা যায়। সেই কারণে ভ্রমণকাহিনী লেখায় উৎসাহ যথেষ্ট—এ জাতীয় রচনার পাঠকসংখ্যাও যথেষ্ট।

সম্প্রতি কয়েকটি ভ্রমণকাহিনী পড়ে এ কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে যে, নিছক ভ্রমণের নেশায় যেমন তেমনি ভিন্নতর উদ্দেশ্যে বাঙালী বেড়াতে ভালোবাসে। কখনও দেশ দেখার কৌতূহল, কখনও প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারের আনন্দ, কখনও-বা ভিন্নদেশের মানুষকে জানবার আগ্রহ মানুষকে ভ্রমণে উৎসাহ দিয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ শেষ করে সংবাদ প্রভাকরে লিখেছিলেন, "ভ্রামক হইয়া ভ্রমণকালে স্থানে স্থানে সমূহ সুখ সম্ভোগ করিয়াছি।··নূতন নূতন যত দেখিয়াছি ততই নূতন নূতন সুখের সঞ্চার হইয়াছে।··কত নগর, কত গ্রাম, কত হট্ট, কত গঞ্জ, কত দেবালয়, কত তীর্থ, কত ক্ষেত্র, কত উপবন, কত সরোবর, এইরূপ কত কত বিষয় বিলোকন করত কেবল পুলকে

পরিপূরিত হইয়াছি, চক্ষের সার্থকতা হইয়াছে।" এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশের বিচিত্র ঐশ্বর্য কবিকে ভ্রমণে উৎসাহ দিয়েছে, কবির 'চক্ষের সার্থকতা' ঘটেছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবি এবং সাংবাদিক। কোন্ কোটিতে তিনি বিচরণ করতে ভালোবাসতেন তা বুঝে ওঠা শক্ত। তাঁকে আসলে সাংবাদিক-কবি বলা উচিত। একই প্রয়োজনে কখনও তাঁকে কবিতায় যুদ্ধ করতে হয়েছে কখনও সংবাদপত্রে বাদপ্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন। দেশপ্রীতি তাঁকে কবিজীবনী সংগ্রহে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। কবির নাড়ীর যোগও ছিল কবিওয়ালাদের প্রতি। আবার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে বাঙালীর কবি তার প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র সবিস্তারে দিয়েছেন। কিন্তু কবিকে সমাজের নকিবিও করতে হয়েছে। এই কারণে কেবল 'চক্ষের সার্থকতা' নয় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহে তিনি সমানভাবে পরিশ্রমী এবং আগ্রহী। বাংলাদেশ ভ্রমণ করে তিনি খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। যে যে জেলায় তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন সেই সেই জেলার জনসাধারণের আচার-আচরণ, শিক্ষাব্যবস্থা, ভাষা, আইনআদালত, ভৌগোলিক সংস্থান, প্রাকৃতিক পরিচয়, উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকা ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের একটা নির্ভরযোগ্য সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। একদিক থেকে সেকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে যে দুর্লভ ঐতিহাসিক নিষ্ঠার পরিচয় পাই তা এ কালেও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কবিজীবনী সংগ্রহে গুপ্তকবি যে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, শ্রম এবং অর্থব্যয় করেছিলেন তা আমাদের প্রশংসার দাবি রাখে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই দেশভ্রমণবৃত্তান্তও অনুরূপ কারণে আমাদের শ্রদ্ধার' বস্তু। কবির দেশভ্রমণ আসলে বাংলার স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস। নিজেকে তিনি ভ্রমণকারী বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছেন। প্রভাকরের বন্ধু তিনি নিশ্চয়ই। প্রভাকর বাঙালীর আত্মজিজ্ঞাসার স্মারক। সেই দিক থেকে তিনি বাঙালীর বান্ধব। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রকে বাঙালীর কবি বলেছেন। কিন্তু কবি রূপেই তিনি বাঙালীর নন, সাংবাদিক হিসাবেও তিনি বাঙালীর এ কথা স্বীকার করতে হয়। সম্পাদক মোহনলাল মিত্র সংবাদপত্র থেকে এই রচনাগুলি সংগ্রহ করে একটি অনারব্ধ কর্মকে পূর্ণতা দিলেন।

'চলো যাই' ছোটদের জন্য লেখা বই। কবি অমিয় চক্রবর্তী রংমশাল কাগজের জন্য কয়েকটি ভ্রমণকথা লিখেছিলেন। সেইগুলি তিনি গ্রন্থাকারে ছাপিয়েছেন। ছাপানোর প্রয়োজনও ছিল। ছোটদের জন্য এমন সরস করে লেখা ভ্রমণকাহিনী বাংলাভাষায় খুব বেশি নেই। ছোটদের দিকে তাকিয়ে তিনি রহস্য কিংবা রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে চান নি। কিন্তু কৈশোর কল্পনাকে উত্তেজিত করবার মত উপাদান-উপকরণ সমাবেশে তিনি অকৃপণ। রূপকথার রাজ্যের মতই ইরান, ফিনল্যাণ্ড, ন্যু ইয়র্ক, জর্মানি, সীরিয়া, অক্সফোর্ড, ডেনমার্ক, মস্কো, হল্যাণ্ডের পরিবেশ মনোরম, মনোহর। কখনও এসব রাজ্যের প্রাচীন স্মৃতিচয়নে কখনও প্রকৃতির মায়াঘন রূপ অঙ্কনের দ্বারা কবি অমিয় চক্রবর্তী এইসব নগর-নগরীর চলচ্চিত্র আমাদের উপহার দিয়েছেন। এসব বিদেশী রাজ্যের বর্ণনার মধ্যে বরিশালের চকিতচমক দীপ্তি আশ্চর্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ইরান, ফিনল্যাণ্ড, ন্যু ইয়র্কের স্বাতন্ত্র্য যেমন চোখে পড়বার মত বরিশালের বিশিষ্টতাও তেমনি কারও দৃষ্টি এড়াবার নয়। সেও একই সারিতে স্থান পাবার যোগ্য। বিষয়-বিন্যাসে অমিয়বাবু যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন তাতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর

পরিবর্তন সম্ভব। এখানে অমিয়বাবু শিশুচিত্তের মতই উদার, সমদর্শী। তা ছাড়া কবির চোখ যে সৌন্দর্য আবিষ্কার করে তা দেশকালাতীত। তার সংবেদনশীল মন সপ্তদ্বীপে বিচরণ করে।

বারীন মৈত্রের 'যেতে যেতে' ভিন্ন স্বাদের বই। বারীনবাবুও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেছেন। বারীনবাবুর কৌতূহল সাংবাদিকের নয়, প্রত্নতত্ত্ববিদের এবং ভ্রাম্যমাণের। শ্রীযুক্ত মৈত্র বাংলাদেশের তীর্থস্থানগুলি পরিভ্রমণ করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য পুণ্যসঞ্চয় নয়, মূলত তিনি তীর্থস্থানের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহে আগ্রহ বোধ করেছেন। আমাদের তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে যে প্রাকৃত-অপ্রাকৃত কাহিনী গড়ে উঠেছে সেগুলির বিবরণ সংক্ষেপে দিয়ে শ্রীযুক্ত মৈত্র এসব কাহিনীর ইতিহাস-বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মৈত্র মহাশয় যে সাগরসঙ্গম দিয়ে বর্ণনা শুরু করেছেন তাতে প্রত্নমহিমা এবং 'সত্য' উদ্ধারের প্রচেষ্টা সমধিক। মাঝে মাঝে জনজীবনের করুণমধুর চিত্র পরিবেশন করে ইতিহাসের নীরস তথ্যবিবৃতিকে সরস করে তোলবার প্রয়াস পেয়েছেন। বস্তুত বারীনবাবু প্রত্নতত্ত্ব এবং মানুষের জীবন উভয় সম্বন্ধেই সমান কৌতূহলী। যে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন— কখনও বন্ধু, কখনও পরিচিত, কখনও অপরিচিত, কখনও বৃদ্ধ, কখনও তরুণ— তাদের বিচিত্র সংলাপ আমাদের উপহার দিয়েছেন।

একদা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে আমরা ভ্রমণের নেশায় বিদেশে যাই কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যেই বিষ্ণুপুরে যে বিস্ময়কর স্থাপত্যকলার নিদর্শন আছে তার সংবাদ রাখি না। বারীনবাবু সে অভাব কথঞ্চিৎ মিটিয়েছেন। কিন্তু আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয় মাঝে মাঝে দুটি উপাদানকে (ভ্রমণের আনন্দ এবং ঐতিহাসিক দায়িত্ব) তিনি সমান্তরালভাবে প্রবাহিত করেছেন। এদের অন্তরাল মুছে যায় নি। ফলে অনেক সময়েই গ্রন্থপাঠে কিছুটা ক্লান্তি আসে।

গালিভারের ভ্রমবৃত্তান্তকে ভ্রমণকাহিনীর পর্যায়ভুক্ত করা বোধ করি সমীচীন হবে না। রচনাটি ব্যঙ্গরসাত্মক। কিন্তু বইটির গঠনকৌশলে ভ্রমণকাহিনীর নির্মিতি অনুসৃত। এই জন্যই বইটির আকর্ষণ। ব্যঙ্গরসিকের সাহিত্যের সকল শ্রেণীতেই গতাগতি সম্ভব। সুইফট ভ্রমণকাহিনীর আধারে তাঁর ব্যঙ্গ-মিশ্রিত মনোভাব বিন্যস্ত করেছেন। সুইফট এই প্যাটার্ন নির্বাচন করার জন্য সমালোচকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন। সমালোচকদের আগেই পাঠকবর্গ বইটিকে অভিনন্দিত করেছিল। ইংরেজি সাহিত্যে সুইফটের পূর্বে অনেকেই ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। সেসব বৃত্তান্তের বিস্তৃত বিবরণ দেবার এখানে অবসর নেই। কিন্তু আমরা সকলেই জানি ভ্রমণসাহিত্যের তখন বাজারদর খুবই চড়া। সুইফট তাঁর ব্যঙ্গধর্মী মনোভাবকে এই জনপ্রিয় সাহিত্যের মোড়কে উপহার দিলেন। লিলিপুট, ব্রব্‌ডিংনাগ, লাপুটা, হুইনম দেশে ভ্রমণ নিশ্চয়ই কল্পিত ভ্রমণ। কিন্তু ভ্রমণকালে আমরা যেমন অভিনব বস্তুর সাক্ষাতে চমকিত হই, বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তৃত হয় সুইফটের গ্রন্থেও সে চমক সে অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি লাভ সম্ভব্। এসব কথার এই মানে নয় যে সুইফটের অভিপ্রায় ছিল গালিভারের নিছক ভ্রমণের আনন্দ পাঠককে উপহার দেওয়া। বরং চতুর্থ কাহিনীটিতে সুইফট প্রায় অনাবৃতভাবে আপনাকে প্রকাশ করে বহিরঙ্গ রূপকল্পকে নষ্ট করেছেন। চতুর্থ কাহিনীতে

সুইফট আঘাতপ্রবণ মন্তব্যপ্রকাশে কিঞ্চিৎ তিক্ত। সুতরাং গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত নিছক ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়।

যাই হোক, বাংলায় গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত ইতিপূর্বেও অনূদিত হয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অপূর্ব দেশভ্রমণ' (১৮৭৬) গালিভারস ট্রাভেলসের অনুবাদ। কিন্তু সে বই'র কথা আমরা ভুলে গিয়েছি। সাহিত্য অকাদেমি থেকে শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার এই স্মরণীয় গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। শ্রীযুক্তা মজুমদার এ ব্যাপারে যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা শৈশবে এই বই'র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পড়েছি। ছেলেদের জন্যই এই বই লেখা হয়েছিল বহুকাল পর্যন্ত সে ধারণাই ছিল। সে ধারণা অবশ্য কেটে যায় সকলেরই বুদ্ধির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে শিশুচিত্তহরণকারী উপাদান-উপকরণের অভাব নেই। আমাদের দেশে বর্তমানে শিশুসাহিত্যে লীলা মজুমদারের আসন পাকা। সুতরাং এ গ্রন্থ অনুবাদে এমন স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যায়। এ অনুবাদ কেবল ভাষান্তরিত নয়— মূলের সাহিত্যরসকে তিনি প্রায় সর্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। বাংলার ইডিয়মের সঙ্গে ইংরেজির চলনের আশ্চর্য মেলবন্ধন স্থাপন করেছেন। এখানেই এ গ্রন্থের সার্থকতা।

বিজিতকুমার দত্ত

স্বরলিপি

দুঃখরাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে—
জাগি হেরিনু তব প্রেমমুখছবি ॥
হেরিনু উষালোকে বিশ্ব তব কোলে,
জাগে তব নয়নে প্রাতে শুভ্র রবি ॥
শুনিনু বনে উপবনে আনন্দগাথা,
আশা হৃদয়ে বহি নিত্য গাহে কবি ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

পা -া । -হ্মাপা -ধণধা ধা । পগা -পমা । মগা গমা -গমরা I
দুঃ ০ ০০ ০০০ খ রা০ ০০ তে০ হে০ ০০০

[র]গমগা -রগা । মা পহ্মা -ধপহ্মাপা । মগা -মা । রা সা -া I
না০০ ০০ থ কে০ ০০০০ ডা০ ০ কি লে ০

সা -া । সমা -গা মপা । পা -া । -া পা পা I
জা ০ গি০ ০ হেরি নু ০ ০ ত ব

হ্মপা -ধনা । -র্সর্রর্সা -নর্সা ধা । -পা -া । -মা মা -পা I
প্রে০ ০০ ০০০ ০০ ম ০ ০ ০ মু ০

-মপা -ধণধা । পমা গা -মা । -রা -া । -সা -া -া II
০০ ০০০ খছ বি ০ ০ ০ ০ ০ ০

স্বরলিপি

{পা পা । পর্সধা -র্সা র্সা । র্সা -া । র্সা র্সা -া I
হে রি স্নু॰ ॰ উ ষা ॰ লো কে ॰

র্সা -ধা । না র্সা র্রা । র্সা -না । নর্সা -ধা -পা} I
বি ॰ শ্ব ত ব কো ॰ লে॰ ॰ ॰

মা -া । মগা -রগা মপা । পা -া । পক্ষা পা -া I
জা ॰ গে॰ ॰॰ তব ন ॰ য়॰ নে ॰

ক্ষপা -ধনা । -র্সর্রর্সা -নর্সা ধা । -পা -া । -মা মা -পা I
প্রা॰ ॰॰ ॰॰॰ ॰॰ তে ॰ ॰ ॰ শু ॰

-মপা -ধণধা । পমা গা -মা । -রা -া । -সা -া -া II
॰॰ ॰॰॰ ভ্রব বি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

{পা পা । পর্সধা -র্সা র্সর্সা । র্সা র্সা । -া র্সা র্সা I
শু নি স্নু॰ ॰ বনে উ প ॰ ব নে

র্সা -ধা । না -র্সা নর্সর্রা । র্সা -না । নর্সা -ধা -পা} I
আ ॰ ন ন্ দ॰॰ গা ॰ থা॰ ॰ ॰

মা -া । মগা -রগা মপা । পা -া । পা পা -া I
আ ॰ শা॰ ॰॰ হৃদ য়ে ॰ ব হি ॰

I ন্মাপা -ধনা । -র্সর্রর্সা -নর্সা ধা । -পা -া । -মা মা -পা I
নি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত্য ০ ০ ০ গা ০

I -মপা -ধণধা । পমা গা -মা । -রা -া । -সা -া -া II II
০ ০ ০ ০ ০ হেক বি ০ ০ ০ ০ ০ ০

সংশোধন

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১

পৃষ্ঠা	স্বরলিপি-ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৩	৪-৫	···। ^ধ^না ধপা -া I পা -া না । প রা০ য়্ ই ন্ দ্র ধা না -া I -া -া -া । ধ নু ০ ০ ০ ০	···। { ^ধ^না ধপা -া I পা -া না । প রা০ য়্ ই ন্ দ্র ধা না -া I -া -া -া } ।··· ধ নু ০ ০ ০ ০

সম্পাদকের নিবেদন

ভারতের প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পীদের মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। অন্যান্য শিল্পীর চিত্র থেকে তাঁর রচিত চিত্রের চরিত্র আলাদা, মেজাজও একটু পৃথক। এইজন্য তাঁর বৈশিষ্ট্যও বেশ স্পষ্ট।

তাঁর সম্বন্ধে যতটা আলোচনা হওয়া উচিত ছিল, ততটা সম্ভবত হয় নি। এইজন্যেই তাঁর চিত্র সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা সম্ভবত তেমন স্পষ্ট নয়। কেবলমাত্র কিছু সংখ্যক চিত্ররসিকই গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন।

সমালোচকদের মতে ভারতের বেশির ভাগ শিল্পীই শহর সম্বন্ধে তেমন সজাগ নন, তাঁদের কাছে শহরের তেমন স্থান নেই, শহরের সঙ্গে সম্পর্কও যেন তাঁদের নেই ; তাঁদের চিত্রে শহর সেইজন্যে ধরা পড়েছে খুব কম। অন্য কোনো দিক থেকে বিচার না করে স্থূলভাবে এটুকু বলা যায় যে, গগনেন্দ্রনাথ এই দিক থেকে স্বতন্ত্র, তিনি শহরের শিল্পী। শহর, বিশেষ করে কলকাতা শহর, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রের উপাদান ও উপকরণ। তাঁর বহু চিত্রে শহরের জীবন প্রতিবিম্বিত। যে পরিবেশে তিনি অবস্থান করেছেন তা প্রতি-ফলিত হয়েছে তাঁর তুলির রেখায় ও রঙে। তিনি যে শহুরে মানুষ ছিলেন এবং তাঁর মেজাজও ছিল শহুরে তা তিনি স্পষ্টভাবেই চিত্রের ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এ'কে অনেকে হয়তো বলবেন, শিল্পীর স্বীকারোক্তি।

ঠাকুরবাড়ির আবহাওয়ায় তিনি মানুষ, সেই পরিবারের পরিবেশও তিনি তাঁর তুলিতে ধরে রেখেছেন—রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গগনেন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রে ভূষিত। ঐ চিত্রাবলীর অনেকগুলিতেই সে আমলের ঠাকুরবাড়ি মূর্ত হয়ে আছে। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, সেটি হচ্ছে কার্টুন। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে অনেকে তাঁর আঁকা কার্টুনের কথা উল্লেখ করতে চান না, কারণ এগুলিতে শিল্প নাকি তেমন নেই, সুতরাং এর উল্লেখ করলে গগনেন্দ্রনাথকে অবিচার করা হয় বলে তাঁদের ধারণা। তাঁদের ধারণা ভুল না হতে পারে, কিন্তু সাধারণ ব্যঙ্গচিত্রের মত গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ব্যঙ্গচিত্র এক দিনেই যে বাসী হয়ে যায় নি, আজও যে সেগুলি জীবন্তই আছে, এও শিল্পীর কৃতিত্বের কথা।

গগনেন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় গগনেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ করে ও তাঁর অঙ্কিত চিত্র মুদ্রিত করে আমরা শিল্পীর প্রতি আমাদের শতবার্ষিক নমস্কার নিবেদন করলাম।

১৫ আশ্বিন

স্বীকৃতি

গগনেন্দ্রনাথ-অঙ্কিত 'নিরঞ্জন' চিত্রের ব্লক রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সৌজন্যে ও 'সাতভাইচম্পা' চিত্র শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৩

মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪

IISCO

নিম অদ্বিতীয়
নিমের উপকারিতা হাজার হাজার
বছরের পরীক্ষিত সত্য
ভারতীয়দের সুদৃঢ় ও ঝক্‌ঝকে দাঁত বিদেশীদের বিস্ময় ও প্রসংশার বিষয়। এই প্রশংসনীয় দাঁতের মূলে ছিল নিমের দাঁতনের নিয়মিত ব্যবহার। অবশ্য নিম দাঁতনের স্থান এখন বহুলাংশে গ্রহণ করেছে নিম টুথ পেস্ট।
কারণ, নিম টুথ পেস্টে নিমের সক্রিয় উপাদান ছাড়াও আছে ফ্লুরাইড এবং দাঁতের পক্ষে উপকারী অধুনা-আবিষ্কৃত অন্যান্য উপকরণাদি যা দাঁত ও মাঢ়ী সুদৃঢ় করে, পাইওরিয়া ও দন্তক্ষয় নিবারণে সাহায্য করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর ক'রে শ্বাসপ্রশ্বাস সুরভিত এবং দাঁত ঝক্‌ঝকে করে তোলে।

Spencer's
ICECREAM

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪ · ১৮৮৯-৯০ শক

সম্পাদক শ্রীসুশীল রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৩ · মাঘ-চৈত্র ১৩৭৪ · ১৮৮৯-৯০ শক

চিঠিপত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

[২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৫]

কল্যাণীয়েষু

রথী, আমি শনিবার সকালের গাড়িতে, অর্থাৎ ৯টার সময় ছেড়ে বেলা আড়াইটায় কলকাতায় পৌছব। ইতিমধ্যে দেবল এসে পড়লে তাকে ছাড়িস্ নে— আমি এখানে ফেরবার সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে আসব। ১৯শে সেপ্টেম্বরে সে মাদ্রাজ থেকে আমাকে চিঠি লিখেচে। তাহলে হয়ত বা শনিবারেই কলকাতায় পৌছবে। Merkara ষ্টীমারের ঠিকানায় B. I. S. N.দের কেয়ারে তাকে চিঠি লিখে দিস্ যেন জোড়াসাঁকোয় আসে। সে লিখেচে সে সোজা বোলপুরে চলে আস্‌বে— জোড়াসাঁকোয় না এসেই যদি সে সোজা দৌড়য় তা হলে গোল হবে। তোরা বোধ হয় শনিবারের আগেই আস্‌চিস্ নে। ইতি বুধবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

[শিলাইদহ। ফেব্রুয়ারি ১৯১৬]

কল্যাণীয়েষু

গানের কাগজ[১] এই লোকটিকে পাঠিয়ে দিস্।

উমাচরণ আমার ছাতা ফেলে এসেচে সেটা পাঠাবার ব্যবস্থা করিস্।

অনঙ্গ এবং বসন্ত ত আজও এসে পৌছয় নি।

তোরা কবে আস্‌বি সময় থাকতে যেন খবর পাই। রাত্রের গাড়িতে ষ্টীমারে করে পাবনায় গিয়ে সেখান থেকে বোটে করে আসাই হচ্চে সব চেয়ে সুবিধের পথ।

এখনো এখানে তেমন গরম পড়ে নি— ভারি সুন্দর লাগ্‌চে।

তোরা যখন আসবি মনে করে দুই ভল্যুম ব্রাউনিং নিয়ে আসিস্— সে বই দুটো বাইরেই আমার সেই বিছানার শেল্‌ফে আছে। তোদের সঙ্গে বেশি চাকর আনবার বোধ হয় দরকার হবে না— অন্তত সুলতানকে আনিস্‌নে— ওর চেহারা এবং ভাব আমাকে কেমন অকারণে পীড়া দিতে থাকে।

---

১ 'বিগত মাঘোৎসবে' আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে যে-সকল গান গাওয়া হয়, তৎসম্পর্কিত 'কাগজ'।

মণিলাল যদি আসে ত বেশ হয়। অবন এলে কথাই ছিল না।

নন্দলাল কিম্বা মুকুলকে আনতে পারলে বেশ হয়— আমার ইচ্ছা শিলাইদহের অনেকগুলো ছবি আঁকা হয়ে থাকে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

ওঁ

[১৯১৬]

কল্যাণীয়েষু

অনঙ্গের কাছে শুনলুম বসন্তের সেই ছবিটা তোরা খুঁজে পাচ্চিস্ নে। সেটা আমার তেতালার শোবার ঘরের কোনো একটা দেয়ালে টাঙানো আছে— বোধ হয় দেয়ালের দিকে খোঁজ করিস্নি।

তোরা আস্বার সময় এক বোতল fountain penএর কালি নিয়ে আসিস্।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

ওঁ

[চৈত্র ১৩২২]

কল্যাণীয়েষু

সত্য বেচারার পক্ষে এবার ১লা বৈশাখের কাজ করতে আসা অসম্ভব হবে। অতএব মেজদাদাকে বেদীতে বসিয়ে তোরা সেদিনকার কাজ যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়ে দিস্। ভুলিস্ নে। যদু সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতে পারবে— সে জানে কি কি করা হয়ে থাকে।

মুকুলকে Merc Sol. 200 এক ডোজ দিলেই তার রক্তপড়া সেরে যায়— কোনো injection দরকার হয় না।

রামগড়ের দলিলটা পাঠাচ্চি।

গোপালকে জিজ্ঞাসা করিস আমার জামা ও ইজেরের কি করলে? আজও কি তৈরি হয় নি?

স্কুলের বাড়ির যে আসবাবগুলি শান্তিনিকেতনের জন্যে নেওয়া হয়েচে— কলকাতা থেকে তোরা তার দাম ধরে নিস্।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫

ওঁ

[চৈত্র ১৩২২]

কল্যাণীয়েষু

গুরুলের কাছে শীঘ্র আমার দুটো ছোট ফোটোগ্রাফ পাসপোর্টের জন্যে পাঠাতে ভুলিস্ নে। যাতে আমার সামনের মুখ আছে এমন একটা দিস্। আমেরিকার Offer গ্রহণ করে আজ টেলিগ্রাফ করে দিয়েছি। সেখান থেকে শীঘ্রই পথ খরচের টাকা আসবে। জাপানের জাহাজের খোঁজ করচিস্?

যদি কলকাতার জাহাজে জায়গা না থাকে কলম্বোর জাহাজের খোঁজ করিস্। মীরার সেই Twilight Sleep সন্ধান করেচিস কি? ২রা বৈশাখ অর্থাৎ শনিবারে কলকাতায় যাব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ওঁ

[১৯১৬?]

কল্যাণীয়েষু

রথী, চেক্ সই করে দিলুম। টাকাটা পাওয়া গেল। এখন ত আর ভাবনা নেই। এইবার এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাবে। তোরা তাহলে এখানে এলেই ভালো হয়। যদি বিশেষ কাজ থাকে ত লিখে পাঠাস্। এখানকার সমস্ত ব্যবস্থা একেবারে পাকা করে তবে ছুটি নেওয়া যাবে। তোর স্বরুলের বাড়ির যদি কিছু করবার থাকে ত সেরে নিস্। মাঝে গ্রীষ্মের ছুটি আসবে। তার পরে আমরা কোথায় থাকব ঠিক নেই। এই যে বারো হাজার টাকা আমরা নিলুম এর বদলে আমাদের পাওনা টাকাটা transfer করে দিয়েছি। কিন্তু সেই ১৬০০০ টাকার মধ্যে কতটা আমরা নিয়েছি ঠিক জানি নে— সেই পরিমাণ টাকার ৬পার্সেন্ট স্থদ দেবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ১৫০০ টাকা কি আমরা এই ফাল্গুন থেকেই পাব? কবে নাগাদ আমরা জাপানে যাত্রা করব ভালো করে ভেবে স্থির করে রাখিস।

বাবা

৭

ওঁ

[২০ বৈশাখ ১৩২৩]
সকাল ৮টা

কল্যাণীয়েষু

এতক্ষণে সত্যই জাহাজ ছাড়ল। বেশ হাওয়া দিচ্চে। মেঘ কেটে গিয়ে রৌদ্র উঠেচে। তোরা কেমন থাকিস্, বৌমা কেমন থাকেন রেঙ্গুনে P. C. Senএর কেয়ারে খবর দিস্— আমাদের জাহাজের চেয়ে মেল্ শীঘ্র পৌছবে।

যথাসময়ে মীরার শুশ্রূষার যেন স্থব্যবস্থা হয়।

ঈশ্বর তোদের কল্যাণ করুন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

ওঁ

[২৪ বৈশাখ ১৩২৩]

কল্যাণীয়েষু

প্রকাণ্ড একটা সাইক্লোনের ভিতর দিয়ে কোনো রকম করে কাটিয়ে চলে এসেচি। কাপ্তেন বল্লে এমন ঝড় ইতিপূর্ব্বে কখনো পায় নি। আমার লেখার মধ্যে তার সমস্ত বর্ণনা পাবি। এই লেখাটা তোদের দেখা হলে প্রমথকে পাঠিয়ে দিস্— এটা সবুজপত্রে যাবে।

মুকুল ঝড়ের মধ্যেও একরকম মন্দ ছিল না। ওর seasick হয় নি এই আশ্চর্য্য। খাওয়া দাওয়াও বেশ চল্‌চে।

রেঙ্গুন দূর থেকে দেখা যাচ্চে। আজ রাত্রে নাবতে পারব কি না জানি নে। কাল সকালে হয় ত নাবব। তার পরে চিঠি ডাকে দেব। বুধবারে সম্ভবত জাহাজ আবার রেঙ্গুন থেকে ছাড়বে— ইতিমধ্যে সহরটা দেখে নেব।

তোরা কেমন আছিস কবে খবর পাব জানি নে।

Sandhead থেকে Pilotএর হাতে যে চিঠি দিয়েছিলুম পেয়েছিস কি? সন্দেহ আছে। টিকিট ছিল না— ওদের হাতে পয়সা দিয়েছিলুম। প্রথম দিনেই harbourmasterএর হাতে যে চিঠি দিয়েছি নিশ্চয় পেয়েচিস্। সবুজ পত্রের জন্যেও harbourmaster এবং Pilotএর হাতে দু কিস্তি লেখা দিয়েচি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিদের পরিচয়

দেবেন।	নারায়ণ কাশীনাথ দেবল : শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র
উমাচরণ।	ভৃত্য
সুলতান।	ভৃত্য
মণিলাল।	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
নন্দলাল।	নন্দলাল বসু
মুকুল।	মুকুল দে
সত্য।	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
মেজদাদা।	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
যদু।	যদু চট্টোপাধ্যায় : সরকার
গোপাল।	গোপাল চট্টোপাধ্যায় : সরকার
প্রমথ।	প্রমথ চৌধুরী

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সার্ধশতাব্দীর আলোকে

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

সে যুগের রাজধানী কলিকাতা আর চিরযুগের দেবতাত্মা হিমালয়— দ্বারকানাথ-পুত্র দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও মননের পটভূমি। লোকালয় আর লোকাতীতের এমন এক সমন্বয় তাঁর জীবনে ঘটেছিল, যার ফলে ঔপনিষদিক ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের তপস্যার জ্যোতির্মণ্ডল তাঁকে বাংলা ও ভারতের নবযুগের 'মহর্ষি'তে পরিণত করেছে; পিতৃঋণশোধ সে মহত্ত্বের আংশিক প্রতিফলনমাত্র। আজ বরং শ্রদ্ধাবনতচিত্তে আমাদের এ কথাই স্মরণীয় জাতির জীবনে এমন এক শ্রেষ্ঠ পিতৃপুরুষের স্মৃতিতর্পণের আমরা কতটুকু যোগ্য অধিকারী। যে বিপুল পিতৃঋণের অঙ্ক তিনি পরিশোধ করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি পিতৃঋণ ও ঋষিঋণে আমরা সমগ্র দেশ ও জাতি তাঁর কাছে আবদ্ধ। পরবর্তী কোনো কীর্তি বা প্রচেষ্টার দ্বারা সে ঋণভার লঘু হওয়া তো সম্ভব নয়, শুধু প্রণত শ্রদ্ধায় স্মরণমননের প্রচেষ্টাই আমাদের সীমিত সাধ্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর দেড়শো বছর পার হয়ে গেছে। নবজাগরণের যে সন্ধিক্ষণে তিনি এসেছিলেন, তখন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পরাধীনতার চিহ্ন আমাদের সর্বদেহমনে। অথচ যে সমুজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যে মহর্ষির স্বাধীনচিত্ত সমসাময়িকতার ঊর্ধ্বে আপন ধ্যানের আসনটি প্রতিষ্ঠা করেছিল, সে স্বাতন্ত্র্য, সে চারিত্র্যশক্তি আজকের রাজনৈতিক পরাধীনতামুক্ত ভারতবর্ষে ক্রমে বিরল হয়ে আসছে। নানা শিবিরে বিভক্ত আজকের বুদ্ধিজীবী-সমাজে যে পরিমাণে গোষ্ঠীগত আনুগত্যের দাবি, ঠিক সেই পরিমাণে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধির স্বল্পতা। অনুকৃত মহত্ত্ব নয়, স্বকীয় মৌলিকতাই জাতির চলমান চিন্তাধারাকে স্বচ্ছ ও গতিবেগসম্পন্ন করে, সে কথা এ যুগের তরুণসমাজ বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ অবধি ভারতের নবজাগরণের মূলপ্রেরণাই তো সত্যের স্বাধীন অন্বেষণে!

প্রতিটি সত্যান্বেষীর জীবনে যেমন গুরু বা পথপ্রদর্শকের বিশেষ স্থান থাকে, দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও রাজা রামমোহনের প্রতি তেমনি অন্তরতম শ্রদ্ধার আসনটি পাতা ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র রামমোহনের রচনাবলীর পাতায় তাঁর চিন্তা থেমে থাকে নি। সে বীজকে তিনি সঙ্ঘবদ্ধ মহীরুহে পরিণত করেছেন সাহিত্যে সমাজে স্বাদেশিকতায় অধ্যাত্মসাধনায়— সবার উপরে ব্যক্তিগত জীবন ও উপলব্ধিতে। স্বয়ং এক মহাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে পরবর্তী যুগের তরুণতর ও তরুণতম ব্রাহ্মদেরই শুধু উদ্বুদ্ধ করেন নি, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আস্থাহীন সে যুগের অধিকাংশ নব্যবঙ্গ জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সুনীতি সদাচার শোভনতা ও সহৃদয়তার সঙ্গে স্বাদেশিকতার এক পূর্ণাঙ্গ আদর্শ তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে প্রভাবিত হয়েছিল। জীবিতকালেই যাঁরা নানা মতভেদে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন, তাঁরাও আদর্শ মনুষ্যত্বের অধিকারীরূপে নিঃসংশয় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান তাঁকে দিয়েছেন। আজ দেড়শো বছরের এপারে থেকে মহর্ষির কীর্তি সাধনা চারিত্র্যের সেই তুঙ্গশিখরটি আমাদের সমতলধর্মী জীবনযাত্রায় সবিস্ময় প্রেরণার উৎসস্থল।

এ যুগের বাঙালীসমাজে 'ব্রাহ্ম' এবং 'হিন্দু' কথাটির পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামানো বাহুল্য বিবেচিত।

মহর্ষি নিজেকে হিন্দুসমাজের বিশালতর প্রবাহেরই এক সমুন্নত অংশের অধিকারী মনে করতেন। পরবর্তী যুগে 'ব্রাহ্ম'-চেতনার স্বাতন্ত্র্যবোধ যে বিচ্ছেদ-বেদনার সৃষ্টি করেছিল তার সাহিত্যরূপ পুত্র রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে নানাভাবে প্রকাশিত হলেও শেষ অবধি এক দিকে পরেশবাবু ও অন্যদিকে আনন্দময়ীর মাধ্যমে যে চিরন্তন মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে তার আদি উৎস পিতা দেবেন্দ্রনাথ। অথচ সামাজিক আচার-আচরণে দেবেন্দ্রনাথের সংরক্ষণশীলতাই একদা তাঁর অনুবর্তীদের দুঃসহ মনে হয়েছিল। একদা বন্ধনমোচনকারীই পরবর্তীদের বন্ধনভীতির কারণ হয়ে ওঠার পরবর্তী উদাহরণ কেশবচন্দ্র স্বয়ং। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে দেখা দিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। আভিজাত্যের গণ্ডি ভেঙে ক্রমে সাধারণের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া— এমন এক সমাজচেতনাও ব্রাহ্মসমাজের ভাঙনের ইতিহাসে সক্রিয় ছিল সন্দেহ নেই। দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজের এই ত্রিধা-বিভক্তরূপের ব্যাখ্যা শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতে' বিধৃত— "তিনি তখন চুঁচুড়া সহরে গঙ্গাতীরস্থ এক ভবনে একাকী বাস করিতেছিলেন। তিনি 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নামটা শুনিয়া বলিলেন, 'বেশ হয়েছে। আমাদের সমাজের নাম 'আদি' সমাজ, আমরা কালে আছি। কেশববাবুর সমাজের নাম 'ভারতবর্ষীয় সমাজ', তাঁরা দেশে আছেন। তোমরা দেশকালের অতীত হইয়া যাও।' "

অধ্যাত্মদৃষ্টির যে স্তর থেকে দেবেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে 'দেশকালের অতীত' হতে আহ্বান করেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সে দৃষ্টির প্রসার আর সম্ভব হয় নি। ব্রাহ্মগোষ্ঠীর অধ্যাত্ম-আন্দোলন এর পর থেকে সমাজনীতি ও রাজনীতির দেশকালে-আবদ্ধ জগতে পথ খুঁজে ফিরেছে। রাজনীতির সর্বগ্রাসী প্রভাব আজ বিশ শতকের তরুণ বাংলার কাছে ধর্মনীতির আন্দোলন অনেক পরিমাণে অর্থহীন করে তুলেছে। কিন্তু যে ধর্মচেতনার নিরবচ্ছিন্ন ফল্গুধারা আমাদের জাতীয়-জীবনের মূলসূত্র তাকে ভুলে গিয়ে আমরা জাতীয় ঐতিহ্যের সত্যরূপটিই অনেক সময় ধরতে পারি না। অন্নবস্ত্র-শিক্ষার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতাও মানবমনীষার অপরিহার্য উপকরণ। অনুষ্ঠানবর্জিত ধর্ম অসম্ভব, কিন্তু অনুষ্ঠান-আনুগত্যই ধর্ম নয়। ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে এই স্বাধীন নির্বাচনের অধিকার ভারতবর্ষ যুগে যুগান্তরে স্বীকার করে এসেছে। উনিশ শতকের ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সমগ্র ভারতের অধ্যাত্মচিন্তার ক্ষেত্রে একেবারে স্বয়ম্ভূ কখনোই নয়। বৌদ্ধ বা জৈন আন্দোলন অথবা মধ্যযুগের দাদূ কবীর নানক প্রমুখ বিচিত্র সাধু ও সন্ত সমাজ রূপাতীতের সাধনায় মগ্ন হয়েছেন, সবচেয়ে বেশি করে রূপের সত্যকে অতিক্রম করেছেন হিন্দুদর্শনের অদ্বৈতবাদী বেদান্তীর দল— শংকরাচার্য যার মুখপাত্র। দেবেন্দ্রনাথ এই চরম অদ্বৈতবাদ ও দেশাচার-সমাকীর্ণ চূড়ান্ত দ্বৈতবাদ— এরই মাঝামাঝি একটি পন্থা খুঁজে পেলেন রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনার একনিষ্ঠ-ভাবাদর্শে। রামমোহনের চিন্তাধারায় যা প্রধানত যুক্তি ও মননে প্রতিষ্ঠিত ছিল, দেবেন্দ্রনাথের ভক্তহৃদয়ের স্পর্শে তা ব্যক্তিসম্বন্ধের অনুরাগাঞ্জনে মণ্ডিত হল। বিশ্বপিতার উদ্দেশে ঋষিপুত্রের প্রণামমন্ত্রে তা অভিব্যক্ত— ওঁ পিতা নোঽসি।

১৮৬৭তে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে দেবেন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় এবং সে অভিনন্দনের উত্তরে মহর্ষি যা বলেছিলেন, আজ শতবর্ষ পরে সে যুগের মননেতিহাস-রচনায় তা উল্লেখযোগ্য উপাদান। সে অভিনন্দনে দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব তরুণতরদের চোখে এইভাবে প্রতিভাত— "যে দিন দেশহিতৈষী ধর্মপরায়ণ রাজা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি সাধারণ

গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই দিন ইহার প্রকৃত মঙ্গলের অভ্যুদয় হইল। বহুকালের অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া বঙ্গদেশ নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে পদসঞ্চারণ করিতে লাগিল। কিন্তু উক্ত মহাত্মার অনতিবিলম্বে পরলোক-প্রাপ্তি হওয়াতে, তৎপ্রদীপ্ত ব্রহ্মোপাসনারূপ আলোক নির্বাণোন্মুখ হইল, এবং সকল আশা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। এই বিশেষ সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উত্থিত করিয়া, বঙ্গদেশের ধর্মোন্নতির ভার আপনার হস্তে অর্পণ করিলেন।··· যে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্দীপন করিবার জন্য, আপনি ১৭৬১ শকে (২১শে আশ্বিন) তত্ত্ববোধিনীসভা সংস্থাপন করেন, তথায় অনেক কৃতবিদ্য যুবক ধর্মালোচনার দ্বারা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন এবং ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা হৃদয়-মনকে বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন।··· যাহাতে আপনাদের আলোচনার ফল আরও বিস্তীর্ণভাবে প্রচারিত হয়, এই উদ্দেশে আপনি ১৭৬৫ শকে (১লা ভাদ্র) সুবিখ্যাত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করিলেন।··· এইরূপে তত্ত্ববোধিনী সভা ও রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের পরস্পর সাহায্যদ্বারা ব্রহ্মোপাসকদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহাদিগকে এক বিশ্বাসসূত্রে গ্রথিত করিয়া, দলবদ্ধ করিবার জন্য আপনি যথাসময়ে ব্রাহ্মধর্মগ্রহণপ্রণালী প্রবর্তিত করিলেন। এই প্রকৃষ্ট উপায়দ্বারা আপনি উপাসনাকে বিশ্বাস-ভূমিতে বদ্ধমূল করিলেন এবং ব্রহ্মোপাসকদিগকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্মে সম্প্রদায়ীভূত করিলেন।··· কিন্তু পবিত্র ধর্মের উন্নতিস্রোতে অধিক কাল অসত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এ কারণ বেদাদি গ্রন্থের অভ্রান্ততাবিষয়ক যে ভয়ানক মত এই সমুদায় ব্যাপারের মূলে গূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা যখনই বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চাতে প্রকাশিত হইল, তখনই বিবেকের অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে আপনি উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মভ্রাতাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান হইলেন। হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া পূর্বে সত্যামৃত লাভ করিয়াছিলেন, পরে তন্মধ্যে গরল দৃষ্ট হওয়াতে, আপনি তদুভয়কে ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম নামে হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত সত্যসংগ্রহ প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্মগ্রহণপ্রণালীও সুতরাং পরিবর্তিত হইল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া, আপনি ব্রাহ্মধর্মের কয়েকটি নির্বিরোধ মূলসত্য নির্ধারণকরত, তদুপরি ব্রাহ্মমণ্ডলীকে স্থাপন করিলেন। এইরূপে সমাজ-সংস্কার করিয়া আপনি কয়েক বৎসর পরে হিমালয় পর্বতে গমন করিলেন। তথায় দুই বৎসরকাল অবস্থানকরত, হৃদয় মনকে উপাসনা, ধ্যান ও অধ্যয়নদ্বারা সমধিক উন্নত করিয়া, সেখান হইতে প্রত্যাগত হইলেন, এবং দ্বিগুণিত উদ্যম ও নিষ্ঠাসহকারে বিশুদ্ধ প্রণালীতে সংস্কৃত সমাজের উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত হইলেন। যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রাহ্মধর্মের নির্মল মুক্তিপ্রদ জ্ঞান নিয়মিতরূপে বিতরণ করিয়া, নব্যসম্প্রদায়ের অনেককে ঈশ্বরের পথে আনিয়াছেন এবং যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশগুলি গ্রন্থবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হওয়াতে, শত শত লোকে এখনও ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস বুঝিতে সক্ষম হইতেছে, আপনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার যথার্থ মহত্ত্ব তখনও সম্যকরূপে প্রকাশ পায় নাই। যখন আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্যরূপে পবিত্র বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্মের মহান্ সত্যসকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত মহোচ্চ ও সুগভীর ভাবনিচয় লোকের নিকট প্রকাশিত হইল; ··· ব্রাহ্মধর্ম যে প্রীতির ধর্ম এবং কঠোর জ্ঞান ও শূন্য অনুষ্ঠানের অতীত, তাহা আপনারই নিকট ব্রাহ্মেরা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং আপনারই

উপদেশ ও দৃষ্টান্তে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আনন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।"[১]

কেশবচন্দ্রের এই বন্দনায় সমসাময়িক যুগের অধ্যাত্মসাধকদের দৃষ্টিতে দেবেন্দ্রনাথের যথার্থ স্থানটি নির্দেশিত, সেই সঙ্গে সমকালীন ব্রাহ্ম-আন্দোলনের পটভূমিটি সংক্ষেপে উপস্থাপিত। এ অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে দেবেন্দ্রনাথ আপন মানস-ইতিহাস যেভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, তার অংশবিশেষ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক—"··যখন আমার হৃদয়ের ভাবের প্রতিভাব উপনিষদের পত্রে প্রথম প্রত্যক্ষ দেখিলাম, 'এই ব্রহ্মাণ্ডের যে-কিছু পদার্থ, সমুদায়ই ঈশ্বরদ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে, পাপ-চিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর, কাহারও ধনে লোভ করিও না'— তখনই আমার হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন সমুদায় উপনিষৎকে, সমুদায় বেদকে আমার মনের শ্রদ্ধা আসিয়া আলিঙ্গন করিল। পূর্বে আমার কোনো শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ছিল না, এই সময়ে সমুদায় বেদশাস্ত্রে আমার শ্রদ্ধা ব্যাপ্ত হইল। উপনিষদের এক এক মহাবাক্যে আমার আত্মা জ্ঞানসোপানে উন্নত হইতে লাগিল।···কিন্তু যখন আবার এই উপনিষদে দেখিলাম, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'সোঽহমস্মি' 'তত্ত্বমসি'— এই আত্মা ব্রহ্ম, তিনি আমি, তিনি তুমি— তখনই বুঝিলাম যে, ব্রাহ্মধর্মের মূলতত্ত্বের সহিত ইহার সকল বাক্যের ঐক্য নাই।··· আবার যখন তাহাতে দেখিলাম, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্বাণমুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল। 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।' যেমন নদীসকল স্যন্দমান হইয়া নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রেতে লীন হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পূর্ণপুরুষকে প্রাপ্ত হয়। ইহা তো মুক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ। কোথায় ব্রাহ্মধর্মে আত্মার অনন্ত উন্নতি, আর কোথায় বেদান্তে তাহার এই নির্বাণমুক্তি···। বেদান্তের এই নির্বাণমুক্তি আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না।"[২]

বেদান্তের অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ভক্তহৃদয়ের এই বিরোধ, চিনি হওয়ার চেয়ে চিনির স্বাদগ্রহণের প্রতি এই পক্ষপাত— এর দ্বারাই ভবিষ্যতে দার্শনিক মননের ক্ষেত্রে ও ভক্তিবাদের প্রশস্ততর ভূমিকায় প্রতিমাপূজা ও প্রতীকোপাসনার মাধ্যমে হিন্দু সাধনার চিরাচরিত ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তির পথ খোলা রইল। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সাধনমগ্ন, বিবেকানন্দ মাতৃঅঙ্কশায়ী শিশু 'বিলে'।

জাতীয় ইতিহাস-চেতনার দিক থেকে বিচার করলে দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুধর্ম ও সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে ধীরগতিতে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের প্রস্তুতিই অনেক বেশি দূরদর্শিতার পরিচায়ক। ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সে ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে স্বল্পায়তন সরোবরে পরিণত হয়ে অচিরেই গণ-সংযোগ হারাল। ধর্ম ও সমাজের এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে না পেরেই উনিশ ও বিশ শতকের অধিকাংশ সংস্কারক ও প্রচারকেরা জাতির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারেন নি।

দেবেন্দ্রনাথের এই ইতিহাসদৃষ্টির অন্যতম প্রমাণ স্বরূপ তাঁর 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের

১, ২ কেশবচন্দ্রের পত্রাবলী : শ্রীমণিকা মহলানবীশ -সম্পাদিত।

পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' থেকে উদ্ধৃত অংশটি লক্ষণীয়— "হিন্দুধর্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম, ইহা সকলপ্রকার উন্নতি আপনাদের মধ্যে নিবিষ্ট করিতে পারে। অতএব হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহারদের মধ্যে থাকিয়াই ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এ দেশের ব্রাহ্মধর্মের প্রচার বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবে না। এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম এখানে স্থান পায় নাই; এই কারণেই মোসলমানেরা সাত শত বৎসর পর্যন্ত তরওয়ারের শাসনেও হিন্দুধর্মকে পরাস্ত করিতে পারে নাই; এজন্যই মায়াবী খ্রীষ্টানেরা শত বৎসর পর্যন্ত কৌশলজাল বিস্তার করিয়াও তাহাকে মুগ্ধ ও কুণ্ঠিত করিতে পারে নাই।··· আমা কর্তৃক দেশের উন্নতি হইবে— এই উৎসাহে লোকাচার দেশাচার উন্মূলন ও বিজাতীয় সভ্যতা আনয়ন করিবার নিমিত্তে সময়ের ব্যবধান সংকোচ করিতে গেলে আমারদের লক্ষ্য সিদ্ধি আরো সুদূরপরাহত হইবে।" মহর্ষির ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে, তবু পরবর্তী ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার্য।

মহর্ষির অনুগামীদের মধ্যে তাঁর চিন্তাধারার সবচেয়ে কাছাকাছি ছিলেন রাজনারায়ণ বসু— ইংরেজি-পাণ্ডিত্যের জন্য যাঁকে তিনি 'ইংরাজী খাঁ' উপাধি দিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রথম পর্বে মহর্ষির ঘরে এক দিকে উপনিষদপাঠরত রাজনারায়ণ ও অন্য দিকে বাইবেল-পাঠরত কেশবচন্দ্রের একটি দৃশ্য সহজেই কল্পনীয়। খ্রীষ্টধর্মের পাপবাদ-সমুদ্ভূত নীতিজ্ঞান সেকালের এবং একালেরও অনেক বুদ্ধিজীবীর কাছে এর নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত এনে দিয়েছে। খ্রীষ্ট-প্রভাবিত পাশ্চাত্যজীবনযাত্রায় এ নীতিজ্ঞানের কত দূর পরিচয় মেলে, সে কথা বাদ দিলেও ভারতীয় ধ্যান-ধারণা ও জীবনসাধনার সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের অভাবই অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হীনমন্যতার কারণ। সেদিক থেকে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতাটি আজকের দিনের ভারতীয়মাত্রেরই অনুধাবনযোগ্য। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা তখনই সফল হতে পারে, যখন স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা অটুট থাকে।

প্রতিটি ধর্মের ইতিহাস এক একটি জাতি বা গোষ্ঠির জীবনসাধনায় গড়ে উঠেছে। পরধর্ম যতই মহৎ হোক, আপন দেশের জল-মাটি-আকাশে তার বিস্তার ঘটে নি বলে স্বদেশ ও স্বজাতির জীবন ও মননের মধ্য দিয়ে তা বিকশিত হয় না— এই কারণেই তা ভয়াবহ। রাজা রামমোহন খ্রীষ্টান মিশনারীদের অসঙ্গত আক্রমণের বিরুদ্ধে এই জন্যই কলম ধরেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ মিশনারীদের ধর্মান্তরিতকরণের দুরভিসন্ধিকে ধিক্কৃত করে রাজা রাধাকান্তদেবের সঙ্গে মিলে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পাদ্রি আলেক্‌জাণ্ডার ডফের India and India's Missions গ্রন্থের সুচতুর কুৎসা ও বিদ্বেষপ্রচারের সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়েছেন, এমন কি প্রাণপ্রতিম কেশবচন্দ্রের খ্রীষ্টপ্রীতির আতিশয্যকে বারংবার সাবধানবাণীর দ্বারা সংযত করতে চেয়েছেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই স্বধর্মপ্রীতি আসলে স্বজাতিপ্রীতিরই আর একটি দিক এবং এই স্বধর্মে অবিচল থাকার দৃঢ়তাই পরবর্তীকালে 'হিন্দু-মেলা'র মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে সঙ্ঘবদ্ধতার শুভসূচনা করেছে।

'হিন্দু' শব্দটিই এ যুগে অনেকের কাছে সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক। দেবেন্দ্রনাথ বা রাজনারায়ণ কিন্তু সে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ অর্থে হিন্দুত্বের প্রতিনিধিত্ব করেন নি, তাঁদের স্বধর্মপ্রীতি ভারতীয় সংস্কৃতির মূল আদর্শকে ধারণ করেই অগ্রসর হতে চেয়েছিল। শয়নে স্বপনে অশনে বসনে পাশ্চাত্য অনুকরণের মাদকতা থেকে এইভাবেই ব্রাহ্মসমাজ আমাদের স্বাজাত্যবোধকে ধারণ ও পালন করেছেন, এবং এ কথাও স্মরণীয়

যে, স্বাধীনতা-উত্তর পাশ্চাত্যসর্বস্ব মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সে আদর্শের প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায় নি।

ইংরেজিতে লেখা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের চিঠি দেবেন্দ্রনাথ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ যত্র তত্র গজিয়ে ওঠা ইংরেজি-মাধ্যম বিদ্যালয়ের কল্যাণে মাতৃভাষায় ভাবের আদানপ্রদান বা উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনাও আমাদের দ্বারা অবাস্তব বলে উপহসিত হয়ে থাকে। আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসের এই দৈন্যের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষানিষ্ঠ মনোভঙ্গী এখনো এই বাংলাদেশেই রূপায়ণের প্রতীক্ষায়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা এবং দেবেন্দ্রনাথের বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনার কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শুধু ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সেকালের উচ্চবিত্ত-সমাজে ইরেজরাজপুরুষদের সান্নিধ্যমাত্রের যে পরম স্পৃহনীয়তা ছিল, দেবেন্দ্রনাথের আত্মসম্মানবোধের স্বাতন্ত্র্য তাকে পুরোপুরি বর্জন করে চলেছে। এক্ষেত্রেও অনুগামী কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সহজেই লক্ষণীয়। পাশ্চাত্যসমাজের সঙ্গে সখ্যস্থাপনের দ্বারা কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষকে অনেক পরিমাণে বিশ্বমুখী করে তুলেছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য-বোধে যে জাতীয়তার অঙ্কুর বিকশিত, ভারতের নবজাগরণে তা ভারসাম্য স্থাপনে সহায়ক। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই দোটানা দ্বন্দ্ব ভারতীয় জীবন ও মননে মৌল সমস্যাগুলির অন্যতম। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত যতই সংযুক্ত হোক, প্রতিটি প্রান্তের নিজস্ব বাণী রয়েছে এবং থাকবে। ভারতীয় জীবনদর্শন, সাহিত্য, আচারপদ্ধতি— এ সব-কিছুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মূলে যে ভারতচেতনা— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তারই নবজাগরণের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক। স্বভাবতই ভারতবর্ষের উপনিষদের সঙ্গে মিলেছে ইসলামের মরমী সাধনার বাণী।

অধ্যাত্মসাধনার মুক্তাকাশে তাঁর আত্মার বিচরণ, তবু প্রতিদিনের জীবনচর্যায়, জাতি ও সমাজের সংগ্রামে, সঙ্ঘবদ্ধ সত্যান্বেষীদের সুনিশ্চিত নেতৃত্বে, আপন অন্তরতম আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বিশালতা এই সার্ধ শতাব্দীর পার থেকেও সমান অনুভব করা যায়। বরং সমকালীন ও পরবর্তী অনেক খ্যাত ও বিখ্যাতদের তুলনায় তাঁর সত্যসংকল্প হৃদয়ের স্বচ্ছতর দৃষ্টির আলোক আজও ভবিষ্যতের পথনির্দেশে অমোঘ ও অভ্রান্ত।

"আমাদের সকল আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তিনি ছিলেন একা যেমন একা সৌরপরিবারে সূর্য— স্বীয় উপলব্ধির জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে তিনি আত্মসমাহিত থাকতেন।"[৩] এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য—"যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে-পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া উদ্বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়া ছিলেন, কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।"[৪]

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে দেবেন্দ্রনাথের এই পরিচয় তাঁর জীবনক্ষেত্রের ব্যাপকতর পটভূমিতেও সমান সত্য। তাই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্ম হয়েও সামগ্রিক পরিচয়ে হিন্দু, যে ব্রাহ্মসমাজ তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করেছেন তার

৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, চারিত্রপূজা, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৩৮০

৪ জীবনস্মৃতি: হিমালয় যাত্রা।

ত্রিধাবিভক্ত সত্তাও তাঁরই মধ্যে এসে মিলনের মধ্যবিন্দু খুঁজে পায়, আত্মার অনুসন্ধানে মগ্ন থেকেও লোকশ্রেয়ের সাধনায় তাঁর নিরলস উদ্যম ও উৎসাহ।

অনুগামী রাজনারায়ণ যখন তাঁর সহোদর ও জেঠতুত দুই ভাইয়ের বিধবাবিবাহে উদ্যোগী হলেন পশ্চিম-ভারতে ভ্রমণরত দেবেন্দ্রনাথ তখন তাঁকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, "এই বিধবাবিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়।"[৫] 'আত্মচরিতে' রাজনারায়ণ লিখেছেন— "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায় এই বাক্য এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জনসাধারণবাক্য হইয়া পড়িয়াছে।"[৬] সাধক দেবেন্দ্রনাথের জীবনও এই কথারই সুন্দরতম প্রমাণ।

ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে ধীর ও নিশ্চিত গতিতে যে সব পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তাকে ঈশ্বরের অভিপ্রেতরূপে স্বীকৃতি দেওয়ার উৎসাহ তাঁর ছিল, তবু অন্যের চিন্তার উপর জোর করে নিজের চিন্তা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা ছিল না। প্রধানত উপনিষদ-অবলম্বনে দেবেন্দ্রনাথ নিজস্ব পদ্ধতিতে যে ধর্মমত গড়ে তুলেছিলেন, তার সাধনপদ্ধতিও স্বভাবত তাঁর নিজস্ব। জীবনের সব কাজেই তাঁর ব্রহ্ম-সমর্পিত অন্তরে ঈশ্বরের আদেশরূপে অনুভবের প্রচেষ্টা ছিল। এ দিক দিয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য শিবনাথ শাস্ত্রী এভাবে লক্ষ্য করেছেন— "আমি কেশববাবুর কোনো কোনো মত লইয়া সর্বদা তর্ক উপস্থিত করিতাম। এই তর্ক অনেক সময়েই কেশববাবুর সাক্ষাতে হইত। তন্মধ্যে আদেশের মত লইয়া বড়ো তর্ক হইত। কেশববাবু তাঁহার সমুদয় কার্য যেরূপ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া উপস্থিত করিতেন, এবং সকলকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে বলিয়া উপদেশ দিতেন, তাহাতে আমার মনে ভয় হইত যে, তাঁহার সঙ্গের লোকের চিন্তার স্বাধীনতা নষ্ট হইবে। হয় তাঁহার আদেশ ফর্জ করিতে হইবে, নতুবা নিজের হাত পা বাঁধিয়া তাঁহার হাতে আপনাকে দিতে হইবে। আমি কেশববাবুকে বলিতাম 'আপনি আদেশ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, সেইভাবে কাজ করিয়া যান। আমরা আদেশ বলিয়া লইতেছি কিনা, দেখিবেন না।' তিনি আমার কথার প্রতি কর্ণপাত করিতেন না। ইহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে মুখে ও চিঠিপত্রে তর্ক হইত। আমি মানবচিন্তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইতাম। তাঁহাকে বলিতাম, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তো তাঁহার সকল কাজ ঈশ্বরাদেশ বলিয়া নির্বাহ করিয়াছেন। কই, তিনি তো তাহা অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই, অন্যে সে ভাবে না লইলে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই?'"[৭]

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণেও দেবেন্দ্রনাথের এই স্বাধীনতাদানের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। আদিব্রাহ্মসমাজ যে অনেকটাই পারিবারিক গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল তার কারণও অনুগামীদের নিজস্ব পথসন্ধানের অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার আদর্শ। আদর্শ যাই হোক ব্যক্তিগত বিচ্ছেদের বেদনা তো অস্বীকার করা চলে না। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে দেবেন্দ্রনাথ তাই সমাজ-জীবন থেকে অনেক পরিমাণে দূরে সরে গেলেন। হিমালয়ের স্নেহবক্ষে এই নির্জনবাস তাঁর সত্যোপলব্ধির পথে সবচেয়ে সহায়ক হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই আত্ম-সংহরণ একান্ত ব্যক্তিগত

৫, ৬ রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৯৯

৭ শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত, সিগনেট সংস্করণ, পৃ. ১১৫

সাধনা বলে মনে হলেও মহর্ষির শেষজীবনে যাঁরা তাঁর ধ্যান ও সাধনার পরিচয় পেয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তেমন বহু জনের সাক্ষ্য-অনুযায়ী এই সময়েই ভারতবর্ষের ঋষির আনন্দঘন প্রশান্তি তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এমন এক একটি জীবনের স্পর্শেই গ্রন্থবদ্ধ সত্য বাস্তব প্রত্যক্ষতা লাভ করে। দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এই শেষার্ধের সঙ্গেই কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয়। পিতার অধ্যাত্মসাধনতন্ময় জীবনের দিক্‌টি তিনি যে পরিমাণে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁর প্রথম-জীবনের সংগ্রাম ততখানি দেখবার সুযোগ হয় নি। কিন্তু মহর্ষির জীবনের পরিণতরূপটুকুই তাঁর সমগ্রসত্তার লক্ষ্য এবং সারাংশ। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ অশেষ সৌভাগ্যবান। পিতৃসান্নিধ্যে হিমালয়-ভ্রমণের স্মৃতিকথায়— "তীব্র শীতের প্রত্যূষে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁকে দেখতুম বাতিহাতে। তাঁর দীর্ঘদেহ লাল একটা শালে আবৃত করে তিনি আমায় জাগিয়ে দিয়ে উপক্রমণিকা পড়তে প্রবৃত্ত করতেন। তখন দেখতুম, আকাশে তারা, আর পর্বতের উপর প্রত্যূষের আবছায়া অন্ধকারে তাঁর পূর্বাস্য ধ্যানমূর্তি, তিনি যেন সেই শান্ত স্তব্ধ আবেষ্টনের সঙ্গে একাঙ্গীভূত। এই কদিন তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য সত্ত্বেও এটা আমার বুঝতে দেরি হত না যে, কাছে থেকেও তাঁর নাগাল পাওয়া না।"[৮]

এই হিমালয়েরই পটভূমিকায় আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর আর একটি স্মৃতিচিত্র— "একবার তিনি হিমালয় পর্বতে নির্জনে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তখন সেখানে গমন করি। কথাপ্রসঙ্গে তিনি উপনিষদের একটি অতি পরিচিত স্তোত্র—ব্রহ্ম যেখানে সত্যম্ রূপে বর্ণিত, সেটি আমার সম্মুখে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। স্তোত্রটি আমি নিজেও বহুবার উচ্চারণ করিয়াছি, অন্যের নিকট হইতেও বহুবার শুনিয়াছি, কিন্তু মহর্ষির মুখনিঃসৃত স্তোত্র হইতে সেদিন যেন ইহার মর্ম নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম! বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম, সূত্রটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখমণ্ডলে এক অপার্থিব উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল, কেশরাশি যেন এক অনির্বচনীয় পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া চলিলেন, আর আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

"অতঃপর আমার প্রতি চাহিয়া মহর্ষি প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন—'আজ তোমার সামনে যে কথাগুলি বলছি তা তুমি বহুবার শুনেছ, এমন কি নিজেও একাধিকবার উচ্চারণ করেছ। কিন্তু তুমি জান কি, এই শব্দের অন্তরালে কি গভীর সত্য নিহিত রয়েছে? আমার সমগ্র চিত্ত এই সত্যরসে মধুময় হয়ে উঠেছে।—সেদিন তাঁহার বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিলাম। মনে হইল এতকাল শব্দ উচ্চারণই করিয়াছি মাত্র, ইহার নিহিতার্থ কোনো দিন উপলব্ধি করি নাই।"[৯]

দেহাবসানের অল্প কিছুদিন আগে শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে মহর্ষি তাঁর অন্তর্জগতের যে পরিচয় দিয়েছিলেন— "আমার অবস্থা কিরূপ জান? ঝাঁপিয়ে পড়েছি কূলহীন অনন্ত সমুদ্রে, কিন্তু তার কোনো ঠিকানা এখনও পাই নি। অধ্যাত্মসাধনার ফলে যে নূতন সত্যের জগৎ আমার জীবনে নেমে এসেছে তাকে ব্যক্ত করবার মতো ভাষা আমার জানা নেই। সে অনন্ত, অব্যক্ত।"[১০]— সে পরিচয় তাঁর অধ্যাত্ম-উপলব্ধির গভীরতারই ধ্রুব নিদর্শন।

---

৮ চারিত্রপূজা

৯, ১০ Men I have Seen অনুবাদ: মহান পুরুষদের সান্নিধ্যে: মায়া রায় পৃ. ৫৩-৫৪; পৃ. ৫৫

দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে নানা বিতর্ক ও সংশয় স্বাভাবিক। কিন্তু যে ভগবৎপ্রাণতায় এঁরা সমসাময়িক সমাজজীবনে এক নির্লোভ নীতিপরায়ণতার বিশুদ্ধি সঞ্চার করেছিলেন, তার সার্থকতা এ যুগের উত্তরাধিকারীদের অবনতশিরে স্বীকার করতে হয়।

দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে ভাবতন্ময়তা ও কর্মকুশলতার এক অপূর্ব মিশ্রণ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে তাঁর এই গুণটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিকশিত পুত্র-রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কর্ম -সাধনায়। 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় এই কনিষ্ঠ পুত্রটির চিন্তাজগতের সব কটি বাতায়ন খুলে দেবার যে প্রচেষ্টা দেখি, তার মধ্যে জীবনের পরিপূর্ণতা সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণারই প্রকাশ। মানবজ্ঞানের বিভিন্ন বিচিত্র বিকাশের সঙ্গে তিনি নিজে পরিচিত ছিলেন, সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থায়ও সে আদর্শই স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি যে সাহিত্য শিল্প সংগীতকলার তীর্থভূমি হয়ে উঠেছিল, সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই সহৃদয়হৃদয়সংবাদে। ঠাকুরবাড়ির প্রতিটি উৎসবে অনুষ্ঠানে, এমন কি ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও মহর্ষির পরিকল্পনা থেকেই শ্রী ও সৌন্দর্যের একটি আদর্শ সঞ্চারিত হয়েছিল। যথার্থ আভিজাত্যের পরিচ্ছন্ন রুচির সঙ্গে নির্মল আধ্যাত্মিকতার সংযোগে দেবেন্দ্রনাথ সমকালীন সমাজে নানা দিক থেকেই অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিলেন।

আর এ সব-কিছুর পিছনে ছিল তাঁর কর্মনিপুণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী। যে কর্মদক্ষতায় তিনি বিনষ্ট পিতৃ-সম্পত্তির উদ্ধার ও উন্নতিসাধন করেছিলেন, সে কর্মশক্তিরই আর-একটি রূপ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্ঘবদ্ধতায়, তত্ত্ববোধিনীসভা স্থাপনে ও তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সম্পাদকের পদে তাঁর কৃতিত্বের কথা ঐতিহাসিকেরা একবাক্যে স্বীকার করেন। একেবারে শেষ-বয়সের দিকেও সংসার পরিচালনার তুচ্ছতম খুঁটিনাটি তাঁর নখদর্পণে থাকতো—"স্বাস্থ্যভঙ্গের সময় তিনি যখন কলকাতায় ছিলেন তখন আমার যুবকবয়সে তাঁর কাছে প্রায়ই বিষয়কর্মের ব্যাপার নিয়ে যেতে হত। প্রতি মাসের প্রথম তিনটে দিন ব্রাহ্মসমাজের খাতা, জমিদারির খাতা নিয়ে তাঁর কাছে কম্পান্বিত কলেবরে যেতুম। তাঁর শরীর তখন শক্ত ছিল না, চোখে কম দেখতেন, তবুও শুনে শুনে অঙ্কের সামান্য ত্রুটিও তিনি চট করে ধরে ফেলতেন।"[১১]

এ যেমন সাংসারিকতার নৈপুণ্য, তেমনি আর-এক ধরণের নিপুণতা দেখি সমকালীন দিক্‌পাল চিন্তা-নায়কদের মধ্যে তত্ত্ববোধিনীসভাকে কেন্দ্র করে এক বিদগ্ধ গোষ্ঠীরচনার প্রচেষ্টায়। এই সভায় বিশিষ্ট সদস্যদের কথা এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করা যায়—"জোড়াসাঁকোর এক নিভৃত কুঠুরীতে অথবা সুকিয়া স্ট্রীটের কোনো গৃহে তত্ত্ববোধিনীসভার বাহ্যাড়ম্বরশূন্য অধিবেশন হলেও, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিশেষে ভোরের সূর্যের মতো তার কিরণ সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্র আলোকিত করে তুলেছিল।… প্রধানত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের স্তরেই এই আলোক প্রসারিত হয়েছিল। নোঙরহীন মন ও দিকভ্রান্ত চিত্ত যেন একটা আলোকোজ্জ্বল দ্বীপের সন্ধান পেয়েছিল তত্ত্ববোধিনীসভার মধ্যে। তাই দেখা যায় কবি ঈশ্বর গুপ্তের মতো মধ্যপন্থী স্বভাবকবি থেকে আরম্ভ করে অক্ষয়কুমার দত্তের মতো নিখাদ বস্তুবাদী বুদ্ধিজীবী,

---

১১ চারিত্রপূজা

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো নির্ভীক সমাজসংস্কারক, রামগোপাল ঘোষের মতো বিচক্ষণ ডিরোজীয়ান, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো একনিষ্ঠ জ্ঞানতপস্বী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো স্বধর্মনিষ্ঠ সদাচারী ঐতিহ্যবাদী, সকলেই একে একে তত্ত্ববোধিনীসভার বন্দরে তাঁদের মানসতরীটি ভিড়িয়েছিলেন।"[১২]

উদ্ধৃত অংশে যাঁদের নাম করা হয়েছে, তাঁরা সকলে যে সব বিষয়ে একমত হতেন না, একথা বলাই বাহুল্য। মতপার্থক্যের দরুণ শেষ অবধি তত্ত্ববোধিনীসভা তো তুলেই দিতে হয়। তবু, স্বীকার করতেই হবে যে, এতবড়ো বিদ্বজ্জনসভা সেকালে বা একালেও সমান দুর্লভ।

হিন্দুকলেজের দুই প্রাক্তন ছাত্র— দেবেন্দ্রনাথ ও ভূদেব— এঁদের দুজনের মানস-সাধর্ম্য একদিক থেকে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সমসাময়িক তারুণ্যের ঘূর্ণিস্রোতে এ দুই চিন্তানায়ক স্বদেশ ও স্বধর্মের ভারকেন্দ্রে অবিচল ছিলেন। এঁদের পথ হয়তো এক ছিল না। কিন্তু যে ভারততীর্থ এ দুজনেরই অন্বিষ্ট, তার মূলগত ঐক্য প্রশ্নাতীত। তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিভাত্রয়ী দেবেন্দ্রনাথ-রাজনারায়ণ-অক্ষয়কুমার বাংলাসাহিত্যে অক্ষয় আসনের অধিকারী। দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিবাদে যুক্তি সঞ্চার করেছেন বলে অক্ষয়কুমার উনিশ শতকের চিন্তাধারার ইতিহাসে বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যখন থেকে বেদ ও উপনিষদের মন্ত্রমালাকে নিজের সহজাত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে শুরু করেছেন, তখন থেকেই তিনি বিচারমূলক পন্থা গ্রহণ করেছেন। অক্ষয়কুমারের দ্বারা সেই বিচারবোধই প্রখরতর হয়েছে মাত্র।

আসলে অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম উপলব্ধির জগৎকে কতটা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করতেন সে বিষয়েই সন্দেহ জাগে। বিজ্ঞান ধর্মের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' যতই করা যাক-না কেন, অধ্যাত্মসাধনার পন্থানির্ণয়ে তা সব সময়ই বহিরঙ্গ। এ কথা ঠিক যে, অক্ষয়কুমারের সম্পাদনার ফলেই ধর্ম সাহিত্য বিজ্ঞান রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে জ্ঞানচর্চা ও স্বদেশসমাচার তত্ত্ববোধিনীপত্রিকাকে শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টিতে একটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকারূপে সমাদরণীয় করে তুলেছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের প্রধান তন্ত্রীটি যে অধ্যাত্ম উপলব্ধির পর্দায় বাঁধা ছিল, তার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকের একাত্মতা সম্ভব হয় নি। সমগ্র বিশ্বরূপ বেদের অন্তরালে রয়েছে আত্মানুভূতির চিরন্তন বেদ। বাংলাসাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথ সেই উপলব্ধির বাণীই বিতরণ করেছেন 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' ও 'স্বরচিত জীবনচরিতে'র মাধ্যমে।

প্রার্থনার মূল্য সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের সেই বিখ্যাত সমীকরণটির কথা মনে রেখেও বলা যায় দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র শিবনাথের ব্রাহ্মসমাজ এই প্রার্থনার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। অনন্ত সত্যের সঙ্গে সান্ত মানবপ্রাণের সেতুবন্ধনই প্রার্থনা। অসত্য থেকে সত্যের অভিমুখে, তমসা থেকে জ্যোতির পরপারে, মৃত্যু থেকে অমৃতের উদ্দেশে নিখিল মানবকে আহ্বানের যে সাধনা ভারতবর্ষের, সে সাধনাই দেবেন্দ্রনাথের সীমিত ব্যক্তিসত্তার। আর এই আহ্বানই সব মহৎ সাহিত্যের ভিত্তি, সব সার্থক রচনার প্রাণশিল্প।

---

১২ সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : ২য় খণ্ড : সম্পাদকীয়

দেবেন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গিমায় প্রত্যয়ের সেই ঋজুতা ও অনুভবের মধুময় লাবণ্য— এ দুয়ের এত সার্থক মিলন ঘটেছে যা সমকালীন বাংলাসাহিত্যে আর কোথাও সম্ভব হয় নি। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রগদ্যরীতি যতটা ঋণী, দেবেন্দ্রনাথের কাছে তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। সমসাময়িক আর সব আত্মজীবনীর তুলনায় দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত অনেক বেশি অন্তর্মুখী, আর সব কথা ছাপিয়ে গেছে তাঁর সাধনার কথা। 'জীবনস্মৃতি'র লেখক রবীন্দ্রনাথও এই অন্তর্মুখী পদ্ধতিই অনুসরণ করে তাঁর কবিসত্তার উন্মেষের ইতিহাস লিখে গেছেন, সমকালীন যুগ ও জীবন তারই প্রসঙ্গসূত্রে স্থান পেয়েছে। দুটি আত্মজীবনীই জীবনের সিংহদ্বারে এসে থেমেছে, দুটিই ইঙ্গিতে পরিসমাপ্ত। দেবেন্দ্রনাথের জীবন-শিল্পে সাহিত্য অন্যতম উপকরণ, রবীন্দ্রজীবন-শিল্পে সাহিত্যই প্রধান অবলম্বন। তবু মহৎজীবনের স্পর্শে মহৎসাহিত্যের উদ্ভবের দৃষ্টান্ত পিতাপুত্র দুজনের রচনাতেই মেলে।

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথের ভারতচেতনার শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপ তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যখানি মহর্ষির উদ্দেশে উৎসর্গিত—

পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ করিলাম।

এ নৈবেদ্য স্বয়ং বিশ্বপিতার প্রসাদধন্য। রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনাই সংহতরূপে সমগ্র ভারতবর্ষের সাধনারূপে প্রতিভাত।

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

এ আদর্শ যেমন ব্যক্তি দেবেন্দ্রনাথের, তেমনি নিত্য ভারতবর্ষের। এই শান্তরসের সমাহিত উপলব্ধির যুগ পার হয়ে 'খেয়া'র শেষে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছেছিলেন 'গীতাঞ্জলি'র যুগে। উপনিষদের পরে এল বৈষ্ণব লীলাবাদের আধুনিক রূপান্তর। তবু আনুষ্ঠানিকভাবে রাধা-কৃষ্ণের প্রতীক রবীন্দ্রকাব্যে অতি সামান্য পরিমাণেই ব্যবহৃত। দেবেন্দ্রনাথের সূফী মরমিয়া সখ্যরসের প্রতি আগ্রহ রবীন্দ্রকাব্যে ব্যক্তি ও ঈশ্বরের বিচিত্র হৃদয়রঙ্গের অন্যতম উৎস; কিন্তু সেই কারণেই রূপাতীতকে কোনো নির্দিষ্ট প্রতীকে বা মূর্তিতে আবদ্ধ করার তাঁর একান্ত অনভিপ্রায়। 'রাজা' বা 'অরূপরতনে'র মতো অধ্যাত্মব্যঞ্জনাময় নাটকে তাই চোখের আলোয় 'রাজা'র দেখা মেলে নি। তরুণ বয়সে লেখা তাঁর গান 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে'— অন্যান্য গানের সঙ্গে যা শুনে দেবেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন— সে গান এবং সে যুগে রচিত রবীন্দ্রনাথের সব ব্রহ্মসংগীতই তো মহর্ষির অনুপ্রেরণায় বিকশিত।

ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যর উদাহরণসত্ত্বেও বলা যায়, জ্ঞানমার্গীদের চেয়ে ভক্তিপন্থীরাই সংসার ও ব্রহ্মের সেতুসংযোগ সম্ভবপর করে তুলেছেন। সেদিক থেকে ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ সংসারের কর্তব্য এবং নির্জনবাসের সাধনা— এ দুয়ের মধ্যেও এমন এক অন্তরঙ্গ যোগস্থাপন করতে

পেরেছেন যার দ্বারা বহুযুগের উপেক্ষিত ভারতের গার্হস্থ্যধর্মের সাধনায় এক নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। বৌদ্ধযুগের সময় থেকেই কৃত্রিমভাবে ধর্মসাধনার দায়িত্ব একমাত্র সন্ন্যাসীদের উপরেই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যথার্থ সন্ন্যাসের অধিকারী সব দেশের সব সমাজেই বিরল। খ্রীষ্টধর্মের সন্ন্যাসবাদ যেমন বহুকাল প্রাচীন গ্রীসের প্রেরণাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু সন্ন্যাসবাদও তেমনি অনেক পরিমাণে প্রাচীন ভারতের সামগ্রিক জীবনবোধকে জাতির দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এদিক থেকে বিচার করলে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম-আন্দোলন কেবল যে খ্রীষ্টধর্মের রবাহুত আধিপত্য থেকেই আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে, তা নয়, ভারতীয় ধারণায় সন্ন্যাসের একাধিপত্য থেকেও আধুনিক মনকে অনেকপরিমাণে মুক্ত করেছে।

প্রসঙ্গত 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা'র সম্পাদক-নিয়োগ প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয়— "...অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর; আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জুট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃ-সন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।"[১৩]

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পত্রিকার উন্নতি হলেও সম্পাদক সম্বন্ধে অভিপ্রায়টি সফল হয় নি— "তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম, এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর, তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ;— আকাশ পাতাল প্রভেদ!"[১৪]

শুধু অক্ষয়কুমারের সঙ্গে বা ব্রহ্মসমাজের কনিষ্ঠ সভ্যদের সঙ্গেই যে দেবেন্দ্রনাথের মতপার্থক্য ছিল, তা নয়, এক হিসাবে সমকালীন হিন্দুধর্মের চিরাগত ধ্যানধারণার সঙ্গেই তাঁর মৌলস্বাতন্ত্র্য। তথাকথিত পৌত্তলিকতা এবং সন্ন্যাস— এ দু'দিক থেকেই দেবেন্দ্রনাথের ভিন্ন মত শুধু আদিব্রাহ্মসমাজকেই নয়, সমগ্র ব্রাহ্ম আন্দোলনকেই ভারতীয় জীবনদর্শনের বিচিত্র সমৃদ্ধি থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে। পৌত্তলিকতা এবং প্রতিমাপূজার পার্থক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন না তুলেও বলা চলে, পুরাণ-কাহিনীর প্রতীক-ধর্ম অবলম্বনে এ দেশে ভক্ত সাধক ও মহাপুরুষদের এত অজস্র উদাহরণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে যে, তাকে অস্বীকার করলে সমাজের বেশির ভাগ মানুষের প্রাণচেতনাই অস্বীকৃত থাকে। ফলে মুষ্টিমেয় ব্রহ্মবাদীদের মতামত গণস্বীকৃতির অভাবে ক্রমেই স্বল্পপরিমাণ শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বুদ্ধিগত চর্চায় পরিণত হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম অনুভবের গভীরতা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়; তবু ক্রমেই বহিরঙ্গ মতামতের স্বাতন্ত্র্যবোধ যে সহজেই ব্রাহ্মসমাজকে বিচ্ছিন্ন করেছিল, তার কারণ মানবমনের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্রাহ্মনেতৃবৃন্দের উপেক্ষা। পৌত্তলিকতা ও ভগবদ্ভক্তির পার্থক্য সম্পূর্ণ মুছে ফেলার প্রয়াসই সেই উপেক্ষার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ।

১৩, ১৪ আত্মজীবনী: দেবেন্দ্রনাথ: সপ্তম পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাস সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর উজ্জ্বলতম উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথেরও মতৈক্য সহজেই লক্ষণীয়। 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি' সম্বন্ধে দু'জনেরই অনীহার কারণ মুলতঃ বৈরাগ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়, যে স্থূলভ বৈরাগ্যের বহিরাবরণ অধিকাংশক্ষেত্রে ভ্রান্ত জীবনবোধেরই পরিচায়ক তারই বিরুদ্ধে এঁদের আপত্তি। কিন্তু আদর্শ মাত্রেরই একটি স্বাভাবিক বহিরঙ্গ রূপায়ণ আছে। তরুতলবাস, জটাজূটধারণ, গৈরিকবেশ— এ সব সেই অন্তরতম অনাসক্তিরই প্রতীকমাত্র। ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা এগুলিকে অস্বীকার করা যায়, তেমনি ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রের কারণেই এদের স্বীকৃতিও দিতে হয়।

দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনে বাইরের কোলাহল যত নীরব হয়ে এসেছে, অন্তরে অনন্তের অনুভব তত প্রসারিত হয়েছে। এই অনুভবই যখন জীবনের সর্বময় সত্যে পরিণত হয়, তখন ক্ষণসত্যের দেশকালে আবদ্ধ চিহ্নগুলি আমাদের জীবন থেকে মুছে যায়— 'চিহ্নধারী সন্ন্যাস' সেই পরিবর্তনেরই সূচনা। হিন্দুশাস্ত্রে বিদ্বৎসন্ন্যাস ও বিবিদিষাসন্ন্যাসের পার্থক্য এক্ষেত্রে স্মরণীয়। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে সন্ন্যাসী হন তাঁরাই আসল সন্ন্যাসী। তাঁদের পক্ষে সংসার বা অরণ্য দুইই সমান হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু যাঁরা পরমসত্যলাভের জন্য সর্বস্বত্যাগ করতে চান, তাঁদের পক্ষে নির্দিষ্ট বিধি-অনুসারে ত্যাগের পথে অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়— চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস তাঁদের একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য যোগ্যতার প্রশ্ন সবসময়ই রয়েছে এবং থাকবে। তবু বুদ্ধ-শংকরের দেশ ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের বহিরঙ্গ আবরণ মানুষের অন্তরতম অনুসন্ধানেরই প্রতীক।

দেবেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের সায়াহ্নপর্বে উনিশ শতকের সপ্তম অষ্টম দশক থেকেই ধীরে ধীরে হিন্দুসাধনার মর্মবাণী পুনরুদ্ধারের নবপ্রয়াস দেখা দিতে থাকে। বেদ এবং উপনিষদের চর্চার দ্বারা রামমোহন এবং আদিব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দই এ প্রয়াসের প্রথম উদ্যোক্তা। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের সাধনার যুগ পার হয়ে এল পুরাণ-প্রতিমা-অদ্বৈতবাদের নবমূল্যায়ন। হিন্দুয়ানির দেশাচার লোকাচারকে নানা বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক ব্যাখ্যায় ঢেলে সাজবার চেষ্টা তার একটি দিক, আর-একটি দিক সাধনার দ্বারা পরমসত্যের প্রত্যক্ষ স্পর্শলাভের প্রেরণা।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগাযোগের অনেক আগেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের কথা রয়েছে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের প্রথম খণ্ডে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের প্রথমপর্বে তাঁর অনুরাগী 'রসদদার'দের অন্যতম রানী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস হিন্দুকলেজে দেবেন্দ্রনাথের সতীর্থ ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুরাগের কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁকে দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, মথুরামোহন তখন স্বভাবতঃই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার ভার সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ— "…সেজোবাবু আমার কথা বল্লে, ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন— ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল। আমি লক্ষণ দেখবার জন্য দেবেন্দ্রকে বল্লুম, 'দেখি গা, তোমার গা'। দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুল্লে, দেখলাম— গৌরবর্ণ, তার উপর সিঁদুর ছড়ানো। তখন দেবেন্দ্রের চুল পাকে নাই।

"প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখেছিলাম। তা হবে না গা? এত ঐশ্বর্য, বিদ্যা, মান, সম্ভ্রম? অভিমান দেখে সেজোবাবুকে বল্লুম, আচ্ছা, অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তার কি 'আমি পণ্ডিত', 'আমি জ্ঞানী', 'আমি ধনী' বলে অভিমান থাকতে পারে?

"দেখলাম যোগ ভোগ দুইই আছে; অনেক ছেলেপুলে ছোট ছোট ডাক্তার এসেছে, তবেই হ'লো এত জ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়। বল্লুম, তুমি কলির জনক। 'জনক এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি'। তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছো শুনে তোমায় দেখতে এসেছি; আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও।

"তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শুনালে। বল্লে এই জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মত, আর জীব হয়েছে—এক একটি ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ঐরকম দেখেছিলাম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিল দেখে ভাবলুম, তবে তো খুব বড় লোক। ব্যাখ্যা ক'রতে বল্লাম—তা ব'ললে 'এ জগৎ কে জানতো?—ঈশ্বর মানুষ করেছেন, তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।'

"অনেক কথাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুসী হয়ে বল্লে 'আপনাকে উৎসবে (ব্রাহ্মোৎসবে) আসতে হবে'। আমি ব'ল্লাম, 'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা; আমার তো এই অবস্থা দেখছো!—কখন কিভাবে তিনি রাখেন।' দেবেন্দ্র বল্লে, 'না আসতে হবে; তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো,—তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু ব'ল্লে আমার কষ্ট হবে।' আমি বল্লাম, 'তা পারবো না। আমি বাবু হতে পারবো না।' দেবেন্দ্র, সেজোবাবু সব হাসতে লাগলো।

"তার পর দিনই সেজোবাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠি এলো—আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ করেছে। এলে অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না।"[১৫]

দেবেন্দ্রনাথ-শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে লক্ষণীয় চিহ্নধারী সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণও নন, যদিচ আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অপরপক্ষে সাধারণ সন্ন্যাসীর মতো স্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও নন। তবু জীবনদর্শনের দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ মূলতঃ সন্ন্যাসী, দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ গৃহী। তাই সামাজিকতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপেক্ষা দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে অভাবিত। আবার প্রতিমাপূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ রূপমূর্তিতে যে সত্যলাভ করেছেন তারই চরম পরিণতি তাঁর অদ্বৈতপোলব্ধির দিব্যচেতনায়। ভারতসাধনার বিভিন্ন স্তর শ্রীরামকৃষ্ণ-মননে এসে পূর্বাপর সামঞ্জস্য পেয়েছে। স্বভাবতঃই পরবর্তীকালের হিন্দুসমাজ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্ন্যাসী-শিষ্য বিবেকানন্দের মাধ্যমে ভারতীয় ধ্যানধারণার আর-একটি প্রকাশ দেখতে পেয়েছে, যার সঙ্গে গোটা দেশের ও জাতির মানস-ঐতিহ্যের মিল অনেক বেশি। 'নবজাগরণ'-অর্থে যদি আত্মোপলব্ধির সূচনা বোঝায়, তাহলে রামমোহনের মননশীলতা থেকে ক্রমপ্রসারিত-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান ও মনন অবধি বর্তমান ভারতের রেনেসাঁসের সূচনা।

নবযুগের বাংলার মানস-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে'র দ্বাদশ পরিচ্ছেদটির নাম দিয়েছেন—'ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের হ্রাস ও হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সূচনা'। ১৮৭০ থেকে ১৮৭৯ অবধি এই দশকটিতেই কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মদের মধ্যে বিচ্ছেদ তীব্রতর হয়, তারও আগে বিবাহপদ্ধতি নিয়ে যে পৃথক আইনের প্রয়োজন কেশবচন্দ্র অনুভব করেছিলেন, তার দ্বারাই আদি ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজের সঙ্গে তরুণগোষ্ঠীর মতভেদের স্থায়ী ভিত্তি রচিত হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে—"চিন্তা করিয়া যতদূর অনুভব করিতে

---

১৫ শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ১ম খণ্ড : ১৮৮৪, ২৬শে অক্টোবরের দিনলিপি

পারি এই সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল।”

বাংলা ও ভারতের মননেতিহাসে ১৮৮০ থেকে ১৯০২ অবধি শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাব যে ইতিহাস রচনা করেছে, রামতনু লাহিড়ীর জীবন-কেন্দ্রিক শিবনাথ শাস্ত্রীর গ্রন্থে তার আলোচনা সম্ভব ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রমুখ হিন্দু-ঐতিহ্যের চিন্তানায়কদের অনুসরণ করলে এ কথা বেশ বোঝা যায় যে প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষে এক নূতন মননভূমির সৃষ্টি হতে চলেছে, পরবর্তী জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার মূল আধারশক্তিরূপে যার পরিণতি। দেবেন্দ্রনাথের দেহাবসান ১৯০৫এর জানুয়ারী। সুতরাং সুদীর্ঘ অষ্টাশীবৎসরের জীবনে তিনি বাংলার মননজগতের পটপরিবর্তন নানাভাবে নানাদিক থেকেই লক্ষ্য করেছেন।

তরুণ নরেন্দ্রনাথ দত্ত একদা সত্যসন্ধানের প্রেরণায় তাঁর কাছেও যাতায়াত করেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হলেও নরেন্দ্রনাথ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুবর্তীদের আরো অনেকেরই প্রথম-জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র শিবনাথ বিজয়কৃষ্ণ—এঁদের কল্যাণপ্রদ প্রভাব বিশেষভাবেই স্বীকার্য। তবে যে প্রসারণশীল হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক হবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ দেবেন্দ্রনাথ চিরকালই করে এসেছেন, সেই হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত প্রেরণাই এঁদের ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডী অতিক্রম করে ভারতবর্ষের বিশালতর অধ্যাত্ম-ঐতিহ্যের পথে আহ্বান করেছে। কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ড-পরিভ্রমণের পর বিবেকানন্দের আমেরিকা-য়ুরোপ পরিক্রমা—এই দুই সাংস্কৃতিক দৌত্যের ঘটনাও দেবেন্দ্রনাথের জীবৎকালেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-সংযোগের শুভসমাচার। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যে অন্তরঙ্গতা ছিল তার ফলে কেশবচন্দ্রের প্রতীচ্যহৃদয়স্পর্শের কাহিনী স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে নাড়া দিয়েছিল, যদিও এ দুই ‘পিতাপুত্রে’র পুনর্মিলন আর সম্ভব হয় নি। কিন্তু তরুণতর নরেন্দ্রনাথের আমেরিকার বক্তৃতাবলী সম্বন্ধেও তাঁর অসীম উৎসাহ ছিল। পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে বিবেকানন্দও মহর্ষিকে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধানিবেদন করে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতো স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গেও দেবেন্দ্রনাথ বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতির সহধর্মিতা সম্ভব হয় নি। অদ্বৈতবেদান্তের ভিত্তিতে মানবজীবনের সর্বতোমুখী যে জাগরণের ও মহামিলনের স্বপ্ন বিবেকানন্দ দেখেছিলেন, রামমোহন বা দেবেন্দ্রনাথ ঠিক সেইভাবে চিন্তা না করলেও বিশ্বজনীন ধর্মচিন্তার প্রথম অগ্রদূতের সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য। ভারতীয় ভক্তিবাদ ও পাশ্চাত্য ভক্তিবাদের সম্মেলনে কেশবচন্দ্র যে সমন্বয়ের প্রয়াসী ছিলেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মনন ও সাধনায় সে সমন্বয়ের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াল অদ্বৈতবাদের আধুনিক ভাষ্য। আপাতদৃষ্টিতে সাকারবাদীদের প্রতিমা-পূজা অবলম্বন হলেও সাকার ও নিরাকার উভয় মতের সগুণ ব্রহ্মচিন্তার পারে যে ঐক্যবোধে তাঁরা ভারতীয় ধর্মচেতনার মূল খুঁজে পেলেন তা একেশ্বরবাদ নয়, অদ্বৈতবাদ। অপরপক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন আবার তাঁর পৌরাণিক ধর্মবিশ্বাসের জগতে ফিরে এলেন, তখনও হিন্দুসমাজের পক্ষ থেকে এ প্রত্যাবর্তন একান্ত স্বাভাবিক বিবর্তনরূপেই গৃহীত হল। ব্রাহ্মসমাজের স্বাতন্ত্র্যবোধের দূরত্বই অনেক পরিমাণে হিন্দুধর্মের প্রশস্ততার সহায়ক হয়ে উঠল।

দেবেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ—দুই বিভিন্ন যুগের নেতা। বিদ্রোহে এঁদের চিন্তানয়কত্বের সূচনা,

আত্মস্থ গভীরতায় সে বিদ্রোহের পরম পরিণাম। দেবেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনে যে সত্যের একটি দিক শান্ত ছন্দে বিকশিত, বিবেকানন্দের সংহত জীবনবৃত্তে সেই সত্যরূপের আর একদিকের চিরায়ত প্রকাশ। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ও ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসী—দু জনেরই সত্যান্বেষণের আন্তরিকতায় মিল ছিল। তাই প্রাচীনের আশীর্বাদ নবীনের উপর বর্ষিত। ভারতবর্ষে এ দুই আদর্শেরই প্রয়োজন।

আধুনিক ইতিহাসের পাঠকেরা কেউ কেউ উনিশ শতকের এই শেষপর্বটিকে হিন্দু-প্রতিক্রিয়াশীলতার যুগ মনে করে সমালোচনায় কঠোর হতে চেয়েছেন। প্রাচীন সংস্কারের অর্থহীন পুনরাবৃত্তি নিশ্চয়ই ক্রিয়া নয়, প্রতিক্রিয়া। কিন্তু প্রাচীনের অন্তরসত্যের অনুধ্যান ও অনুসরণ তো নবীনের সৃষ্টিপ্রয়াসেরই প্রাথমিক কর্তব্য। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যসংঘাতে আমরা সেই জাতীয় অস্তিত্বের ভিত্তিভূমিটিই অনুসন্ধান করে ফিরেছি। জ্ঞান কর্ম ভক্তি ও যোগ—পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ। সে সম্বন্ধটি আগে অনুধাবন করে নিয়েই যথার্থ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। উনিশ শতকের বিভিন্নমুখী আন্দোলনগুলির অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র ভারতীয় জীবনদর্শনের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। তাই বেদ-উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানীদের থেকে শুরু করে ইদানীংকালের ব্রহ্মজ্ঞানীদের অন্তরে প্রসারিত ভারত-পন্থার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা আমাদের প্রয়োজন ছিল, তারপরে জাতীয়সংগ্রামের পথে আমাদের বন্ধুর পথযাত্রা। এই যুগটি তাই জাতীয় আত্মস্থতার যুগ—স্বদেশী-আন্দোলন বা স্বাধীনতাসংগ্রামের সার্থক সূচনাপর্ব।

এ কথা ঠিক, পূর্ববর্তী রামমোহন বা অনুজ কেশবচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতো দেবেন্দ্রনাথ ইসলামের সাধনা বা মুসলমান সমাজ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করেন নি। বিভিন্ন ধর্ম ও সাধনার তুলনামূলক চর্চা তিনি অতি সামান্যই করেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানতম সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রকৃতি অনুধাবনে যে যুক্তি ও ভক্তির সমন্বয় তাঁর চিন্তাধারায় দেখা দিয়েছিল, তার দ্বারাই স্বাদেশিকতার প্রথমপর্বে আমরা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলাম। হিন্দুধর্মের যে বিশেষ দিকটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাও মানবমনের সত্যান্বেষণের অন্যতম প্রধান দিক। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় সত্যলাভের যে পন্থা তার নিজস্ব সার্থকতা মেনে নিয়েও প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব যাত্রাপথের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা স্বীকার্য। সেদিক থেকে দেবেন্দ্রনাথের অভীষ্ট অনেক পরিমাণেই তাঁর জীবনে সাধিত।

পৃথিবীর ইতিহাসে নেতামাত্রেরই এক আদর্শ কল্পনার জগৎ থাকে। সে আদর্শের সঙ্গে বাস্তব-রূপায়ণের মিল বা অমিল বড়ো কথা নয়। আদর্শের মহত্ত্বই মনুষ্যত্বের আসল মাপকাঠি। এই আদর্শের জন্যই প্রয়োজন এক সহজাত কল্পনাশক্তি—যা প্রতিভার তৃতীয় নয়নে কবিতার মতো অন্তরে বাহিরে উদ্ভাসিত জীবনসত্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তর্লোকে তেমনি এক কবিত্বময় সূক্ষ্ম অনুভূতি-শরীর ছিল—তাঁর শৈশবের অনন্তানুভব, যৌবনের ব্রাহ্মধর্মান্দোলন, প্রৌঢ়বয়সের নেতৃত্বশক্তি, সৌন্দর্য ও শোভনতাময় উন্নতরুচি, অধ্যাত্মব্যঞ্জনাময় গদ্যের কারুশিল্প—এই সবই সেই অনুভূতিলোকের বিচিত্র বিচ্ছুরণ।

মাতৃভাষার প্রতি তাঁর একান্ত স্বাভাবিক অনুরাগ সেই বিদেশীয়ানার যুগে যেমন আশ্চর্য ছিল আজকের অনুকরণসর্বস্বতার যুগেও তার চেয়ে কম আশ্চর্য নয়। আজ এতকাল পরেও তাঁর গদ্যভঙ্গীর প্রসন্ন ঐশ্বর্যময় প্রকাশ আমাদের শ্রদ্ধাবোধ দ্বিগুণিত করে, যখন ভাবি, এ গদ্যে তাঁর পূর্বগামী বা দোসর আর কেউ নন, তাঁর প্রতিভাস্বাতন্ত্র্যেরই এ আর এক সমুজ্জ্বল প্রকাশ।

"উষাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রদোষকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, নিশাকালে সেই আনন্দরূপমমৃতং, প্রকাশ পাইতেছেন। কেবল এই সকলের মধ্যে কি তাঁহার আবির্ভাব? মনুষ্যের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব নাই? যদি উষার শোভা, সন্ধ্যার শোভা, চন্দ্রতারকের শোভার মধ্যে সেই সত্য সুন্দর মঙ্গলস্বরূপের শোভা দেখিতে পাই, তবে মনুষ্যের মুখশ্রীতে তাঁহার আবির্ভাব আরো কি সুস্পষ্ট দেখা যায়। ইহাতে যদি তাঁহার আবির্ভাব না দেখিলে, তবে আর কোথায় দেখিবে? মৃত্যুর রূপ জড়ের মধ্যেই কি কেবল তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে, পশুরাজ্যের মধ্যেই কি কেবল তাঁহার প্রকাশ দেখিবে? মনুষ্যের মুখশ্রীতে তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিবে না? ধর্ম্মাত্মার অনুরাগরঞ্জিত মুখে কি তাঁহার জ্যোতি দেখিবে না? ঈশ্বরপ্রেমী প্রসন্নহৃদয় পুণ্যাত্মা যখন প্রিয়তম ঈশ্বরের জন্য প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করেন; তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কি তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার আবির্ভাব, দেখিবে না?"[১৬]

"আগ্রায় আসিয়া 'তাজ' দেখিলাম। এ তাজ পৃথিবীর তাজ। আমি তাজের একটা মিনারের উপর উঠিয়া দেখি, পশ্চিম দিক সমুদায় রাঙা করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে; নীচে নীল যমুনা; মধ্যে শুভ্র স্বচ্ছ তাজ, সৌন্দর্য্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।"[১৭]

"এখন হিমালয়ে বর্ষা ঋতু আরম্ভ হইল, ঈশ্বরের জল-যন্ত্র দিবানিশি চলিতে লাগিল। চিরকাল মেঘ ঊর্দ্ধে দেখিয়া আসিয়াছি; এখন দেখি, অধস্তন পর্ব্বতের পাদমূল হইতে শ্বেত বাষ্পময় মেঘ উঠিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। ক্রমে ক্রমে তাহা পর্ব্বত-শিখর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি একেবারে মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঋষি-কল্পিত ইন্দ্রের রাজত্ব প্রত্যক্ষ করিলাম।… শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষাতে, হয়তো এক পক্ষ চলিয়া গেল, সূর্য্যের সঙ্গে আর দেখা হইল না। তখন মেঘে সকল এমনি আবৃত, যেন দশ হাত দূরে আর সৃষ্টি নাই। আমি আছি, আর আমার সঙ্গে কেবল ঈশ্বর আছেন। তখন সহজেই আমার মন সংসার হইতে উপরত হইল, তখন সহজেই আমার আত্মা সমাহিত হইয়া পরমাত্মাতে বিশ্রাম করিল। ভাদ্র মাসে হিমালয়ের জটাজূটের মধ্যে জল-কল্লোলের বিষম কোলাহল, তাহার প্রস্রবণ সকল পরিপুষ্ট, নির্ঝর সকল প্রমুক্ত, পথ সকল দুর্গম।"[১৮]

১৮৬৮ সালে লেখা দেবেন্দ্রনাথের একটি চিঠি—"··'তং সং প্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্ত্যা' পৃথিবী জানিবার নিমিত্তে তাঁহাকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু সেই 'পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা' তাহার নিকটে 'তমসি তিষ্ঠন তমসোন্তরোয়ম্' হইয়া রহিয়াছেন। সমুদ্রগর্ভ হইতে পর্বতসকল তাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে মেঘ ভেদ করিয়া উন্নত মস্তকে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, তাহারা জানিতে না পারিয়া চিরকাল স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, 'ধ্যায়ন্তীব পর্বতাঃ'। তাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে শিরাজের উদ্যানে গোলাব প্রস্ফুটিত হইল, মানসসরোবরে পদ্ম বিকশিত হইল—কিন্তু তাঁহাকে না জানিতে পারিয়া তাহারা প্রাণদান করিল। সুপর্ণ হোমায়ুন অনাহারে আকাশে আকাশে সঞ্চরণ করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারিল না—মৃগরাজ সিংহও কোন বন-দেবতার নিকট হইতে তাঁহার বিষয়ে উপদেশ পাইল না। মাতা ভূমি যুগে যুগে স্তরে স্তরে অসংখ্য জীবজন্তু উৎপাদন করিলেন, কেহই তাঁহার অনুসন্ধান পাইল না। আশ্চর্য

১৬ ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান। দ্বিতীয় ব্যাখ্যান। ২৫শে শ্রাবণ, ১৭৮২ শক

১৭ আত্মজীবনী। একত্রিংশ পরিচ্ছেদ। পৃ: ১৭৯; ১৩৬৮ সংস্করণ

১৮ তদেব, ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। পৃ. ২১৭

হইয়া নিষ্কাম অপ্রমত্ত মনুষ্যই সকলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। 'বেদাহম্‌ এতং পুরুষং মহান্তম্‌ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' "[১৯]

অমৃতসরে রামবাগানের কাছে তাঁর বাসা ও বাগানের ছবি— "··· তাহা ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা বাগান, এলোমেলো গাছ— জঙ্গলা রকম। কিন্তু আমার নবীন উৎসাহ, তাজা চক্ষু, সকলি তাজা সকলি নূতন সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুল-সকল শিশিরজলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীতস্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্বপুরী বোধ হইত। কোন কোন দিন ময়ূর-ময়ূরীরা বন হইতে আসিয়া আমার ঘরে ছাদের একতালায় বসিত, এবং তাহাদের চিত্র-বিচিত্র দীর্ঘ পুচ্ছ সূর্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত।"[২০]

বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ দেবেন্দ্রনাথের রচনাবলীর এমন অনেক অংশই উদ্ধৃত করা যেতে পারে যাতে তাঁর ঈশ্বরপ্রেমিকসত্তা কবি ও শিল্পী রূপে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মোহিতলাল মজুমদার দেবেন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করেছেন তাঁর 'বাংলার নবযুগ' বইটিতে— "দেবেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনে উপনিষদের বাণী যেভাবে পুষ্পিত ও বিকশিত হইয়াছিল তেমন আর সে যুগে কোথাও দেখা যায় না। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন একজন স্রষ্টাকবি। তিনি তাঁহার নিজ জীবনের ভাষায় যে-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার ছন্দ ও সুর রবীন্দ্রনাথের বাণী-মন্ত্রে বীজরূপে প্রবেশ করিয়াছিল।"[২১]

দেবেন্দ্রনাথের ভক্তি-তন্ময়তার প্রশান্ত ধ্যানমূর্তি তাঁর শান্তিনিকেতনবাসের পর্বে উদ্বেল আনন্দময় প্রকাশে আর এক নূতন পরিণতি লাভ করেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিচারণে তার অন্যতম চিত্ররূপ—

"···একবার এক ব্রাহ্মসম্মিলনের সভায় তিনি ঈশ্বরের প্রেম বিষয়ে তাঁহার একটি রচনা পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ দেখেন এক জায়গায় তাঁহার রচনা খুলিয়া মুগ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয় হাত ধরাধরি করিয়া 'পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ তস্য তুচ্ছং সকলং' এই গান গাহিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সভা ভুলিয়া, সমস্ত ভুলিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ একই গান গাহিয়া দুজনে নৃত্য করিলেন। সভার শেষে যখন তিনি বিদায় লইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে গেলেন তিনি তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন— 'তুমি আমায় আজ কি কথা শোনালে! এমন কথা যে শোনায় আমি তার গোলাম!' "[২২]

দেবেন্দ্রনাথের শেষজীবনের মানস-রূপান্তর নদী ও সমুদ্রের মহামিলন-মুহূর্তের অনুকল্প। বাইরের কর্ম ও প্রচার থেকে আত্মসংহরণ করে আত্মার অনন্তসত্তায় বিলীন হবার এ উদাহরণ একান্ত ভারতীয় জীবনসাধনারই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। চুঁচুড়া থেকে লেখা শেষদিকের একটি চিঠি— "এখানে এখন গঙ্গা নদীর উপরে আছি— সকল স্থানেই তাঁহার আবির্ভাব ও মহিমা। এখানে উষার শোভা, সন্ধ্যার শোভা, গঙ্গার

---

১৯ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : অজিতকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৪৮১

২০ আত্মজীবনী পৃ. ১৮৭

২১ ত্রয়োদশ অধ্যায়

২২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : অজিতকুমার চক্রবর্তী, পৃ. ৫৫০-৫৫১

লহরী, বায়ুর হিল্লোল আমার জীর্ণ ও ভগ্ন শরীরের সেবা করিতেছে। ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম! সেখানে হিমালয়ে একপ্রকার সুখদুঃখ ছিল, এখানে আর একপ্রকার সুখদুঃখ। সুখদুঃখ এ সংসারে অহর্নিশি বিচরণ করিতেছে। যতদিন এ শরীর থাকিবে, ততদিন সুখদুঃখের ও প্রিয়াপ্রিয়ের অব্যাহতি নাই। যে ভাগ্যবান পুরুষ অধ্যাত্ম যোগদ্বারা পরমেশ্বরকে জানিয়া তাহাতে আপনার আত্মাকে সংস্থাপিত করিতে পারে, সে-ই সুখদুঃখেতে অক্ষত থাকিতে পারে।'[২৩]

পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে থাকার সময়ে যাঁরা তাঁর পরিচর্যায় একান্ত কাছাকাছি ছিলেন, তাঁদের সাক্ষ্য-অনুযায়ী 'স্নানাহার ছাড়া আর সমস্ত ক্ষণই তাঁহার মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট থাকিত।' অথচ এই সময়েই বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলার ছলে তাঁর 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' নামে কিশোরপাঠ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অপূর্ব আলোচনাগুলি লিপিবদ্ধ হয়।

শোনা যায়, অন্তিমশয্যায় শয়ান দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"আমি আর এখানে নাই, অমরলোকে আছি।"[২৪] সে অমরলোক যদি কোথাও থাকে, অনায়াসে কল্পনা করা যায় আনন্দে-অমৃতরূপে উদ্ভাসিত দেবেন্দ্রনাথ সেখানে শান্ত শিব অদ্বৈতের ধ্যানে নিবাতনিষ্কম্প। কিন্তু মহর্ষির তিরোভাবের অর্ধ-শতাব্দীর পারে দাঁড়িয়েও আমরা জানি এই মানবলোকে ধ্যান ও কর্মের যে যোগসূত্র তিনি আদর্শ গৃহীরূপে স্থাপন করেছিলেন, তার স্বকীয় সিদ্ধি ও সার্থকতা জাতির জীবনজিজ্ঞাসার সমাধানে পরম সহায়ক। সে আদর্শের সমৃদ্ধিময় প্রকাশ শুধু তাঁর মধ্যে নয়, তাঁর পুত্রকন্যা ও সমগ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের মাধ্যমেই তা নবযুগের বাংলা ও ভারতবর্ষের পথপ্রদর্শক।

যে শান্তিনিকেতনের ভুবনডাঙ্গায় তিনি সাধকরূপে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন, বিশ্বমানসের মিলনক্ষেত্ররূপে আজ তা সর্বমানবের শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সামগ্রী। অনেক সময় আমাদের ভুল হয়, কর্মের কলরব ধ্যানের নীরবতাকে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে পরিহার করে। তবু দিনের আরম্ভ ও অবসানের মতো ওই ধ্যানে ও মননেই সৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তি। রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ে তাই উপনিষদের মন্ত্রসংহতি দেখা দেয়। বীরভূমের গেরুয়া প্রান্তরে শ্যামল শান্তিনিকেতন একই সঙ্গে সন্ন্যাসী ও রাজার কথা মনে পড়ায়— যে রাজর্ষির সবচেয়ে কাছের দিনের প্রকাশ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

---

২৩ তদেব পৃ. ৬১৩

২৪ ধর্ম ও কর্ম : ৯ম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা

সাহিত্যের প্রকাশ

বনফুল

সাহিত্য একটা বিরাট ব্যাপার। মানব-মনীষার সমস্ত আলোকই সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিহাস বিজ্ঞান ভ্রমণকাহিনী সমাজতত্ত্ব রাজনীতি— এ সমস্তই আজ সাহিত্যের এলাকায়। বস্তুত যা-কিছু লেখা হয়, এবং ছাপা হয় তাই নাকি সাহিত্য। আমি এই প্রবন্ধে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের, বিশেষ করে কবিতার, প্রকাশ সম্বন্ধেই কিছু বলব।

সাহিত্যকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: প্রথম— সংবাদধর্মী, দ্বিতীয়— সৃষ্টিধর্মী। আমার এই আলোচনা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের প্রকাশ নিয়ে। যা আলোকিত, যা দ্যুতিমান তার নামও প্রকাশ। কবি বা শিল্পীর প্রতিভাই এই প্রকাশের উৎস। Ovid বলেছেন, "there is a deity within us who breathes the divine fire by which we are animated।"[১] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষ সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায়···মানুষ আপন সৃষ্টকার্যে আপন পূর্ণতাকে দেখতে চাচ্ছে···তার আত্মার আনন্দ থেকে তাকে উদ্ভাবিত করতে হবে স্বর্গলোক, লক্ষপতির কোষাগার নয়, পৃথ্বীপতির জয়স্তম্ভ নয়।"[২]

কথাটা যত সহজে বলা হয়েছে ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজ নয়। সৃষ্টি করব বলে বললেই সৃষ্টি করা যায় না। Divine fire বা আত্মার প্রেরণা হুকুম করলেই এসে হাজির হয় না। তার জন্যে অনেক প্রস্তুতি, অনেক সাধনা, অনেক আরাধনার দরকার। কলম হাতে করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেও সেই প্রেরণা আসে না যা কবির মনে সৃষ্টির উৎসব জাগাবে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে এই আকূতি প্রকাশ পেয়েছে—

হেথা যে গান গাইতে আসা আমার
হয় নি সে গান গাওয়া—
আজো কেবলি সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া· ·
শুধু আসন পাতা হল আমার
সারাটি দিন ধরে—
ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে
ডাকব কেমন ক'রে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে
হয় নি আমার পাওয়া।

কবির মনের মধ্যেই সৃষ্টির সব উপাদান রয়েছে— আলো, অন্ধকার, সুর, রং, ভাষা, ছন্দ সবই রয়েছে—

---

১ Dictionary of Thoughts

২ সাহিত্যের পথে, 'সৃষ্টি'

কিন্তু কখন কোন্ বিশেষ যোগাযোগে সেগুলি সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠবে, অনন্য অপরূপ অনবদ্য হয়ে উঠবে তা কবিও জানেন না। কিন্তু তা জানবার জন্যে তাঁর অহোরাত্র ব্যাকুলতা, তা আবিষ্কার করবার জন্যেই তিনি পাগল, তাকে রূপ দেবার জন্য তিনি যে কোনও পরিশ্রম করতে প্রস্তুত। বস্তুত যাঁরা প্রতিভাবান কবি তাঁরা এই নিদারুণ শ্রম জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে করেই চলেছেন। তাই Longfellow বলেছেন, "Genius is infinite painstaking"।[১] Owen Meredith আর একটু অন্য সুরে বলেছেন, "Genius does what it must and talent what it can।"[২] প্রতিভাবান কবিকে সৃষ্টি করতেই হবে, না করে তার উপায় নেই, স্বস্তি নেই, বিশ্রাম নেই। তিনি সবার অলক্ষ্যে প্রতীক্ষা করেন প্রেরণার— যে প্রেরণার বলে মনের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ঐশ্বর্যসম্ভারকে সৃষ্টির মহিমায় মহিমান্বিত করতে পারবেন। Talent গুছিয়ে-গাছিয়ে একটা চলনসইগোছ জিনিস খাড়া করতে পারেন— কিন্তু তা সৃষ্টি হয় না। তা P. W. D.র তৈরি বাড়ির মতো একটা বাড়ি হতে পারে— হয়তো ভালো বাড়িই হতে পারে— কিন্তু তা কখনও তাজমহল হয় না। এই তাজমহল বানানোই প্রতিভাবান শিল্পীর লক্ষ্য, তাঁর সৃষ্টি হল অনন্য। মনে হয়তো একটা ভাব এল, কিন্তু ঠিক তাকে কোন্ ছন্দে কোন্ ভাষায় প্রকাশ করবেন এ-ও কবির কাছে মস্ত সমস্যা। মনোমত বাক্যটি, মনোমত বিশেষণটি, মনোমত অলংকার ও বক্রোক্তির সমন্বয়টি ঠিক সময় মনে আসে না। অনেক সময় তার জন্যে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে হয়, অনেক সময় লিখে আবার কেটে দিতে হয়, অনেক সময় ছাপতে পাঠিয়েও প্রুফে আবার সব বদলে দিতে হয়। বড়ো বড়ো লেখকের লেখা পাণ্ডুলিপি যদি দেখে থাকেন তা হলে বুঝতে পারবেন, কত খুঁতখুঁতে তাঁদের মন। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখার পাণ্ডুলিপি দেখে মনে হয় যেন একটা রণাঙ্গন, সুন্দরের অসুন্দরের যেন নীরব একটা যুদ্ধ চলেছে সেখানে। ভাবকে রূপ দেওয়া সত্যিই বড় কঠিন কাজ। কারণ তাকে সাধারণ বেশবাসে সাজিয়ে আটপহুরে পোশাক পরিয়ে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে কোনো প্রথমশ্রেণীর কবিই রাজি নন— সে প্রকাশে যদি অভিনবত্ব না থাকে, যদি মৌলিকতার দীপ্তি তার সর্বাঙ্গ দিয়ে বিচ্ছুরিত না হয় তা হলে তাঁর মনে হয় কিছুই হল না। কেবল মাত্র ভাবই কাব্যের অনন্যতা হতে পারে না, বস্তুত কোনো ভাবই অনন্যতা দাবি করতে পারে না, সব ভাবই তো পুরাতন। তার প্রকাশের বৈশিষ্ট্যই তার আসল বৈশিষ্ট্য, রস-সৃষ্টিতেই তার প্রধান পরিচয়। বামন দণ্ডী প্রভৃতি আলংকারিকরা বলবার রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, কুণ্তল মম্মটভট্ট প্রাধান্য দিয়েছেন বক্রোক্তিকে, রুদ্রত ও ভামহ অলংকারকে, আনন্দবর্ধন ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলে বর্ণনা করেছেন।[৩] কবির আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ এই কটি ছত্রে—

> ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
> রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
> অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
> সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।

এই আকাঙ্ক্ষাই বস্তুত সব কবিরই আকাঙ্ক্ষা। নানা কবি নানা উপায়ে এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের আকৃতি নিজের স্বকীয়তা নিয়ে যখন ছন্দবন্ধনে বাঁধা পড়ে তখন আমরা অনুভব করি

৩ ভাব ও প্রকাশভঙ্গী : সাহিত্য প্রসঙ্গ : কবিশেখর কালিদাস রায়

বিষয়টা যদিও এক কিন্তু প্রকাশভঙ্গী আলাদা আলাদা এবং সেই জন্যেই প্রত্যেকটা আলাদা রকম সৃষ্টি। সবাই ফুল, কিন্তু কেউ পদ্ম, কেউ গোলাপ, কেউ চন্দ্রমল্লিকা, কেউ নাগকেশর। উদ্ভিদবিজ্ঞান পড়ে আমরা জেনেছি ফুল ফোটাবার জন্যে ফুলগাছকে কোনও সক্রিয় চেষ্টা করতে হয় না, সময় হলে ফুল আপনিই ফোটে। ফুলেরা যন্ত্রচালিতবৎ ফুল ফুটিয়ে চলেছে চিরকাল, তাদের মধ্যে প্রতিভার কোনো লক্ষণ নেই, সবাই একরকম। গোলাপগাছ গোলাপই ফোটাবে চিরকাল, গোলাপগাছে নাগকেশরের আবির্ভাব আমরা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু মানুষ-কবির কাছে এই অপ্রত্যাশিতকেই আমরা প্রত্যাশা করি। তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি যা খুশী সৃষ্টি করতে পারেন। বাংলা সাহিত্যের তিন জন প্রথম-শ্রেণীর সৃষ্টিকর্তার— মাইকেল মধুসূদন দত্তের, বঙ্কিমচন্দ্রের এবং রবীন্দ্রনাথের— সৃষ্টির আলোচনা করলে তাঁদের সৃষ্টির বৈচিত্র্যই আমাদের বিস্মিত করে। যে মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্য লিখেছেন, তিনিই আবার লিখেছেন ব্রজাঙ্গনা কাব্য, তাঁরই কল্পনা আবার সৃষ্টি করছে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কমলাকান্তের দপ্তর, বিবধ প্রবন্ধ, মুচিরাম, বিজ্ঞানরহস্য, লোকরহস্য, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি যে একই লোকের রচনা এর অকাট্য প্রমাণ না থাকলে বিশ্বাস করা শক্ত হত। আর রবীন্দ্রনাথের কথা বলাই বাহুল্য, তিনি কী-না লিখেছেন, তাঁর বিরাট সাহিত্যকীর্তির সৌধে কত বিভিন্ন রঙের মণিমাণিক্য যে তিনি গেঁথে দিয়েছেন, কত রং, কত রূপ, কত ঐশ্বর্যের যে অনন্য সমাবেশ করেছেন তার প্রকৃত মূল্যায়ন আজও হয় নি। যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের সৃষ্টি বৈচিত্র্যপূর্ণ। একই স্রষ্টার নানা রচনার স্টাইলও নানারকম। অনেকে মনে করেন 'স্টাইল' লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তাই যদি হয় তাহলে বলতে হবে প্রথমশ্রেণীর প্রতিভাবান লেখকরা বহু-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। কারণ তাঁদের বিভিন্ন লেখার বিভিন্ন রকম স্টাইল। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেই কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি—

হে নূতন, এস তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি
পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে
ব্যাপ্ত করি লুপ্ত করি স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘন ঘোর স্তূপে।
কোথা হতে আচম্বিতে মুহূর্তেকে দিক দিগন্তর
করি অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহ ক্ষণকাল।

এই নূতনকেই আবার তিনি ভিন্ন ছন্দে ভিন্ন সুরে ভিন্ন স্টাইলে আহ্বান করেছেন—

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে

পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা॥

এই নূতনকেই সূর্যের জবানীতে তিনি অভ্যর্থনা জানিয়েছেন খুব ছোটো একটি কবিতাতে। সেখানে তাঁর স্টাইল ও সুর অন্যরকম—

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্-ধিক্ করে তারে কাননে সবাই ;
সূর্য উঠি বলে তারে, ভালো আছ ভাই ?।

প্রতিভাবান লেখকদের এই বহু-ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখে আমরা চমৎকৃত হই, কিন্তু একটা কথা ভাবি না এই বহু-ব্যক্তিত্বের বিরাট বোঝা বহন করতে তাঁদের কি পরিমাণে ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছে। একটা ব্যক্তিত্বের ভার বহন করেই সাধারণ মানুষ কুব্জ হয়ে পড়েন, সেই ব্যক্তিত্বকে পোষণ-পালন করবার রসদ সংগ্রহ করতেই তাঁকে হিমসিম খেতে হয়। প্রথমশ্রেণীর প্রতিভাবান সাহিত্যিকদেরও হিমসিম খেতে হয়, কিন্তু বাইরে তার সার্থক প্রকাশ হয় বহুবর্ণবিচিত্র সাহিত্য-সম্ভারে। তাঁর বহু-ব্যক্তিত্বের রসদ তিনি নিজেই সংগ্রহ করেন তাঁর রহস্যময় অন্তর-ভাণ্ডার থেকে, যার নাম আমরা দিয়েছি প্রতিভা। এই বহু-ব্যক্তিত্বের চাপে অনেক কবির বাইরের সামাজিক চেহারা অবশ্য অনেক সময় স্বাভাবিক থাকে না। কেউ খামখেয়ালী, কেউ রাগী, কেউ নির্জনতা-প্রিয়, কেউ অতি-দাম্ভিক, কেউ বা অতি-বিনয়ী হন। তাঁর বহু-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাধারণ সমাজের যেন খাপ খায় না। অনেকে পাগল হয়ে পাগলা-গারদে জীবন কাটিয়েছেন এ খবরও শোনা যায়।

এই বহু-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন কবিরা সাদা কাগজের উপর কালির আঁচড় দিয়ে নিজের সৃষ্টিকে যখন প্রকাশ করেন তখন সেটাকে জননীর সন্তানপ্রসবের সঙ্গে উপমিত করা যায় কি— এই প্রশ্ন অনেকে করেন। এর উত্তর হচ্ছে, যায় এবং যায়ও না। জীবজগতের সমস্ত ব্যাপারই অমোঘ অলঙ্ঘ্য নিয়তি-চালিত। জননী নিজ দেহেই সন্তান ধারণ করেন, তাঁর দেহের উপাদান দিয়েই সন্তানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হয়, কিন্তু সে সন্তান-নির্মাণে তাঁর নিজের কোনও হাত থাকে না। তা সুন্দর, কুৎসিত, অঙ্গহীন, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক জননী তাকেই মেনে নেবেন, তুলে নেবেন বুকে। কবির কাব্যও জন্মগ্রহণ করে কবির মনে। কিন্তু সে মন বাইরের মন নয়— অন্তরের অন্তর্লোকে, আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় নির্জ্ঞান মনে। সেই নির্জ্ঞান মন সজ্ঞান মনোভূমিতে যখন সে কাব্যটিকে প্রকাশ করে তখনি কবির মনে জাগে প্রসব-বেদনা, তখনই তিনি সেটাকে লিখে প্রকাশ করতে ব্যগ্র হন। তা তখন ভাষার মাধ্যমে মূর্তি পরিগ্রহ করে কবির খাতার পাতায়। জননী তাঁর সন্তানের রূপ-বৈগুণ্যকে সংশোধন করতে পারেন না, যা পেয়েছেন মেনে নেন। কবি কিন্তু তা নেন না। তিনি তাকে বার বার ঘসে-মেজে অদলবদল করে নিজের মনোমত করে রসোত্তীর্ণ করতে চান। রসের যে আবছায়া তাঁর মনে অস্পষ্ট ভাবে প্রথমে প্রতিভাত হয়, সেটাকে স্পষ্টরূপ দেবার জন্যে তিনি সর্বদা সচেষ্ট। তাঁর সমস্ত শক্তিকে তিনি বারবার বলেন— ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না, আর-একটু আলো জ্বালো। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতা—

জলের পারে ঝাউএর সারি জ্যো'স্নালোকে দেখায় কালো
অনেক দূরে পাহাড়-চূড়ে রাতের কাজল হয় ঘোরালো।
আবছায়া সে বেড়ায় ঘুরে ডাক দিয়ে যায় চেনা স্বরে
মুখের রেখা যায় না দেখা— চলার সাথী বাতি জ্বালো।

সব কবিই এই আবছায়ার মায়াকেই সার্থক রসোত্তীর্ণ কাব্য করেন প্রতিভা-আলোর সাহায্যে। অর্থাৎ তিনি শুধু সৃজন করেন না, নিজের সৃজনকে বারবার সংশোধনও করেন। জননীর সে ক্ষমতা নেই। তিনি যা সৃজন করেন তাকেই মেনে নেন, ছোট চোখকে পদ্মপলাশলোচন করবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

কবির এই সৃজনী-শক্তির সঙ্গে সংশোধনী-শক্তি মিলিত হয়ে কাব্যসৃষ্টি করে। বিভিন্ন কবির এই শক্তি বিভিন্ন— তাই কাব্যেরও বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই আমরা বিভিন্ন কবির লেখায়। কাব্যের রূপ যে কি মন্ত্রবলে কবির মানস-নয়নে উদ্ভাসিত হয় তার রহস্য কেউ জানে না, এমন কি কবি নিজেও জানেন না বোধ হয়। রবীন্দ্রনাথ আমাকে একবার বলেছিলেন— 'ওসব উনপঞ্চাশ বায়ুর লীলা'। এই উনপঞ্চাশ বায়ুর লীলা নানা কবির মনে নানারকম ছবি আঁকে। এক সমুদ্রের বিষয়েই কয়েকটি কবির কবিতা উদ্ধৃত করছি, তার থেকেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।—

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব। তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন। তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির-পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি। তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন করো আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর-অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।—

করুণানিধান লিখেছেন :

ভো মহার্ণব, নীল ভৈরব
গর্জদ্‌-জল-ভঙ্গে
দূর অম্বুদ মন্দ্র-সমান
তুলিতেছ কার বন্দনাগান
নক্তন্দিব উদ্বোধনের
দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।

নীলকণ্ঠের বিরাট পিনাক
টঙ্কারে অহোরাত্র
আজো কি ভোলনি মন্থনরোল
দেব-দানবের উন্মাদ রোল
ইন্দিরা আজি উরিবেন বুঝি
কক্ষে অমৃত পাত্র।· ·
হে দুর্নিবার, মুক্ত-উদার,
হে পূর্ণ অফুরন্ত
চেয়ে চেয়ে ওই বিপুল উরসে
অসীমের ভাষা অন্তরে পশে
হেরি নেপথ্যে অন্তবিহীন কল্পলোকের পন্থ।

সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

সিন্ধু তুমি, মহৎ কবি, ছন্দ তব প্রাচীন অতি ;—
কণ্ঠে তব বিরাজ করে 'বিরাট রূপা-সরস্বতী'।
আর্য তুমি বীর্যে বিভু, ঝঞ্ঝা তব উত্তরীয় ;
মন্দ্রভাষী ইন্দু-সখা, সিন্ধু তুমি বন্দনীয় !
সিন্ধু তুমি প্রবল রাজা, অঙ্গে তব প্রবাল-ভূষা,
যত্নে হেম-নিষ্ক-মালা পরায় তোমা সন্ধ্যা-উষা !
স্বাধীন-চেতা মৈনাকেরে ইন্দ্র-রোষে অভয় দিয়ো ;
উপপ্লবে বন্ধু তুমি, সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।
তমাল জিনি বরণ তব, অঙ্গে মরকতের দ্যুতি,
কর্ণে তব তরঙ্গিছে গঙ্গা-গোদাবরীর স্তুতি ;
নর্মসখী নদীর যত অধর-সুধা হর্ষে পিয়ো।
শান্তগতি, হাস্যরতি সিন্ধু তুমি বন্দনীয়।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দুঃখ ও হতাশার কবি। তিনি লিখেছেন :

চলে বিষপান চলে বিষদান চলে চির-মন্থন
অনন্ত নাগ বন্ধনে ঘোরে অনন্ত ক্রন্দন
দেবতার সুধা দেবতা হরিয়া অদৃশ্য কোন্খানে
বিশ্বনাথের কণ্ঠে বিশ্ব নীল হল বিষ-পানে।
তবু মন্থন চলে মন্থন অবারিত অকারণ
জীব সাথে শিব বিষ-নির্জীব, কেবা করে নিবারণ ?
তাই নিরুপায় চির হায় হায়, হে সিন্ধু তব জলে
অমৃত-প্রয়াসে যত ওঠে বিষ তত মন্থন চলে।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের সমুদ্র বিষয়ে যে কবিতাটি পড়েছি— তার সুর একটু ভিন্ন রকম। কবির স্নেহপ্রবণ মন যেন ধরা দিয়েছে কবিতাটিতে। সিন্ধুর কাছে বিদায় নিতে গিয়েও যেন তাকে ছেড়ে যেতে পারছেন না—

বিদায় সিন্ধু, আসি,
প্রবাস-বন্ধু, নীল ছন্দের নীলানন্দের রাশি,
ফুরালো জীবনে নয়নোৎসব লহরী-পুঞ্জ গোনা
সন্ধ্যা-প্রভাতে তোমার নান্দী বন্দনা-গান শোনা
উর্মি-কেশর ছুঁয়ে ভয়ে ভয়ে ফুরাইল ছেলে-খেলা
ফুরালো বালুকামন্দির গড়া আনমনে সারাবেলা।
হেরিব না আর কণা-সহস্রে নিশীথে মণির দ্যুতি
মহানীলিমায় ইন্দ্রিয়াতীত লভিব না অনুভূতি।
ছেড়ে যেতে তাই পিছু পানে চাই, আর একবার হেরি
আগাতে পারি না, পদে পদে বাধা দেয় বালুকার বেড়ি।
বালু-স্তূপ হতে গুল্‌ফ ধরিয়া প্রীতির ফল্গু টানে
বল্লিত হয় যাত্রা আমার চাহিলে তোমার পানে· ·

ফিরে যেতে হবে দৃষ্টি যেথায় যখন যেদিকে ধায়
প্রাচীরে ব্যাহত হইয়া জানায় ব্যাঘাতের বেদনায়—
ঠাঁই নাই মোর, হে বিরাট, তব লোকাতীত পরিষদে
তোমারে ছাড়িয়া ফিরে যেতে হবে জনপদ-গোষ্পদে।

সমুদ্র-বিষয়ে স্বদেশী বিদেশী অনেক কবিই কবিতা লিখেছেন। যাঁর কবিতায় স্বকীয়তা আছে, যাঁর কবিতা রসোত্তীর্ণ হয়েছে, যিনি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছেন তিনিই সাহিত্য-প্রকাশের বিচিত্র ক্ষেত্রে নিজের দাগ রেখে গেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের একটি কবিতাও মনে পড়ছে। তাঁর 'এষা' কাব্যের 'শোক' কবিতাটি অপূর্ব। এখানে শোকার্ত কবি সমুদ্রের সমীপবর্তী হয়ে যেন তার মধ্যেই নিজের শোক-বিক্ষুব্ধ অন্তরের আলোড়ন প্রত্যক্ষ করছেন।

উচ্ছ্বসিয়া— উল্লঙ্ঘিয়া,
সহস্র তরঙ্গ নিয়া,
সহস্র বাসুকি-ফণা ঘর্ঘর-নির্ঘোষে—
বক্ত্রে ফেন রাশি রাশি,
কি বিকট অট্টহাসি!
ধরারে ফেলিবে গ্রাসি' আহত সংরোষে!
এইখানে ধরা শেষ—
ধরার সংঘর্ষ-ক্লেশ,
জীবনে মরণে সন্ধি— লুপ্ত আত্ম-পর!

কম্পিত ভঙ্গুর তট ;
মহাকাশ সন্নিকট,
সাগরে জলদ-বিম্ব— জলদে সাগর !
এই চির হাহা-রবে—
যেন আমি একা ভবে
হেরি মূল-প্রকৃতির হৃদয়-স্পন্দন !
পলকে পলকে হয়
কত-না উত্থান লয়—
কত অনির্দেশ আশা, অস্ফুট স্বপন !

রবীন্দ্রনাথের মতো অক্ষয়কুমারও কবি বিহারীলালের শিষ্য ছিলেন। "বিহারীলালের ভাষা, ভঙ্গী ও ভাব অক্ষয়কুমারেই সর্বাধিক পরিণতি লাভ করেছিল।"[৪]

কবি-মনের এই প্রকাশের নেপথ্যে যে রহস্যাবৃত অন্ধকার আছে—ঊষার প্রকাশের পূর্বে রাত্রির অন্ধকারের মতো—সেই অন্ধকারের কাহিনী জানবার উপায় নেই। সেই অন্ধকারেই অমূর্তরা মূর্তি পরিগ্রহ করে, প্রস্ফুট হয় অস্ফুটরা, সেই অন্ধকারেই ধ্বনিত হয় আলোর চরণধ্বনি, সেই অন্ধকার সৃষ্টিলোকেই সৃষ্টির লীলা ধীরে ধীরে সুগোপনে লীলায়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই অন্ধকার-লোকের খবর আমরা জানি না। কিন্তু একটা কথা জানি সেই অন্ধকার অস্পষ্ট লোকে কবির কল্পনার প্রেরণা আনন্দ, সে কল্পনার লক্ষ্যও আনন্দ। বস্তুত সৃষ্টির আনন্দ না থাকলে সৃষ্টি করা সম্ভব নয় আর সে আনন্দ যদি রসিকের মনে সঞ্চারিত হয়ে তাঁকেও আনন্দ-বিহ্বল না করতে পারে তা হলেও সে সৃষ্টি সাহিত্যের শাশ্বত মন্দিরে স্থান পায় না। নিজে আনন্দিত হয়ে রসিককে আনন্দ-লোকে নিয়ে যাওয়াই কবির কাজ। এ কাজ করতে হলে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতি, দুঃখ-বঞ্চনা, অপমান-অবহেলা, লাঞ্ছনা-ধিক্কারের ঝড়-ঝাপটা বাঁচিয়ে কবিকে এমন একটা লোকে উত্তীর্ণ হতে হয় যেখানে তিনি সামাজিক-সুখদুঃখের-দোলায় আন্দোলিত মানুষ নন, যেখানে তিনি কবি। তাঁর ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ছোঁয়া লাগতে দেন না তিনি তাঁর সৃষ্টিতে। তাঁর সৃষ্টিতে থাকে কেবল প্রতিভার ভাস্বর দ্যুতিতে উদ্ভাসিত তাঁর আনন্দময় অনন্যতা। তাঁর কাব্যে তাঁর ব্যক্তি-সত্তাকে চেনা যায় না। চেনা যায় তাঁর কবি-সত্তাকে। শেক্‌সপীয়র ম্যাকবেথ না হ্যাম্‌লেট্, ইয়াগো না ফল্‌স্টাফ্, ব্রুটাস না আণ্টোনিও, ক্লিওপেট্রা না পোর্শিয়া—কার মতো ছিলেন তা তাঁর কাব্য থেকে সনাক্ত করা যায় না—শুধু বোঝা যায় তিনি প্রথমশ্রেণীর কবি, প্রথমশ্রেণীর শিল্পী, তাঁকে আমরা ভুলে যাই, কেবল মনে থাকে তাঁর কাব্যের প্রতিটি চিত্র অনবদ্য, অনন্য, অপরূপ। সেই ছবির ভীড়ে মানুষ শেক্‌সপীয়রই আত্মগোপন করে আছেন কিন্তু তিনি নিজের সুখদুঃখ হতাশা-বিলাপ নিয়ে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন নি একবারও। তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন শুধু অমৃত, শুধু আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের 'চৈতালি'তে 'কাব্য' নামে একটি কবিতায় এই কথা চমৎকার ভাবে লিখেছেন তিনি—

৪ অক্ষয়কুমার বড়ালের গ্রন্থাবলীর সম্পাদকীয় ভূমিকা—সজনীকান্ত দাস

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত,
আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো,
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভাষড়চক্র, আঘাত গোপন।
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর— নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি।
তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্যপানে ; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখ-দৈন্য-দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

শাশ্বত সাহিত্যের প্রকাশে ওই অমৃতই রসিকদের তৃপ্ত করে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনেও অনেক শোকদুঃখ এসেছে, অনেক অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে আমাদের দেশের লোকেরই হাতে— যদি তারিখ মিলিয়ে মিলিয়ে কেউ একটা প্রবন্ধ লেখেন তা হলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে তাঁর ব্যক্তিগত সামাজিক জীবনে যখন তুমুল ঝঞ্ঝা বইছে, তখন তিনি অনেক উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেছিলেন। সে কাব্যে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের আক্ষেপ-হাহাকার ছায়াপাত করে নি, তাতে মূর্ত হয়েছিল আনন্দ আর অমৃত।

আজকাল কবির ব্যক্তি-সত্তা এবং সামাজিক-সত্তা নিয়ে একটু বেশি আলোচনা হয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই এরকম অজস্র আলোচনা হয়েছে। এ ধরণের আলোচনার একটা আলাদা রস আছে, সেটা হচ্ছে কৌতূহলের রস। সে রসের সঙ্গে কাব্যের কোনো সম্পর্ক নেই, রবীন্দ্রনাথ মংপুতে শিলাইদহে লণ্ডনে বা আমেরিকায় যেখানেই গিয়ে থাকুন, যে যে বিশেষ খাবার তিনি পছন্দ করতেন বা যে ধরণের কাপড়জামা পরতে ভালবাসতেন— এ সবের ফর্দ যতই হৃদয়গ্রাহী হোক— তাঁর কাব্যের সঙ্গে এ সবের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং আমার মনে হয় ও ধরণের আলোচনার বাড়াবাড়ি হলে আসল রবীন্দ্রনাথ থেকে আমাদের দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আমি এমন লোক দেখেছি যিনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই ধরণের খুঁটিনাটি অনেক খবর রাখেন, কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান বড়ই সংকীর্ণ। কালিদাস ভবভূতি চণ্ডীদাস বা শেক্‌সপীয়র সম্বন্ধে এ ধরণের খবর পাওয়ার উপায় নেই, তাই তাঁদের পরিচয় পেতে হলে আমরা তাঁদের কাব্যলোকেই প্রবেশ করি এবং সেইখানেই সম্ভবত তাঁদের সত্য পরিচয় পাই। সাহিত্যিকের পরিচয় যদি তাঁর সাহিত্য-পরিচয়কে ঢেকে ফেলে তা হলে সেটা নিঃসন্দেহেই দুঃখের বিষয়। আজকাল কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হচ্ছে। সাহিত্যের প্রকাশ একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার, কিন্তু সাহিত্যিকের পরিচয় নিতান্তই বস্তুতান্ত্রিক জিনিস। আর অধিকাংশ মানুষের মনই বৈষয়িক। সাধারণ

লোকের কাছে যিনি দামী হীরের আংটি গরদের কাপড় পরে দামী মোটর চড়ে বেড়ান তাঁর কদর যিনি ভালো কবিতা লেখেন তাঁর চেয়ে অনেক বেশি। এই দু রকম অভিব্যক্তি যদি একই লোকের হয় তবু সাধারণ লোকের দৃষ্টি কবিতার চেয়ে হীরের আংটি, গরদের কাপড় আর দামী মোটরের উপর পড়বে বেশি। সাধারণ লোকেরা সাহিত্যের প্রকাশ সম্বন্ধেও এই রকম আরও নানা রকম বস্তুতান্ত্রিক আলোচনা করতে ভালোবাসেন। সাহিত্যিকেরা কে কি রকম বেগে লেখেন এ নিয়েও অনেকের কৌতূহল আছে। অনেকেই হয়তো জানেন না যে কাব্য যখন কাগজে আত্মপ্রকাশ করে তার বহুপূর্বেই তার জন্ম হয় কবির মনের আকাশে নীহারিকার মতো, সেই নীহারিকা কখনও হয়তো অতি দ্রুতবেগে সৃষ্টিমহিমায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, কখনও হয়তো অনেক দেরি হয়, কখনও হয়তো ওঠেই না, অস্পষ্ট নীহারিকার মতোই থেকে যায় চিরকাল। কিন্তু তবু সাধারণ লোকেরা জানতে চায় কোন্ কবির সাহিত্য-প্রকাশের বেগ কত দ্রুত। আজকাল স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের যুগ, এ নিয়ে প্রবন্ধ লিখবেন কেউ হয়তো গ্রাফ এঁকে। সেদিন Charles Chaplinএর আত্মজীবনীতে এই রকম একটি ফর্দ দেখে কৌতুক অনুভব করেছিলাম। Charles Chaplin সিনেমা জগতের একজন দিক্‌পাল, যদিও তিনি শিল্পী হিসাবে খুব উঁচুদরের, কিন্তু তিনি যে-শিল্পের কারবারী সে-শিল্পে artএর চেয়ে box-officeটারই সম্মান বেশি। তাই তাঁর মনটাও সম্ভবত একটু বৈষয়িক-গোছের। তিনি লিখেছেন—"I like to know the way the writers work and how much they turn out a day. Thomas Mann averaged about 400 words a day. Lion Fechtwagener dictated 2000 words which averaged 600 written words a day. Somerset Maugham wrote 400 words a day just to keep in practice. H. G. Wells averaged 1000 words a day. Hannen Swaffer, the English journalist, wrote from 4000 to 5000 words a day. The American critic, Alexander Woollcott wrote a 700-word review in fifteen minutes, then joined a poker game—I was there when he did it. Hearst would write 2000 word editorial in an evening. Georges Simenon has written a short novel in a month and of excellent literary quality. Georges tells me that he gets up at five in the morning, brews his own coffee, then sits at his desk, and rolls a golden ball, the size of a tennis ball and thinks. He writes with a pen and when I asked him why he wrote in such small handwriting, he said—'It requires less effort of the wrist'. As for myself I dictate about 1000 words a day which averages me about 300 in finished dialogue for my films".

এই ধরণের আরও নানা রকম খবর পাওয়া যায়। কোনো কবি নির্জন ঘরে বসে লেখেন, ভীড়ে বসেও কারও লেখা অপ্রতিহত বেগে চলতে থাকে, লিখতে লিখতে কে কটা সিগারেট খান বা কতবার নস্যি নেন, রেডিওতে বা গ্রামোফোনে Jazz বা বীটোফেন বাজালে কার কল্পনা উদ্বুদ্ধ হয়, ভালো ফুলের গন্ধ, বা পচা আপেলের গন্ধ কার সাহিত্যপ্রেরণার পক্ষে অত্যাবশক—এ ধরণের নানা খবর পড়েছি। কোন্ কবির কোন্ কাব্য কোন্ নারীর দ্বারা প্রভাবিত এ রকম মুখরোচক আলোচনাও করেছেন অনেক

তথাকথিত লেখক— এঁরা পূর্বজন্মে হয়তো চণ্ডীমণ্ডপ-বিহারী নিম্নকণ্ঠ ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপকারী জমাটি লোক ছিলেন— এ জন্মে লেখক-বৃত্তি গ্রহণ করে নিজের কুৎসা করবার প্রকৃতিটাকে সাহিত্যের আবরণে ঢেকে সাহিত্যসমাজে আস্ফালন করবার সুযোগ পেয়েছেন।

একটা কথা কিন্তু নিঃসংশয়ে জেনে রাখা উচিত সাহিত্য-প্রকাশের অন্তরতম রহস্য বাইরের থেকে জানা অসম্ভব। কবির জীবনচরিতের ঘটনাবলী থেকে কবিকে বোঝা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন তাঁর 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থে—

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে—
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।...
নাহি জানি আমি কী পাখা লইয়া উড়ি,
খেলাই ভুলাই দুলাই ফুটাই কুঁড়ি—
কোথা হতে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি
সন্ধান তার বলিতে পারি না কাহারে।
যে আমি স্বপনমূরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি—
সেই আমি কবি। কে পারে আমারে ধরিতে!
মানুষ-আকারে বদ্ধ যেজন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

হতে পারে— হতে পারে কেন, নিশ্চয়ই— বাইরের ঘটনাবলীর সংঘাত কবির মনে কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা জাগায়, কিন্তু যে সৃষ্টি তিনি করেন তার সঙ্গে ওই সংঘাতের কোনও মিল থাকবেই এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

'একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি— তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী'— কিন্তু যে ফাল্গুনী কবি রচনা করেন তার সঙ্গে ওই ছোঁয়ার বা কথার কোনও সাদৃশ্য এমন কি প্রভাবও হয়তো থাকে না শেষ পর্যন্ত। রসায়নশাস্ত্রে catalytic agent বলে একটা পদার্থ আছে, তার সামান্যতম ছোঁয়ায় বড় বড় রাসায়নিক কাণ্ড ঘটে যায়। যে কাণ্ডটা ঘটে তার সঙ্গে কিন্তু ওই catalytic agentএর কোনও সাদৃশ্য থাকে না। Catalytic agent ঘটনাটা কেবল শুরু করে দেয়, কিন্তু ফলে যা হয় তা একেবারে অন্যরকম। কবির মন এই রকম নানা সুর, নানা ছোঁওয়া, নানা চাহনি দিয়ে যে কাব্য সৃষ্টি

করেন তা সৃষ্টি, তা কোনও বিশেষ ছোঁওয়া বা চাহনির ফোটোগ্রাফ নয়। তা ছাড়া কবি যখন লেখায় আত্মপ্রকাশ করেন তখন সেটা সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে ঢেকে প্রকাশ করেন— রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার আবির্ভাবের মতো অনেকটা তা। কবি ইচ্ছে করলেও অনাকৃতভাবে নিজেকে তাঁর কাব্যে প্রকাশ করতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন[৫]—"যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না, আমার অনেক কথাই তারা ঠিক বুঝবে না এবং নম্রভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না এবং যেটুকু তাদের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না— তখন মনের ভাবগুলি সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকেই যায়। এর থেকে বেশ বুঝতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত; তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই··· আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই; আমরা ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি না— চব্বিশ ঘণ্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত···"।

এই সাধ্যাতীত কাজই সব কবিরা সারাজীবন করবার চেষ্টা করেছেন, এরই নাম সাধনা, এরই নাম তপস্যা। এই তপস্যার উপকরণ কবিরা শুধু বহির্জগৎ থেকেই সংগ্রহ করেন না অন্তর্জগৎও তাঁদের কাব্য-প্রেরণার অনেক উপকরণ জোগায়। কবিদের কাব্যে যাঁরা কবিদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ সন্ধান করবার চেষ্টায় গলদঘর্ম হন তাঁরা সেই দলের লোক যাঁরা ফুলের মধ্যে মাটির এবং ফলের মধ্যে পরাগবাহী কীটের নৈপুণ্য আবিষ্কার করে আমোদ পান। এও একরকম আমোদ, কিন্তু কাব্যের আমোদ নয়। লেখকদের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের জীবনচরিতে। বিশেষ করে আত্মজীবন-চরিতে। বিদেশী লেখকরা 'জার্নাল' বলে যা লেখেন তাতেও তাঁদের ব্যক্তিজীবনের অনেক খুঁটিনাটি পরিচয় মেলে। সব চেয়ে প্রচণ্ড আত্মজীবনী হচ্ছে—'রুশো'র 'The Confessions' যার গোড়াতেই তিনি বলেছেন—"My purpose is to display to my kind a portrait in every way true to nature and the man I shall portray will be myself···।" তা তিনি নিরঙ্কুশভাবেই করেছেন। আর একটি প্রকাণ্ড আত্মজীবনী হচ্ছে বস্ওয়েলের লেখা ডক্টর জন্সনের জীবনী। আরও অনেক লেখক (এদেশের এবং বিদেশের) আত্মজীবনী লিখেছেন— Goethe, Herzen, Tolstoy, Mill, Ruskin, Trollope, Moon, Bunnin, Gide[৬] এবং আরও অনেকে এ কাজ করেছেন। অনেকের জীবনীতে কাব্যরসও আছে, তাও সাহিত্য হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে আমেরিকার থিয়েটার জগতের নামকরা নাট্যকার Moss Hart 'The Man who came to Dinner' লিখে ওদেশের নাট্যামোদীদের প্রাণে তুমুল আলোড়ন জাগিয়েছিল। তাঁর Act One নামে একটি আত্মজীবনী আছে। খুব ভাল লেগেছিল বইটি পড়ে। বইটি রসোত্তীর্ণ। একটা নাটক ওদেশের মঞ্চে নাবাতে হলে নূতন নাট্যকারকে যে কি সংশয়-সন্দেহ-যন্ত্রণার দোলায় দুলতে হয়, ওদেশের

---

৫ ছিন্নপত্র

৬ Introduction to 'The Confessions'

থিয়েটারের নেপথ্যে কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে এ বইটি পড়লে তার খবর পাওয়া যায়। এতে লেখকের বৈষয়িক জীবনের খুঁটিনাটি খবর তেমন পাওয়া যায় না, কিন্তু লেখকের অন্তর্দ্বন্দ্বের খবর পাওয়া যায় অনেক। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রে বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীকে লেখা 'চিঠিপত্রে' মানুষ রবীন্দ্রনাথকে অনেকটা পাই আমরা। কিন্তু তবু আমার মনে হয় সবটা যেন পাই না। রবীন্দ্রনাথের স্বভাব লাজুক এবং আভিজাত্যপূর্ণ প্রকৃতি তাঁকে 'রুশো'র মতো উলঙ্গ হতে দেয় নি, তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে বা অন্য কোথাও যখন নিজের কথা বলেছেন তখন বেশ সামলে-সুমলেই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য বিরাট। সেই বিরাটের মধ্যে মানুষ রবীন্দ্রনাথ আছেন, কিন্তু অনেক সময় লুকিয়ে আছেন, বেশি প্রকট হয়ে উঠেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

এইবার সাহিত্যের প্রকাশের আর-একটা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করে আমার বক্তব্য শেষ করব। কবি সাহিত্যকে নিজের খাতায় লিপিবদ্ধ করেই সন্তুষ্ট হন না, তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয় তাঁর সৃষ্ট কাব্যকে রসিক লোকের দরবারে পৌঁছে দিতে। আগে, যখন ছাপাখানা ছিল না, তখন কবিরা নিজেই নিজের লেখা পাঠ করে জনসাধারণকে শোনাতেন। পুরাকালে অধিকাংশ সাহিত্যই গানে কবিতায় লেখা হত। কবিরা তা সাধারণতঃ নিজেরাই সুর করে বা আবৃত্তি করে শোনাতেন সকলকে। মেলায় মেলায় যাত্রায় বৈঠকে ধনীদের উৎসব-প্রাঙ্গণে কবির আসর বসত তখন। কবির সঙ্গে রসিকের তখন সামনাসামনি দেখা হত। কিন্তু যখন ছাপাখানা এল তখন কবির আর রসিকদের মাঝে দুটো প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়াল প্রায় আকাশচুম্বী হয়ে। একটি প্রাচীর প্রকাশক, আর একটি প্রাচীর সমালোচক। এদের আনুকূল্য না পেলে লেখকরা পাঠক-সমাজে পৌঁছতে পারেন না। প্রকাশকরা ব্যবসায়ী, তাঁরা সাধারণত সেই বই ছাপতে চান যা বেশি বিক্রী হয়। কবিতার বই বা প্রবন্ধের বই কম বিক্রী হয় তাই তাঁরা তা ছাপতে চান না। নাটকও যদি মঞ্চস্থ এবং জনপ্রিয় না হয় তা হলেও তার পুস্তক-আকারে আত্মপ্রকাশ করা দুরূহ হয়ে ওঠে। পাঠকদের কাছে যাওয়ার আর-একটা পথ সাময়িক পত্র-পত্রিকা। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় যদি লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয় তা হলে তা ভালো হলে পাঠক-পাঠিকা এবং গ্রন্থপ্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বৃহত্তর রসিকসমাজ সে লেখার রসাস্বাদন করবার সুযোগ পান। কিন্তু হায়, আমাদের দেশের অধিকাংশ সাময়িক পত্রই ব্যবসায়ী পত্রিকা, ব্যবসায়ের হাল ধরে যিনি বসে থাকেন তিনি সাহিত্যিক বা রসিক নন, তিনি কোনও ধনীপুত্র। তাঁরও লক্ষ্য সাহিত্যের উন্নতি নয়, ব্যবসায়ের উন্নতি। তাঁরা তাই নামজাদা লেখকদের লেখা ছাপেন, আর ছাপেন সেই সব লেখা যা প্রাকৃত-জন-মন-রোচক। আজকাল অধিকাংশ পত্রিকাতেই সিনেমার সচিত্র খবর থাকে, রান্নার খবর থাকে, জ্যোতিষের খবর থাকে, যৌন-আবেদনমূলক লেখা থাকে, রাজনীতির খবর থাকে, বিদেশী সাহিত্যের পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহীত অনেক বাজে খবর থাকে, উদ্ভট রসিকতা এবং দুর্বোধ্য কবিতা থাকে— থাকে না কেবল এদেশের নূতন লেখকদের লেখা সৎসাহিত্য। এ দেশের উদীয়মান সাহিত্য-সমাজ তাই আজ অনূদিত। আমাদের দেশে নূতন প্রতিভাবান সাহিত্যিক আর জন্মগ্রহণ করছে না এ কথা অবিশ্বাস্য। প্রকৃত কথা হল— তাঁরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে না। অনেক সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকেরা নূতন লেখকের লেখা পড়েও দেখেন না। আমরা যখন লেখা শুরু করেছিলাম তখন কিন্তু এরকমটা ছিল না— আমি যখন স্কুলে পড়ি তখনই আমার লেখা রামানন্দবাবু 'প্রবাসী'তে ছেপে

ছিলেন। তখন টাকায় আট সের দুধ ছিল, ভালো রুদ্নি চাল সাত টাকা মণ ছিল, ঘি পাওয়া যেত টাকায় এক সের, ইলিশমাছ টাকায় চারটে, পাকা রুই ছ আনা সের, ভালো খাসির মাংস আট আনা সের, মুর্গি টাকায় চারটে পাঁচটা। এই অনুপাতে ভদ্রলোকের সংখ্যাও দেশে অনেক ছিল তখন। অধিকাংশ পত্রিকার সম্পাদকেরা তখন মাননীয় বিবেকবান সম্পাদক ছিলেন, কোনও ধনীপুত্রের চাকর ছিলেন না তাঁরা। তাই সে যুগে তাঁরা উদীয়মান সাহিত্যিকদের উৎসাহ দিয়ে, তাঁদের লেখা সংশোধন করে, তাঁদের লেখা প্রকাশ করে তাঁদের মানুষ করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু এ যুগে? আমার মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথও যদি এ যুগে জন্মাতেন তা হলে তাঁরাও বোধ হয় কলকে পেতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এদিক দিয়েও সৌভাগ্যবান ছিলেন, কারণ তাঁদের নিজেদেরই কাগজ ছিল— সাধনা, বঙ্গদর্শন, সবুজপত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সাহিত্য-প্রতিভা-উন্মেষের একটা নবযুগের ইতিহাসকে বিধৃত করে রেখেছে। কিন্তু সব লেখকদের এ সৌভাগ্য হয় না, সবাই নিজেদের কাগজ বার করতে পারে না। তাঁরা আধুনিক নামজাদা পত্র-পত্রিকার আপিসেই লেখা পাঠান এবং তা সম্ভবত অপঠিত অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়। বর্তমান যুগে চাল ডাল তেল নুন মাছ মাংস প্রভৃতির সমস্যায় আমরা ব্যাকুল, আমাদের দেশের উদীয়মান সাহিত্য-প্রতিভা প্রকাশের অভাবে শুষ্ক শীর্ণ বিলীন হয়ে যাচ্ছে, এ নিয়ে আমরা এখনও ব্যাকুল হয়ে উঠি নি। কিন্তু দেশকে যদি বড় করতে হয় তা হলে এ সমস্যারও সমাধান আমাদের করতে হবে। আমাদের দেশে ভালো লেখকরা আত্মপ্রকাশ করতে পারছেন না বলে ভালো পাঠকও তৈরি হচ্ছে না। যাঁরা ভালো লেখক তাঁরাও ভালো লেখা লিখতে চান না, 'পপুলার' লেখা লিখতে চান, তাঁরাও যৌনসমস্যা রাজনীতি আর সিনেমা-মার্কা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। কারণ তাঁরা জানেন ভালো লেখা লিখলে বাজারে তা চলবে না। ভালো পাঠক নেই। আজকাল ভালো সাহিত্য সৃষ্টি করা তাই অধিকাংশ লেখকদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য বাজারে চালু থাকা। ওদেশেও বোধহয় এই রকম অবস্থা। Arnold Wesker-এর লেখা *Roots* নাটকের হতাশ নায়িকা Beatie Bryant শেষ দৃশ্যে যে কথা বলেছেন তা পড়ে এই কথাই মনে হয়। Beatie Bryant অশিক্ষিতা। সে একটা হোটেলের waitress। Beatie Bryant বলছে যে দেশের প্রতিভাবান শিল্পীরা তাদের রুচির বহর দেখে ঘাবড়ে গেছে। তাদের জন্য ভালো কিছু তাই তারা আর সৃষ্টি করছে না। ভুল ইংরেজিতে সে যা বলেছে তা উদ্ধৃত করি—

"Do you think when the really talented people in the country get to work they get to work for us ? Hell, if they do ! Do you think they don't know we won't make the effort ? The writers don't write thinking we can understand, nor the painters don't paint expecting us to be interested— that they don't, nor don't the composers give out music thinking we can appreciate it. 'Blust' they say, 'the masses is too stupid for us to come down to them. 'Blust' they say, 'if they don't make no effort why should we bother ? So you know who come along ? The slop singers and pop writers and the film makers and women's magazines and the Sunday papers and the picture strip love stories— that's

who come along, and you don't have to make no effort for them, it come easy."

আমাদের দেশেও slop singers and pop writers আবির্ভূত হয়েছে এবং তারাই জনসাধারণের মানসিক খোরাক সরবরাহ করছে। আমার বিশ্বাস, সত্যিকার প্রতিভাবান লেখক-লেখিকারা যে নেই তা নয়, কিন্তু তাঁরা আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পাচ্ছেন না। 'ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে'? সব সলিলই 'সমল' হয়ে গেছে। ধনী পত্রিকাওয়ালারা এবং সম্পাদকরা বাংলার প্রতিভা-ধারার উপর যে 'ড্যাম' চাপিয়ে দিয়েছেন তা অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছে সুস্থ সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে। আমাদের সরকার নানারকম পরিকল্পনা করে দেশের উন্নতির চেষ্টা করছেন, কিন্তু সুস্থ সাহিত্য বিকাশের কোনো পরিকল্পনা যদি না হয়, তা হলে শেষ পর্যন্ত সব পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যাবে। কারণ সব পরিকল্পনাতে মানুষই প্রধান উপাদান। দেশের সাহিত্যই দেশের মানুষ তৈরি করে। সাহিত্যের যদি অবনতি হয়, জাতিরও অবনতি বাধ্য। গ্যেটে (না, গ্যয়টে?) বলে গেছেন—The decline of literature indicates the decline of a nation : the two keep pace in their downward tendency।[৭] দেশকে মহৎ করতে হলে মহৎ সাহিত্যকে বাঁচাতে হবে, এবং এ দায়িত্ব সরকারের।

---

৭ Dictionary of Thoughts

রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯০২ কি ১৯০৩ সাল। বিভূতিভূষণের তখন আট ন' বছর বয়েস। পড়েন আপার প্রাইমারি পাঠশালায়। এক দিন হেডমাস্টার গগনচন্দ্র পাল একখানি শিশুপাঠ্য বই থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির ধ্বনি ও ছন্দ বিভূতিভূষণের কানে এক অভূতপূর্ব গানের মত বাজল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত হেডমাস্টারমশায়ের মুখের দিকে চেয়ে কবিতাটি শেষ পর্যন্ত শুনলেন। আবৃত্তির শেষে হেডমাস্টারমশায় জানালেন— কবিতাটির নাম 'শরৎ', কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'রবীন্দ্রনাথের নাম সেই প্রথম শুনলাম জীবনে। দাশু রায়ের পাঁচালি শুনেছি, কবি-জারি-গান শুনেছি, কাশীরাম দাসের মহাভারত নিজেও পড়েছি, গুরুজনদের মুখেও শুনেছি, কিন্তু এমন সুললিত কবিতা কখনও শুনি নি। যেন একটি অপূর্ব সংগীত— অভূতপূর্ব বাণী। এই নামটির সঙ্গে বাল্যকালে শ্রুত সেই কবিতাটির অপরিচিত সৌন্দর্য মিশে গিয়ে ওই নামটির চারি পাশে একটি মায়ালোক গড়ে উঠল আমার মনে সেই দিন থেকেই।'[১]

বিভূতিভূষণ যখন বনগাঁ হাই স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান। পাঠশালায় রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলেও এবং বনগাঁ হাই স্কুলে পড়তে পড়তে তাঁর কবি-খ্যাতির কথা যথেষ্ট শুনলেও তখনও রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের তেমন পরিচয় হয় নি। তার কারণ সেই সময়ে বনগাঁর মতো একটি ক্ষুদ্র মফস্বল শহরে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বিশেষ প্রচলন ছিল না। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ঘটনায় তাঁর মনে আছে 'সে সময়ে গর্ব অনুভব করেছিলুম এই ভেবে যে, আমাদেরই এক জন আজ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সম্মান সারা বাংলা দেশের তথা সারা ভারতবর্ষের সম্মান— আমাদের সম্মান।'[১]

১৯১৪ সাল। বিভূতিভূষণ তখন কলেজে পড়ার জন্য সবে কলকাতা এসেছেন। এখনকার সুরেন্দ্রনাথ (আগেকার রিপন) কলেজে তিনি আই. এ. পড়ছেন ; কলকাতার পথ-ঘাট কিছুই ভালো করে চেনেন না। এক দিন দুপুর বেলায় কলেজে কে বললে— 'আজ সেণ্ট পল্‌স্ কলেজ হস্টেলে রবিবাবু আসবেন, দেখতে যাবে ?' রোদ্দুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে, বেলা তখন তিনটে মতো হবে। কলেজ হস্টেলের সামনের মাঠে রবীন্দ্রনাথ আসবেন। সেখানে তাঁর জন্যে চেয়ার-টেবিল পড়েছে, টেবিলের পাশে দর্শনার্থীদের ভিড়ের মধ্যে বিভূতিভূষণ দাঁড়িয়ে আছেন। ছাত্রদের ভিড়ের মাঝখানে সরু পথ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢুকলেন। বিভূতিভূষণ এর আগে ছবিতে তাঁর চেহারা অনেকবার দেখেছেন, কিন্তু এখন তাঁকে দেখে তাঁর মনে হল কোনো ছবিতেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ রূপ ফুটে ওঠে নি। 'কি একটি অনন্যসাধারণ দীপ্তদৃষ্টি চোখ, চিবুকের নীচে শ্মশ্রুরাজির বাঁকা ভার। একেবারে তাঁর কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি, তাঁর অতটা নিকট সান্নিধ্য লাভের আনন্দে তখন আমি আত্মহারা। সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; ছেলে বেলায় তাঁর কবিতা গগন পালের মুখে প্রথম শুনে মুগ্ধ হই।'[১] হস্টেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট মিঃ কেনেডি রবীন্দ্রনাথের সামনের টেবিলে বড়ো একটা কাঁচের জগ ভর্তি করে জল ও গ্লাস রাখলেন। বিভূতিভূষণ সকৌতুকে ভাবছেন, অতটা জল কি

---

১ আমার লেখা, প্রথম সংস্করণ, প্রথম দর্শন, পৃ. ৩২-৩৩

ওঁর খাওয়ার দরকার হবে? রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতে উঠলেন। বিভূতিভূষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। এমন অসাধারণ কণ্ঠস্বর তিনি আর কখনও শোনেন নি। তাঁর মনে হল জীবনে এই প্রথম এমন কণ্ঠস্বর শুনলেন যা হাজার লোকের মাঝখানেও আলাদা করে চেনা যায়। তাঁর বক্তৃতার আর কোনো কথাই বিভূতিভূষণের মনে নেই। শুধু মনে আছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতার মধ্যে একটি কথা ডান হাতের চাঁপার কলির মতো আঙুলের সাহায্যে সুশ্রী মুদ্রা রচনা করে বলছিলেন 'কল্পলোক···কল্পলোক।'

হস্টেলের মাঠে ক্রমে ছায়া পড়ে এল, বক্তৃতাও শেষ হল। অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নিলেন। তাঁর মনে আছে সেদিন রবীন্দ্রনাথের পায়ে ছিল চক্‌চকে বাদামি চামড়ার জুতো।[১]

১৯৩৩ সালের ৫ এপ্রিল। বিভূতিভূষণ তখন শিক্ষকতা করেন ধর্মতলা স্ট্রীটে খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে, থাকেন ৪১নং মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে। স্কুল থেকে তিনি বাড়ি ফিরে এসেছেন। একটা খবর পেলেন, আজ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বরানগরের বাড়িতে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। বিভূতিভূষণ উপস্থিত হলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং কালিদাস নাগ এঁরা সব আগেই উপস্থিত হয়েছেন। প্রশান্তবাবুর স্ত্রী সবার জন্য খাবার আনলেন, তারপরে এল আইস্‌ক্রিম। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'আরে, still they come!' এইবার 'পথের পাঁচালী'র কথা উঠল, বললেন, এইবারের 'পরিচয়'এ 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে তিনি লিখেছেন।[২] ১৩৪০ সালে বৈশাখ মাসে 'পরিচয়'এ পুস্তক-পরিচয় বিভাগে চারুচন্দ্র দত্তের 'কৃষ্ণরাও'এর সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে লেখেন। "আধুনিক অনেক ভালো গল্প সম্বন্ধে আজও কোনো মত দিই নি— সেই অপরাধ হল নিবিড় —যথা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'। 'পথের পাঁচালী'র আখ্যানটাও অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের জিনিসেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। 'পথের পাঁচালী' যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, নতুন জিনিস ঝাপসা হয় নি, মনে হয় খুব খাঁটি, উঁচুদরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তা দরের রাঙতার সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েছি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয় নি কিছুই, দেখা হয়েছে অনেক যা পূর্বে এমন করে দেখি নি! এই গল্পে গাছপালা পথঘাট মেয়েপুরুষ সুখদুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতায় প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মতো সে সুস্পষ্ট।"

১৯৩৩ সালের ১ মে রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণকে তাঁর নাটক (সম্ভবতঃ 'বাঁশরি') শোনাবার জন্যে ডেকে পাঠান। বিভূতিভূষণ তাঁর ঐ দিনের দিনলিপিতে লিখে গেছেন— 'স্কুল থেকে টাকা নিয়ে বঙ্গশ্রী। সেখানে গিয়ে শুনি রবীন্দ্রনাথ আমার সন্ধান করেচেন— রবীন্দ্রনাথ নতুন নাটক পড়বেন— বলেচেন বিভূতিকে আনা চাই।' যতদূর মনে হয় বিভূতিভূষণ ঐ দিন রবীন্দ্রনাথের নাটক শুনতে যেতে পারেন নি। বিভূতিভূষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত লেখাটি ছাড়া আর একটি আশীর্বাণীর

---

২ বিভূতিভূষণ, অপ্রকাশিত দিনলিপি, ৫।৪।১৯৩৩

উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হাওড়া টাউন হলে বিভূতিভূষণের সম্বর্ধনা উপলক্ষে এক সভা হয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠান।[৩] কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই আশীর্বাণীটির কোনো সন্ধান আজও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণ। বিভূতিভূষণ তখন মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে রয়েছেন। এই দিন সকালে উঠে তিনি লেখাপড়া করছেন এমন সময় এক জন এসে খবর দিলে— রবীন্দ্রনাথ আর নেই। শুনেই তিনি জোড়াসাঁকো চলে এলেন। সেখানে বেজায় ভিড়, ঢোকা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তখনও জীবিত, তবে তাঁর অবস্থা খুব খারাপ। বিভূতিভূষণ ওখান থেকে স্কুলে এলেন এবং স্কুলেই শুনলেন ১২টা ১৩ মিনিটের সময় রবীন্দ্রনাথ গত হয়েছেন। শুনেই তিনি স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে কলেজ স্কোয়ার দিয়ে হেঁটে গিরিশ পার্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শবযাত্রীদের বিরাট জনতা তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে নিয়ে চলল। সেনেটের সামনে বিভূতিভূষণ শেষবারের মতো রবীন্দ্রনাথকে দেখার সুযোগ পেলেন। 'তারপর ট্রেনে চলে এলুম বনগাঁ। শ্রাবণের মেঘনির্মুক্ত নীল আকাশ ও ঘন সবুজ দিগন্তবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতের শোভা দেখতে দেখতে কেবলই মনে হচ্ছিল—

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নূতন জনম লভি—

অনেক দিন আগে ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' পড়তে পড়তে বারাকপুর ফিরছিলুম— মায়ের হাতের তালের বড়া খেয়েছিলুম, সে কথা মনে পড়ল।'[৪] বাড়ি ফিরে রবীন্দ্রনাথের শবাধারের একটি শ্বেতপদ্ম তিনি তাঁর স্ত্রীকে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবৎসরপূর্তি উপলক্ষে ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসের 'বিচিত্রা'য় (রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা) বিভূতিভূষণ 'রবীন্দ্রনাথের দান' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে বিভূতিভূষণের প্রথম আলোচনা। তিনি এই প্রবন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিক অ্যাক্টনের কথা তুলে বলেছিলেন, উনিশ শতকের মানুষের পক্ষে নবম অথবা দশম শতকের মানুষের মন বোঝা বেশ কঠিন। এই কারণে কঠিন যে, কি রাষ্ট্রে ও সমাজে, কি ব্যক্তিগত কাজে ও ভাবনায় নবম অথবা দশম শতকের মানুষ বর্তমান মানুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই মৌলিক পার্থক্যের মূল সূত্রটি মনে রাখলে সেকালের অবিচারের নৃশংসতার ও রক্তলোভের কাহিনী একালে আর দুর্বোধ্য লাগে না। বিভূতিভূষণ লর্ড অ্যাক্টনের উক্তিতে শুধু যে সেকাল আর একালের পার্থক্য দেখতে পেয়েছিলেন তা নয়, সেকাল থেকে একালের অন্তর্নিহিত অগ্রগতির তত্ত্বকে বুঝতে পেরেছিলেন। লিখেছিলেন 'শতাব্দীর পর শতাব্দী যতই পার হয়ে যাচ্ছে, মানুষ ততই দ্রুত এগিয়ে চলেছে— একযুগের গোঁড়ামি ধর্মান্ধতা কুসংস্কার অন্য যুগের মানুষের পক্ষে পরম বিস্ময়ের বস্তু, এ যুগের মিরাকল পরবর্তী যুগের সুপরিচিত দৈনিক ঘটনা— সহস্র শতাব্দীর পারের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা, এখনও সে গৌরবময় বিবর্তনের কাহিনী আমাদের কল্পনারও অতীত। বিশ্বমানবের অগ্রগতির সাহায্যের জন্য মাঝে মাঝে এক একজন লোক আসেন। যাঁরা একাধারে মানুষের

৩ উৎকর্ণ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), পৃ. ১৬৩
৪ উৎকর্ণ (দ্বিতীয় মুদ্রণ), পৃ. ২১৮

সকল দিকে সকল পরিণতির আদর্শ।' তাঁর ধারণায় রবীন্দ্রনাথ তেমন এক আদর্শ মানুষ। অসীমের জন্যে যে তৃষ্ণা সভ্যতার অগ্রগতির পথের সাথী ও প্রদর্শক আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেই সেই তৃষ্ণার সন্ধান পাই। আগে আমাদের দেশের লেখকদের উৎকর্ষের পরিচয় দিতে হলে বিদেশি সাহিত্যিকদের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হত। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙলার স্কট, মধুসূদনকে বাঙলার মিল্টন, কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বাঙলার এমার্সন না বলা পর্যন্ত আমরা স্বস্তি পেতাম না। আমাদের এই দাস-মনোবৃত্তি রবীন্দ্রনাথই দূর করলেন। আমরা নিশ্চিন্ত মুরুব্বিয়ানার সুরে তাঁকে বাঙলার শেলি অথবা মেটারলিঙ্ক বলতে পারলাম না। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের একটি 'unclassified phenomenon' হয়ে রইলেন। বিভূতিভূষণের মতে রবীন্দ্রনাথ যেমন সভ্যতার অগ্রগতি ঘটিয়েছেন তেমনি নানা দিকে সাহিত্যের মোড় ফিরিয়েছেন। যেমন, প্রকৃতির দিক। তাঁর আগে প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে ছিল 'Decadent যুগের সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে আড়ষ্ট ও মামুলী ধরণের বাঁধিগৎ। পূর্ণিমা থেকে কোকিলের কুহু পর্যন্ত তাতে সবই আছে, নেই কেবল প্রাণ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতি-বর্ণনাও সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবমুক্ত নয়, কিন্তু সর্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথেরই মধ্যে পাই প্রকৃতির বিপুলতা ও রহস্যকে। অনাড়ম্বর বাহুল্যবর্জিত বলেই তা প্রাণবন্ত; অসাধারণ চক্ষুষ্মান্ প্রতিভা সেখানে কেতাবী বর্ণনাপদ্ধতির মোহপাশ কাটিয়ে দিয়ে নিজের চোখ ও মনকে বড়ো বলে মেনেছে; সে দর্শনও যেমন নিখুঁত, তেমনি convincing— পদ্মাচরের বিপুল প্রসারের সঙ্গে, পুষ্পিত কাশবনের সৌন্দর্যের সঙ্গে মন সেখানে এক দিকে যেমন এক হয়ে মিশে যায়, অন্য দিকে তেমনি নতুন শক্তির উৎসমুখের সন্ধান পেয়ে নতুন পথে দিগ্বিজয়ে বার হবার অদম্য স্ফূর্তিকে লাভ করে।' বিভূতিভূষণ বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতির বিপুলতার ও রহস্যের সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি ব্যাপার আমরা সর্বপ্রথম লক্ষ করি। তা হল, জীবন ও জগতের প্রসঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আত্মীয়তা খুঁজে পেয়েছেন। প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, শরতের মধ্যাহ্ন থেকে শুরু করে নাম উচ্চারণের পদ্ধতি পর্যন্ত জীবনের মহৎ ও ক্ষুদ্র এমন কোনো দিক নেই যেদিকে তাঁর নজর পড়ে নি। 'এ যুগের বাংলার কবি, কথাসাহিত্যিক প্রবন্ধলেখক— তাঁর কাছে সবারই ঋণের বোঝা বিপুল, বর্তমান চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন তিনি, রূপ দিয়েছেন তিনি— বিশ্লেষণ করে দেখলে সকলেরই চিন্তার উপর রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাব ধরা পড়বেই।'

বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর-একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, নাম 'রবিপ্রশস্তি'। আসলে এটি ছিল ২৫ বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত এক সভায় সভাপতি বিভূতিভূষণের ভাষণ। লেখাটি প্রথমে অধুনালুপ্ত 'অভ্যুদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে ১৩৬৮ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'শনিবারের চিঠি'তে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের কবিতার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বহুব্যবহৃত সৌন্দর্যানুভূতি কথাটির ব্যবহার ও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন লিওনার্দো যেমন রেখার ও রঙের অপূর্ব সমাবেশে, বেঠোফেন যেমন সুকৌশল ধ্বনিসমন্বয়ে, রবীন্দ্রনাথ তেমনি অনন্য শব্দচয়নে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন। তবু তাঁদের তৈরি কল্পলোক রেখার আর রঙের, ধ্বনির আর শব্দের সমষ্টিমাত্র নয়। আসলে এই কল্প বা আনন্দলোক সৃষ্টির মূলে আছে এ

সবের অতীত কোনো অদৃশ্য প্রভাব, কোনো ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি। 'এই অনুভূতি বর্ণ ও ধ্বনির বহু উর্ধ্বে স্থাপিত এক মহত্তর সত্য।' এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শ বোঝাতে গিয়ে তিনি গল্পগুচ্ছ-এর উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের আগে বাঙলা সাহিত্যে ছোটোগল্প ছিল না। যা ছিল তা ছোটোগল্প নয়— হয় কাহিনী, নয় অসার্থক উপন্যাসের অধ্যায়। ছোটোগল্প 'কথা'র একটি বিশেষ ধরণের প্রকাশ। এই 'কথা' আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে ছিল। যেমন কথাসরিৎসাগর, উদয়সুন্দরীকথা, পঞ্চতন্ত্র, দশকুমারচরিত। কিন্তু ছোটোগল্প এই ধরণের 'কথা' নয়। ফরাসি সাহিত্যে উনিশ শতকের মধ্যভাগে মোপাসাঁ ব্যালজাক অ্যালফাস-দোঁদে প্রভৃতির হাতে conte নামে এক ধরণের রচনা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এই রচনা ফ্রান্স পেরিয়ে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশের লেখক ফরাসি conteএর রূপের সামান্য অদল বদল করেন বটে কিন্তু এর রচনার মূল কৌশলটি এঁরা যথাযথভাবে আয়ত্ত করে নেন। সে মূল কৌশল হল মুহূর্ত বা moment সৃষ্টি, যা 'ছোটোগল্পের আর্টের প্রাণবস্ত'। ইউরোপের এই নতুন ধরণের সৃষ্টির উপর রবীন্দ্রনাথেরও নজর পড়ল এবং আমাদের সাহিত্যে তিনি conte ধরণের রচনার আমদানি করলেন। যার ফলস্বরূপ আমরা গল্পগুচ্ছ-এর অপূর্ব গল্পগুলি পেলাম। ফরাসি সাহিত্যের এই ধরণের রচনাশিল্পের সুনির্দিষ্ট ক্রমগুলির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ফরাসি সাহিত্যের গল্পের নিয়মগুলো এত স্থিতিশীল ও সুনির্দিষ্ট যে এর সঙ্গে ইউরোপীয় সংগীতের বিভিন্ন ক্রমগুলির তুলনা চলে। এই রচনাশিল্পের পাঁচটি পর্যায়— ভূমিকা, সম্প্রসারণ, পুনরাবৃত্তি, বিরতি ও চরমোৎকর্ষ। এই শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে তিনি আনাতোল ফ্রাঁসের 'জুডিয়ার শাসনকর্তা' গল্পটির উল্লেখ করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোটোগল্প এ বিষয়ে একেবারে নিখুঁত ফরাসি আর্ট। যেমন অপূর্ব তাহার পরিবেশ, তেমনি অপূর্বতর তাহার মুহূর্তসৃষ্টি। মুহূর্তসৃষ্টির সাহায্যেই ছোটো-গল্প অমর হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ অমর মুহূর্ত সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার 'পোস্টমাস্টার' 'কাবুলি-ওয়ালা' 'দৃষ্টিদান' 'ব্যবধান' প্রভৃতি বিখ্যাত গল্পগুলিতে। এই মুহূর্তগুলি এতই সুস্পষ্ট ও যথাযথ, যে কখনও ছোটোগল্প পড়ে নাই বা ছোটোগল্পের আর্ট যে জানে না— সেও এগুলির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে।' রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের এই অনুভূতিপ্রধান মুহূর্তসৃষ্টির সঙ্গে ক্যাথারিন ম্যান্‌স্‌ফিল্‌ডের গল্পগুলির তুলনা চলে। রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের গল্পগুলির সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ বলেছিলেন, এই পর্বের গল্প-গুলিতে ফরাসি conteএর প্রভাব আর দেখা যায় না। যেমন, 'বোষ্টমী'। এই পর্বে ফরাসি শিল্পের শৃঙ্খল ভেঙে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব একটি অপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন, যার চরম পরিণতি আমরা দেখতে পাই 'চতুরঙ্গ'এ।

বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের যে বইটি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন সে বইটি হচ্ছে 'ক্ষণিকা'। দিনলিপির এক জায়গায় তিনি লিখে গেছেন 'আমি ক্ষণিকার বড় ভক্ত। 'ক্ষণিকা'র কথা একবার উঠলে আমি স্থির থাকতে পারি না।'[৫]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে একালের বাঙলার কবি-শিল্পীদের ঋণের বোঝা বিপুল। এ কথা সাধারণ ভাবে জানিয়ে প্রকৃতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সম্পর্কে বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, প্রকৃতির বিপুলতা ও রহস্যকে আমরা রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে প্রথম চিনতে শিখি। তাঁর গল্প কবিতায়

৫ বিভূতিভূষণ, অপ্রকাশিত দিনলিপি, ১১।৮।১৯৩৩

পদ্মাচরের বিপুল প্রসার ও পুষ্পিত কাশবনের সৌন্দর্যের সঙ্গে মন যেমন এক দিকে এক হয়ে যায়, অন্য দিকে আবার এই নতুন শক্তির উৎসমুখের পরিচয় পেয়ে নতুন পথে বার হবার প্রেরণা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'এ অথবা 'সোনার তরী' 'চিত্রা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলিতে পদ্মার এই বিপুল প্রসার ও রহস্যের চিত্র মেলে। 'নিশীথে' গল্পে কথক যখন মনোরমাকে নিয়ে বোটে করে পদ্মায় এসে পৌঁচেছে 'ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশনির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।' পদ্মার এই প্রসার 'সোনার তরী'র কবির চোখে পড়েছে, 'মানসসুন্দরী'তে তিনি লিখেছেন—

> হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
> শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
> প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
> শুয়ে আছে।

প্রকৃতির মধ্যে বিপুলতার ও রহস্যের সন্ধান ও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক স্থাপন আমাদের দেশে সফলতায় ও ব্যাপকতায় রবীন্দ্রনাথে প্রথম হলেও এই ধারার সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথে সর্বপ্রথম নয়। ইংলণ্ডে উনিশ শতকীয় রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর কাছ থেকে বাংলা সাহিত্যে বিহারীলালই সর্বপ্রথম এই ধারা গ্রহণ করেন। এর পরে বিহারীলালের কাছ থেকে পান রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিক গোষ্ঠী। রবীন্দ্রোত্তর কথাশিল্পীদের মধ্যে আবার বিভূতিভূষণই এই ধারা সবচেয়ে অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেন। বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে যে বিপুলতার ও রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন সে সন্ধান বিভূতিভূষণেরও প্রকৃতিবোধের অন্যতম উৎস-সন্ধান। প্রকৃতির অনির্বচনীয় বিপুলতা ও রহস্য-ময়তার বার্তানিবেদনের জন্য বিভূতিভূষণের কি অশান্ত ব্যাকুলতা। 'যে-কথাটা বার-বার নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোনোবারই ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছম্‌-ছম্‌-করানো সৌন্দর্যের দিকটা।'[৬] নিস্তব্ধ অপরাহ্নে লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তবিস্তৃত বনঝাউ ও কাশের বনে প্রকৃতির বিশাল রূপ বিভূতিভূষণের মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। বিভূতিভূষণ তাকে বলেছেন, সে যেন খুব উঁচু দরের নীরব সংগীত। সে মহাসংগীতের লয় ও সঙ্গতি 'নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে।'[৬]

রবীন্দ্রনাথের মতো বিভূতিভূষণও বিপুল বিস্ময় নিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথে এই বিস্ময় এক দিকে যেমন অনির্দেশ্যতায় রোমান্টিক, অপর দিকে তেমনি তাত্ত্বিকতায় মরমিয়া বা মিস্টিক। পুরীর সমুদ্রের ধারে বসে প্রকৃতির প্রতি রোমান্টিক দৃষ্টি মেলে কখনও তিনি সমুদ্রের 'প্রথম গর্ভের মহারহস্য বিপুল'তায় বিস্মিত হয়েছেন, কখনও বিস্ময়ে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হয়েছেন এই কথা ভেবে 'আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন

৬ আরণ্যক (ষষ্ঠ মুদ্রণ), পৃ. ১১৪, ১১৫

পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত।'[৭]

রোমান্টিক দৃষ্টিতে বিভূতিভূষণেরও কাছে এই পৃথিবী দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় এক অপার্থিব স্বপ্নভূমি বলে মনে হয়েছে, কখনও তিনি পায়ে পায়ে সময়ের উজান বেয়ে ফিরে গেছেন কোনো এক অতীত দিনে যে দিন মহালিখারূপের পাহাড় আর অরণ্যের জায়গায় ছিল 'মহাসমুদ্র— প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্বিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে— এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। মানুষ তখন ছিল না, এ ধরণের গাছপালাও ছিল না। যে ধরণের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে।'[৮]

যে-রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক ভাবদৃষ্টিতে কখনও বসুন্ধরার জন্মলগ্নের আদিম ক্ষণটিতে ফিরে যেতে চান, কখনও তার বিচিত্র সৃষ্টিকে স্পর্শ করতে চান, সেই রবীন্দ্রনাথই মরমীর গভীর তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রকৃতির আদি সত্তার কাছে আত্মনিবেদন করেন—

আমারে ফিরায়ে লহো
সেই সর্ব-মাঝে যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ· ·।[৯]

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেমন এই বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে পরমের স্পর্শ অনুভব করেছেন ('And I have felt a presence') রবীন্দ্রনাথও তেমনি জ্যোৎস্নাসুপ্ত নিস্তব্ধ প্রহরে আনন্দে ও বিষাদে-গাঁথা ছায়ালোকের মাঝখানে তাঁর আসন পেতেছেন—

শুনিতেছি তৃণে তৃণে, ধুলায় ধুলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।[১০]

রবীন্দ্রনাথের মতো বিভূতিভূষণও মরমীর গভীর তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে এই বিশ্বপ্রকৃতি এক মহান্ শিল্পীর মহাকাব্য। 'মহাকবি তিনি, অনাদ্যন্ত শাশ্বত যুগ ধরে এই রকম শিলাস্তৃত ঝর্ণার তটে, অনন্ত নীহারিকামণ্ডলী ছড়ানো আকাশপটে, বনকুসুমের পাপড়ির দলে,

---

৭ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র সংখ্যা ৭৪
৮ আরণ্যক, পৃ. ১০০
৯ সোনার তরী, বসুন্ধরা
১০ নৈবেদ্য, ২৩ সংখ্যক কবিতা

বিহঙ্গকাকলীতে, অগ্নিপুচ্ছ ও ধূমকেতুদলের যাতায়াতে, তিনি আপন মনে তাঁর বিরাট এপিক কাব্য লিখেই চলেছেন।'[১১] কখনও ক্ষান্তবর্ষণ মেঘথমকান সন্ধ্যায় ফুলকিয়া বইহারের দিগন্তহারা প্রান্তরের মধ্যে তিনি সেই দেবশিল্পীর স্বপ্ন দেখেছেন। 'এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী-হ্রদের জলজ পুষ্প, মহালিখারূপের পাহাড়, আকাশ, ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় এক দিন ছিল বীজরূপে নিহিত— তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নবনীলনীরদমালার মতোই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে।'[১২]

প্রকৃতিভাবনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতিভূষণের আর-একটি মৌলিক মিল চোখে পড়ে। সে মিল মূলতঃ মনোভাবের এবং তার আদি উৎসে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য। রবীন্দ্রনাথ এবং বিভূতিভূষণ উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানতঃ শান্তরসাশ্রিত এবং সেই অর্থে যথার্থ ভারতীয়। ফলে উভয়ের হাতে প্রকৃতির শান্তরূপটি বেশি করে ফুটেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে শুকনো পাতায় অলস মধ্যাহ্নের খেলা, অশ্বত্থের দীর্ঘতর ছায়া, দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে রৌদ্রপীত অঞ্চল বক্ষে উদাসিনী বসুন্ধরার মূর্তি, কানে ভাসে তরু মর্মরের ব্যাকুলতা, মেঠোসুরে অনন্তের বাঁশির কান্না।[১৩] তার পাশে বিভূতিভূষণের চোখে পড়ে সোনাডাঙার মাঠে সোঁদালি ফুলের ঝাড়, দূরবিসর্পিত প্রান্তরের ওপর তিসিফুলের মতো নীল আকাশ, গৃহত্যাগী উদাসী বাউলের মতো কাঁচা মাটির পথ।[১৪] প্রকৃতিভাবনায় উভয়েই শান্তির ও কল্যাণের পূজারী হয়েও প্রকৃতির অশান্ত ও অমঙ্গল রূপের প্রতি যে উভয়েই উদাসীন ছিলেন তা নয়। একান্তই স্বল্পসংখ্যক হলেও রবীন্দ্রনাথ যেমন 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' 'সিন্ধু তরঙ্গ' প্রভৃতি কবিতায়, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'এর মতো গল্পে প্রকৃতির ধ্বংসমূর্তি দেখেছেন, বিভূতিভূষণও তেমনি গ্রীষ্মের দাবদাহে, বোমাইবুরুর জঙ্গলে প্রকৃতির রুদ্র মূর্তি দেখেছেন। তাঁর ধারণা 'মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্যকে ধ্বংস করিতেছে সত্য, গাছপালাকে দূর করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি এক দিন প্রতিশোধ লইবে। ট্রপিকস-এর অরণ্য আবার জাগিবে, মানুষকে তাহারা তাড়াইবে, আদিম অরণ্যানী আবার ফিরিবে।'[১৫]

রবীন্দ্রনাথের শান্তরসাশ্রিত প্রকৃতিভাবনায় শান্তরসের পথ বেয়ে যে দুই ঋতুর প্রকৃতি তাঁর গল্প-কবিতায় অধিকতর আনাগোনা করেছে সে দুই ঋতু বর্ষা ও শরৎ। বর্ষা ও শরৎ অবশ্য একান্তভাবেই শান্তরসের ঋতু নয়। উভয় ঋতুরই মাঝখানে বিপুল উদ্দামতার ও উৎসবের সুর রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শান্ত দৃষ্টিতে এক দিকে বর্ষার স্নিগ্ধ সজল করুণরূপ, অপর দিকে শরতের সুদূর স্বপ্নাচ্ছন্ন উদাসরূপ চোখে পড়েছে। ঋতুর মধ্যে যেমন বর্ষা ও শরৎ তাঁর স্বভাবের অনুকূল বলেই গল্পে-কবিতায় বেশি জায়গা পেয়েছে, ঠিক তেমনি পেয়েছে দিনের মধ্যে মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা। বর্ষার সঙ্গে সন্ধ্যার এবং শরতের সঙ্গে মধ্যাহ্নের মেজাজ মিলে প্রকৃতির ওপরে বর্ষা-সন্ধ্যা ও শরৎ-মধ্যাহ্ন এক করুণ ও উদাস ছায়া ফেলেছে। তাই আষাঢ়ের এক সন্ধ্যায় বাঁধনহারা বৃষ্টিধারার মাঝখানে গৃহকোণবাসী একাকী কবি বলেন,

---

১১ হে অরণ্য কথা কও (ষষ্ঠ মুদ্রণ), পৃ. ১৬০

১২ আরণ্যক (ষষ্ঠ মুদ্রণ), পৃ. ২৫২

১৩ সোনার তরী, যেতে নাহি দিব

১৪ পথের পাঁচালী (অষ্টম সংস্করণ), ২৮ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৭৫

১৫ অপরাজিত, (ষষ্ঠ মুদ্রণ), ২০ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩০৯

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।[১৬]

কখনও শরৎ-মধ্যাহ্নের আকাশের নীচে কবির চোখে পড়েছে রৌদ্রস্নাত দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, নীলাভ্রের স্বচ্ছতম নির্মল বিস্তার ; স্বপ্নাচ্ছন্ন ক্ষণটিতে মনে হয়েছে—

কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।'[১৭]

এই শান্তদৃষ্টির ফলে বিভূতিভূষণের সাহিত্যেও শারদীয়া প্রকৃতি এসে ভিড় করেছে। 'আকাশে বাতাসে গরম রৌদ্রের গন্ধ, নীল নির্মেঘ আকাশের দিকে চাহিলে মনে হঠাৎ উল্লাস আসে, বর্ষাশেষের সবুজ লতাপাতায়, পথিকের চরণভঙ্গিতে কেমন একটা আনন্দ মাখানো। রেলপথের দু পাশে কাশফুলের ঝাড় গাড়ির বেগে লুটাইয়া পড়িতেছে।'[১৮] এই শরৎ-মধ্যাহ্নে 'অপরাজিত'র শেষে অপুর এক অদ্ভুত জীবনানুভূতি হয়েছে। 'নিস্তব্ধ শরৎ-দুপুরে যখন অতীতকালের এমনি এক মধুর মুগ্ধ শৈশব দুপুরের ছায়াপাতে স্নিগ্ধ ও করুণ হইয়া উঠে তখনই সে বুঝিতে পারে চেতনার এ স্তর বাহিয়া সে বহুদূর যাইতে পারে।'[১৯] বিভূতিভূষণ তাঁর মনোভাব প্রকাশের উপায় হিসেবে কোনো বিশেষ ঋতুর চেয়ে দিবসের দুটি বিশেষ কালকে অধিকতর অনুকূল বলে বিবেচনা করেছেন। সেই দুটি কাল— অপরাহ্ণ ও জ্যোৎস্নারাত্রি। তাঁর দিনলিপির এক স্থানে তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, 'আমি বৈকাল ভালোবাসি বড়ো আর ভালোবাসি— জ্যোৎস্নারাত।'[২০] বিভূতিভূষণের স্বভাবের মাঝখানে যে উদাসী ও রহস্যময় সত্তা লুকিয়ে আছে সেই সত্তা অপরাহ্ণ ও জ্যোৎস্নারাত্রিরও মাঝখানে লুকিয়ে আছে। বিভূতিভূষণ তাই তাঁর মনোভাবকে বোঝাতে গিয়ে অপরাহ্ণের ও জ্যোৎস্নারাত্রির প্রকৃতিকে এনে ফেলেছেন। বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণের মতো আর কারও সাহিত্য অপরাহ্ণের আলোতে এত মায়াময় হয়ে ওঠে নি। বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্প উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোর অনেক নিবিড় মুহূর্তের সঙ্গে এই অপরাহ্ণ জড়িয়ে আছে। অপুর 'পাঠশালার চারি পাশের বনজঙ্গলে অপরাহ্ণের রাঙা রৌদ্র বাঁকা ভাবে আসিয়া পড়িত। কাঁটালগাছের জগডুমুরগাছের ডালে-ঝোলা গুলঞ্চলতার গায়ে টুনটুনি পাখি মুখ উঁচু করিয়া বসিয়া দোল খাইত। পাঠশালাঘরে বনের গন্ধের সঙ্গে লতাপাতার চাটাই, ছেঁড়াখোঁড়া বই-দপ্তর, পাঠশালার মাটির মেঝে, ও কড়া দা-কাটা তামাকের ধোঁয়া ; সবসুদ্ধ মিলিয়া

---

১৬ গীতাঞ্জলি, ১৬ সংখ্যক কবিতা

১৭ কড়ি ও কোমল, সারাবেলা

১৮ পথের পাঁচালী, (অষ্টম সংস্করণ) ২৬ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৩১

১৯ অপরাজিত ২৬ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৯৮

২০ বিভূতিভূষণ, অপ্রকাশিত দিনলিপি, ২।২।১৯৩৪

এক জটিল গন্ধের সৃষ্টি করিত।'[২১] বিভূতিভূষণের এই প্রিয় অপরাহ্ণ তাঁর ভাবনায় অতীতে-ভবিষ্যতে দূরবিসর্পিত। বিকেলকে দেখে অপুর কখনও মনে হয়েছে কোনো এক অতীতে এই মায়াময় অপরাহ্ণ তার জীবনে এসেছিল, আবার কখনও মনে হয়েছে কোনো এক ভবিষ্যতে 'তখনও এই রকম বৈকাল, এই রকম কালবৈশাখী নামিবে তিন হাজার বর্ষ পরের বৈশাখ দিনের শেষে।'[২২] এই উদাস অপরাহ্ণের পাশে পাশে তাঁর সাহিত্যে জ্যোৎস্নারাত্রির কোথাও স্নিগ্ধকরুণ, কোথাও অপার্থিব রহস্যময় রূপ ধরা পড়েছে। কখনও বৈশাখী শুক্লাদ্বাদশীর জ্যোৎস্না পরলোকগত দুঃখিনী মায়ের আশীর্বাদের মতো অপুর ওপর বর্ষিত হয়েছে, কখনও দোলপূর্ণিমারাতের জ্যোৎস্না সত্যচরণের মনে কেমন এক উদাস বাঁধনহীন ভাব এনেছে। 'সে-রকম ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড়ো বড়ো গাছ নাই, ছোটোখাট বনঝাউ ও কাশবন— তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চক্‌চকে সাদা বালি মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্ত ভাব— মন হু হু করিয়া উঠে, চারি দিকে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথরাত্রে জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।'[২৩] প্রকৃতির উদাস ও করুণ এই দুই রূপ রবীন্দ্রনাথ এবং বিভূতিভূষণ উভয়ের মাঝখানে থাকলেও রবীন্দ্রনাথে যেমন প্রকৃতির দুই রূপই যথেষ্ট, বিভূতিভূষণে কিন্তু তা নয়। বিভূতিভূষণের চোখে প্রকৃতির উদাস ও রহস্যময় রূপই বেশি করে ধরা পড়েছে। অবশ্য সব শান্তরসের কেন্দ্রেই এই রহস্য বা বিস্ময়বোধ বর্তমান— বিভূতিভূষণে আবার এই বোধেরই প্রাধান্য। বিভূতিভূষণের শিশুদৃষ্টি বিরাট সৃষ্টির খেলাঘর নিয়ে এত মুগ্ধ, এত মশগুল যে তার মাঝখানে মানুষের সুখ-দুঃখকে একান্তভাবে নজর দেওয়ার সময় তিনি পান না। অরণ্য এবং জীবজগতের মতোই মানুষও এই খেলাঘরের খেলনা। মোহিতলালকে বিভূতিভূষণ যে 'vastness of space and passing time'এর কথা বলেছিলেন সেই দিশাহারা দেশকাল, সেই 'মহাকালের মিছিল' নিয়ে তিনি অধিকতর কুতূহলী। 'আমি শুধু কৌতূহলাক্রান্ত এই মহাকালের মিছিলে। এই সম্রাট সম্রাজ্ঞী খোজা ভৃত্য সৈন্য সেনাপতি— তৃণের মতো স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়ার দিকটা আমায় মুগ্ধ করে। মহাকালের এই তাণ্ডবনৃত্যছন্দ যুগ যুগ ধরে রাজা মহারাজা সাম্রাজ্য কাহিনীকে উড়িয়ে ফেলে দিয়ে আপন মনে কোন বিশাল অন্তরের মৃদঙ্গের গম্ভীর বোলের সঙ্গে তাল রেখে চলছে— দিকে দিকে, যুগে যুগে, ইউট্রোপিয়াস্ গিল্‌ডো রুফাইলাসের দলও তাদের কড়ির পুটুলি ফেনার ফুলের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে— জাতি মহাদেশ মথিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর বিরাট চরণ-পেষণে। মহাশূন্যে তাঁর মহাবিষাণ শুধু অনন্তকাল ধরে এই চলে যাওয়ার উদাসভেরীধ্বনি বাজাচ্ছে···অনাহত শব্দের মতো তা সাধারণ মানুষের শক্তির বাইরে।'[২৪] প্রকৃতির মাঝখানেও এই গতির ছন্দকে আবিষ্কার করে বিভূতিভূষণ বিস্মিত হয়েছেন।

২১ পথের পাঁচালী (৮ম সংস্করণ), ১৪ পরিচ্ছেদ, পৃ. ১০১

২২ অপরাজিত (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ২৪ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩৮৫

২৩ আরণ্যক, (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), পৃ. ২৫-২৬

২৪ স্মৃতির রেখা (৪র্থ মুদ্রণ), ৬।১২।১৯২৭, পৃ. ৭৪-৭৫

বাইরে থেকে যে জগৎকে এত শান্ত ও সনাতন লাগে তিনি তার আড়ালে এক ভয়ানক রুদ্র গতিবেগ উপলব্ধি করেছেন। 'রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রগুলি কি অদ্ভুতভাবে স্থান পরিবর্তন করে। আবলুস ডালের ফাঁকের তারাগুলি ক্রমশ নীচে নামে, কালপুরুষ ক্রমে পর্বতসানুর দিক হইতে মাথার উপরকার আকাশে সরিয়া আসে, বিশালকায় ছায়াপথটা তেরছা হইয়া ঘুরিয়া যায়, বৃহস্পতি পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়ে। রাত্রির পর রাত্রি এই গতির অপূর্ব লীলা দেখিতে দেখিতে এই শান্ত, সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক রুদ্র গতিবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে তাহার স্নিগ্ধতা ও সনাতনত্বের আড়ালে, সে সম্বন্ধে অপুর মন সচেতন হইয়া উঠিল— অদ্ভুতভাবে সচেতন হইয়া উঠিল।'[২৫]

রবীন্দ্রনাথের মতো বিভূতিভূষণেরও প্রকৃতিভাবনা শান্তরসাশ্রিত বলে উভয়েই যেমন বিশেষ ঋতুর ও ক্ষণের প্রকৃতির রূপকে দেখিয়েছেন ঠিক তেমনি এই কথাটিকেই আবার ঘুরিয়ে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণ উভয়েই প্রকৃতির দুই রূপের রূপকল্প দিয়ে তাঁদের জীবনবোধের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং বিভূতিভূষণ সৃষ্টির মাঝখানে যে সীমাহীনতা ও গতির স্বপ্ন দেখেছেন সেই স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোথাও নিরুদ্দেশ নদ-নদীর, কোথাও উধাও পথ-প্রান্তরের ছবি। রবীন্দ্রনাথ সীমাহীনতা ও গতির ভাবনাকে যেমন কখনও নিরবধি পদ্মার নয়তো বীরভূমের শাল-তাল-আমলকির পত্রমর্মরিত উধাও মাঠের চিত্রকল্পে রূপায়িত করেছেন, তেমনি বিভূতিভূষণও কখনও ইছামতীর চলমান ছবিতে, কখনও দিগন্ত-বিস্তৃত ফুলকিয়া-বইহার-লবটুলিয়ার প্রান্তরের ছবিতে তাকে রূপায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন পদ্মা-মাতৃক, বিভূতিভূষণ তেমনি ইছামতীমাতৃক। রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণের মতো আজন্ম না হলেও দীর্ঘকাল নদীর সঙ্গে বসবাস করেছেন। ১৮৯১ সালে উত্তরবঙ্গে জমিদারি দেখতে যাওয়া থেকে শুরু করে ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এই দীর্ঘ দশ বছর পদ্মার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। আর বিভূতিভূষণের সঙ্গে ইছামতীর সম্পর্ক তো আরও আবাল্যের। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক না হলেও কৌতূহলপ্রদ বলে একটি ব্যাপারের উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হল একের প্রিয় নদী সম্বন্ধে অপরের ধারণা। বিভূতিভূষণের প্রিয় নদীটির কথায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, এই ছোটো খামখেয়ালি নদী, দুই ধারে সবুজ ঢালু ঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত আর আখের ক্ষেত, আর সারি সারি গ্রাম— এ যেন একই কবিতার লাইন আমি বারম্বার আবৃত্তি করে যাচ্ছি এবং প্রতিবারেই নতুন বোধ হচ্ছে। 'ইছামতী মানুষ-ঘেঁষা নদী— তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের দৈনিক কর্মপ্রবাহগুলি বেশ সুন্দরভাবে এসে মিশছে।'[২৬] রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নদীর কথায় বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, 'পদ্মা? সেও অপূর্ব সন্দেহ নেই। কিন্তু সে আদরে পালিতা ধনীবধূ, একগুঁয়ে, তেজস্বিনী, শক্তিশালিনী। যা খুশি করে, কেউ আটকাতে পারে না— সবাই ভয় করে চলে— খামখেয়ালি— রূপবতী— তবে মিষ্টি নয়— high-bred রূপ ও চালচলন। ঘরকন্না পাতিয়ে নিয়ে থাকবার পক্ষে তত উপযোগী নয়।'[২৭]

ইছামতীর শান্ত প্রবাহের সঙ্গে বিভূতিভূষণের মনের মিল থাকায় তাঁর ইছামতী-প্রীতি যেমন স্বাভাবিক লাগে, রবীন্দ্রনাথের পদ্মা-প্রীতি আপাততঃ তেমন লাগে না। এই কথা ভেবে লাগে না, পদ্মা তো

২৫ অপরাজিত (৬ষ্ঠ মুদ্রণ), ১৮ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৭৫

২৬ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২২০

২৭ তৃণাঙ্কুর (৪র্থ মুদ্রণ), পৃ. ৮৩

প্রমত্তা। অপ্রমত্ত রবীন্দ্রনাথ তাকে এত ভালোবাসলেন কি করে? কি করে বললেন 'বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি।…পদ্মা আমার যথার্থ বাহন।'[২৮] এই ভালোবাসা কি নেহাতই পদ্মার সঙ্গে দশ বছর বসবাসের ফল? এর উত্তরে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ যে পদ্মাকে ভালোবেসেছেন সে পদ্মা যে কোথাও ভয়ংকরী ও সর্বনাশা নয়, তা নয়। কবির চোখে সে পদ্মা বিশেষ করে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন পূর্ণ সংসার-যাত্রার পণ্যবাহী, নয় সে একটি idea বা ভাবমূর্তি। তার পাশে কোথাও নামগোত্রহীন মানবসমাজের বিপুল সংসারলীলা চলেছে, নয় তার মাঝখানে চলেছে নিঃশব্দ এক গতিচ্ছন্দ। যে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাকে ভালোবাসার কথা লিখেছেন সে চিঠির সবটা পড়লে বোঝা যাবে তাঁর প্রিয় পদ্মা স্ফীত ও নীলাভ নয়, তন্বী ও পাণ্ডুর। 'পদ্মার জল অনেক কমে গেছে— বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে— একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন।'[২৮] তবে ইছামতীর মতো মানুষের সঙ্গে তার এত 'মাখামাখি সখিত্ব' নয়, সে 'খুব বেশি পোষমানা নয়, কিছু বুনোরকম'।

ছোটোগল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতিভূষণের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রসাহিত্যে গল্প-উপন্যাসের অঞ্চল সাধারণতঃ এক নয়। 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি,' যা প্রধানত বঙ্কিমী ভাবনায় রচিত, বাদ দিলে তাঁর উপন্যাসের অঞ্চল শহর ও অধিবাসীরা নাগরিক এবং তাঁর ছোটোগল্পের অঞ্চল গ্রাম ও অধিবাসীরা গ্রামবাসী। তা হবারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম খাস কলকাতা শহরে এবং শিক্ষা-দীক্ষাও প্রধানত শহরে। তারপর অবশ্য জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে উত্তরবঙ্গে যেতে হয় এবং সেখানেই পল্লীবঙ্গের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ও গল্প কবিতায় তার প্রকাশ। জন্ম থেকে শুরু করে জমিদারি দেখার পূর্ব পর্যন্ত এই দীর্ঘ ত্রিশ বছর শহর বাঙলাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের সংস্কার ও নাগরিক ভাবনা গড়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় নি। তাঁর জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা, প্রথমজীবনের কর্মস্থল (জাঙ্গিনাড়া, হরিনাভি, ভাগলপুর-আজমাবাদ) ও উত্তরজীবনের আশ্রয় (বারাকপুর ও ঘাটশিলা) পল্লীতে ও মফস্বল শহরে। সেজন্যে তাঁর গল্প-উপন্যাসের অঞ্চল স্বাভাবিক ভাবেই গ্রাম-বাঙলা। 'অপরাজিত' (অংশবিশেষ) 'দম্পতি' 'অনুবর্তন' এই তিনটি উপন্যাস এবং 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' 'মরফোলজি' প্রভৃতি গল্পের স্থান অবশ্য কলকাতা। তবু, প্রথমত তাঁর সাহিত্যের একান্ত কম আয়তন জুড়ে এই শহর ও শহুরে জীবন। দ্বিতীয়ত অপুর মতো সার্থক এবং প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রের জীবনবোধের বিবর্তন ও পরিণতি নিশ্চিন্দিপুরের পল্লীতে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে বিভূতিভূষণ নগরবিমুখ। তাঁর দিনলিপিতে কলকাতার আকর্ষণের কথা রয়েছে। কলকাতার মতো শহরে না থাকলে যে 'মন বড় হয় না, চোখ ফোটে না', এ শিক্ষা দেওয়ানপুরের হেডমাস্টারমশায় অপুকে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের অধিবাসীরা যেমন শহরের আদবকায়দায় ও স্বভাবে গঠিত, গল্পের অধিবাসীরা তেমনি মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত। বিভূতিভূষণের গল্পে উপন্যাসে কিন্তু তা নয়। তাঁর গল্প-উপন্যাসের অঞ্চল রবীন্দ্রনাথের মতো ভিন্ন নয়— এক। অর্থাৎ তা প্রধানত পল্লী। দ্বিতীয়ত তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু রবীন্দ্রনাথের বিপরীত। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে প্রকৃতি ও মানুষ একত্রে গ্রথিত, যার জন্যে অপুকে 'অর্ধেক মানব তুমি অর্ধেক প্রকৃতি'[২৯] বলা হয়েছে। 'অপরাজিত' 'দৃষ্টিপ্রদীপ' 'আরণ্যক'

---

২৮ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৯৩

২৯ প্রমথনাথ বিশী, ভূমিকা ।/০, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

'ইছামতী' প্রভৃতি প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসগুলিতে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনা যেখানে অত্যন্ত প্রবল, কোথাও বা একান্তই লক্ষস্থানীয় সেখানে তাঁর ছোটোগল্পের প্রধান লক্ষ মানুষ। তাঁর উপন্যাসে যেমন প্রকৃতির ও মানুষের সম্পর্ক প্রধান, ছোটোগল্পে তেমনি মানুষই প্রধান। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের বিষয়বস্তু যা— পল্লীবঙ্গের নদ-নদীর, আকাশ ও প্রান্তরের পটভূমিতে সুখ-দুঃখ ও বিরহ-মিলন-পূর্ণ মানুষের জীবনযাত্রা —বিভূতিভূষণের উপন্যাসের বিষয়বস্তু তাই। আবার, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিষয়বস্তু যা— অর্থাৎ প্রকৃতি সম্পর্কবর্জিত নিছক মানুষ, বিভূতিভূষণের ছোটোগল্পের বিষয়বস্তু তাই। তবে এই মানুষ একান্তই দুই ভিন্ন প্রকৃতির— একজন নাগরিক অপর জন গ্রাম্য। অবশ্য এই বিভাগ একেবারেই সাধারণ। কারণ প্রকৃতিকে নিয়ে বিভূতিভূষণ 'কুশল পাহাড়ী' 'আচার্য কৃপালনী কলোনি' 'কনে দেখা' প্রভৃতির মতো সুন্দর গল্প লিখেছেন। গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে উভয়ের তুলনা প্রসঙ্গে এই কথাটি সাধারণভাবে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস যেমন মানুষ ও ছোটোগল্প প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে, বিভূতিভূষণে ঠিক তদ্বিপরীত।

প্রকৃতির মাঝখানে এক নিগূঢ় প্রাণসত্তার আবিষ্কারে বিভূতিভূষণের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এবং উভয়ের মনোভঙ্গির মিল থাকলেও প্রকৃতির প্রতি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছুটা তফাত আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি নানান ঋতুতে আপন বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য নিয়ে গ্রাম্য জনপদের পাশে সহানুভূতিশীল মূক এক আত্মীয়ের মতো বেড়ে উঠেছে— পরস্পর পরস্পরের সমঝদার ও সম্পূরক। এক দিকে পদ্মাতীরের মুক্ত প্রসার ও পুষ্পিত কাশবন নিয়ে সমগ্র প্রকৃতি, অপর দিকে বন্ধনভীরু বালক তারাপদ এবং মুগ্ধা বালিকা শুভাকে নিয়ে সমগ্র মানবসমাজ। এদের কাউকেই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে ভাবা যায় না। বিভূতিভূষণের সাহিত্যে নিশ্চিন্দিপুরের পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে অপুর নিবিড় সম্পর্কে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার কথা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো বিভূতিভূষণের প্রকৃতিও মানুষের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিভূষণের সাহিত্যে 'অপরাজিত' 'আরণ্যক' 'বনেপাহাড়ে' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকৃতির আর-একটি রূপ প্রকাশিত হয়েছে। সে রূপ ঋতুতে ঋতুতে রঙ-বদলানো গাছপালা-বনজঙ্গল নিয়ে প্রকৃতির এক স্বয়ংসম্পূর্ণ মনুষ্যসম্পর্কনিরপেক্ষ সজীব রূপ। বিভূতিভূষণের এই মনুষ্যসম্পর্কনিরপেক্ষ ও খুঁটিনাটি বর্ণনায় বিশদ প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথে তেমন নেই। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির প্রতি উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিক হয়েও 'অহল্যার প্রতি' 'বসুন্ধরা' 'মাটির ডাক' প্রভৃতি কবিতায় এবং বিশেষ করে 'ছিন্নপত্র'-এর চিঠিগুলোতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকৃতিভাবনায় যত দার্শনিক ও তত্ত্বাশ্রয়ী এবং রূপরচনায় চিন্তাশীল ও পরিমার্জিত, বিভূতিভূষণ কিন্তু তা নন। প্রকৃতির ব্যাপারে তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কোনো দিনই কাটে নি। তাঁর মতে বিস্ময়কে যাঁরা 'Mother of philosophy' বলেছেন, তাঁরা কম বলেছেন। বিস্ময়ই philosophy, বাকিটা তার অর্থসঙ্গতি মাত্র।[৩০] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথে প্রকৃতির প্রতি বিস্ময় থেকে যেখানে দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে বিভূতিভূষণে বিস্ময়ই দার্শনিক তত্ত্ব থেকে গেছে। বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে দেখেছেন শিশুর অপরিসীম বিস্ময়দৃষ্টি দিয়ে। তাই তাঁর উপন্যাসে অপু-দুর্গা-জিতুর মতো এমন শিশুর নয়তো সত্যচরণ-ভবানীর মতো শিশু-প্রাণের ভিড়। প্রকৃতিভাবনায় বিভূতিভূষণ শেষ পর্যন্ত বিস্মিত ও মুগ্ধমতি এক চিরকিশোর। ফলে, রূপ রচনায় তিনি একান্তই অকৃত্রিম ও অমার্জিত এবং একটু

৩০ অপরাজিত (ষষ্ঠ মুদ্রণ), ৬ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৯১

অগোছাল। কি ব্যক্তিগত, কি সাহিত্যিক কোনো জীবনেই বিভূতিভূষণের স্বভাব পরিপাটি ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তিনি চেক সময় মতো না ভাঙিয়ে ফেলে রেখেছেন, সাহিত্যিক জীবনেও তিনি তাঁর লেখা পড়ে দেখতেন না বা মাজাঘষা করতেন না। ফলে তাঁর লেখায়, কোথাও কোথাও স্থূল বৈয়াকরণিক ক্রটি থেকে গেছে। কিন্তু এসব সামান্য ক্রটি সত্বেও বিভূতিভূষণের সাহিত্যের ভাষা তার বক্তব্যের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে। বিভূতিভূষণের ভাষার আলোচনা করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী বলেছিলেন, তাঁর ভাষা হচ্ছে রেশমি কাপড়ের মতো, ভাবের গায়ে তা নির্বিশেষে লেগে আছে। এমন যে হতে পেরেছে তার কারণ, বিভূতিভূষণের মনে শিল্পী ও ব্যক্তিসত্তার কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। তাঁর সামান্য রচনা থেকে সেরা গল্প-উপন্যাস পর্যন্ত বিষয় নির্বাচনে তিনি কোথাও ভুল করেন নি। তাঁর স্বভাব অনুযায়ী তিনি বিষয় নির্বাচন করেছেন, ফলে, ভাষাও একান্ত স্বাভাবিক হয়েছে।

মুখ্যতঃ যে তিনটি উপাদানে বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক মানস গড়ে উঠেছে, সে তিনটি উপাদান হল: অধ্যাত্ম বা ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং মানুষ। আধ্যাত্মিকতার এবং প্রকৃতিবোধের ব্যাপারে তাঁর যুগের তথা তাঁর নিজস্ব রচনার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে যথেষ্ট তা তিনি নিজের আলোচনাতেই স্বীকার করেছেন এবং সে আলোচনাও পূর্বে করা হয়েছে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের শেষোক্ত উপাদানের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কম নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বিভূতিভূষণ তাঁর দিনলিপির এক জায়গায় বলেছেন, 'আমি 'ক্ষণিকা'র বড়ো ভক্ত। 'ক্ষণিকা'র কথা একবার উঠলে আমি স্থির থাকতে পারি না।' 'ক্ষণিকা' কাব্য এককথায় সহজ সাধারণ মানুষের দুঃখসুখের কথা। বিভূতিভূষণের সাহিত্যজগতের একাংশ এই সহজ সাধারণ মানুষকে নিয়ে। ইন্দির-ঠাকরুণ হরিহর সর্বজয়া দুর্গা অপু জিতু ভানুমতী সুশীলা—এরা সবাই সেই জগতের অধিবাসী। বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনেও এই সহজ সাধারণ মানুষগুলোর আনাগোনা ও পরিচয় অত্যন্ত বেশি ছিল। তাঁর সাহিত্যের একটা বড়ো অংশ এদের নিয়ে তাঁর আত্মস্মৃতি। তিনি নিজে যেমন এদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন তেমনি ভাবী সাহিত্যিকদের কাছে এদের নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করার মিনতি রেখে গেছেন। বলে গেছেন, এদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক, 'বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃতছায়ায় ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যেসব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকেই রূপ দিতে হবে।'[৩১] সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ব্যাপারে তাঁর যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তা এক দিকে যেমন তাঁর অভিজ্ঞতার অপর দিকে তেমনি 'গল্পগুচ্ছ-ক্ষণিকা'র অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল। সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের প্রতি বিভূতিভূষণের যে সহজাত মমতা ছিল সেই মমতা 'গল্পগুচ্ছ-ক্ষণিকা'তে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বলেই গ্রন্থ দুটিকে এত ভালোবেসেছিলেন এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে 'পথের পাঁচালী' যখন গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ('short and simple annals of the poor') ব্যাপারে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর তুলনা করা হয়েছিল। তুলনা ঠিকই করা হয়েছিল। সত্যি, মেজাজের দিক থেকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে বিভূতিভূষণের মিল খুব। কিন্তু এ ব্যাপারে অতদূরে যাবার দরকার কি? কাছেই তো আছেন রবীন্দ্রনাথ।

আর-একটি বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিভূতিভূষণের তুলনা চলতে পারে। সে বিষয়, উভয়ের

৩১ স্মৃতির রেখা, সাহিত্যের কথা

লিপিসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ এবং বিভূতিভূষণ উভয়েই পত্রলিপি ও স্মৃতিলিপি রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো এত বেশি না হলেও বিভূতিভূষণের কিছু সংখ্যক পত্র 'আমার লেখা' নামক গ্রন্থে ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তার চেয়েও বেশি অপ্রকাশিত পত্র উদ্ধার করা গেছে। এই পত্রগুলো এক দিকে যেমন তাঁর জীবনী-রচনার অপরিহার্য উপাদান, অপর দিকে তেমনি এগুলো উচ্চাঙ্গের পত্রসাহিত্য। পত্রসাহিত্যের গুণের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, 'ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস'।[৩২] এই সহজ রসের পরিচয় তাঁর 'ছিন্নপত্র'এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। 'এই নৌকো-পারাপার দেখতে বেশ লাগে। ও পারে হাট, তাই খেয়ানৌকোয় এত ভিড়। কেউ বা ঘাসের বোঝা, কেউ বা একটা চুপড়ি, কেউ বা একটা বস্তা কাঁধে করে হাটে যাচ্ছে এবং হাট থেকে ফিরে আসছে, ছোটো নদীটি এবং দুই পারের দুই ছোটো গ্রামের মধ্যে নিস্তব্ধ দুপুরবেলায় এই একটুখানি কাজকর্ম, মনুষ্যজীবনের এই একটুখানি স্রোত অতি ধীরে ধীরে চলেছে।'[৩৩] 'ছিন্নপত্র'এর তুলনায় একান্ত কম হলেও বিভূতিভূষণের চিঠিতে এই সহজ রসের সন্ধান মেলে। বাসা বদলের একটি সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করে বিভূতিভূষণ তাঁর স্ত্রী কল্যাণীকে লিখেছেন, 'যাবার আগে আমাদের ছোট্ট ঘরটিতে এসে একা দাঁড়ালাম একবার। জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে, নির্জন বাড়িটা,—আমার কেবল মনে হচ্ছিল, যে বালিকার সঙ্গে এই ছোট্ট ঘরটির অতি ঘনিষ্ঠ ও মধুর সম্পর্ক, যার কতদিনের কত কথাবার্তা, ঝগড়া, বকুনি, আদর-ভালবাসা, হাসি ও কান্না এই ঘরের হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে আছে— সে যেন এইমাত্র এখানে ছিল, কোথায় গিয়েচে, এখুনি এল বলে। কতকটা তার নীরব প্রতীক্ষায় একা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম জ্যোৎস্নার আলোয়, আধ-অন্ধকারে খাবারের ঘরের মেজেতে তার পদশব্দ শুনবার প্রত্যাশা করছি যেন প্রতিমুহূর্তে— কিন্তু সে কই এল না তো? এই বাড়িতে তার আঠারো বৎসরের যৌবন ও নববিবাহিতার বহু অনভিজ্ঞ সাধ-আহ্লাদকে ফেলে গেলাম চিরকালের জন্য· ·।'[৩৪]

পত্র ছাড়া আর-এক ধরণের লিপিসাহিত্য— যাকে স্মৃতিলিপি বলা হয়েছে— উভয়েই রচনা করেন। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণের মতো এত অধিক সংখ্যক স্মৃতি বা দিন -লিপি আর কেউ রচনা করেন নি। তাঁর প্রকাশিত দিনলিপির সংখ্যা ৬, তা ছাড়া রয়েছে তাঁর ৫ খানি অপ্রকাশিত দিনলিপি। দিনলিপির কথায় সজনীকান্ত দাস একদা লিখেছিলেন, 'এগুলো ঠিক সাহিত্যসেবকের ডায়েরি নয়। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'র সঙ্গে ইহার কিছুটা মিল আছে। পাশ্চাত্য দেশে এমিয়েল, আর্নল্ড বেনেট এবং আঁদ্রে জীদ্ যে ধরণের 'জার্নাল' রাখিয়া গিয়াছেন, বিভূতিভূষণের দিনলিপি কতকটা সেই ধরণের।'[৩৫] উপলব্ধির গভীরতার ও তার মনোরম প্রকাশের কথা ভেবে তিনি সম্ভবত এই তুলনা করেছিলেন। চিঠির মতোই বিভূতিভূষণের এই দিনলিপিগুলো এক দিকে যেমন তাঁর জীবনী রচনার উপাদান অপর দিকে তেমনি সরস। অবশ্য বিভূতিভূষণ একটি দিনলিপির ভূমিকায় তাঁর এই ধরণের লেখা সম্বন্ধে

---

৩২ পথে ও পথের প্রান্তে, পৃ. ৮০

৩৩ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র সংখ্যা ২৩

৩৪ আমার লেখা (১ম সংস্করণ), পরিশিষ্ট, পত্রসংখ্যা ৩, পৃ. ৭২

৩৫ শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭, বিভূতিভূষণের জীবনকথা

বিনীতভাবে উল্লেখ করেছেন, 'এই সব রচনার উদ্ভব চলন্ত রেলগাড়ির কামরায়, পথের পাশের বৃক্ষতলে অথবা শিলাসনে। প্রকাশের কথা ভেবে এগুলো লেখা হয় নি। এগুলোর মূলে লিপিকৌশল অথবা 'লেখক মনের কারিকুরি' প্রকাশের কোনো ইচ্ছা ছিল না।'[৩৬] এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিলিপির সঙ্গে তাঁর রচনার পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিলিপি রচনা বিভূতিভূষণের মতো সদ্য নয়, সুদূর এবং আত্মবিস্মৃত নয়, সচেতন। 'জীবনস্মৃতি' 'ছেলেবেলা' এবং 'আত্মপরিচয়' রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি স্মৃতি-লিপি সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। এর মধ্যে 'আত্মপরিচয়'কে এক প্রকার বাদ দেওয়া চলে এই কারণে যে, 'আত্মপরিচয়' ঠিক জীবনস্মৃতি নয়, কবিজীবনের স্মৃতি বা কবিভাবনার ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।' 'আত্মপরিচয়' রচনার শুরুও সৃষ্টির তাগিদে নয়, 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদকের আহ্বানে। রবীন্দ্রনাথের আর বাকি দুটি গ্রন্থ যথার্থ জীবনস্মৃতি। 'জীবনস্মৃতি'র ঘটনাকাল যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ থেকে 'কড়ি ও কোমল' অর্থাৎ বাল্যকাল থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত। 'ছেলেবেলা'র ঘটনাকাল রবীন্দ্রনাথের জন্ম থেকে বিলেত যাওয়া অর্থাৎ সতের বৎসর বয়স পর্যন্ত। 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' এই দুই গ্রন্থে বাল্য কৈশোর ও যৌবন কালের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রৌঢ় বয়সে চর্চা করেছেন। দ্বিতীয়ত, 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' এই গ্রন্থ দুটি রচনার পেছনে ছিল যথাক্রমে 'প্রবাসী'র সহ-সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং শান্তিনিকেতনের সাহিত্যের অধ্যাপক নিত্যানন্দ-বিনোদ গোস্বামীর (গোঁসাইজি) অনুরোধ। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিলিপি সম্বন্ধে এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, দূরত্বের ও সচেতনতার ফলে তাঁর এই ধরণের রচনায় 'লেখকমনের কারিকুরি' প্রকাশ বা লিপিকৌশলের অবকাশ যথেষ্ট ছিল। আর এই গুণের জন্যেই 'জীবনস্মৃতি' 'ছেলেবেলা' সাহিত্য হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের দিনলিপি যে সবার জন্যে নয়, নিজের জন্যে লেখা এ সম্বন্ধে তিনি সচেতন। 'আমার জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতির অতীত ইতিহাসের দিক হইতে ইহার মূল্য আমার নিজের কাছে যথেষ্ট বেশি। বহু হারানো দিনের মনের ভাব ও বিস্মৃত অনুভূতিরাজি আবার স্পষ্ট হইয়া ওঠে। যে সব অবস্থার মধ্যে আর কখনো পড়িব না, ক্ষণকালের জন্য তাহার মধ্যে আবার ডুবিয়া এগুলি পড়িতে পড়িতে— ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে বাণীমূর্তি দেওয়ার ইহাই একটি বড় সার্থকতা বলিয়া মনে করি।'[৩৭] বিভূতিভূষণের এই ধরণের লেখা এক দিকে রোজনামচার মতো তথ্যবাহুল্যে, অপর দিকে লিপিকৌশলের অভাবে সর্বত্র সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে নি। তা ছাড়া অবশ্য দিনলিপির সাহিত্য হয়ে ওঠার একটা সাধারণ অন্তরায় আছে। সে অন্তরায় বিষয়বস্তুর অতিনৈকট্য। অথচ সাহিত্যসৃষ্টির মূলে রয়েছে এক ধরণের দূরত্ব বা দূরত্ববোধ। তার ফলে স্মৃতিলিপি যত সহজে সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, দিনলিপি সেই মৌলিক কারণের অভাবে অনেক সময় সাহিত্য হয়ে ওঠে না। কিন্তু বিভূতিভূষণের দিনলিপি সম্পর্কে এ ধরণের কোনো অভিযোগ আনা চলে না। কারণ তাঁর কবি-স্বভাবের মূলে এক সহজাত দূরত্ববোধ ছিল। তাঁর স্বপ্নচারী ক্রান্তদর্শী মন বর্তমানের বিষয়বস্তুকে নিয়ে অতীতে ভবিষ্যতে উধাও

৩৬ তৃণাঙ্কুর (৪র্থ মুদ্রণ), ভূমিকা

৩৭ স্মৃতির রেখা, ৪।২।১৯২৬, পৃ. ২৬–২৯

হতে পারত। তাঁর সাহিত্য-চিঠিপত্র-দিনলিপিতে এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং অতিনৈকট্যের ফলে তাঁর দিনলিপি যে সব ক্ষেত্রে সাহিত্য হতে পারে নি, সে কথা বলা চলে না। এদিক থেকে তথ্যবাহুল্য ও লিপিদুর্বলতা তাঁর দিনলিপির সাহিত্যিক ব্যর্থতার যথার্থ কারণ। কিন্তু সে তো তাঁর ব্যর্থতার দিক। তাঁর দিনলিপির সাহিত্যিক সার্থকতা কোথায়? বিভূতিভূষণ বিশ্বাস করতেন মানুষের 'sincere দুঃখের কাহিনী চিরদিন অমর থাকবে'। বিভূতিভূষণের সাহিত্য তো মূলতঃ এই গভীর sincerityর কথা এবং তাঁর দিনলিপিও তাই। লিপিকুশলতা বা বিভূতিভূষণ যাকে 'লেখকমনের কারিকুরি' বলেছেন, তার অভাব সত্ত্বেও জীবনের সার্থকতার গভীর উপলব্ধিতে এগুলি হৃদয়ের আদি উৎস-মুখে দৈবী ভাষা নিয়ে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন, এই ধরণের দিনলিপি সম্বন্ধে সে কথার জের টেনে বলা যায়— এগুলো 'দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে'। শিল্পীমনের সচেতনতায় এর রূপ ও ভাষা আবিষ্কৃত হয় নি, বিভূতিভূষণের ধ্যান-তন্ময়তায় এর রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে, ভাষা ক্ষরিত হয়েছে। সামান্য দীর্ঘ হলেও বিভূতিভূষণের দিনলিপির এমন এক অনন্য অংশ উদ্ধার করা গেল। 'ভয় নেই, ব্যাঙ্কে টাকা জমিও না, অসময়ে দেখবার ভয়ে ব্যাকুলও হয়ো না। আমি অনন্ত জীবন তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি। কোনো ভয় নেই, পৃথিবীর কোনো শান্ত, গ্রাম্য নদীর কূলের চিতায় তোমার হুঁসিয়ার জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে সেদিন থেকে এই অসীম শূন্য অনন্ত রহস্য তোমার সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে। আপনা আপনিই হবে, কোনো ব্যাঙ্কে জমাবার কোনো প্রয়োজন নেই। জ্যোৎস্না ভালোবাস? ফুল, ফল, পাখি ভালোবাস? গান ভালোবাস? পৃথিবীর ভাগ্যহত ছেলেমেয়েদের করুণ দুঃখের কাহিনী শুনে চোখে জল আসে? মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে? আর্তের কান্না শুনে অন্যমনস্ক হয়ে যাও? তবে তুমি অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী, তোমার সুখের সীমা হবে না। সে খুসি আনন্দের মধ্যে দিয়ে নয়, দুঃখের মধ্যে দিয়ে। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেখে বেড়িও, কত দীন-দরিদ্র, আতুর-জীব কঠিন সংগ্রামে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নির্জন নদীর তীরে কেউ হয়তো বসে বসে কাঁদছে— ওদের চোখের জল মুছে দেবার চেষ্টা কোরো, তাদের সঙ্গে কেঁদো, সেই তোমার স্বর্গ হবে। চোখের জলেই এ বিশ্বসৃষ্টি ধন্য হয়েছে। চোখের জল, কান্না, অত্যাচার না থাকলে বিশ্বের সৌন্দর্য থাকতো না। সব সুখ, সব পরিপূর্ণতা, সব ঐশ্বর্য, সব সন্তোষ, শান্তি কেমন মরুভূমির মতো ভয়ানক খাঁ খাঁ করতো। মাঝে মাঝে আর্তদের চোখের জলের শ্যামশান্তিভরা ওয়েসিস আছে বলেই তা করুণ মধুর হয়েছে। জ্যোৎস্না যখন ওঠে, তখন অনেক দিন আগে মরে-যাওয়া ছেলের কথা ভেবো— দেখবে, জ্যোৎস্না মধুর করুণ হয়ে আসছে। পাখির গানে করুণ গৌরীর উদাস মীড় ধ্বনিত হচ্ছে। যে বুড়িটা গ্রামের পাঁচ জনের ঝাঁটা লাথি খেয়ে কিছু দিন আগে ঘরে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে জল-অভাবে মৃত্যুতৃষ্ণা নিবারণ করতে না পেরে মরেছিল তার কথা ভেবো— মন উদার শোক ও শান্তিতে ভরে আসবে— জগতের পবিত্র কারুণ্যের, আশাহত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে অনন্তের অনাহত ধ্বনি কানে বাজবে।'[৩৮]

---

৩৮ স্মৃতির রেখা, ৪র্থ মুদ্রণ, ৪।২।১৯২৩, পৃ ২৬-২৭

কালিদাস-রচনাবলীর কালানুক্রম

মনোমোহন ঘোষ

সাহিত্যের রস আস্বাদনের জন্য ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক আদি তথ্যের কতটা দরকার সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এক দল সমালোচক মনে করেন, এ সবের আলোচনা নিতান্ত বহিরঙ্গ ব্যাপার। রসের আস্বাদন কখনো এ সকল তথ্যের উপর নির্ভর করে না; পূর্বজন্মের সংস্কারবশত যাঁদের হৃদয় এ বিষয়ের অনুকূল কেবল তাঁরাই গ্রন্থবিশেষের রস আস্বাদন করতে সমর্থ। এ কথার মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও, জ্ঞানের রাস্তা একান্তভাবে ছেড়ে দিয়ে রসাস্বাদন সম্ভবপর নয়। কারণ সাহিত্যের প্রকাশ হয়ে থাকে কোনো-না-কোনো ভাষার মাধ্যমে; সে ভাষা ভালো করে না জানলেও, শুধু হৃদয়ের সাহায্যে রচনাবিশেষের মর্ম উদ্ঘাটন করা অসম্ভব। এই মত মেনে চললে রসাস্বাদনের ব্যাপারে কাব্যাদির নিছক বাইরের তথ্যকে অগ্রাহ্য করা যায় না। এখন কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তবে প্রাচীনকালে সাহিত্যচর্চা চলত কি করে? তখনকার রসজ্ঞসমাজের চেষ্টা কি তবে ব্যর্থতার কাছ ঘেঁষে চলত? প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ধীর ভাবে খোঁজ নিলে জানা যাবে যে, সেকালের লোকেরাও ইতিহাস সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কালিদাসের জীবন সম্পর্কে নানা কিংবদন্তীই এর প্রমাণ। যথা— তিনি গোড়ার দিকে অকাট মূর্খ ছিলেন, ঘটনাচক্রে রাজকন্যার পতিত্ব লাভ করেন। পত্নীর তিরস্কার ও অবজ্ঞা লাভ করে রাজসংসার ত্যাগ করার পরে মা-সরস্বতীর বরে অলৌকিক কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হন। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে এ সবের কি দশা হবে সে আলোচনা স্থগিত রেখে বলা যেতে পারে, এ সব তুচ্ছ লোকোক্তির ভিতর দিয়ে আমরা হয়তো কালিদাসের কবিত্বশক্তি বিকাশের মূল সূত্রটি আবিষ্কার করতে পারছি। তাঁর রচনায় অসামান্য রসসৃষ্টি-ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে যে বহুমুখী পাণ্ডিত্যেরও নিদর্শন পাওয়া যায় তার থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি কবি-নাম লাভ করবার আগে নিশ্চয়ই কঠোর পরিশ্রম সহকারে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয়েছিলেন। এটিই হল তাঁকে মা-সরস্বতীর বরপুত্ররূপে কল্পনার ভিত্তি। এ সকল কথা বলেও আমরা এমন সিদ্ধান্ত করছি না যে, কালিদাসের জীবন সম্পর্কিত কিংবদন্তীগুলি ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলির জন্ম হয়তো নিতান্তই কৌতূহলী এবং অনুরাগী পাঠকগণের কল্পনাপ্রবণ চিত্তক্ষেত্র থেকে। তাঁরা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চেয়েছেন। কিন্তু এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সাহিত্যের রসাস্বাদনে ঐতিহাসিক আদি তথ্যেরও কিছু কিছু উপযোগিতা আছে। আধুনিক সমালোচকেরা মনে করেন, লেখকের যে সমুচ্চ ব্যক্তিত্বরূপ হিমাচল থেকে রসবাহিনী ভাবগঙ্গা নির্গত হয়ে তাঁর দেশকালের— এমন কি দেশকালের বাইরেও— বহু মানবের চিত্তক্ষেত্রকে সরস ও সমৃদ্ধ করেছে তার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় থাকলেই তদীয় রচনার রসোপলব্ধি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। লেখক-বিশেষের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান যতই ব্যাপক এবং গভীর হয়, ততই তিনি হয়ে ওঠেন পাঠকের আপনার জন, অর্থাৎ তাঁর প্রতি অনুকূলত্ব এবং সমবেদনার সীমাও প্রসারিত হয়। তেমনটি ঘটলেই তবে তাঁর কল্পনা ও চিন্তাধারার আবিষ্কার আর দুরূহ থাকে না। অতএব, লেখকদের সম্বন্ধে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়,

সে সবের আলোচনা অপরিহার্য। কালিদাসের রচনাবলীর পৌর্বাপর্য বিচারের এই হল গোড়ার কথা।

মহাকবির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে এক সময়ে নানা মত প্রচলিত থাকলেও, এখন এ কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, তিনি খুব সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ চতুর্থাংশ ও পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে জীবিত ছিলেন; এবং ঋতুসংহার হয়তো পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে রচিত। এ কাব্যখানি যে তাঁর প্রথম গ্রন্থ সে সম্বন্ধে নানা যুক্তি আছে। ঋতুসংহারে তাঁর প্রতিভার সুনিশ্চিত পূর্বাভাস দেখা গেলেও এ কাব্যখানি যে পাকা হাতের রচনা নয় তার প্রমাণও এর ভিতরেই আছে। এর ভাষা ও রচনাশৈলী অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সরল। খুব সম্ভব এই কারণেই মল্লিনাথ কাব্যখানির টীকা লেখেন নি; অধিকন্তু রঘুবংশ (সংক্ষেপে 'রঘু') এবং কুমারসম্ভব (সংক্ষেপে 'কুমার') কাব্যের টীকার প্রারম্ভে তিনি কাব্যত্রয়েরই উল্লেখ করেছেন। এই ঘটনাটিকে আশ্রয় করে এক কালে কেউ কেউ বলেছেন যে, ঋতুসংহার কালিদাসের রচনাই নয়। কিন্তু আজকাল আর কারো মনেই এ সম্বন্ধে সংশয় নেই। অতঃপর কালিদাসের দ্বিতীয় গ্রন্থ কোন্‌খানি তা দেখা যাক্‌। কিন্তু মনে হয়, তার আগে ঋতুসংহারের একটু আলোচনা করলে এ কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হতে পারে।

আধুনিক কোনো লেখকের মত এই যে, কালিদাস তাঁর প্রথম কাব্যের প্রেরণা হয়তো পেয়েছিলেন ঋগ্বেদ এবং রামায়ণ থেকে।[১] কথাটা অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কালিদাসের মৌলিকতা এতে ক্ষুণ্ণ হয় নি। উক্ত মহাগ্রন্থদ্বয়ে যে ঋতুবর্ণনা আছে তা নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, এবং এ সম্পর্কে রামায়ণের বিশেষত্ব এই যে, সেখানকার ঋতুবর্ণনা রামচরিত্রের সঙ্গে নিতান্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। কিন্তু তাঁর প্রথম গ্রন্থে কালিদাস বর্ষব্যাপিনী প্রকৃতির যে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করেছেন তাতে বিভিন্ন ঋতু কেবল যে স্ব স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত তা নয়, পরন্তু বেশ সুশৃঙ্খলভাবে একসূত্রে গ্রথিত। তাতে কেবল ঋতুগুলির নিজ নিজ রূপের বৈচিত্র্যই প্রকাশ পায় নি; পর পর এই রূপগত ঐশ্বর্য বিকাশের দ্বারা ঋতুনিচয় বিলাসী নরনারীর জীবনের প্রত্যেকটি বৎসরকে কেমন এক অপরূপ মাধুর্যের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় পরিষিক্ত করে, তার বেশ মনোজ্ঞ চিত্র এই কাব্যখানি। এই চমৎকার তথ্যটিকে রবীন্দ্রনাথ এক অপূর্ব কাব্যময় রূপ দিয়ে গেছেন।[২] তাঁর রচিত এই সুনিপুণ প্রশংসাবাণী ছাড়াও ঋতুসংহার সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকের কৃত অনুকূল মন্তব্যের অভাব নেই। মনে হয়, রচিত হওয়ার অল্প কালের মধ্যেই এ ক্ষুদ্র কাব্যখানি কালিদাসের জন্মপ্রদেশের কবিযশঃপ্রার্থীদের চিত্তে গভীর রেখাপাত করতে আরম্ভ করে। পঞ্চম শতকের মান্দাশোর অঞ্চলের শিলালিপিগুলিতে পুনঃ পুনঃ ঋতুবর্ণনার যে নিদর্শন পাওয়া যায় তার পিছনে কালিদাসের অভিনব কাব্যের প্রভাব কল্পনা না করে পারা যায় না।[৩] সুপ্রসিদ্ধ জর্মন সংস্কৃতবিদ্‌ এবং ভারতীয় শিলালিপিতে অদ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ কীলহর্নের মত এই যে,

---

১ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য প্রণীত কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ২০। এই তথ্যপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থখানি বর্তমান প্রবন্ধের রচনায় বিশেষ সাহায্য করেছে।

২ চৈতালি কাব্যগ্রন্থের 'হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে' ইত্যাদি সনেট।

৩ কোনো কোনো লেখক এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে বৎসভট্টিরচিত মান্দাশোর শিলালিপির দুটি শ্লোক ঋতুসংহারের শিশিরবর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত। এই কটি কথা মনে রেখে, কালিদাসের দ্বিতীয় গ্রন্থ কোন্‌খানি সে বিষয়ের আলোচনা শুরু করা যাক।

কবির দ্বিতীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে দুই জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অংশত এক মত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন মালবিকাগ্নিমিত্র (সংক্ষেপে 'মালবিকা') কালিদাসের দ্বিতীয় গ্রন্থ,[৪] আর সারদারঞ্জন রায় বলেন যে, ঐ স্থান বিক্রমোর্বশীয় (সংক্ষেপে 'বিক্রম') নাটকেরই প্রাপ্য।[৫] কালিদাস যে ঋতুসংহারের পর একখানি নাটক লিখেছিলেন কেবল এতেই পণ্ডিতদ্বয়ের ঐকমত্য। মুখ্যত মালবিকার প্রস্তাবনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেই শাস্ত্রীমশায় তাঁর মত সমর্থন করেছেন এবং যুক্তিকে দৃঢ়তর করবার জন্য তিনি কারণ উল্লেখ-পূর্বক নাটকখানিকে দেশপ্রেমমূলক বলতে দ্বিধা করেন নি। আর সারদারঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, কালিদাস ঋতুসংহারে যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয়ভোগ ও প্রেমচর্চার দৃশ্য বর্ণনার পরে বয়োবৃদ্ধিহেতু ইষ্টদেব শিবের স্তুতি নিয়ে বিক্রম আরম্ভ করেছিলেন। যেহেতু একাধিক গ্রন্থ কবি তাঁর ইষ্টদেব শিবকে স্মরণপূর্বক আরম্ভ করেছেন, এ যুক্তি অতি দুর্বল মনে হয়। আর বিক্রমে নায়কের যে উদ্দাম প্রেমের চিত্র পাওয়া যায় মালবিকায় অঙ্কিত প্রেমের চিত্রের সঙ্গে এর তুলনা করলেও এ কথাই বলতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শাস্ত্রীমশায়ের মত গ্রহণযোগ্য হয়ে দাঁড়ায় না। সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাচ্ছে।

আধুনিক জগতের যে সকল শ্রেষ্ঠ লেখকের জীবনী আমাদের হাতে এসেছে তাতে দেখা যায় যে, তাঁদের সমালোচনীশক্তিও প্রায়শ উচ্চশ্রেণীর। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন বাহুল্যমাত্র। তাঁদের সমালোচনা-শক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্য, শ্রেষ্ঠ লেখকদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে পাঠকগণকে অবহিত করা। কালিদাসের সাধারণ বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ ছিল এ সহজবোধ্য কথা মেনে নিলে কি করে ভাবা যায় যে, কাব্যরচনার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সাফল্যলাভের পর হঠাৎ তিনি সে পথ ছেড়ে দিলেন, যেটি ধরে অগ্রসর হয়ে তিনি সর্বপ্রথমে সিদ্ধির মুখ দেখেছিলেন। ধ্রুব বস্তু পরিত্যাগ করে অধ্রুব বস্তুর পিছনে ছুটলে কি দুরবস্থা ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁর কি কোনও চেতনা ছিল না? অতএব এ কথা মনে হয় যে, ঋতুসংহার রচনা করবার ঠিক পরে তিনি একখানি শ্রব্য কাব্যই লিখেছিলেন, দৃশ্যকাব্য বা নাটক নয়। এ ছাড়াও এ সম্পর্কে আর কি কি যুক্তি থাকতে পারে তা দেখা যাক।

ঋতুসংহার রচনার পর কাব্যরসিকগণের একাংশ (যেমন শিলালিপির কবিগণ) তাঁর অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও নূতন কবি কালিদাস যে তৎকালীন সর্বশ্রেণীর কাব্যানুরাগীকে তাঁর প্রতি অনুকূল করতে পারেন নি এ কথা অস্বীকার করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এর মুখ্য কারণ কি হতে পারে? এরূপ অনুমান করতে বাধা নেই যে, এক দল সমালোচক কালিদাসকে অবজ্ঞা করবার কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর প্রথম কাব্যের ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে। সাধারণ লোকে আয়তনের বিপুলত্বকেই বোঝে ভালো; কলাকৌশল বা রসের উপলব্ধি তাদের ক্ষমতার বাইরে। এ শ্রেণীর লোকদের প্রতি লক্ষ্য করেই

---

৪ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের প্রাগুক্ত গ্রন্থ পৃ. ৩৫-৩৮। উপস্থিত প্রবন্ধে উল্লিখিত শাস্ত্রীমশায়ের অন্যান্য মতও এ স্থানে পাওয়া যাবে। এজন্যে, অতঃপর বাহুল্য হবে বলে সে সকলের স্থানোল্লেখ করা হবে না।

৫ অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় প্রণীত *Kalidasa's Abhijnana-Sakuntalam with an Original Commentary,* Critical and Explanatory Notes, 15th edition, Calcutta, 1959, pp. 56-58 (A Chronological Survey of Kalidasa's Works) অধ্যাপক রায়ের অন্যান্য মতও এ প্রবন্ধে পাওয়া যাবে।

রচিত হয়েছে লৌকিক প্রবাদ—'ধারে না কাটলেও ভারে কাটে'। অতএব ঋতুসংহারে উৎকর্ষের অভাব না থাকলেও এর ক্ষুদ্র আকার কালিদাসের জনপ্রিয়তা লাভের বিরোধী ছিল। এর একটি সাদৃশ্যমূলক ঘটনার উল্লেখ করা যাক। যেবার রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নাট্য প্রথম প্রযোজিত হয়, তার পূর্ব দিনে 'নটীর পূজা'ও পুনরভিনীত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য দুএকজন রসজ্ঞ 'শাপমোচন' অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করায়, কেউ কেউ বলেছিলেন, 'তা সত্যি, কিন্তু শাপমোচন খুব ছোট, অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়'। শুনে অবনীন্দ্রনাথ আঙুলের ভঙ্গী দেখিয়ে বলেছিলেন, 'অমৃতের এক বিন্দু, আর পায়েসের এক খোরা।' পাঠকদের অনুমতি নিয়ে আরেকটি দৃষ্টান্তও দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান লেখকের বাল্যকালে কোনও সম্মানিত ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে মহাকবি নামে অভিহিত হতে শুনে বলেছিলেন, 'তিনি আবার কেমন মহাকবি, তাঁর মহাকাব্য কোথায়?' অথচ এ কথা উচ্চারিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশদ্বর্ষপূর্তির অব্যবহিত পরবর্তী কালে। কালিদাসের সমসাময়িক রসজ্ঞেরা যে আমাদের সময়কার লোকদের চেয়ে বেশি উচ্চশ্রেণীর ছিলেন এরূপ মনে করবার কোনও হেতু নেই। মনে হয় নিতান্ত না ভেবেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে—'।

যাক, এবার আরব্ধ বিষয়ে ফিরে আসি। উল্লিখিত তথাকথিত দোষটি ছাড়াও ঋতুসংহারের মধ্যে সত্যিকারের ত্রুটি কিছু কিছু ছিল। যেমন, শব্দবিশেষের পুনরাবৃত্তি—যথা, গ্রীষ্মবর্ণনের মধ্যে 'ক্ষত' শব্দ পর পর দুটি শ্লোকে (১-২), 'নিদাঘ' 'কামী' ও 'স্তন' দুবার, 'প্রচণ্ড' ও 'নিতম্ব' তিনবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এ ছাড়া ভাববিশেষের পুনরাবৃত্তিও অল্পস্বল্প দেখা যায়। যেমন, বর্ষার প্রাকৃতিক অবস্থাবিশেষ চিত্তকে সমুৎসুক করে, এ ভাবটি ৯ম ১৩শ ও ১৭শ শ্লোকে বর্তমান; এর মধ্যে 'সমুৎসুক' শব্দটিও দুবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। শরৎ এবং বসন্ত বর্ণনায়ও উল্লিখিত ভাবটি দু-দুবার দেখা দিয়েছে। কিন্তু ঋতুসংহারের মূলীভূত কল্পনা নিতান্ত অভিনব ও মনোজ্ঞ বলে সাধারণ কাব্যরসপিপাসুর চোখে এগুলি হয়তো তেমন বড়ো হয়ে দেখা দেয় নি; তবু সে কালের প্রৌঢ় সমালোচকেরা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে নীরব থাকতে পারেন নি। যেহেতু 'বিদ্বান্' কথাটির অন্যতর প্রতিশব্দ 'দোষজ্ঞ', এবং বিদ্যাবত্তার অভিমান নেই এমন সমালোচক কোথায়? এমন অবস্থায় শ্রব্যকাব্য রচনায় যথেষ্ট সিদ্ধিলাভের আগে কালিদাস কি করে হঠাৎ এ পথ ছেড়ে দিয়ে দৃশ্যকাব্য রচনার দিকে অগ্রসর হতে পারেন? তিনি যে ঋতুসংহার রচনার ঠিক পরে কোনো শ্রব্যকাব্যই রচনা করেছিলেন এরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসংগত মনে হয়। যেহেতু শ্রব্যকাব্য রচনার ফলে তিনি যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, অভিনিবেশ এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা সে সকল আরো বাড়ানোর সম্ভাবনা, অনভিজ্ঞাত নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনার চেয়ে নিশ্চয় অধিকতর ছিল।

এখন প্রশ্ন হবে অবশিষ্ট তিনখানি কাব্যের মধ্যে কোন্‌খানি কালিদাসের দ্বিতীয় গ্রন্থ। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে এ স্থান মেঘদূতেরই প্রাপ্য। তাঁর সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি কি ছিল তা জানা যায় না। কিন্তু এ মত যে গ্রহণযোগ্য নয়, তার অকাট্য প্রমাণ মেঘদূতের নিতান্ত ক্ষুদ্র আকার। মল্লিনাথ-প্রদর্শিত প্রক্ষিপ্তস্থলগুলি নিয়েও এতে রয়েছে মাত্র ১১৭টি শ্লোক; অথচ ঋতুসংহারের শ্লোকসংখ্যা ১৪৪। ক্ষুদ্র আকার কিরূপ অসুবিধাজনক হতে পারে তা আগেই দেখা গিয়েছে। অতএব

বর্তমান প্রসঙ্গে মেঘদূতের দাবি নামঞ্জুর করতে পারা যায়। এখন দেখতে হবে রঘু ও কুমারের মধ্যে কোন্‌খানি আগের রচনা। এ সম্পর্কে বিতর্ক বহু আগেই দেখা দিয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কমলাকান্তে 'বুড়া বয়সের কথা' নামক নিবন্ধে লিখেছিলেন,

"আমি নিশ্চিত বলিতে পারি— কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

প্রথম অজবিলাপে,

ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্‌পদস্বনম্॥

এটি যৌবনের কান্না।

তার পর রতিবিলাপে,

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মামবিসহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্॥

এটি বুড়া বয়সের কান্না।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ মতের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এই বিতর্কে পক্ষদ্বয়ের যোগ্যতা বিচার করলে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিকে প্রামাণিক বলে মানতে হয়। কারণ শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হলেও তখন বয়সে তরুণ এবং সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত; আর বঙ্কিমচন্দ্র কেবল ইংরেজিতে নয় সংস্কৃত সাহিত্যেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তাঁর কাব্যপাঠের গুরু ছিলেন শ্রীরামশিরোমণি নামক সেকালকার একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আরো বক্তব্য এই যে, তখন তিনি বহু উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস রচনা করে খ্যাতির উচ্চতম শিখরে সমাসীন। তবু আমরা কেবল এ রকম যুক্তির উপরই নির্ভর করতে চাই না। উদ্ধৃত শ্লোক দুটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায় যে, কোন্ শ্লোকটিতে কালিদাসের উপমা বেশ স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। অজবিলাপের শ্লোকটির অর্থ—

যার উপর চূর্ণকুন্তল (বাতাসে) উড়ছে, তোমার সেই বাক্যহীন মুখখানি, নিশাকালে নিমীলিত এবং ভ্রমরগুঞ্জনরহিত একটি পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করছে।

আর রতিবিলাপের শ্লোকটির অনুবাদ—

তোমার সেই সখা (প্রবল) বাতাসে নিবে যাওয়া প্রদীপের মতো চলে গেছেন, আর ফিরবেন না; আমি অসহ্য দুঃখে কাতর হয়ে সেই নেবা দীপটির সল্‌তের মতো (কেবল) ধোঁয়াচ্ছি।

প্রথম শ্লোকটির উপমা যে খানিকটা কষ্টকল্পিত তা যে কোনো রসজ্ঞ সমালোচকই স্বীকার করবেন। তার তুলনায় কুমারের শ্লোকটির উপমা বেশ সহজ। দমকা হাওয়ায় নিভে যাওয়া বাতির সঙ্গে মহাদেবের নেত্রানলে হঠাৎ ভস্মীভূত মদনের অবস্থার তুলনা এবং তার পরে বিরহকাতর রতির শোকাকুল অবস্থার সঙ্গে দীপ নিভে যাওয়ার পর যে-সতেল্ ক্রমাগত ধোঁয়াচ্ছে তার তুলনা, এ দুটিই বেশ সুপরিচিত এবং

অতি সহজে হৃদয়কে স্পর্শ করে। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে কবি রঘু রচনা করেছিলেন অপেক্ষাকৃত কম বয়সে যখন একটা নূতন কিছু রচনা করে পাঠক বা শ্রোতাদের চমৎকৃত করবার ইচ্ছা থাকে খুব প্রবল। সমগ্রভাবে অজবিলাপের সঙ্গে রতিবিলাপের তুলনা করলেও অনেকটা এ রকম ধারণাই হবে। রঘুর উনবিংশ সর্গেও দীপ নিভে যাওয়ার সঙ্গে মৃত্যুর একটি উপমা রয়েছে; উপস্থিত প্রসঙ্গে সেটির আলোচনা করলেও কুমারের পরবর্তিত্ব সম্পর্কে পাঠকদের ধারণা দৃঢ় হবে। সেখানে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত অগ্নিবর্ণের মৃত্যু-বর্ণনায় কালিদাস লিখেছেন, 'প্রদীপ যেমন (প্রবল) বাতাসকে (এড়াতে পারে না) তেমনি তিনি বৈদ্যগণের চেষ্টাব্যর্থকারী রোগকে অতিক্রম করতে পারলেন না (বৈদ্যযত্ন-পরিভাবিনং গদং ন প্রদীপ ইব বায়ুমত্যগাৎ)।' কুমারে ব্যবহৃত উপমাটি এর চেয়ে উৎকৃষ্ট। কিছুকাল রোগে ভোগার পর মৃত্যু, দমকা হাওয়ায় বাতির হঠাৎ নিভে যাওয়ার মতো নয়; উপমাটি যে হরনেত্রানলে মদনের হঠাৎ বিনাশ সম্বন্ধেই ভালো করে খাটে, সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় হতে পারে না। রঘুর উপমাটি অবশ্য কাঁচা হাতের রচনা। এর পরেও, রঘু কালিদাসের দ্বিতীয় গ্রন্থ কিনা এ সম্বন্ধে যদি সমালোচকদের সন্দেহ থাকে তবে কাব্য-খানির আঙ্গিকে যে কিছু ত্রুটি আছে তার প্রতি লক্ষ্য করলেই তাঁদের সে সংশয় কেটে যাবে। ঋতু-সংহারে শব্দপ্রয়োগের যে পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, তা রঘুতেও দুর্লভ নয়। যেমন নবম সর্গে বসন্ত-বর্ণনায় 'মধু' শব্দ প্রথম পাঁচ শ্লোকে চার বার এবং ষোড়শ সর্গে গ্রীষ্ম-বর্ণনায় 'সায়ন্তন-মল্লিকা' শব্দ দুবার দেখা যায়; এর উপর ভাবোদ্দীপক চিত্রগুলিও কখনো কখনো পুনরাবৃত্ত হয়েছে। যেমন, কোকিলের রবকে এক বার বর্ণনা করা হয়েছে কামসৈন্যের গর্জনরূপে (৪৩) আর, এক বার কল্পনা করা হয়েছে দূতীর মানভঞ্জন-কারী উপদেশরূপে(৪৭); পূর্বোল্লিখিত 'সায়ন্তন-মল্লিকা'র পুনরুক্তিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ সকল ছাড়াও নবম সর্গে বসন্তঋতুর মহিমা দেখাতে গিয়ে কালিদাস বর্ণন করেছেন এক দোলারূঢ়া নায়িকার, যে নায়কের গলা জড়িয়ে ধরবার ইচ্ছায় ছল করে দোলার রজ্জুতে লাগানো হাতকে শিথিল করে দিচ্ছে। আর উনবিংশ সর্গে এর পরিবর্তিত রূপ— নায়ক প্রণয়িনীর পক্ষে এমন অবস্থার সৃষ্টি করছে যাতে নিজেকে পতন থেকে রক্ষা করবার জন্যে সে নায়কের গলা জড়িয়ে ধরতে বাধ্য হয়। এও তো এক প্রকার পুনরাবৃত্তি। এ সকল ছাড়াও অল্পস্বল্প যে অর্থালংকার সংসৃষ্ট দোষ রঘুতে আছে; বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণের সপ্তম পরিচ্ছেদে যুক্তি সহকারে সে সকল দেখিয়েছেন। এর সঙ্গে নবম সর্গের শব্দালংকারমূলক ত্রুটিও উল্লেখ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে রঘুবংশের গোঁড়া ভক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বলেন—

> কিন্তু ইহাতে তাঁহার অলৌকিক কবিত্বশক্তির পর্যাপ্ত স্ফুরণ হইয়াছে বলিলে সত্যের মর্যাদা রক্ষা হয় না। শব্দের অত্যন্ত বাঁধাবাঁধির মধ্যে পড়িয়া কবির চিরনবীনা কল্পনাসুন্দরী যেন তেমন স্বৈরাচারে পদবিন্যাস করিতে পারেন নাই।[৬]

বিদ্যাভূষণমশায়ের প্রদর্শিত এই ত্রুটি কালিদাসের পরিণত বয়সের কাব্যে দেখা দিয়েছিল এমন কল্পনা করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। মনে হয়, রঘু যে কালিদাসের দ্বিতীয় গ্রন্থ এ কাব্যের নমস্ক্রিয়া থেকেও তার খানিকটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঋতুসংহারের পূর্বোল্লিখিত দোষগুলি স্মরণ করলে বোঝা যায়, এ স্থলে কালিদাস যে কেন 'বাগর্থপ্রতিপত্তি'র অভিলাষে 'বাগর্থাধিব সংপৃক্ত' হরপার্বতীর বন্দনা গান করেছিলেন। তাঁর নাটকত্রয়ের কোনও আশীর্বচনে তিনি এ ধরণের ব্যক্তিগত কথা কিছু বলেন নি।

---

৬ বসুমতী সাহিত্য-মন্দির-প্রকাশিত কালিদাসের গ্রন্থাবলী। ১ম ভাগ, ১০ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৫৬ বাং, পৃ. ১৫১ পাদটীকা।

অতএব এরূপ ভাবতে বাধা নেই যে, কালিদাস তাঁর মহাকাব্যের সূচনায় পরিকল্পিত গ্রন্থের গুরুত্ব কল্পনা করে সিদ্ধিলাভের জন্যে সোজাসুজি দৈবশক্তির আনুকূল্য প্রার্থনা করেছিলেন। নমস্ক্রিয়ার পরে তিনি পূর্বসূরীদের প্রতি যে বিনয়পূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তাও হয়তো রঘু যে কালিদাসের গোড়ার দিকের রচনা, সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়।

টীকাকারগণ এ সম্পর্কে নীরব থাকলেও মহাকবি ভাসের রচনাবলী আবিষ্কারের পর এরূপ অনুমান করতে বাধা নেই যে, রঘুবংশ সম্পর্কিত অন্তত দুখানি নাটকের প্রণেতা তিনিও কালিদাসের স্বীকৃত পূর্বসূরীদের এক জন। যেহেতু তাঁর প্রতিমা-নাটকের তৃতীয় অঙ্কে রয়েছে বিশ্বজিৎ যজ্ঞের প্রবর্তয়িতা দিলীপের এবং চতুর্থ অঙ্কে আছে 'যজ্ঞবিশ্রান্তকোশ'[৭] রঘুর উল্লেখ। অধিকন্তু তৃতীয় অঙ্কে 'প্রিয়াবিয়োগ-নির্বেদ-পরিত্যক্ত-রাজ্যভার'[৮] অজের কথাও রয়েছে। অতএব মনে করা যেতে পারে যে, রঘুর পঞ্চম সর্গে বর্ণিত অজকৌৎস-সংবাদ মহাকবি ভাসের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। তদ্রূপ রঘুর অষ্টমসর্গস্থিত ইন্দুমতীর দেহত্যাগান্তে শোকাকুল অজের বর্ণনাও ভাসের তৎসম্পর্কিত উক্তিরই সুনিপুণ সম্প্রসারণ। মালবিকা রচনার সময় কালিদাস ভাস-আদি কবিগণের অনুরাগীদের সম্পর্কে যে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে রঘুর আরম্ভে প্রচ্ছন্নভাবে পূর্বগামী কবির নিকট তাঁর ঋণ স্বীকারের কথা বিবেচনা করলেও স্পষ্টই বোঝা যাবে কোন্ গ্রন্থখানি তাঁর আগের রচনা।

রঘুবংশের কিছু কিছু ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করায় কোনও পাঠক যেন মনে না করেন, আমরা এ কাব্যখানির উৎকর্ষ-বিষয়ে উদাসীন। 'রঘুরপি কাব্যং তদপি পাঠ্যম্, তস্যাপি টীকা সাঽপি পঠনীয়া ?' এরূপ বলে অতীতে এক দল সাহিত্য-ব্যবসায়ী যে, মহাকবির এই উত্তম কাব্যখানির প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে গেছেন তা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। খুব সম্ভব পণ্ডিতমশায়দের এই বিরূপ ভাবের সঙ্গে সত্যিকারের কাব্য বিচারের বিশেষ যোগই ছিল না। রঘু যে ভারবি মাঘ ও শ্রীহর্ষের রচিত কাব্যত্রয়ের মতো যথেষ্ট দুর্বোধ্য নয়, এই হয়তো ছিল কাব্যখানির সম্বন্ধে পণ্ডিতমশায়দের অনাদরের মূল কারণ। রঘু সম্পর্কে তাঁদের উক্তিটি আধুনিক রসজ্ঞসমাজের হাস্যোদ্রেক করে মাত্র। রঘুবংশের উল্লেখিত সামান্য দোষগুলি শুধু এই প্রমাণ করে যে, কাব্যখানি কালিদাসের গোড়ার দিকের রচনা, এবং তাঁর অসামান্য প্রতিভার পূর্ণতর বিকাশ তখনো ভবিষ্যতের অপেক্ষায় ছিল। কি সুবিশাল পরিকল্পনা, কি সমুন্নত আদর্শ, কি কাব্যকলার অপূর্ব পারিপাট্য, যে দিক থেকেই বিচার করা যায় রঘুবংশ কাব্যখানি এক অসাধারণ সৃষ্টি। এ গ্রন্থ রচনা করেই যে, কালিদাস মহাকবি বলে গণ্য হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ মাত্র নেই ; এবং নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত জেনে তবেই তিনি তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ মালবিকার প্রস্তাবনায় ভাস প্রভৃতি পূর্বগামী কবিদের অনুরাগিবর্গ সম্পর্কে এমন সগর্ব উক্তি করতে সাহসী হয়েছিলেন।

কিন্তু কালিদাসের তৃতীয় গ্রন্থ কোন্খানি এ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং সারদারঞ্জন রায় অন্য মত পোষণ করেন। তাঁদের উভয়েরই মত এই যে, মেঘদূত কালিদাসের তৃতীয় রচনা। এর বিপক্ষে যে নানা যুক্তি দেখানো যেতে পারে, তার মধ্যে মেঘদূতের ক্ষুদ্র আকার সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ সম্পর্কে

---

৭ যিনি যজ্ঞ-কালে সমস্ত রাজকোশ বিলিয়ে দেন।

৮ প্রিয়ার বিয়োগে বৈরাগ্যবশত যিনি রাজ্যভার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

আগেই যথোচিত আলোচনা হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়াও যে সকল যুক্তি আছে সে সকল যথাস্থানে উল্লিখিত হবে। তৃতীয় স্থান সম্পর্কে মেঘদূতের দাবি অগ্রাহ্য করার পর দেখা যাক কুমারকে কালিদাসের তৃতীয় গ্রন্থরূপে গণ্য করা যায় কিনা। কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে তৃতীয় স্থানের সম্বন্ধে কুমারের দাবিও বলবান্ মনে হয় না। কারণ, মেঘদূত এবং কুমার এ দুয়ের কোনও কাব্যেরই নায়ক নায়িকা মর্তলোকের অধিবাসী নন। অতএব মর্তের বর্ণনায় পরিপূর্ণ রঘুবংশ রচনার ঠিক পরেই যে কালিদাস অ-মর্তবাসীদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন এ রকম ভাবা একটু কষ্টকর। এ কারণে, মালবিকাই যে তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। রঘুর আরম্ভে কালিদাস 'বাগর্থাধিব সংপৃক্ত' যে অর্ধনারীশ্বর শিবের স্তুতি করেছেন, মনে হয় মালবিকার আশীর্বচনে 'কান্তাসংমিশ্রদেহ' কৃত্তিবাসের উল্লেখে তা স্বাভাবিক কারণে অব্যবহিত পরবর্তী গ্রন্থে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এই আশীর্বচনের শেষ চরণটিও বেশ অর্থপূর্ণ। এর থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নাটকখানি রঘুর ঠিক পরেই রচিত। এখানে সামাজিক-বর্গকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে কবি বলেন, তোমরা যাতে সন্মার্গ (অর্থাৎ সাধুজনের অনুসৃত পথ) দেখতে পাও, সেজন্য মহাদেব তোমাদের তামসীবৃত্তি দূর করুন (সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু বস্তামসীং বৃত্তিমীশঃ)। কালিদাস এখানে তাঁর সংখ্যালঘু সমালোচকদেরই নিপুণভাবে ভর্ৎসনা করেছেন। মনে হয়, রঘুবংশ প্রচুর সমাদর লাভ করার পরও মক্ষিকাবৃত্তি সমালোচকরা তাঁর যশকে খর্ব করার চেষ্টা করছিলেন ; তাঁদের এই তামসীবৃত্তি বা অন্ধতাকেই তিনি আশীর্বচনের ভিতর দিয়ে অবজ্ঞা জানিয়েছেন।

বিক্রম কেন যে, কালিদাসের চতুর্থ গ্রন্থ বা দ্বিতীয় নাটক তার সমর্থনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যা বলেছেন তাই পর্যাপ্ত মনে হয়। তাঁর মতের সারমর্ম এই—নায়ক-নায়িকার যে প্রেম মালবিকার কেন্দ্রীয় বস্তু, তা তেমন করে ফুটে ওঠে নি ; যেহেতু এ প্রেম মিলনের মধ্যেই পরিসমাপ্ত। প্রেম দুর্নিবার গতি সংগ্রহ করে কেবল তখনি, যখন হঠাৎ বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়ে প্রণয়ের স্রোতকে কিছুকালের জন্য দৃঢ় বাধা প্রদান করে। মালবিকা রচনার অচিরকাল মধ্যেই কালিদাস বুঝেছিলেন এই নাটকখানির মূলগত দুর্বলতা। মনে হয়, বিক্রম রচনা করেই তিনি নিজ প্রতিভাকে এতৎসম্পর্কীয় বিরুদ্ধ সমালোচনা থেকে রক্ষা করলেন। উর্বশী ও পুরুরবার প্রেম অবশ্যই পাকা হাতের রচনা এবং সেই কারণেই মালবিকার পরবর্তী। শকুন্তলা এই নাটকখানিকে নিষ্প্রভ করলেও এর কাব্যত্ব খুবই উঁচুদরের।

এবার দেখতে হবে, কোন্ গ্রন্থখানি কালিদাসের পঞ্চম রচনা। সারদারঞ্জন রায়ের মত এই যে, মেঘদূতই বিক্রমের অব্যবহিত পরবর্তী গ্রন্থ। কিন্তু শাস্ত্রী মশায়ের মতে এ স্থান কুমারেরই প্রাপ্য। এ সম্পর্কে অধ্যাপক রায়ের মতের সারমর্ম এই—বিক্রমের চতুর্থ অঙ্কে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিত্রলেখা বলছেন, 'এ সময়ে সুখী জনেরও উৎকণ্ঠাজনক মেঘোদয়ে (উর্বশীর বিরহ-পীড়ার) কোনও প্রতীকার থাকবে না।'[১] তার ক্ষণপরেই সে দৃশ্যে রাজা পুরুরবার প্রবেশ। নববর্ষার মেঘোদয় রাজাকে তখন যে উন্মাদের মতো আচরণ করিয়েছিল তার মধ্যেই রয়েছে মেঘদূত কাব্যের সুনিশ্চিত পূর্বাভাস। যুক্তিটি আপাতত খুব দৃঢ় মনে হয়। কিন্তু মেঘদূত যে একটি কারণে তৃতীয় গ্রন্থ বলে গণ্য হতে পারে নি তা এ স্থলেও প্রযোজ্য। মেঘদূতের নায়ক-নায়িকা মর্তের নরনারী নন। অতএব মেঘদূতকে কালিদাসের পঞ্চম গ্রন্থ বলে মনে করা খুব শক্ত। অতঃপর বাকী রইল অভিজ্ঞান-শকুন্তল (সংক্ষেপে 'শকুন্তলা') ও

১ এদিণা উণ নিব্বিদাণং-পি উক্কণ্ঠাআরিণো মেহোদএণ অপ্প.দিআরো ভবিস্সদি-ত্তি তক্কেমি।

কুমার। মর্তের ও মর্তলোক থেকে সুদূর নায়ক-নায়িকার প্রসঙ্গের পূর্বোল্লিখিত যুক্তি এখানেও প্রযোজ্য। তা হলে শকুন্তলাকেই কালিদাসের পঞ্চম গ্রন্থ বলে স্বীকার করতে হয়। এই সিদ্ধান্তের অন্য পরিপোষক কারণ এই যে, যে-নাট্য রচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে কালিদাস ভাস প্রভৃতি কবির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা করেছিলেন, কেবল শকুন্তলা রচনার পরেই তাতে তাঁর সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল। যেহেতু মালবিকা বা বিক্রম এর কোনোখানিই ভাসের সর্বোত্তম নাটক স্বপ্নবাসবদত্তার কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে না, মনে হয় না যে কালিদাসের মতো প্রতিভাশালী এবং উচ্চাভিলাষসম্পন্ন ব্যক্তি নাট্য-রচনা সম্পর্কে তাঁর সংকল্প (অর্থাৎ ভাসের যশ নিষ্প্রভ করা) সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করবার আগে অন্যবিধ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই কারণে শকুন্তলাকেই কালিদাসের বিক্রম-পরবর্তী গ্রন্থ বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। এই নাটকখানি রচনার পরে তাঁর মহাকবি আখ্যা যে সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছিল তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

এরূপ অসামান্য কৃতকার্যতা লাভ করার পরে কালিদাসের নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি তাঁকে সম্পূর্ণ নবতর সৃষ্টির প্রেরণা দিল। তিনি যে কেবল অর্ধদিব্য নায়ক-নায়িকা (যক্ষ ও যক্ষপত্নী) নিয়ে কাব্য রচনা করলেন তা নয়, এ কাব্যের আঙ্গিকেও ছিল এক দুঃসাহসিক অভিনবত্ব। যাঁরা মেঘদূতকে কালিদাসের গোড়ার দিকের রচনা মনে করেন তাঁরা এ ঘটনাটির দিকে লক্ষ্য করেন নি। কেবল একটি মাত্র ছন্দে কালিদাস রচনা করলেন তাঁর ক্ষুদ্রতম কাব্যখানি। মেঘদূতের মূলেও ছিল এক অতি অদ্ভুত কল্পনা: পৃথিবীতে নির্বাসিত ও জাতিসুলভ স্বৈরবিহারের শক্তি থেকে বঞ্চিত অভিশপ্ত যক্ষ এবং তার অলকাবাসিনী বিরহিণী পত্নীর নিকট দয়িতের বার্তা-বহনকারী আষাঢ়ের নবীন মেঘ। কাব্যখানির উপাখ্যানভাগ অতিশয় সরল এবং নাটকীয়ত্ব-বর্জিত। কিন্তু উপকরণের কোনও আড়ম্বর না থাকলেও কালিদাসের অসামান্য প্রতিভার ফলে কাব্যখানি এমন অদৃষ্টপূর্ব মূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হল যে, তৎকালীন রসজ্ঞ সমাজের হৃদয় লুঠ করে নিতে এর দেরি হল না। কেনই বা হবে? তখনকার অগণিত কাব্যরস-পিপাসুর দল যে, কালিদাসের রচিত কাব্যের ক্ষেত্রেই ভূমিষ্ঠ এবং তাঁর কাব্যের রসপানেই সংবর্ধিত। কিন্তু তাঁর যশ তখন যতই সুপ্রতিষ্ঠিত হোক-না কেন, প্রতিকূল সমালোচনার হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন না। ভামহের রচিত কাব্যালংকার থেকে আমরা এ কথা অনুমান করতে পারি।[১০] যে মুষ্টিমেয় লোক তখনো প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে অন্ধ অনুরাগের মায়া কাটাতে পারেন নি এবং নূতন কবিদের সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করতেন তাঁরা প্রতিকূলতা দেখাতে দ্বিধা করলেন না। কিন্তু কালিদাসই

১০ অযুক্তিমদ্যথা দূতা জলভৃন্মারুতেন্দবঃ। তথা ভ্রমরহারীতচক্রবাকশুকাদয়ঃ। অবাচোঽব্যক্তবাচশ্চ দূরদেশবিচারিণঃ। কথং দূত্যং প্রপদ্যেরন্নিতি যুক্ত্যা ন যুজ্যতে। যদি চোৎকণ্ঠয়া যত্তদুন্মত্ত ইব ভাষতে। তথা ভবতু ভূম্নেদং সুমেধোভিঃ প্রযুজ্যতে (১ম পরিচ্ছেদ, ৪২-৪৪)। বটুকনাথ শর্মা ও বলদেব উপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ, বনারস, ১৯২৪। সম্পাদকদ্বয়ের মতে ভামহের আবির্ভাবকাল পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী। আমাদের মনে হয় তিনি কালিদাসের বয়োকনিষ্ঠ সমকালবর্তী ছিলেন। ভামহের উক্তি থেকে অনুমান করা যায় যে, কালিদাসের জীবৎকালে এবং তার অব্যবহিত পরে অনেক দূতকাব্য রচিত হয়েছিল এবং যথেষ্ট গুণের অভাবে সে সকল নষ্ট হয়ে গেছে। মনে হয়, ভাসের রচনাও তাঁর জানা ছিল, কিন্তু তিনি ভাস বা কালিদাস কারোই নাম উল্লেখ করেন নি। অথচ যাদের রচনা আমাদের হাতে পৌঁছয় নি, তিনি এমন একাধিক কবির নাম করেছেন। এর অর্থ কি? মনে হয় উল্লিখিত কবিগণ তাঁর সমকালবর্তী। নিতান্ত সৌজন্যবশত অথবা বন্ধুপ্রীতির জন্য তিনি তাঁদের নাম করেছেন; এবং ভাস ও কালিদাস স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে তিনি 'তেলা মাথায় তেল' ঢালতে যান নি।

শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেন। তাঁর মেঘদূত কাব্যের অনুকরণে যে অন্যূন বিশখানি দূতকাব্য পরবর্তীকালে ভারতের নানা প্রান্তে রচিত হয়েছিল তাই এ কথার অবিসংবাদিত প্রমাণ।

মেঘদূতের আরম্ভে কোনও মঙ্গলাচরণ নেই। এজন্যে কেউ কেউ এমন মত প্রকাশ করেছেন যে, কাব্যখানি রচিত হয়েছে কবিজীবনের গোড়ার দিকে, যখন তাঁর মধ্যে দেবভক্তি বা ধর্মভাব প্রবল হয়ে ওঠে নি। রঘুবংশকে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ মনে করলে এ কথা টেঁকে না। তবে প্রৌঢ় বয়সে রচিত মেঘদূতের আরম্ভে কেন তিনি কোনও মঙ্গলশ্লোক লেখেন নি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মোটেই দুঃসাধ্য নয়। সাধারণত যাকে মঙ্গলাচরণ বলা হয় এমন কোনও কবিতা লিখে তিনি কাব্যখানির আরম্ভ করেন নি বটে, তবু মেঘদূতের সূচনায় যে সর্বজনপূজ্য রাম-সীতার নাম রয়েছে তাই কি লেখক ও পাঠকগণকে মঙ্গলদানের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়? এই কথাটি মনে করলে কুমারের আরম্ভে মামুলী মঙ্গলশ্লোকের অভাবও ব্যাখ্যাত হয়।[১১] জগতের জনকজননী হরপার্বতীর যে মহিমময় চরিত্রকীর্তন কাব্যখানির বিষয়বস্তু, তাঁরা কি যথেষ্ট মঙ্গলের বিধায়ক নন? এ কারণে তাঁদের প্রেম ও পরিণয় প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত কুমারকে কালিদাসের সর্বশেষে রচিত গ্রন্থ বলে মনে করা সম্পর্কে কোনো গুরুতর আপত্তি হতে পারে না।

কিন্তু পূর্বোক্ত সকল আলোচনার পরেও এ কথা জোর করে বলা যায় না যে, কালিদাস ঠিক্‌ঠাক্‌ এমনি পর্যায়ক্রমে তাঁর কাব্য ও নাটক সকল লিখেছিলেন। তবে এ কথা মানতে বাধা নেই যে, ধীরভাবে তাঁর রচনার গুণাগুণ এবং বিষয়বস্তু আদি বিবেচনা করলে এরূপ কালানুক্রমই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে, তিনি সর্বাগ্রে ঋতুসংহার লিখে তার পর ক্রমান্বয়ে রঘুবংশ মালবিকাগ্নিমিত্র বিক্রমোর্বশীয় অভিজ্ঞান-শকুন্তল মেঘদূত এবং কুমারসম্ভব রচনা করেছিলেন।[১২]

---

১১ এভাবে দেখলে ঋতুসংহারও মঙ্গলাচরণহীন নয়। কারণ এ কাব্যের প্রথম শ্লোকটির গোড়ায় সর্বপাপঘ্ন দিবাকরের (সূর্যের) নাম রয়েছে, এবং তার পরেই উল্লিখিত চন্দ্রমাও নানা শুভ ফল দিয়ে থাকেন। এ ছাড়াও প্রত্যেক সর্গের শেষে কবি পাঠকের প্রতি আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছেন, যেন প্রত্যেক ঋতুই তার সুখ বা হিত বিধান করেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতে গেলে ঋতুগণ এ স্থলে কালস্বরূপ বা শিবেরই রূপান্তর। অতএব, প্রথম বয়সে কালিদাস ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, এ কথার বিশেষ গুরুত্ব নেই।

১২ বাহুল্যবোধে, কালিদাসের সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একাধিক মতের আলোচনা করা হয় নি। কালিদাসের জন্মস্থান ও আবির্ভাবকাল সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় যে সকল মূল্যবান আলোচনা রেখে গেছেন তার জন্যে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

প্রাচীন তন্ত্রে বিজ্ঞানচর্চা

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

প্রাচীন ভারতীয় সাধনা ধর্মকে জীবন থেকে আলাদা করে দেখে নি। এদেশে ধর্ম জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই বেদ-উপনিষদে যেমন, পুরাণ-তন্ত্রেও তেমনি ঐহিক জীবন ও সমাজ-সংসারের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। জীবনকে কেমন করে সুন্দর করা যায়, কিভাবে আমরা নীরোগ হতে পারি, আমাদের সমাজ উন্নত হতে পারে কি করলে, এ সব কথাই ওইসব শাস্ত্র-গ্রন্থে বিস্তৃত করে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে তন্ত্রশাস্ত্র বোধ করি অন্য সব শাস্ত্রকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর কারণ, বেদ-উপনিষদ্ ও পুরাণের তুলনায় তন্ত্রকে জীবনের অধিকতর উপযোগী করে গড়ে তোলবার চেষ্টা হয়েছিল। কেন হয়েছিল, সে কথা বলতে গেলে তন্ত্রের উদ্ভব নিয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

তন্ত্রের উদ্ভব হয় বেদ-উপনিষদের অনেক পরে। এমন কি অনেকগুলো পুরাণও তান্ত্রিক যুগের পূর্বে লেখা। বৈদিক যাগযজ্ঞ ছিল সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তা ছাড়া ওইসব ক্রিয়াকর্মে বিরাট উদ্যোগ-আয়োজন প্রয়োজন হত। সে কারণেই কালক্রমে সাধারণ মানুষরা তো বটেই, এমন কি শাস্ত্রজ্ঞ অসাধারণরাও বেদচর্চায় অক্ষম হয়ে পড়লেন। বৈদিক ক্রিয়াকলাপকে তাই আরও সরল করার প্রয়োজন দেখা দিল এবং এই প্রয়োজন থেকেই রচিত হল উপনিষদ ও পুরাণ। কিছুকাল পরে শাস্ত্রজ্ঞরা লক্ষ করলেন, পুরাণ-উপনিষদ থেকেও জ্ঞান আহরণের শক্তি সাধারণ মানুষের নেই; জনসাধারণকে শাস্ত্রচর্চার সুযোগ দিতে হলে এসকল শাস্ত্রকে আরও সহজ ও জীবনধর্মী করা আবশ্যক। জীবনের সঙ্গে শাস্ত্রের সহজে সংযোগ-স্থাপনের এই বাসনা থেকেই তন্ত্রের উদ্ভব।[১] সে কারণেই তন্ত্রসাধনায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্রিয়া-কর্মের প্রাধান্য।

প্রাচীন ভারতীয় ঔষধ-বিজ্ঞানের প্রায় অর্ধেকই তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত। শুধু ঔষধের কথাই বা বলি কেন, সাধারণের জ্ঞাতব্য প্রায় সকল প্রকার বিষয়, পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে ঘরবাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখার পদ্ধতি, শারীরবিজ্ঞান রসায়নবিদ্যা কৃষিবিজ্ঞান আইন সামাজিক রীতিনীতি পর্যন্ত সব কিছুই এতে আছে। তন্ত্রকে এক কথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে।[২]

তন্ত্রের প্রধানত দুটো শ্রেণী— শৈব এবং বৌদ্ধ। বৌদ্ধতন্ত্র এমন কি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতেও ছিল বলে কেউ কেউ অনুমান করেন।[৩]

এ ছাড়া আর-এক ধরণের তন্ত্র আছে যাদের মধ্যে শৈব এবং বৌদ্ধ উভয় প্রকার প্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর তন্ত্রের বিশিষ্ট উদাহরণ হল মহাকালতন্ত্র রসরত্নাকর ইত্যাদি।

---

১ *Tantras their Philosophy and Occult Secrets*, D. N. Bose and H. Halder; 3rd edn. 1956: p. 1-11

Yuganaddha— The Tantric view of life (1952), H. V. Guinther: Introduction.

২ *Principles of Tantra* (2nd edn. 1952), Arthur Avalon.

Introduction, Theory and Practice of Tantra (1925), G. P. Bhattacharya

৩ *A History of Hindu Chemistry* (2nd edn. 1925): P. C. Ray, Vol—II, Introduction—p. XXXV

শৈব তন্ত্রগুলো শিব ও পার্বতীর কথোপকথনের আকারে রচিত। এই শ্রেণীর তন্ত্রের আবার দুটো শাখা— আগম ও নিগম। আগমে পার্বতী শিষ্যা এবং শিব গুরু হিসেবে তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। আর দেবী যেখানে উত্তর দিচ্ছেন ও শিব প্রশ্ন করছেন সেই শ্রেণীর শৈব তন্ত্রকে বলা হয় নিগম।

আসাম থেকে তন্ত্রসাধনার উদ্ভব হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। অনেকেরই ধারণা, কামাখ্যা শ্রীহট্ট ও পূর্ণগিরি অঞ্চল থেকে তন্ত্রচর্চা ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে ভারতের বাইরেও তান্ত্রিক প্রভাব বিস্তৃত হয়।[৪]

তান্ত্রিক যুগ ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে তবে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতেও যে এদেশে তন্ত্রসাধনা প্রচলিত ছিল এ বিষয়ে অনেকেই একমত। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন, পঞ্চম শতাব্দীতে এদেশে তন্ত্রচর্চা ছিল, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল মধ্যভারতের গঙ্গাধর শিলালিপি।[৫]

১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি তন্ত্রসাধনা ভারতীয় সমাজ ও জীবনধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। শৈবতন্ত্র তো বটেই, বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবও উপেক্ষণীয় ছিল না। বৌদ্ধতন্ত্রে শিব ও পার্বতীর স্থলে বোধিসত্ত্ব ও প্রজ্ঞাপারমিতা স্থান পেতেন। এই উভয়প্রকার তন্ত্রে দেখানো হয়েছে, বিশেষ কিছু ক্রিয়াকর্মের সাহায্যে কিভাবে সকলেই ইহজন্মে মুক্তির আস্বাদ পেতে পারে। ক্রিয়াকর্মগুলোর অনেক-কিছুই হয়তো আজগুবি; কিন্তু অনেক-কিছু আবার এত বেশি যুক্তিনিষ্ঠ যে আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের পরীক্ষায়ও এরা উত্তীর্ণ হতে পারে। যাঁরা প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস উদ্ধার করতে চান, তন্ত্রশাস্ত্রের অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক সত্যগুলো তাঁদের কাছে বিশেষ মূল্যবান ও অর্থবহ।

২

অনেক প্রাচীন তন্ত্রেই পারদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। পারদকে কি কি উপায়ে শোধন-করা যায় এবং পারদ-জাত ঔষধ ব্যবহার করে কিভাবে আমরা দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারি, বহু তন্ত্রেই সেসব কথা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। শোধিত পারদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে এমন কি অমরত্ব লাভের স্বপ্নও তন্ত্রসাধকরা দেখেছেন। এই প্রসঙ্গে রসার্ণব রসহৃদয় রসেশ্বরসিদ্ধান্ত প্রভৃতি কয়েকটি তন্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রসার্ণব কথাটির অর্থ হল পারদের সমুদ্র। পারদের বহুবিধ গুণাবলী ও শোধন-প্রক্রিয়া এই তন্ত্রে বর্ণিত। এর এক জায়গায় বলা হয়েছে, শ্রেষ্ঠ ভক্তেরা জীবনের চরম লক্ষে পৌছবার জন্যে পারদ ব্যবহার করে থাকেন।

রসহৃদয়ে পারদকে মহাদেবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর রসেশ্বরসিদ্ধান্তে মহাদেবের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে— পারদের সাহায্যেই জীবন রক্ষা পেতে পারে।

রসহৃদয়ে বলা হয়েছে— পারদকে অম্লগন্ধী কোনো যবজাতীয় শস্যের মণ্ডের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে

৪ *An Introduction to Buddhist Esoterism* (1932): Dr. Benoytosh Bhattacharya: p. 43-46; তন্ত্রকথা: (বিশ্altবিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা নং ১০৩) চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

৫ পঞ্চোপাসনা (১৯৬০): জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৬৩-২৬৫

নিয়ে পাতন করা হলে তা সংমিশ্রিত দস্তা ও টিন থেকে মুক্ত করা যায়। আবার পারদকে গন্ধকমিশ্রিত কোনো লৌহপদার্থ বা হরিতাল দিয়ে পেষা হলে তা লাল রঙ্ ধরে। আমরা তখন স্ফটিকস্বচ্ছ এবং লালচে আভাময় গন্ধকযুক্ত পারদ পেতে পারি।

পারদ-শোধন ও পারদ-জাত ঔষধ সম্পর্কে এ ধরণের আরও অনেক বিজ্ঞান-নির্ভর আলোচনা এইসব তন্ত্রে আছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অনুমান করেছেন,[৬] কিমিয়াবিদ্যা (অ্যাল্‌কেমি)-সংক্রান্ত তন্ত্রগুলোর উদ্ভব একাদশ শতাব্দীতে হয়েছিল। তবে যে সব রাসায়নিক ক্রিয়া-কর্মের বর্ণনা এদের মধ্যে আছে সেগুলো যে আরও অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তান্ত্রিক চিকিৎসা সম্বন্ধে চিকিৎসকরা অবহিত হলেন একাদশ শতাব্দী থেকে। কিন্তু এর কয়েক শো বছর পূর্বেই চিকিৎসার পদ্ধতিগুলো উদ্ভাবিত হয়েছিল। রসার্ণবের প্রাচীনত্বের সপক্ষে একটি বড় যুক্তি হল এই যে, মাধবাচার্য এটিকে একটি প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। মাধবাচার্য ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দেও বিজয়নগরের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যে গ্রন্থকে প্রাচীন বলে উল্লেখ করছেন, তা যে কম করেও তার আমল থেকে শ তিনেক বছর আগেকার রচনা এ কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায়। এ ছাড়া 'বৃহৎসংহিতা'য় (৫৮৭ খ্রী) বরাহমিহির ঔষধ হিসেবে পারদ ব্যবহারের কথা যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকেও কিমিয়াবিদ্যানির্ভর তন্ত্রসাধনার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। রসার্ণবে প্রাপ্ত ইঙ্গিতসমূহ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, এটি রচিত হয়েছে পূর্বে রচিত কয়েকটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংকলন করে। এই প্রসঙ্গে নাগার্জুনের রসরত্নাকর নামক গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রসার্ণবে এমন-কিছু অংশ আছে, রসরত্নাকরের সঙ্গে যেগুলো প্রায় হুবহু মিলে যায়। রসরত্নাকর সপ্তম থেকে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো সময়ে রচিত হয়েছিল। পাতনের সাহায্যে কেমন করে হিঙ্গুল থেকে পারদ উদ্ধার করা যেতে পারে, এই গ্রন্থে তা বর্ণনা করা হয়েছে।[৭]

রসার্ণবের পরবর্তী কালে রচিত কয়েকটি তন্ত্র রসার্ণবকল্পম (১০০০ খ্রী) রসকল্প (১৩০০ খ্রী) রসসার (১২০০-১৩০০ খ্রী) রসরত্নসমুচ্চয় (১৩০০-১৪০০ খ্রী) এবং কাকচণ্ডেশ্বরীমতমে[৮] পারদ সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্যাদি আছে।

৩

প্রাচীন যুগের বহু তন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার ধাতুর শোধন-প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। সোনা রূপা তামা লোহা সীসা টিন দস্তা ইত্যাদি ধাতুকে কিভাবে বিশুদ্ধ করা যায় তা নিয়ে অনেক তন্ত্রকারই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য রসরত্নাকর-প্রণেতা নাগার্জুনের নাম। ধাতুবিজ্ঞান সম্বন্ধে নাগার্জুন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কজ্জলী আবিষ্কার করে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। কজ্জলী হল পারদ ও গন্ধকে মেশান কালো রঙের একপ্রকার ঔষধ। স্বর্ণজাতীয়

৬ *A History of Hindu Chemistry* (Vol. I), 2nd revised edn. (1907): Introduction.

৭ চরণ-সংখ্যা—৩৭

৮ *A Catalogue of Palm-leaf and Selected paper MSS.* (Durbar Library, Nepal) Vol I. H. P. Shastri.

অনেক ধাতব পদার্থকে কিভাবে বিশুদ্ধ করা যায়, কক্ষপুটতন্ত্রে নাগার্জুন তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বলেছেন, ধাতুকে শোধন করতে হলে সেই পদার্থটিকে বালি ও লবণের সঙ্গে মিশিয়ে আগুনে তপ্ত করতে হবে।

সোমদেবের রসেন্দ্রচূড়ামণি তন্ত্রে (১২০০-১৩০০ খ্রী) দেখানো হয়েছে, গন্ধকমিশ্রিত সীসা থেকে কেমন করে খাঁটি সীসা পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া লোহা এবং টিন সম্বন্ধেও কিছু মূল্যবান তথ্যাদি এই গ্রন্থে আছে।

দস্তা-শোধনের নিখুঁত পদ্ধতি উদ্ভাবন করে স্মরণীয় হয়ে আছেন যশোধারা। রসপ্রকাশসুধাকর (১২০০-১৩০০ খ্রী) নামক গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে আমরা খাঁটি দস্তা পেতে পারি। এ ছাড়া পারদঘটিত ঔষধ 'মারকিউরাস ক্লোরাইড' প্রস্তুতের কথাও যশোধারার গ্রন্থে আছে।

রুদ্রযামলের অন্তর্গত রসকল্প তন্ত্রে (১২০০-১৩০০ খ্রী) গন্ধকমিশ্রিত তামা থেকে খাঁটি তামা প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের গন্ধক ও ফটকিরির প্রস্তুতপদ্ধতিও এই তন্ত্র থেকে জানা যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী যুগে লেখা বিভিন্ন তন্ত্রে ধাতব পদার্থ থেকে ঔষধ প্রস্তুতের পদ্ধতি বিস্তারিত-ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় রসসার (১২০০-১৩০০ খ্রী) ও রসনক্ষত্র-মালিকা[৯] তন্ত্র। গোবিন্দাচার্যের রসসারে পারদঘটিত ঔষধ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ধাতব ঔষধের কথা স্থান পেয়েছে। রসনক্ষত্রমালিকায় আফিঙের উল্লেখ দেখা গেল। আর দেখা গেল টিন লোহা পারদ প্রভৃতি ধাতুর ভস্ম দিয়ে ঔষধ প্রস্তুতের পদ্ধতি।

রসনক্ষত্রমালিকার পরবর্তী সময়ে লেখা অনেক তন্ত্রেই সীসা টিন ইত্যাদি ধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ ঘটিয়ে ওইসব ধাতুর অক্সাইড্ প্রস্তুতের কথা বর্ণিত। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ধাতুরত্নমালা[১০] ও ধাতুক্রিয়া (১৫০০-১৬০০ খ্রী)।

ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা অনেক তন্ত্রে আফিঙ্ ছাড়াও অনেক বিদেশী ঔষধের নাম পাওয়া যায়। রসপ্রদীপিকা (১৫০০-১৫৫০ খ্রী) তন্ত্রে বলা হয়েছে, ক্যালোমেল বা মারকিউরাস ক্লোরাইড দিয়ে কিভাবে সিফিলিসের (ফিরিঙ্গি রোগ) চিকিৎসা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া থেকে পর্তুগীজরা গোয়া প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে সুদৃঢ়ভাবে ঘাঁটি স্থাপন করে এবং এই পর্তুগীজদের সংসর্গ থেকেই আমাদের সমাজে এই ফিরিঙ্গি রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। বোধ করি এই কারণেই ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা বিভিন্ন তন্ত্রে এই রোগের চিকিৎসা প্রণালীর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।[১১]

৪

ধাতুবিজ্ঞান ছাড়াও প্রাচীন যুগের অনেক তন্ত্রে বিজ্ঞানের বহু বিচিত্র দিক নিয়ে অনেক মূল্যবান তথ্যাদি রয়েছে। কয়েকটি তন্ত্রে ভ্রূণবিজ্ঞানের (এমব্রায়োলজী) কথা সবিস্তারে আলোচিত। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মাতৃকাভেদ তন্ত্র (৭০০-৮০০ খ্রী) প্রপঞ্চসার তন্ত্র (১১০০-১২০০ খ্রী) পরমেশ্বরমত

৯ রসনক্ষত্রমালিকা তন্ত্রের যে পুঁথি পাওয়া গেছে তাতে নকলকারীর উল্লিখিত তারিখ হল সংবৎ ১৫৫৭ অর্থাৎ ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ

১০ চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত

১১ এই প্রসঙ্গে রসকৌমুদী (১৫০০-১৬০০ খ্রী) তন্ত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

তন্ত্র (১১০০-১২০০ খ্রী) ও শারদাতিলক তন্ত্র। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ কিভাবে বেড়ে ওঠে প্রথমোক্ত তন্ত্রটিতে[১২] তা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বায়ু তাপ ও জলের প্রভাবে ভ্রূণ ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। প্রথমে ভ্রূণকে অনেকটা বুদ্‌বুদের মতো দেখায় ('বুদ্‌বুদাকার')। পনের দিনের মধ্যেই তা চতুর্ভুজের আকার নেয় এবং জননীর গৃহীত খাদ্য থেকে কিছু কিছু গ্রহণ ক'রে ক্রমে পুষ্টি লাভ করে। এর ফলে ভ্রূণের আকৃতি দিন দিন বাড়তে থাকে। প্রথমে এর থাকে ছয়টি অংশ— মাথা দুটি-হাত দুটি-পা ও মধ্যকার অংশ। তারপর এই অংশগুলোর মধ্যে চেতনার সঞ্চার হয় এবং ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফ অনুকূল হলে ধীরে ধীরে নাক চোখ মুখ কান বুক পেট ইত্যাদি গড়ে ওঠে। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তন্ত্রের এই সিদ্ধান্ত পুরোপুরি না মিললেও এর মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈজ্ঞানিক সত্য আছে, তা বোধ করি অস্বীকার করা চলে না।

প্রপঞ্চসার তন্ত্রে[১৩] গর্ভের মধ্যে সন্তানের জন্ম সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। এদিক থেকে নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত পরমেশ্বরমত তন্ত্রও[১৪] বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

শারদাতিলক তন্ত্রে[১৫] মাতৃগর্ভে ভ্রূণের ক্রমপরিণতির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা তন্ত্রকারদের আশ্চর্য সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দেয়। এই তন্ত্রটির রচনাকাল নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে এটি যে একটি প্রাচীন তন্ত্র এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। শারদাতিলকের টীকা রচনা করেছিলেন মাধব ভট্ট। এর আর-একটি টীকা রচনা করেন রাঘব। রাঘব বলেছেন, তাঁর টীকা রচনার কাল হল সংবং ১৫৫১ (১৪৮৪ খ্রী)। এদিকে রাঘবের টীকার বহু জায়গায় মাধবের উল্লেখ আছে। অতএব মূল তন্ত্রটি রাঘবের আমলের অনেক পূর্বে লেখা।

৫

প্রাচীন তন্ত্রে বিজ্ঞানচর্চার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এতক্ষণ ধাতুবিদ্যা ও ভ্রূণবিজ্ঞানের কথা বলা হল। কিন্তু স্মরণে রাখা দরকার, বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তন্ত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান এ দুটি বিদ্যার কোনোটিতেই নেই। তন্ত্রশাস্ত্র স্মরণীয় হয়ে আছে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে।

কয়েকটি তন্ত্রে আমাদের দেহের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলী ও তাদের সম্মিলন-স্থলের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, স্নায়ুমণ্ডলীতে যথাযথভাবে শক্তি সঞ্চারিত করতে পারলে চরম শক্তির আধার কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা যায়। শক্তির এই আধারটি আছে মেরুদণ্ডের ঠিক তলায়। তন্ত্রে বলা হয়েছে, এই কুণ্ডলিনীশক্তি বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌছয় এবং মস্তিষ্ক তখন চরম মুক্তির আস্বাদ লাভ করে।

---

১২ *Mātṛkābheda Tantra :* Calcutta Sanskrit Series No. III, Calcutta 1933. edited by C. Bhattcharya.

১৩ *Prapanchasāra Tantra :* edited by Taranatha Vidyaratna ; Tantric texts Series, Vol. No. III, general editor : Arthur Avalon.

১৪ *A Catalogue of Palm-leaf and Selected paper MSS ;* Vol. II (1915) edited by H. P. Shastri.

১৫ *Shāradātilaka Tantram :* Part I, chapters I—VII, Part II ; ch. VII XXIV.
Edited by Arthur Avalon ; Tantric Texts Series, Vol. XVI and XVII, Calcutta 1933.

ষট্‌চক্রনিরূপণ-তন্ত্র জ্ঞানসংকলিনী-তন্ত্র নিগম-তত্ত্বসার-তন্ত্র ইত্যাদিতে আমাদের দেহের স্নায়ুমণ্ডলী সম্পর্কে বহু বিস্ময়কর তথ্যাদি আছে।

স্নায়ু সম্পর্কিত বর্ণনার গোড়াতেই মেরুদণ্ডের কথা বলতে গিয়ে জানানো হয়েছে, এই মেরুদণ্ড আমাদের পিঠের তলদেশ থেকে ঘাড়ের মূল পর্যন্ত বিস্তৃত। মেরুদণ্ডের মধ্যে যে ছিদ্রপথ আছে, তারই ভিতর দিয়ে গেছে সুষুম্না। এতে আছে মোট তিনটি নাড়ী— সুষুম্না বজ্রিণী ও চিত্রিণী।

ষট্‌চক্রনিরূপণ তন্ত্রের মতে, সুষুম্না হল মেরুদণ্ডের ভিতরকার একটি নাড়ী। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মনে করেন, সুষুম্না বলতে বোঝায় মেরুদণ্ডের ভিতরকার রন্ধ্রপথ; আলাদা কোনো নাড়ী হিসেবে একে অভিহিত করা যায় না।[১৬] অপর দিকে *The Mysterious Kundalini*[১৭] গ্রন্থে বলা হয়েছে, মেরুদণ্ডই হল সুষুম্না নাড়ী। এই অভিমত স্বদেশের ও বিদেশের অধিকাংশ পণ্ডিতই মেনে নেন নি। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন,[১৮] সুষুম্না হল মেরুদণ্ডের ভিতরকার কেন্দ্রীয় নাড়ী। এর সর্বদক্ষিণে আছে ইড়া এবং ইড়া ও সুষুম্নার মধ্যবর্তী অংশে সমান্তরালভাবে আছে গান্ধারী হস্তীজিহ্বা শঙ্খিনী ইত্যাদি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নাড়ী। সুষুম্নার একেবারে বাম দিকে পিঙ্গলা নাড়ী। এই পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মধ্যবর্তী জায়গায় পূষা সরস্বতী ইত্যাদি নাড়ীর অবস্থান। প্রতিটি নাড়ী সুষুম্নার সঙ্গে যুক্ত।

ষট্‌চক্রনিরূপণ জ্ঞানসংকলিনী প্রভৃতি তন্ত্রে বলা হয়েছে, প্রতিটি নাড়ী বেরিয়ে এসেছে স্নায়ুকেন্দ্র[১৯] বা চক্র থেকে। এই চক্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন, চক্র বা স্নায়ুকেন্দ্রের বর্ণনা থেকেই শারীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তন্ত্রশাস্ত্রের সবচেয়ে বড় অবদানের কথা জানা যায়।

তন্ত্রে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ চক্রের উল্লেখ করা হয়েছে। এরা হল— আজ্ঞা বিশুদ্ধ অনাহত মণিপূরক স্বাধিষ্ঠান এবং মূলাধার চক্র। এ ছাড়া আজ্ঞাচক্রের খুব কাছেই আছে মনস ও সোম নামে দুটি ক্ষুদ্র চক্র। আর ঊর্ধ্ব-মস্তিষ্কে আছে সহস্রার। তান্ত্রিকরা মনে করেন, মূলাধার চক্রে সুপ্ত কুণ্ডলিনী-শক্তিকে যোগসাধনার সাহায্যে চিত্রিণী বা ব্রহ্মনাড়ীর পথ দিয়ে সহস্রারে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সাধক তখন পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী হন।

এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তটির কথা জানি নে, তবে চক্র ও নাড়ী সম্বন্ধে তান্ত্রিকদের ধারণা যে অনেকটা পাশ্চাত্য শারীরবিজ্ঞানসম্মত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রখ্যাত ভারতবিদ্যা-গবেষক সার্ জন উড্রফ (আর্থার এভালন) চক্র ও নাড়ী সম্বন্ধে তান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।[২০] এ নিয়ে আধুনিক কালে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে।[২১] এইসব আলোচনা এবং ষট্‌চক্রনিরূপণ ও পাদুকাপঞ্চক ইত্যাদি তন্ত্রের সিদ্ধান্ত

১৬ *The Positive Sciences of the Ancient Hindus* (1958 ed.); p. 219, 226-227.

১৭ pp. 35-36.

১৮ *A History of Indian Philosophy,* Vol II (1932) p. 352-357.

১৯ *Nerve Plexuses*

২০ *The Serpent Power* (Fifth Edition, 1953).

২১ তন্ত্রপরিচয় (১৩৫৯): সুখময় শাস্ত্রী। *Studies in the Tantras,* Part I (1939): P. C. Bagchi.

পাশাপাশি রেখে বিচার করলে মনে হয়, তান্ত্রিক সাধকরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈজ্ঞানিক সত্য-দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন।

প্রথমে আজ্ঞাচক্রের কথা ধরা যাক। তান্ত্রিকরা এর এরূপ নাম দিয়েছেন, কারণ এইখান থেকেই গুরুর নির্দেশ বা আজ্ঞা এসে থাকে বলে এঁদের ধারণা। গুরুর নির্দেশের কথা জানি নে, তবে এই চক্রটির অবস্থান ও প্রকৃতির যে বর্ণনা তন্ত্রে পাওয়া যায় তার সঙ্গে সামনের দিকে দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী জায়গার এবং পিছনের দিকে শ্লেষ্মানিঃসারক গ্রন্থির ও মস্তিষ্কের উপরের দিককার অংশের কিছুটা মিল আছে।

আজ্ঞাচক্রের সামান্য একটু উপরে মনসচক্রের অবস্থান। তান্ত্রিকদের মতে, এই চক্রটি হল রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ইত্যাদি অনুভূতির কেন্দ্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় এই চক্রটির সঙ্গে মস্তিষ্কের অনুভূতিগ্রাহী অংশের হুবহু মিল আছে।

আজ্ঞাচক্রের ঠিক উপরেই আছে সোম নামক আর-একটি ক্ষুদ্র চক্র। মস্তিষ্কের অনুভূতিগ্রাহী অংশের ঠিক মাঝামাঝি জায়গার সঙ্গে এই চক্রের আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা মিলে যায়।

এই গেল মনস ও সোম সহ আজ্ঞাচক্রের কথা। এর পরেই বিশুদ্ধচক্র। কণ্ঠমূল বরাবর মেরুদণ্ড-সংলগ্ন জায়গাতে এর অবস্থান। তান্ত্রিকরা এই চক্রটিকে বিশুদ্ধ বলে থাকেন; কারণ এর মধ্য দিয়ে জীব শুদ্ধ হয় বলে এঁদের বিশ্বাস। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, ঘাড় বরাবর মেরুদণ্ডের সাতটি অস্থিসন্ধির সঙ্গে বিশুদ্ধচক্রের অবস্থান ও কার্যক্রমের মিল আছে।

বিশুদ্ধের পরবর্তী চক্র অনাহতের অবস্থান নাভিপদ্মের ঠিক উপরে হৃৎপিণ্ড অঞ্চলে। তান্ত্রিকদের বিশ্বাস, এই চক্র থেকেই সাধকরা শব্দব্রহ্মের প্রতীক অনাহত শব্দকে শুনে থাকেন। আধুনিক শারীর-বিজ্ঞানের মতে, এই চক্রটির আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে বক্ষসংলগ্ন মেরুদণ্ডের বারোটি অস্থিসন্ধির সাদৃশ্য আছে।

পরবর্তী চক্র মণিপূরকের অবস্থান নাভিদেশের কেন্দ্রে। গোতমীয় তন্ত্রের মতে, এইখানে অসীম শক্তিশালী সব তেজ থাকে বলে জায়গাটি মণির মতো উজ্জ্বল এবং এ কারণেই এর নাম মণিপূরকচক্র। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, এই চক্রটি কটিদেশ বা কোমরের পশ্চাদ্ভাগকে বোঝাচ্ছে এবং এখানে আছে মেরুদণ্ডের পাঁচটি অস্থিসন্ধি। এ ছাড়া বিশুদ্ধ অনাহত ও মণিপূরকচক্র বলতে ঘাড় হৃৎপিণ্ড ফুসফুস পাকস্থলী ও কটিদেশ অঞ্চলের যে জায়গাগুলোকে বোঝাচ্ছে, সেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে স্নায়ুমণ্ডলী কেন্দ্রীভূত।

স্বাধিষ্ঠান চক্রের অবস্থান নাভিপদ্মের নীচে। স্ব বা পরমলিঙ্গম্ থেকে এর নাম হয়েছে স্বাধিষ্ঠান। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে, এ জায়গাটি নিতম্বের ত্রিকোণাকার অস্থিকে বোঝাচ্ছে এবং এই অঞ্চলে আছে মেরুদণ্ডের পাঁচটি অস্থিসন্ধি।

সব শেষে মূলাধার চক্র অবস্থিত। তান্ত্রিকরা মনে করেন, এখানেই কুণ্ডলিনীশক্তি সুপ্ত হয়ে আছে এবং এখানেই আছে সুষুম্না ও অন্যান্য সমস্ত নাড়ীর মূলদেশ। মূলাধারকে তন্ত্রসাধকরা যুক্ত-ত্রিবেণীও বলে থাকেন। কারণ, তাঁদের মতে, এই হল ইড়া (গঙ্গা) পিঙ্গলা (যমুনা) ও সুষুম্নার (সরস্বতী) সঙ্গমস্থল। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের মতে, মূলাধারের অবস্থান গুহ্যদেশ ও উপস্থ অঞ্চলে এবং এখানে আছে মেরুদণ্ডের চারটি অপরিণত অস্থিসন্ধি।

এইবার প্রধান তিনটি নাড়ী সুষুম্না ইড়া ও পিঙ্গলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। তন্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সমস্ত নাড়ী সুষুম্নার অধীন বিভিন্ন তন্ত্রে এ কথা বারবার বলা হয়েছে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চক্র মূলাধার থেকে বেরিয়ে এটি গিয়ে মিলেছে সহস্রার পদ্মের সঙ্গে। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীতে মেরুদণ্ডের প্রধান প্রতিনিধি স্পাইন্যাল কর্ড্ (spinal cord) এবং এই কর্ড্ই যে সুষুম্নাকাণ্ড এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুষুম্নার মতো স্পাইন্যাল কর্ড্ও মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। তান্ত্রিকদের ন্যায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-সাধকেরাও মেনে নিয়েছেন, গুহ্যদেশ ও উপস্থ অঞ্চল থেকে মস্তিষ্ক অবধি এর বিস্তৃতি। স্পাইন্যাল কর্ড্ মস্তিষ্কের চতুর্থ রন্ধ্রপথ অবধি গিয়েছে। সুষুম্নাকাণ্ডও মস্তিষ্কের এই রকম একটি রন্ধ্রপথে গিয়ে শেষ হয়েছে বলে তান্ত্রিকদের ধারণা।

সুষুম্নার মধ্যে আছে বজ্রিণী নাড়ী। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে, এটি হল মেরুদণ্ডের ভিতরকার ধূসর পদার্থ। বজ্রিনীর ভিতরে আবার আছে চিত্রিনী নাড়ী। চিত্রিনীর মধ্যবর্তী রন্ধ্রপথ দিয়ে ব্রহ্মনাড়ী গেছে বলে তান্ত্রিকদের ধারণা।[২২] এই ধারণার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গতি খুঁজে পাই। শারীর-বিজ্ঞানের মতে, স্পাইন্যাল কর্ডের ভিতরে অতি ক্ষুদ্র একটি রন্ধ্রপথ বিদ্যমান।

অপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ নাড়ী ইড়া ও পিঙ্গলার অবস্থান এবং কার্যক্রমের সঙ্গেও আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক ধারণার সাদৃশ্য রয়েছে। সুষুম্নার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে আছে যথাক্রমে ইড়া ও পিঙ্গলা। ষট্‌চক্রনিরূপণ তন্ত্রে বলা হয়েছে, ইড়া ও পিঙ্গলা যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম শুক্রাশয় থেকে বেরিয়ে সুষুম্নার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব বরাবর কিছুটা বক্রভাবে এগিয়ে গেছে। ষট্‌চক্রনিরূপণ তন্ত্রে ইড়া ও পিঙ্গলাকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ; আর সুষুম্নাকে বলা হয়েছে অগ্নি।[২৩]

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে, স্পাইন্যাল কর্ড্ বা সুষুম্নাকাণ্ডের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে কতকগুলো সহযোগী স্নায়ু আছে। ইড়া ও পিঙ্গলা হল সুষুম্নাকাণ্ডের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বের দুটি বড় স্নায়ুমণ্ডলীর প্রতীক। ইড়া বলতে বোঝাচ্ছে বাম দিকের সহযোগী স্নায়ুমণ্ডল। বাম দিককার নাসারন্ধ্র থেকে বাম মূত্রগ্রন্থি (kidney) অবধি এটি বিস্তৃত। আর পিঙ্গলা হল সুষুম্নাকাণ্ডের ডান দিকে ঠিক এরই অনুরূপ একটি স্নায়ুমণ্ডলী। এই দুটি সহযোগী স্নায়ুমণ্ডলী মস্তিষ্কের নিম্নদেশ থেকে বেরিয়ে মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্ত অবধি এগিয়ে গেছে এবং মেরুদণ্ড বরাবর যাবার সময় সর্বক্ষণ এরা স্পাইন্যাল কর্ড্ বা সুষুম্না-কাণ্ডের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার যে পরিচয় তন্ত্রশাস্ত্রে আছে তা যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এ ছাড়া তন্ত্রে উল্লিখিত সহস্রারের বর্ণনাতেও বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় মেলে। তন্ত্রে বলা হয়েছে, সহস্রার আছে ঊর্ধ্বমস্তিষ্কে। এ থেকেই আত্মার প্রজ্ঞাদৃষ্টি উন্মীলিত হয়, মহাশক্তির বিকাশ ঘটে। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতেও ঊর্ধ্বমস্তিষ্কের বহির্বিভাগীয় ভাঁজগুলো হল আমাদের সমস্ত প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিশক্তির আধার।

---

২২ *Pūrṇānanda's Commentary on Ṣat-Cakra-nirūpaṇa,* Sl. 2.

২৩ *Ṣat-Cakra-nirūpaṇa,* Sl. 1 ; *Yogi-Yājñavalkya Saṃhitā* ; p. 18.

এইবার কুণ্ডলিনীর প্রসঙ্গে আসা যাক। বিভিন্ন তন্ত্রে একে একটি রহস্যময় শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এটি অতি সূক্ষ্ম তন্তুর মতো একটি বস্তু। দেখতে অনেকটা সাপের মতো পেঁচানো। সুষুম্নার মুখের সঙ্গে এই বস্তুটি সংযুক্ত। এই পেঁচানো অতি সূক্ষ্ম সর্পিল পদার্থটিকেই তান্ত্রিকেরা বলেন কুলকুণ্ডলিনী। তন্ত্রকারদের ধারণা, এই কুলকুণ্ডলিনী হল সমস্ত শক্তির উৎসস্বরূপ। অপান বায়ু নীচের দিকে যখন একে চাপ দেয় তখন আমরা নিশ্বাস নিক্ষেপ করি। আর প্রাণবায়ু যখন উপরের দিকে চাপ সৃষ্টি করে তখন আমরা প্রশ্বাস গ্রহণ করি এবং এই ভাবেই চলে আমাদের জীবনের সর্বপ্রধান কার্য। তন্ত্রে বলা হয়েছে, সুষুম্নার মধ্যবর্তী রন্ধ্রপথ বা ব্রহ্মনাড়ী দিয়েই আমাদের জীবনের এই সর্বপ্রধান শক্তি দেহের নিম্নাংশ থেকে মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলী অবধি পৌঁছয়। অনেক তন্ত্রে আবার সুষুম্নাকেই কুণ্ডলিনী বলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কুণ্ডলিনীকে নাড়ী বলা চলে না। তবে কুণ্ডলিনীকে তন্ত্রে যেমন সমস্ত শক্তির উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞানও তেমনি দেহের মধ্যে একটি অদৃশ্য মহাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই শক্তির মাধ্যমেই আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলে। আর চলে আমাদের জীবন-রক্ষার কাজ। এ থেকেই আমাদের সমস্ত অনুভূতি ও প্রজ্ঞার উদ্ভব।

ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না ছাড়াও তন্ত্রে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নাড়ীর কথা বলা হয়েছে। এই সকল নাড়ীর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সংযোগ আছে।

তন্ত্রে কুহু নামে একটি নাড়ীর উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, এই নাড়ীটির অবস্থান সুষুম্নার বাম দিকে। নিতম্বের ত্রিকোণাকার অস্থি-অঞ্চল দিয়ে এবং স্পাইন্যাল কর্ডের বাম দিক ঘেঁষে পুণ্ডিক নামে যে নার্ভটি আছে, তার সঙ্গে কুহুর তুলনা করা যেতে পারে।

ইড়া ও সুষুম্নার মাঝামাঝি জায়গায় এবং সুষুম্নার সমান্তরালে বিশ্বোদরা নামে একটি নাড়ীর উল্লেখ তন্ত্রে পাওয়া যায়। এই নাড়ীটির সাহায্যে কটিদেশের বিশেষ কোনো নার্ভকে বোঝানো হয়েছে বলে মনে হয়।

এ ছাড়া সুষুম্নার বাম দিককার সহযোগী স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে গান্ধারী নামে একটি নাড়ীর কথা তন্ত্রকাররা বলে থাকেন। বাম চোখের প্রান্তের তলদেশ থেকে বাম পা পর্যন্ত এটি বিস্তৃত বলে মনে করা হয়। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানীরাও মনে করেন, ঘাড়ের কাছাকাছি জায়গা থেকে উদ্ভূত হয়ে কোনো কোনো নাড়ী মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে এগিয়েছে এবং তারপর নিতম্বের কাছাকাছি জায়গায় শরীরের নিম্নভাগ থেকে আগত কোনো কোনো নাড়ীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

তন্ত্রের হস্তীজিহ্বা নামক নাড়ীটির বর্ণনায়ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। বিভিন্ন তন্ত্রে বলা হয়েছে, বাম চোখের প্রান্তভাগ থেকে বাম পায়ের বুড়ো আঙুল অবধি কতকগুলো সহযোগী স্নায়ু আছে। হস্তীজিহ্বা রয়েছে এই সহযোগী স্নায়ুমণ্ডলীর ঠিক সামনেই। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, চোখ এবং পায়ের আঙুলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী বিশেষ ধরণের কতকগুলো স্নায়ু আছে।

এ ছাড়া শঙ্খিনী সরস্বতী পূষা ইত্যাদি নাড়ীর যে সব বর্ণনা তন্ত্রে পাওয়া যায়, আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের পরীক্ষায় সেগুলো উত্তীর্ণ হতে পারে।

৬

নাড়ী বা স্নায়ুবিজ্ঞান ছাড়াও তন্ত্রশাস্ত্র আরও বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যের আকর। কতকগুলি তন্ত্রে আমাদের দেহের পরিপাক-ব্যবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রপঞ্চসার তন্ত্র (১১০০-১২০০ খ্রী)। খাদ্যের সার অংশকে আমাদের শরীর কিভাবে গ্রহণ করে এবং কিভাবেই বা অসার অংশকে বর্জন করে, এই তন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, খাদ্য প্রথমে পাকস্থলীতে ('আমাশয়') যায় এবং তারপর যায় 'পিত্তাশয়ে'। সেখানে যকৃত-নিঃসৃত পাচক-রসের ('পিত্ত') সঙ্গে মিশ্রণে তা কটুগন্ধযুক্ত হয়। তারপর এই পদার্থ অন্ত্রে প্রবেশ করে এবং পিত্তের সাহায্যে এর পরিপাক-ক্রিয়া চলতে থাকে। পরিপাক-অন্তে যে 'রস' উৎপন্ন হয়, তা রক্ত-গঠনে সাহায্য করে। তারপর এই রক্ত সমগ্র দেহে সঞ্চারিত হয়। খাদ্যের অসার অংশ ক্ষুদ্রান্ত্রে (গ্রহণী) যায় এবং দেহ থেকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অবধি সেখানে সঞ্চিত থাকে আর জলীয় অসার অংশ পাতলা নাড়ীর মধ্য দিয়ে 'বস্তি'তে (মূত্রাশয়) যায়।

পরিপাক-পদ্ধতির বর্ণনা ছাড়াও খাদ্য ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক তথ্য তন্ত্রে পাওয়া যায়। যেমন, অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে যে স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে মহানির্বাণ তন্ত্রে[২৪] (১২৫০-১৩৫০ খ্রী) সে কথা বলা হয়েছে। কতকগুলো তন্ত্রে[২৫] আবার শরীরকে সুন্দর ও সুস্থ রাখবার পদ্ধতি সবিস্তারে বর্ণিত।

শস্যক্ষেত্র ও ঘরবাড়িকে কেমন করে মশা মাছি ইঁদুর পোকা-মাকড় ইত্যাদির উপদ্রব থেকে রক্ষা করা যায় অসংখ্য তন্ত্রে তার ব্যাখ্যা আছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাগার্জুনের কক্ষপুট তন্ত্র[২৬] (৭০০-৮০০ খ্রী)। এই তন্ত্রটির জায়গায় জায়গায় কৃষি ও উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্বন্ধে মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি পাওয়া যায়। যেমন, এক জায়গায়[২৭] বলা হয়েছে, গন্ধক থেকে যে ধূপ নির্গত হয়, তা যে কোনো ফুলকে বিবর্ণ করতে পারে।

বহু তন্ত্রে গাছ-গাছড়া ও লতা-পাতার মাধ্যমে চিকিৎসার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কল্যাণকামধেনুবিবরণ[২৮] (১১১৪ খ্রী) রসবতীশত[২৯] (১১০০-১৩০০ খ্রী) ইত্যাদি।

৭

এ ছাড়া অনেক প্রাচীন তন্ত্রে প্রাকৃতিকবিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যাদি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে[৩০] (৮০০-১০০০খ্রী) বায়ুর পাঁচটি গুণ বর্ণিত। এই গুণগুলো হল বায়ুর রক্ষণশক্তি (ধারণ) এবং পরিচালন (চালন); সংকোচন প্রসারণ ও ক্ষেপণের ক্ষমতা।

---

২৪ *Mahānirvāna Tantra* (3nd edn. 1953), edited dy A. Avalon.

২৫ দত্তাত্রেয় তন্ত্র, কামরত্ন তন্ত্র

২৬ গৃহক্লেশনিবারণম, শ্লোক সংখ্যা ১১

২৭ আশ্চর্যগুটিকা, শ্লোক সংখ্যা ১৩

২৮ *A Catalogue of Palm-leaf and Selected paper MSS.* (Durbar Libray, Nepal) ; Vol II. (1915) edited dy H. P. Sastri.

২৯ *Catalogue of Sanskrit MSS.* (in the library of the India Office), Part IV (1894).

৩০ জ্ঞান সংকলিনী তন্ত্র (১৯১৬), ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত সম্পাদিত

চিদগগনচন্দ্রিকা তন্ত্রে[৩১] (১০০০-১০২৫ খ্রী) ইন্দ্রিয়ের ধর্ম এবং বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা আছে।

আবহাওয়াবিজ্ঞানের কথা আছে মেঘমালা তন্ত্রে। এই তন্ত্রের একটি পুঁথি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রয়েছে। পুঁথিতে বলা হয়েছে, মেঘমালা রুদ্রযামল তন্ত্রের একটি ,অংশ। রুদ্রযামলকে সবচেয়ে প্রাচীন তন্ত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম বলে মনে করা হয়। অতএব মেঘমালা যিনি নকল করেছেন, তাঁর উক্তিকে সত্য বলে ধরে নিলে এই তন্ত্রটির প্রাচীনত্বে সংশয় থাকে না। মেঘমালা নামটি সার্থক। এই তন্ত্রে বিভিন্ন প্রকার মেঘের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। কোন্ মেঘ থেকে কি ধরণের বৃষ্টি হয় এবং গাছপালার উপর সেই বৃষ্টির প্রতিক্রিয়া কি, এই তন্ত্রে সেই সকল প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তন্ত্রকাররা নীরব নন। সূর্য ও চন্দ্র -গ্রহণের বর্ণনা আছে মাতৃকাভেদ তন্ত্রে। এ ছাড়া সূর্য চন্দ্র ও গ্রহের নিরবচ্ছিন্ন গতি সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য প্রপঞ্চসার তন্ত্রে পাওয়া যায়।

শিল্পবিজ্ঞান নিয়েও প্রাচীন ও মধ্যযুগে তন্ত্র রচিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মঞ্জুশ্রী সাধনম্ (১১০০-১৩০০ খ্রী) তন্ত্রে মন্দির-স্থাপত্যের কথা আছে। আবার কোনো কোনো তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় ঘরবাড়ির নির্মাণ-পদ্ধতি। এই প্রসঙ্গে শিল্পশাস্ত্রম্[৩২] বিশ্বকর্মাশিল্পম্[৩৩] ইত্যাদি তন্ত্রগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তবে সামগ্রিকভাবে দেখলে মনে হয়, শিল্পবিজ্ঞান বা এঞ্জিনীয়ারিং নয়, এমন কি পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানও নয়, রসায়ন চিকিৎসা ও শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধেই তন্ত্রসাধকরা বেশি সচেতন ছিলেন। রসায়ন ও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক বহু তন্ত্রের সন্ধান ভারতে ও ভারতের বাইরে পাওয়া গেছে। এই সকল তন্ত্রের পাণ্ডুলিপি-পাঠ যেদিন সম্পূর্ণ হবে, সেদিন হয়তো প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তন্ত্রের অবদান সম্যকভাবে জানা যাবে।

---

৩১ *Chidgagana Candrikā* : Tantric texts Series Vol. XX ; edited by S. T. Tirtha.

৩২-৩৩ *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts* (Tanjore Maharaja Library, Tanjore)

পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ। ড. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব আছে, এ কথা নতুন নয়। বস্তুত এটা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত অভিমত। অজিত চক্রবর্তী এবং সেকালের অন্যান্য সাহিত্যসমালোচকদের সময় থেকেই কথাটি চলে আসছে। কথাটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হলেও এ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম তথ্যগত এবং বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা তেমন হয়েছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উপনিষদের প্রভাব যেমন সর্বজনস্বীকৃত, তেমনি সেই স্বীকৃতি কেবল কিংবদন্তীরূপে নয়, নানা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে প্রভূত পাণ্ডিত্যের কর্ষণাতেও পরিণত হয়েছে। নির্ভরযোগ্য বই এ বিষয়ে রচিত হয়েছে, কিন্তু 'পদাবলী ও রবীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে গবেষণা ও অনুসন্ধান তেমন যথোপযুক্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

এই রকম অনুসন্ধানের বাধাও আছে। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে উপনিষদের যে স্থান ছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল গ্রন্থ ভাগবতের সেই স্থান ছিল না। ঠাকুরপরিবারে উপনিষদের চর্চা বাংলাদেশের আধুনিক জাগরণের সঙ্গে জড়িত। বাংলার যিনি প্রথম যুগনেতা সেই রামমোহন বেদান্তচর্চার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। উপনিষদের আলোচনা তাঁর সময় থেকেই আরম্ভ হয়। কিন্তু তিনি উপনিষদের অদ্বৈত-ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি উপাসনার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করলেও দ্বৈতবাদকে ঠিক গ্রহণ করেন নি। দেবেন্দ্রনাথের সময় দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তাঁর দ্বৈতবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের অনুরূপ ছিল না। বরং তাঁকে বলা যায় রামানুজের বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের অনুবর্তী। দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় বৈষ্ণবের দাস্য সখ্য বাৎসল্য বা মধুর ভাবের কোনো স্থান ছিল কিনা সন্দেহ। ব্রাহ্ম-সমাজের অনুষ্ঠানগুলি বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হত। দেবেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ রামমোহনের সাকার বিরোধিতা পূর্ণমাত্রায় পেয়েছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ধর্মবিশ্বাস দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবার সুযোগ পায় নি এই বিরোধিতার জন্য। তাঁরা রাধাকৃষ্ণলীলাকে বৈষ্ণব নিত্যলীলা বলেই মনে করেন। এর কোনো রূপকত্বও তাঁদের দ্বারা স্বীকৃত নয়। অথচ এই নিত্যলীলার যে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কাহিনী গড়ে উঠেছে, সে কাহিনীর নৈতিক মর্যাদা লৌকিক দৃষ্টিতে স্বীকার করা কঠিন। মানুষের প্রকৃতি অনেক সময়েই লৌকিক-অলৌকিক মিশিয়ে ফেলে সমাজে দুর্গতি টেনে আনে। বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস লিখতে গিয়ে আর. জি. ভাণ্ডারকর লিখেছিলেন—

The dalliance of Krishna with cowherdess, which introduced an element inconsistent with the advance of morality into the Vasudeva religion, was also an aftergrowth, consequent upon the free intercourse between the wandering Abhiras and their more civilised Aryan neighbours.

রাধাকৃষ্ণের কল্পনা আর্যদের উচ্চতর নীতিবোধসম্পন্ন সমাজে সম্ভব ছিল না বলে উপনিষদে এর

অনুকূল কোনো প্রসঙ্গ নেই। দেবেন্দ্রনাথও ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে তিনি ও তাঁর পরবর্তী ধর্মনেতারা নৈতিক শুচিতা রক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট কঠোর ছিলেন। হয়তো এ বিষয়ে খ্রীষ্টীয় নীতিবোধ তাঁদের প্রভাবিত করে থাকবে। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন—

'...পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরী-কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়কনায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রসর সংকীর্ণ, তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না।'—গ্রাম্যসাহিত্য

রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর প্রাচীনত্ব নিয়ে তর্ক আছে। উপনিষদের যুগে দ্বৈতবাদ যে ভাবেই থাক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে এর যে দার্শনিক তত্ত্ব পাওয়া যায়, বলাই বাহুল্য, উপনিষদে তার কিছুই ছিল না। ব্রাহ্মধর্ম প্রাচীন বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবন; তাকেই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম বলে আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতারা মনে করতেন। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া কতখানি সম্ভব ছিল? ধর্মের দিক দিয়ে না হলেও সাহিত্যরসাস্বাদনের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সাহিত্যের দ্বারা কি ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন? পদাবলী-প্রীতি কি ভাবে তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছিল? তার একটা বিস্তৃত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত করা প্রয়োজন।

পদাবলীর পিছনে যে তত্ত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথ তার দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন, এ কথা বলা কতদূর ঠিক হবে? পরবর্তী কালে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে এই সাধনার কোন চিত্র তিনি এঁকেছিলেন? আবার, 'বোষ্টমী' নামে গল্পটিই বা কি প্রমাণ করে? ভক্তিশাস্ত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কতদূর ছিল? দ্বিজেন্দ্রনাথের হয়তো ছিল কিন্তু তা তাঁর ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে ওঠে নি। প্রথমবয়সে রবীন্দ্রনাথ গীতগোবিন্দের ছন্দে ও ভাষায় মুগ্ধ ছিলেন। 'বৈষ্ণবকবির গান' 'বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস' 'বসন্ত রায়' প্রভৃতি প্রবন্ধ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে সম্পাদিত 'পদরত্নাবলী' এবং স্বরচিত 'ভানুসিংহের পদাবলী' (যাকে তিনি বলেছেন 'বিলাতী আরগিনের টুং টাং শব্দ') শুধু এটাই প্রমাণ করে যে তিনি পদাবলীর রসসৌন্দর্যেই আকৃষ্ট ছিলেন। এই সৌন্দর্য প্রধানত ভাষার ও ছন্দের; দ্বিতীয়ত কবিদের চিরকালীন বিষয়—প্রেম-কল্পনা। 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বলেছেন রাধাকৃষ্ণের গান সৌন্দর্যসৃষ্টির গান। বিষয়-কল্পনার সৌন্দর্য যে রবীন্দ্রকবিচিত্তে প্রভাব ফেলেছিল তার প্রমাণ 'বৈষ্ণব কবিতা' 'পসারিনী' প্রভৃতি কবিতা; বিশেষত রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য—

'রাধাকৃষ্ণের রূপকের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা বাংলার বৈষ্ণব অবৈষ্ণব, তত্ত্বজ্ঞানী ও মূঢ় সকলেরই পক্ষে উপাদেয়, এইজন্যই তাহা ছড়ায় গানে যাত্রায় কথকতায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছে।'

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় আলোচ্য বইটিতে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব-নিরপেক্ষ সেই পদার্থটিকেই মূল সূত্র হিসাবে রক্ষা করে রবীন্দ্রকাব্যের ভাবকল্পনা ও বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্বকল্পনার আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে রাধা ও কৃষ্ণমূর্তির সনাতন ও সর্বভারতীয় রূপের বিস্তৃত ব্যাখ্যান করেছেন। বৈষ্ণব দর্শনের এই বিশ্লেষণ রবীন্দ্রকাব্যপাঠের প্রস্তুতিসাধন। বৈষ্ণব ধর্ম-দর্শনের মধ্যে যেটি সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ সর্বজনগ্রাহ্য বিশ্বাসের অনুকূল দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক তারই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। প্রেম অভিসার কিংবা সীমা-অসীমের তত্ত্ব সর্বজনীন অনুভূতিলোকেরই সামগ্রী।

বৈষ্ণবের বিশিষ্ট দার্শনিক পরিভাষা এবং সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় ব্যঞ্জনাগুলি ছাড়াই সাধারণভাবে এই ভাবকল্পনাগুলি রবীন্দ্রকাব্যে অপূর্বরূপে প্রতিভাত। লেখক বলছেন—

> 'উভয় সাহিত্যের আগাগোড়া না হলেও স্থূলভাবে তত্ত্ব ও সুরের মোটামুটি অভেদ অনস্বীকার্য বলেই মনে হয়। পার্থক্য শুধু নামে ও রূপে। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশিষ্ট সিমবল বা প্রতীক রবীন্দ্রকাব্যে অনুপস্থিত …রবীন্দ্রনাথের সীমা-অসীম তত্ত্ব পদাবলী জগতের রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের বিবর্তিত রূপ।' পৃ. ৩৬-৩৭।

লেখকের এই মন্তব্য রসিকজনোচিত সন্দেহ নেই কিন্তু সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থতামুক্ত নয়। উভয় সাহিত্যের সাদৃশ্য কতটুকু তত্ত্বের আর কতটুকু বিশুদ্ধ কাব্যকল্পনার? পঞ্চভূতের 'মনুষ্য' নামক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য (আলোচ্য গ্রন্থে ২৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) কিংবা 'বৈষ্ণব কবিতা' নামক কবিতার 'সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি' প্রভৃতি মন্তব্যে কোনো বিশিষ্ট তত্ত্ব নয়, মানবীয় অনুভূতি যা কবিমাত্রকেই আকর্ষণ করবে— তারই সৌন্দর্য ব্যক্ত। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে কি এই কথাই বলা চলে না যে এই চিরন্তন মানবলীলাকেই বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা দার্শনিক তত্ত্বে পরিণত করেছিলেন? তৃতীয় অধ্যায়ে ('হ্লাদিনী শক্তি ও রবীন্দ্রনাথ') আলোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রেমকল্পনা ও পদাবলীর লীলার বহু মিল দেখিয়ে গ্রন্থকার আমাদের চমৎকৃত করে দিয়েছেন। পদাবলীর চিন্তানুভূতি এবং রবীন্দ্রকাব্যের বিশ্বানুভূতিকে লেখক নিপুণতার সঙ্গেই তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যাকে সৌন্দর্যসৃষ্টি বলেছেন পদাবলীর সেই প্রণয়পরিস্থিতি রবীন্দ্রকাব্যের একটা পর্যায়ে প্রচুর পরিমাণে দেখা দিয়েছিল— 'চিত্রা' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত। নায়িকার মান বিরহ অভিসার মিলনের-আনন্দ ভাবোল্লাস ও প্রেমবৈচিত্ত এবং প্রদীপ চন্দন পুষ্পমালা শয়ন প্রভৃতি চিত্রকল্পগুলির বার বার উল্লেখও এই পর্যায়ের বিশেষত্ব। লেখক ঠিকই বলেছেন, 'বলাকা'র সময় থেকেই এই বিশেষত্ব কমে আসে। 'বলাকা'র পর রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ে বাউল পদাবলীর প্রভাবটাই বরং সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে *Religion of Man* বৈষ্ণব প্রভাবের চেয়ে বাউলের প্রভাবেরই সুস্পষ্ট সাক্ষ্যবহ।

সমালোচ্য বইটির সর্বশেষ অধ্যায়টির নাম 'পদাবলী ও রবীন্দ্রকাব্যের সাহিত্যমূর্তি'। এতে লেখক রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে দেশের ধর্ম ও ভাবগত ঐতিহ্যের যোগ আলোচনা করেছেন। এই সুখপাঠ্য অধ্যায়টিতে পাঠক রবীন্দ্রসাহিত্যের কতকগুলি ভাবগ্রন্থির পরিচয় পাবেন। সমগ্র বইটিতে অনেক আলোর কণিকা ছড়িয়ে আছে। পাঠক সহজেই তার থেকে নিজের চিন্তার দীপটিকে জ্বালিয়ে নিতে পারবেন।

ভবতোষ দত্ত

চিংড়ি : তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই। অনুবাদক : বোম্মানা বিশ্বনাথম্ ও নিলীনা আব্রাহাম। প্রকাশক : সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী। সাত টাকা।

উনিশ বিঘা দুই কাঠা : ফকীরমোহন সেনাপতি। অনুবাদক : মৈত্রী শুক্ল। প্রকাশক : সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী। পাঁচ টাকা।

মালয়ালম এবং ওড়িয়া থেকে যথাক্রমে গ্রন্থ-দুখানি বাঙলায় অনূদিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্য ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হতে হলে অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। বহুভাষী দেশের নানান সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারি অনুবাদের মাধ্যমে। জাতীয় সংহতি আনতে মনে হয় এইটেই অন্যতম প্রকৃষ্ট পথ। আমরা আশা করি বাঙলা ভাষায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা থেকে তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে অনুবাদের সাহায্যে বাঙালি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

চিংড়ি উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ বাহুল্যবর্জিত প্রাঞ্জল এবং স্বচ্ছ। অনুবাদকরা বাঙালি নন তথাপি বাঙলার চলিতরূপের সঙ্গে তাঁদের এমন নিবিড় যোগ হল কি করে তা জানতে ইচ্ছে হয়। স্থান এবং পাত্রপাত্রীদের নাম এবং দেশাচার পালটে দিলে মনে হবে যেন মূল বাঙলা ভাষায় রচিত একখানি উপন্যাস পড়ছি। গতি কোথাও এতটুকু ব্যাহত হয় নি। জেলেদের জীবনকাহিনী পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র কথা। ভারতের দুটি প্রত্যন্ত প্রদেশের জেলেদের জীবনধারার মধ্যে বেশ কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

উপন্যাসে জেলেদের জীবনধারা, তাদের ধর্মবিশ্বাস ও অন্ধসংস্কার, তাদের দুঃখযন্ত্রণার কথা একটা গভীর তাৎপর্য নিয়ে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটি রোমান্টিক-ধর্মী। সত্যই ব্যর্থতার অভিশাপে অশ্রুময় একটি প্রেমের কাহিনী। জেলের মেয়ে কারুতাম্মা প্রেমে পড়েছে পারীকুট্টি নামে এক তরুণ মুসলমানের সঙ্গে। জাতিধর্মের উর্ধ্বে যে প্রেম অনির্বাণ তা সামাজিক স্বীকৃতি পেল না। কারুতাম্মাকে সকলে ভুল বুঝল। তার অপরাধ ?— সে ভালোবাসতে জানে। ভালোবাসার কি জাত আছে! কিন্তু কারুতাম্মার কপালে জুটলো অন্তর্দহন এবং সামাজিক লাঞ্ছনা। জেলেদের সমাজ তার নামে কুৎসা রটনা করল। তবে কোন্ সমাজ আর এ সব থেকে মুক্ত ? 'পল্লীসমাজ' তো শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমাজের সর্বস্তরে এখনো বেঁচে রয়েছে।

কারুতাম্মা তার খেলার সাথী মুসলমান ছেলেটিকে বাহিরে বিদায় দিল সত্যি, তবে অন্তর্লোকে তার দয়িতকে হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে ফেলেছে। কারুতাম্মার বিবাহিত স্বামী পালানির জন্য ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট রইল না। বিরহী পারীকুট্টি সমুদ্রকূলে তার গান 'জোছনার মধ্য দিয়ে হাওয়ার হাওয়ায়' কারুতাম্মার কাছে পাঠিয়ে দেয়। গানের ভিতর দিয়ে প্রেমকে সার্থক করে তোলে। দুটি নরনারীর 'ভালোবাসা ছিল পবিত্র শুদ্ধ, তাতে খাদ ছিল না, কলঙ্ক ছিল না।' পারীকুট্টির জীবন ধূসর উষর মরুভূমি হয়ে গেছে। একেবারে উদ্দেশ্যহীন জীবন। জীবনটা উলটে পালটে গেল কিন্তু কারুতাম্মার প্রতি ভালোবাসা এতটুকু কমে নি। এদিকে কারুতাম্মার স্বামী পালানির কাছে সন্দেহ যখন নির্মম সত্যে পরিণত হল তখন দেখা গেল পালানির মতো এক বলিষ্ঠ যুবক অন্তঃসারশূন্য হয়ে গেছে। শেষ অধ্যায়ে দেখি, সব কিছু তুচ্ছ করে পালানির রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের বুকে নৌকা টানা ; ঘূর্ণির টানের সঙ্গে

বোঝাপড়ার চেষ্টা, চক্রবালকে ভেদ করতে চাওয়া— সব কিছুর ভিতর দিয়ে লেখকের হাতে পালানির জীবনের ব্যর্থতা অপরূপ ফুটে উঠেছে। অপর দিকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ সমুদ্রবেলায় কারুতাম্মা আর পারীকুট্টির মৃতদেহ পাওয়া গেল। জীবনের ব্যর্থতা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠল।

ওড়িয়া ঔপন্যাসিক ফকীরমোহন সেনাপতির (১৮৪৩-১৯১৮) পৌত্রী শ্রীমতী মৈত্রী শুক্ল অনূদিত 'উনিশ বিঘা দুই কাঠা' বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজনা। ওড়িশায় প্রচলিত জমি ও জিনিসের মাপ ও বছরের হিসাব বাঙালি পাঠকের কাছে অপরিচিত লাগবে তবুও পাঠের সময়ে রসবোধের কোনো ব্যাঘাত ঘটাবে না। ওড়িয়া প্রবাদগুলি বাঙালি পাঠকের ভালোই লাগবে। যে কোনো প্রথমশ্রেণীর বাঙলা উপন্যাস পাঠে বাঙালি পাঠক যে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ পান এই গ্রন্থপাঠে তার অভাব হবে না।

উপন্যাসের নায়ক রামচন্দ্র মঙ্গরাজ। শঠতা দ্বারা সম্পত্তিলাভ ও তার পরিণতি উপন্যাসের বক্তব্য। মাঝে মাঝে অপ্রাকৃতি ও অবাস্তব কল্পনা কিছু কিছু থাকলেও লেখক অতীব নৈপুণ্যের সহিত সাধ্বী স্ত্রী কর্ত্রীঠাকরুণ ও বুড়া মজুর মুকুন্দার চরিত্র চিত্রণ করেছেন। উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্রগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত। চরিত্রগুলি লেখকের জীবনের গভীর অনুভূতির সুস্পষ্ট প্রকাশ।

পাদটীকার সাহায্যে কিছু কিছু বিষয় বাঙালি পাঠককে বুঝে নিতে হবে, সেজন্য পাঠককে কোনো অসুবিধায় পড়তে হবে বলে মনে করি না। পাদটীকার এক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে যে মউসা—মেসো; অনাত্মীয়কে আত্মীয় সম্বোধন কালে বাঙালি বলে, খুড়ো; ওড়িয়া বলে, মউসা। অবশ্য পূর্ববঙ্গে মেসো বলে প্রায়ই অনাত্মীয়তা জানানো হয়।

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

সংশোধন

বর্তমান সংখ্যা পৃ ১৬০— ব্যক্তিপরিচয় : দেবেন স্থলে দেবল

স্বরলিপি

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে।
ও যে সুদূর প্রাতের পাখি
গাহে সুদূর রাতের গান॥
বিগত বসন্তের অশোকরক্তরাগে ওর রঙিন পাখা,
তারি ঝরা ফুলের গন্ধ ওর অন্তরে ঢাকা॥
ওগো বিদেশিনী,
তুমি ডাকো ওরে নাম ধরে,
ও যে তোমারি চেনা।
তোমারি দেশের আকাশ ও যে জানে, তোমার রাতের তারা,
তোমারি বকুলবনের গানে ও দেয় সাড়া—
নাচে তোমারি কঙ্কণেরই তালে॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

পা । না না -া II { না -া -ধনা । র্রর্সা -া -না I ধপা -া পক্ষা । ধা পা -া I
অ ধ রা ০ মা ০ ০ ধু ০ ০ রী০ ০ ধ০ রে ছি ০

I পা -না নপা । পা -র্সা র্সনা I ধপা -া (পা । না না -া)} I -া । পক্ষা পা -া I
ছ ন্ দ০ ব ন্ ধ নে০ ০ অ ধ রা ০ ০ ও০ যে ০

I পা পা পা । পা পা পা I পক্ষা ধপা -া । পমা মা -া I
সু দূ র রা তে র পা০ খি ০ গা০ হে ০

I মা মা গা । রা গা মা I গা -া পা । না না -া II
সু দূ র রা তে র গা ন্ "অ ধ রা ০"

-া । -া -া -া II পক্ষা ধা পা । না না -র্সা I র্সা -া র্সা । র্সা র্সা র্সা I
০ ০ ০ ০ বি০ গ ত ব স ন্ তে ০ র অ শো ক

I র্সা -া র্সা । র্সা -না -র্রা I র্সা র্সা -া । নর্সা র্সা পা I
র ক্ ত রা ০ ০ গে ও র্ র ঙি ন

I পা -া -র্সা । না -া -া I -া -া -া । র্সা র্সা -না I
পা ০ ০ খা ০ ০ ০ ০ ০ তা রি ০

I র্সা র্সা -র্গা । র্রা রা র্রর্সা I র্সা -া -া । র্সা না -পা I
ঝ রা ০ ফু লে র০ গ ০ ন্ ধ ও র্

I পা -র্সা র্সা । না পক্ষা -ধা I পা -া পা । না না -া II
অ ন্ ত রে ঢা০ ০ কা ০ "অ ধ রা ০"

পা । মপা মা -া II মা -গা -া । গা -া -রগা I গা -া -মা । -া গা মা I
ও গো০ বি ০ দে ০ ০ শি ০ ০ নী ০ ০ ০ তু মি

I মপা পা -া । পক্ষা পা -া I পা -না -ধা । পক্ষা পা -মা I
ডা কো ০ ও০ রে ০ না ০ ম্ ধ০ রে ০

I -া -া -া । মা গা -া I গা গপা পা । মা গা -া I -া -া গা ।
০ ০ ০ ও যে ০ তো মা রি চে না ০ ০ ০ ও

। গা মা -া I গা -া -া । গা -া -রগা I গমা -া -া । -া -া -া I
গো বি ০ দে ০ ০ শি ০ ০ নী ০ ০ ০ ০ ০

I { পক্ষা ধা পা । না না নর্সা I র্সা র্সা -া । র্সা র্সা -া I
তো০ মা রি দে শে র০ আ কা শ্ ও যে ০

I র্সা -না -র্রা । র্সা -া -া I পর্সা র্সা র্সা । র্সনা র্রা র্সা I
জা ০ ০ নে ০ ০ তো০ মা র রা০ তে র

I না -ধা -র্সা । না -া -া I -া -া -া । র্সা র্সা র্সনা I
তা ০ ০ রা ০ ০ ০ ০ ০ তো মা রি০

I র্সা র্গা র্গা । র্রা র্রা র্রর্সা I র্সনা র্সা -া । র্সা র্সা -না I
ব কু ল ব নে র০ গা০ নে ০ ও দে য়্

I ধা -র্সা -না । ধপা -া -া } I পা র্সা র্সা । না -পা পা I
সা ০ ০ ড়া০ ০ ০ না চে তো মা ০ রি

I পা -া না । ধা পা -া I পক্ষা ধপা পা । না না -া II II
ক ঙ্ ক ণে রি ০ তা০ লে "অ প রা ০"

সংশোধন

পৃষ্ঠা	স্বরলিপি-ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫২	১	II পা -া । -ক্ষপা -ধণধা ধা ।… দুঃ ০ ০০ ০০০ খ	II পা -া । -ক্ষপা -ধণধা পা ।… দুঃ ০ ০০ ০০০ খ

I র্সা -না -র্রা । র্সা -া -া I পর্সা র্সা র্সা । র্সনা র্রা র্সা I
জা ॰ ॰ নে ॰ ॰ তো॰ মা র রা॰ তে র

I না -ধা -র্সা । না -া -া I -া -া -া । র্সা র্সা র্সনা I
তা ॰ ॰ রা ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ তো মা রি॰

I র্সা র্গা র্গা । র্রা র্রা র্রর্সা I র্সনা র্সা -া । র্সা র্সা -না I
ব কু ল ব নে র॰ গা॰ নে ॰ ও দে য়্

I ধা -র্সা -না । ধপা -া -া } I পা র্সা র্সা । না -পা পা I
সা ॰ ॰ ড়া॰ ॰ ॰ না চে তো মা ॰ রি

I পা -া না । ধা পা -া I পক্ষা ধপা পা । না না -া II II
ক ঙ্ ক ণে রি ॰ তা॰ লে "অ ধ রা ॰"

সংশোধন

পৃষ্ঠা	স্বরলিপি-ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫২	১	II পা -া । -ক্ষপা -ধণধা ধা ।…	II পা -া । -ক্ষপা -ধণধা পা ।…
		দুঃ ॰ ॰॰ ॰॰॰ খ	দুঃ ॰ ॰॰ ॰॰॰ খ